অলৌকিক নয়,
লৌকিক
প্রবীর ঘোষ

অলৌকিক নয়, লৌকিক

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রবীর ঘোষ

অলৌকিক নয়, লৌকিক

দ্বিতীয় খণ্ড

দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ALOUKIK NOY, LOUKIK (VOLUME TWO)

PRABIR GHOSH

প্রথম সংস্করণ
—জানুয়ারি ১৯৯১
—মাঘ ১৩৯৭

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও অঙ্কন :
দেবদত্ত নন্দী

অঙ্গসজ্জা :
বিশ্বনাথ সাহা

প্রুফ-নিরীক্ষা :
সুবাস মৈত্র

মুদ্রাকর :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ফটোটাইপ সেটিং :
সুপার কমিউনিকেটরস প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বি· বি· ডি· বাগ
কলকাতা ৭০০ ০০১

দাম : ষাট টাকা
Rupees Sixty only.

সহযোদ্ধা শ্রীঅশোক দাশগুপ্তকে
সংগ্রামী অভিনন্দন ও শ্রদ্ধাসহ

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

অলৌকিক নয়, লৌকিক প্রথম খণ্ড

পিংকি ও অলৌকিক বাবা

বিশ্ব ক্যুইজ

যাঁদের সৌজন্যে আলোকচিত্র পেয়েছি-

তাপসকুমার দেব

কুমার রায়

সৌগত রায় বর্মন

গোপাল দেবনাথ

জ্যোতিপ্রকাশ খান

সজল মুখার্জি

বিকাশ চক্রবর্তী

অসীম হালদার

ও

আজকাল

ভূমিকা

বিজ্ঞান লেখক মাত্রেই বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজমনস্ক নন। এঁরা অনেকেই তাগা-তাবিজ ধারণ করেন, কুসংস্কারের কাছে ব্যক্তি জীবনে নতজানু হয়েও লেখনিতে হাজির করেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠিন-কঠোর শব্দরাজী। বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজমনস্কতা, শুধুমাত্র কলমের ডগায় বা জিভের আগায় কথার ফুলঝুড়ি জ্বেলে অর্জন করা যায় না, এটা বেঁচে থাকার শ্বাস-প্রশ্বাস ও ভাত-রুটির মতই জীবনের প্রতিমুহূর্তের কাজ-কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ার ব্যাপার। প্রবীর ঘোষ লেখনিতে, কথায় ও জীবনচর্যায় একাত্ম এক বিরল ব্যক্তিত্ব, জীবন্ত কিংবদন্তী। সুদীর্ঘ বছর নিজেকে মগ্ন রেখেছেন সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজমনস্ক করে গড়ে তোলার কাজে। সুকঠিন এই কাজকে বাস্তবায়িত করতে একই সঙ্গে তুলে নিয়েছেন কলম, ছুটে যাচ্ছেন গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে, বক্তব্য রাখছেন, হাতে-কলমে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, গড়ে তুলছেন আন্দোলন, মুখোমুখি হচ্ছেন চ্যালেঞ্জের, প্রলোভনের এবং অবশ্যই মৃত্যুর। যে দেশে সাংসদ বিক্রি হয় গরু-ছাগলের মতই, যে দেশের শাসকদল নির্বাচনের খরচ চালাতে, দলের সম্পত্তি বাড়াতে প্রতিনিয়ত শোষকদের কাছে বিক্রি হয়, যে দেশের শাসক দলের চুনো মস্তানরাও চাকরী-ব্যবসা না করেই গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়ে যায়, সে দেশেরই একজন প্রবীর ঘোষ একটা প্রবন্ধ না লেখার জন্য পনের লক্ষ টাকার প্রস্তাব পেয়েও পরম অবহেলায় ও ঔদাসিন্যের সঙ্গে প্রস্তাবের মাথায় পদাঘাত করেন। বিনিময়ে মেনে নেন জীবনের ঝুঁকি। তাঁর এই নির্লোভ সাহসিকতা বহুজনকে অবশ্যই

প্রেরণা দিয়েছে এবং দেবে। বহুর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে এবং তুলবে জীবনের মূল্যবোধ।

প্রবীর ঘোষের 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো এমন এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন ধর্মের উন্মাদনা ও সম্প্রদায়গত উন্মাদনা দেশের শ্রমজীবী মানুষদের সংগ্রামী প্রতিবাদী চেতনাকে বিশাল অজগরের মতোই একটু একটু করে গ্রাস করে চলেছে। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে যখন পা দিতে চলেছি তখন শাসকশ্রেণী তাদের একান্ত স্বার্থে আমাদের চেতনাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে। জাত-পাতের নামে, ধর্মের নামে লড়তে নেমেছে নিপীড়িত মানুষদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষরা। বঞ্চিত, নিরন্ন এই মানুষগুলোকে 'মুরগী লড়াই' তে নামিয়েছে শাসক ও শোষণ শ্রেণী এবং তাদের কৃপায় পালিতেরা। ভাবাবেগে অথবা নিপুণ কৌশলী প্রচারের ব্যাপকতায় যুক্তি আমাদের গুলিয়ে যায়। আমরা বিস্মৃত হই—যে কোনও ধর্মের, যে কোনও জাতের, যে কোনও ভাষাভাষী কালোবাজারি এবং শোষণকারী সাধারণ মানুষের শত্রু এবং শোষক, আর যে কোনও ধর্মের, যে কোনও জাতের, যে কোনও ভাষাভাষী গরীব শ্রমিক-কৃষক গরীবই এবং শোষিত। শোষিত, নির্যাতিত মানুষের নিজেদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে ভাষা নিয়ে, জাত-পাত নিয়ে অনৈক্য সংঘর্ষ শোষক শ্রেণীর সুবিধেই করে। তাই শোষক শ্রেণী প্রয়োজনে বার বার শোষিত শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ধর্ম-ভিত্তিক, ভাষা-ভিত্তিক, জাত-পাত ভিত্তিক উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করে। সংরক্ষণবাদের তকমা এঁটে যাঁরা নিপীড়িত জনগণের মুক্তির কথা বলেন, তাঁরা বিভেদকামী, মিথ্যাচারী, ধান্দাবাজ ও শোষকশ্রেণীর দালাল ছাড়া কিছু নয়। নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি সংরক্ষণের হাত ধরে কোনও দেশে কখনও আসেনি, আসতে পারে না। বর্তমানে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিপুল উত্থান ঘটেছে, তার কারণ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধর্মকে অবলম্বন করে এমনই এক রাজনৈতিক দর্শন, যে দর্শন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দর্শনকে পুষ্টি যোগাচ্ছে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এই কঠিন সময়ে একান্তভাবে প্রয়োজন এক দীর্ঘস্থায়ী সুপরিকল্পিত মতাদর্শগত সংগ্রামের। আর তারই প্রয়োজনে একান্ত কাম্য সাধারণের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কুসংস্কার মুক্ত, সমাজ সচেতন নতুন এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করা। এমনই এক প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রবীর ঘোষ সংস্কারমুক্ত নতুন সমাজ গড়তে লেখনি তুলে নিয়েছেন। ধর্মান্ধতা বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং সংস্কার মুক্ত সুস্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা গ্রহণকরীদের কাছে এই বইটি অবশ্যই একটি জোরালো হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হবে।

গ্রন্থটির লেখক প্রবীর ঘোষ—'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সম্পাদক, যে প্রতিষ্ঠান কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনে সন্দেহাতীত ভাবে সঠিক, বলিষ্ঠ ও আন্তরিক ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির নামকরণের মধ্যেই রয়েছে বিষয় বস্তুর নির্দেশ। বস্তুত অলৌকিকতার প্রশ্নটি তিনি সমাজ,সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক

থেকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন, তাঁর জ্ঞানের স্বচ্ছ আলোকে আমাদের আলোকিত করতে চেয়েছেন। আমাদের দেশে এই ধরনের ব্যাপক কাজ হয়নি বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না।

গ্রন্থে আটটি অধ্যায়। অধ্যায় শুরুর আগে রয়েছে লেখকের 'যুক্তিবাদী প্রসঙ্গ' লেখা 'কিছু কথা'। 'কিছু কথা'য় রয়েছে যুক্তিবাদ নিয়ে বহু যুক্তির অবতারণার পাশাপাশি আমাদের দেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা। এসেছে মুখোশধারী বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা, বস্তুবাদী রাজনৈতিক নেতা ও বিজ্ঞান সংস্থার কথা। উচ্চারিত হয়েছে বিজ্ঞান আন্দোলনের স্বার্থে এদের চিহ্নিত করা এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার কথা। কারণ এইসব মুখোশধারীরা চিরকালই আমাদের পরিচিত শত্রুদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ভয়াবহ। পাশাপাশি বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের দিশা দেওয়া হয়েছে কী ভাবে তাঁরা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলে প্রত্যেকে এক একজন সংগঠক, যোদ্ধা হয়ে উঠবেন, কী ভাবে মানুষদের সাথে নিয়ে এগুবেন।

পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে এসেছে ভূতে ভর, ডাইনির ভর, ঈশ্বরে ভরের নানা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এবং সে-সব আলোচনায় উদাহরণের সূত্র ধরে বহু অসাধারণ আকর্ষণীয় সত্যি ঘটনা—যার অনেকগুলিই কাল্পনিক অ্যাডভেঞ্চারকেও টেক্কা মারার ক্ষমতা রাখে। এসেছে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার রোমাঞ্চকর বহু কাহিনী। এ-সব কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা অনেকেই আক্ষরিক অর্থেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভূত খ্যাতির অধিকারী। এঁদের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা প্রবীর ঘোষের আগে অনেকেই করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ চেষ্টাকারীদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহু ব্যক্তি ও সংবাদমাধ্যম। প্রবীর ঘোষের নিরবচ্ছিন্ন জয় আমাদের মত সম-মতাবলম্বীদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখায়, লড়াই করার শক্তি যোগায়, যখন শোষক শ্রেণী আমাদের বিরুদ্ধে তিনটে ফ্রন্ট খুলে যুদ্ধ চালিয়ে যায় (এক : অবতার ও জ্যোতিষী, দুই : মুখোশধারী আন্দোলনকারী, তিন : 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের আড়ালে থেকে প্রচার-মাধ্যমকে ও গণ-মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে গণ-ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে আমাদের কাছ থেকে জনগণকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।) তখন অনেক সময়ই আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান দেখে নৈরাশ্যপীড়িত হই, ভুলে যাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে, আর তাইতেই সামনের দীর্ঘস্থায়ী লড়াইকে বড় বেশি ভারী মনে হয়। এই সময় বড় বেশি প্রয়োজন স্বপ্ন দেখানোর। এই স্বপ্নই আন্দোলনকারীদের উদ্বুদ্ধ করবে জনগণকে সংগঠিত করতে। প্রবীর ঘোষের ধারাবাহিক সাফল্য আমাদের স্বপ্ন দেখায়।

গ্রন্থটিতে ডাইনী সমস্যার আলোচনার পাশাপাশি এসেছে তার সমাধানের সম্ভাব্য উপায়। আলোচনায় এসেছে তুক্-তাক, ঝাড়-ফুঁক, বাটি চালান, কঞ্চি-চালান, থালা-পড়া, কুলো-পড়া, চাল-পড়ার মত নানা বিষয় ও তার গোপন রহস্য। বিস্ময়কর শিশু-প্রতিভা তৈরি করা যায়, বাড়ানো যায় স্মৃতি—এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এসে পড়েছে মানুষের ওপর প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক

পরিবেশের প্রভাব প্রসঙ্গ। আলোচনার এই অংশে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী এবং পাঠক-পাঠিকাদের ধন্যবাদ কুড়োবেন—এই প্রত্যাশা রাখি। এই অংশে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বহু বিস্ময়কর শিশু ও কিশোর প্রতিভার। বোঝাতে চেয়েছেন, এদের প্রতিভা বিকাশের কার্য-কারণ সম্পর্কে, প্রমাণ করতে চেয়েছেন এরা কেউই অলৌকিকতার প্রতীক নয়।

অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনীষায় লেখক বিচরণ করেছেন আটটি অধ্যায়ে, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষা কখনই সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বাধার পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায়নি।

প্রবীর ঘোষ দেশের মানুষকে জানতে, তাদের মনস্তত্ত্বকে জানতে, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজনীতি, রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞানকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করতে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে যে সাহায্য পেয়েছেন, তার চেয়ে বহুগুণ তিনি অর্জন করেছেন অধ্যয়ন করে, যাযাবরের মত ঘুরে, মানুষের সঙ্গে আপনজনের মত মিশে। ফলশ্রুতিতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতিয়ার নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি—যুক্তিবাদীদের 'গাইড, ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ফিলোজফার'।

আত্তুর মথুস্বামী

প্রেসিডেন্ট
ইরাডিকেশন অফ হোয়াইট শাড়ি
উইডো রি-হেবিলিটেশন মুভমেন্ট
পেট্রোন
সাইন্স অ্যাণ্ড র‍্যাশানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া
আত্তুর টাউন
তামিলনাড়ু

কিছু কথা

যুক্তিবাদ প্রসঙ্গে

যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রথম কথা, প্রথম সর্ত—আমরা সব কিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করব, শুধুমাত্র তারপরই গ্রহণ করব বা বাতিল করব। আমরা লক্ষ্য রাখব—আমাদের যুক্তি যেন শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠিস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত না হয়। তেমনটি হলে আমরা যুক্তির পরিবর্তে গলার জোর ও পেশীবলের উপরই একটু বেশি রকম নির্ভরশীল হয়ে পড়ব।

কিছু সন্ধিক্ষণ আসে যখন মানুষ যুক্তির চেয়ে আবেগকে মূল্য দেয় বেশি। সেই সময় একটি মানুষ কোন্ যুক্তিকে গ্রহণ করবে এবং কোন্ যুক্তিকে বর্জন করবে—এই বিচারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে ধর্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতা, গোষ্ঠিস্বার্থ ইত্যাদি। এই আবেগকে কাজে লাগিয়েই শোষিত মানুষদের মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস ও ঘৃণার বীজ বপনে পরিকল্পিতভাবে সচেষ্ট থাকে শাসক ও শোষক শ্রেণী। এই পরিকল্পনা শোষিতদের উন্মাদনার নেশায় ভুলিয়ে রাখার স্বার্থে, শোষকদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। আর তাইতেই জন্ম নেয় রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ সমস্যা, চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সমস্যার মত সমস্যাগুলো। শোষক নিজ স্বার্থেই চায় সাধারণ মানুষ যুক্তির দ্বারা নয়, আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হোক।

শোষক শ্রেণী কখনই চাইতে পারে না সাধারণ মানুষের চেতনাকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে, বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে।

এর বাইরেও আমরা ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠিস্বার্থে অনেক সময় হৃদয়াবেগে আপ্লুত হয়ে যুক্তিছাড়া যুক্তিকে অর্থাৎ কুযুক্তিকে সমর্থন করি। যখন আমি একজন বাসকর্মী, তখন অপর কোনও বাসকর্মীর প্রতি যে কোনও কারণে আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই—তা সে আইন ভাঙার জন্যে পুলিশ আইন সম্মত ব্যবস্থা নিলেও। যখন আমি ছাত্র, তখন আমারই সহপাঠী বিনা টিকিটে, ট্রেনে কলেজে আসার সময় গ্রেপ্তার হলেও রেলকর্মীদের হাত থেকে বন্ধুকে মুক্ত করতে স্টেশনে হামলা চালাই। আমি কখনও প্রতিবেশীর মৃত্যুতে ডাক্তারের দায়িত্বহীনতার দাবী তুলে ক্ষোভে ফেটে পরি। আমিই আবার হাসপাতাল-কর্মী হিসেবে ওই আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার দাবীতে হাসপাতালের কাজকর্মকে অচল করে দিই। এই ব্যক্তি স্বার্থে বা গোষ্ঠি স্বার্থে পরিচালিত হয়ে কখনও আমরা বাঙালী, কখন বিহারী, কখনও অসমী, কখনও অন্য কিছু। কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও বা অন্যধর্মী। কখনও শুধুমাত্র ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়ার অপরাধে, ভিন্ন ধর্মীয় হওয়ার অপরাধে, ভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্বাস পোষণ করায় একে অপরের জীবনধারণের অধিকার কেড়ে নিতেও দ্বিধা করি না। যুক্তিহীন আবেগই আমাকে হত্যাকারী, অত্যাচারী করে তোলে, কুযুক্তির দাস করে তোলে।

মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব অতি প্রবল। আমরা পরিবেশগতভাবে সাম্প্রদায়িক হয়েছি, প্রাদেশিক হয়েছি। যুক্তির পরিবর্তে শুধুমাত্র কুযুক্তির সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি। সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদের ইতিহাস পড়ে সাম্প্রদায়িক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছি। 'হিন্দু' ঐতিহাসিকরা 'হিন্দু' রাজাদের রাজাংশ ফিরে পাওয়ার যুদ্ধকে স্বদেশ প্রেমের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভুলে থাকতে চেয়েছি—দেশ শুধুমাত্র একটা ভূ-খণ্ড নিয়ে নয়, ভূ-খণ্ডের মানুষদের নিয়ে। কোনও দেশের উন্নতির অর্থ সেই দেশের অধিবাসীদের উন্নতি। স্বদেশ প্রেম বলতে, দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির প্রতি প্রেম। এই অর্থে রাজাদের দেশপ্রেমের সামান্যতম হদিশ মেলে কী ?

সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের যুদ্ধকে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যুদ্ধ বলে প্রচার করতে চাইলেও বাস্তব সত্য কিন্তু আদৌ তা নয়। আকবরের পক্ষে হিন্দু রাজপুত সেনার সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। সেনাপতি মান সিংহও ছিলেন রাজপুত। অপর পক্ষে রাণা প্রতাপের বাহিনীতে ছিল বিশাল সংখ্যায় পাঠান সৈন্য। সেনাপতি ছিলেন হাকিম খাঁ। এ-ছাড়া তাজ খাঁর নেতৃত্বেও ছিল আর এক পাঠান বাহিনী। অতএব দুই রাজার এই লড়াই কোনও সময়ই মুসলমান ও হিন্দুদের যুদ্ধ ছিল না। ছিল দুই রাজার মধ্যকার স্বার্থের লড়াই।

রাণা প্রতাপের
রাজ্য ফিরে পাওয়ার
চেষ্টাকে স্বদেশ প্রেম বলার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও
কারণই থাকতে পারে না। নিজ স্বার্থে লড়াই স্বদেশ

প্রেমের নিদর্শন হলে, আকবর কেন স্বদেশ প্রেমিক হবেন না ?

● ●

একই ভাবে ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর লড়াইও ছিল এক বাদশাহ এবং এক রাজার স্বার্থের দ্বন্দ্ব মাত্র ।

ইতিহাসের নিরিখে ভারতের মধ্যযুগের দিকে একটু চোখ ফেরান যাক । তুর্কি সেনার বিরুদ্ধে রাজপুত প্রভুদের লড়াই শুধুই দু-দলের সেনাবাহিনীরই লড়াই ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রেই । কোথাও তুর্কি সেনাদের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি । ভোগসর্বস্ব হিন্দু রাজাদের জন্য লড়াই করার কোনও প্রেরণাই প্রজারা অনুভব করেনি । এই কঠিন সত্যকে হিন্দু ইতিহাস রচয়িতারা 'হিন্দু' স্বার্থেই দেখতে চাননি । তাঁরা দেখাতে চাননি—মুঘল যুগে মুঘল বা মুসলমান প্রজারাও ছিল চূড়ান্ত ভাবে শোষিত দারিদ্র্যতায় জর্জরিত ।

'হিন্দু' ঐতিহাসিকরা যেভাবে তুর্কিদের বহিরাগত বলে বর্ণনা করেছেন, আগ্রাসকের ভূমিকায় বসিয়েছেন সেভাবে তো তাঁরা বর্বর আর্য উপজাতিদের চিত্রিত করেন নি ? তুর্কিদের চেয়ে তো আর্যরা কোন অংশেই কম বহিরাগত বা কম বিধর্মী ছিল না । কয়েক সহস্রক আগে তারাও তো তুর্কি ভূখণ্ড থেকেই ভারতে প্রবেশ করেছিল। আর্যরা ভারতীয় হতে পারলে তুর্কিরা কেন ভারতীয় বলে পরিচিত হবে না ? প্রাক্-আর্য জাতি পরাজিত হয়েছিল বলেই তাদেরকে অনার্য-রূপে এমনভাবে ঐতিহাসিকরা চিত্রিত করেছেন যে, বর্তমানে 'অনার্য' শব্দটি 'অসভ্য'-র প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে । অথচ মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও নর্মদা উপত্যকার প্রাক্ আর্য যুগের যে নিদর্শন পেয়েছি তা ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচারিতারই প্রমাণ । তাদের গৃহনির্মাণ প্রণালী, নগরবিন্যাস, বয়ন, অঙ্কন, লিখন, ভাস্কর্য প্রতিটিই ছিল অতি উন্নত পর্যায়ের । আর্যরা প্রাক্ আর্য মানুষদের কাছ থেকে এইসব বহু বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এ কথা চূড়ান্তভাবেই সত্য । আর্য সভ্যতার কোনও নিদর্শন না পাওয়ায় অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, আর্য সভ্যতা ছিল গ্রামীণ । তাই প্রাত্নিক উপকরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি ।

আর্যরাই ভারতে প্রথম সভ্যতার আলো এনেছে, এ কথা যেমন মিথ্যা । একইভাবে মিথ্যা ভারতের বর্তমান সভ্য জাতিগোষ্ঠিগুলো সবই আর্যদের থেকেই সৃষ্ট । এই চিন্তাই আমাদের আর্যজাতির বংশধর হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছে প্রাক-

আর্য জাতিকে অনার্য, অসভ্য হিসেবে চিত্রিত করতে ।

আমাদের দেশের 'হিন্দু' জাতীয়তাবোধ পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা সুলতান মামুদ এবং ঔরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসকে 'হিন্দু' বিদ্বেষের এবং হিন্দুত্বের অপমানের প্রমাণ হিসেবে হাজির করেছে । একই সঙ্গে ষষ্ঠ শতকে হর্ষের একের পর এক হিন্দু মন্দির লুণ্ঠনের ঘটনা বিষয়ে নীরব থেকেছে । হর্ষ তো মন্দির লুণ্ঠনের জন্য 'দেবোৎপাটননায়ক' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীরাই নিয়োগ করেছিলেন । মন্দির লুণ্ঠনের জন্য যদি মামুদ ও ঔরঙ্গজেব হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত হন, তবে হর্ষ একই কাজের জন্য কেন হিন্দু বিদ্বেষী হিসেব চিত্রিত হবেন না ?

হর্ষের মন্দির লুণ্ঠন প্রসঙ্গে আমার এক ইতিহাসের অধ্যাপক বন্ধু জানিয়েছিলেন, "আমাদের আলোচনা করা উচিত শুধুমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে নয়, বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে । সে যুগে মন্দির শুধু দেবোপাসনার স্থল ছিল না, মন্দিরের গুপ্ত কক্ষে সঞ্চিত থাকত ভক্তদের দান ও শ্রেষ্ঠীদের রত্নরাশি । অর্থ ও রত্ন রাজ্য শাসনে অপরিহার্য । রাজ্য শাসনের স্বার্থেই রত্ন আহরণের জন্য হর্ষ মন্দিরে হাত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ।"

এই যুক্তিই মামুদ বা ঔরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হবে না ? গোটা হিন্দু যুগব্যাপী বীর-শৈব ও লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়গুলো যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির মঠ পুঁথি ধ্বংস করে গেছেন, আমাদের দেশের ইতিহাসের বইগুলো সে বিষয়ে নীরব কেন ?

হিন্দুদের জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য মুঘল যুগের শাসকদের 'হিন্দু' ঐতিহাসিকরা যতই তাঁদের লেখনিতে অভিযুক্ত করুন, বাস্তবক্ষেত্রে কোনও মুঘল সম্রাটই কিন্তু গণ-ধর্মান্তরের চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করেন নি । এমনকি ঔরঙ্গজেবও নন । সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে রাজধর্মে দীক্ষিত করা নিন্দনীয়ই যদি হয়, তবে নিন্দার প্লাবনে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত সম্রাট অশোককে । নিজ ধর্মে দীক্ষিত করতে তিনি কী না করেছেন ? তবু তিনি মহান ! তিনি ধর্মাশোক । তিনি শান্তি ও অহিংসার প্রতীক !

সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা এমন ইতিহাসই রচনা করেছেন, যা পড়ে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক ভারতের সমস্ত কিছু গৌরবের কৃতিত্ব হিন্দুদের, যা কিছু অগৌরবের তার সমস্ত কিছুর দায়ই মুসলমানদের । দেশের এই শিক্ষা পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে সাধারণভাবে মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষই পোষণ করেছে । সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্যমূলক আচরণ পেয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতি সন্দেহই পোষণ করছে । ফলে একই দেশে বাস করেও সংখ্যাগুরুদের অবিশ্বাস ও পক্ষপাত সংখ্যালঘুদের ভারতকে আপন দেশ ভাবার সুযোগ দিচ্ছে না । বরং ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে মৌলবাদী পরিবেশই আরও বেশি করে জাঁকিয়ে বসছে ।

ঐতিহাসিকরা গোষ্ঠী
স্বার্থে যে ইতিহাস রচনা করেছেন
তা হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই পুষ্ট করেছে।
দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষের বীজ কৈশোরেই ইতিহাস
পাঠকদের মাথায় বপন করা হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে
সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, রক্তপাত, লুণ্ঠন,
হত্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি
লাভ করেই চলেছে।

যুক্তিবাদীদের কাছে কোন্ যুক্তি গ্রহণীয় হবে ? নিশ্চয়ই এমন কোনও যুক্তি গ্রহণীয় হবে না যা সাম্প্রদায়িক, শুধুমাত্র গোষ্ঠিস্বার্থে চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতা। যুক্তিবাদীরা পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও গোষ্ঠি স্বার্থকে সমর্থনের প্রশ্নই যদি বিশাল বড় হয়ে ওঠে, তবে আমরা দ্বিধাহীনভাবে শোষিতদের স্বার্থকেই নিজস্বার্থ জ্ঞান করব। কারণ, যুক্তিবাদীরা মানবিকতার বিকাশকামী, যুক্তিবাদীরা দেশপ্রেমী। যুক্তিবাদীদের ধারণায় 'দেশ' বলতে মাটি নয়, দেশে বলতে ভূখণ্ডের মানুষগুলো। ভূখণ্ডের সংখ্যাগুরু মানুষদের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমই দেশপ্রেম। আমরা চাই সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তুলতে। যার পরিণতিতে তাঁরা যুক্তি দিয়ে বিচার করে শুধুমাত্র তারপরই কোনও কিছুকে গ্রহণ করবেন অথবা বর্জন করবেন। যুক্তিবাদী চিন্তাই তাঁদেরকে বুঝিয়ে দেবে তাঁদের প্রতিটি বঞ্চনার কারণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এই মুহূর্তে প্লেটোর একটা কথা বড় বেশি মনে পড়ছে।

প্লেটো বলেছিলেন,
"মহান মিথ্যে ছাড়া রাষ্ট্র চালান
যায় না।" এই 'মহান মিথ্যে' দিয়েই শোষিত
মানুষগুলোর প্রতিবাদের কণ্ঠ, বিপ্লবের
ইচ্ছে, একত্রিত সংগ্রামের প্রয়াসকে
প্রতিহত করার চেষ্টা চলেছে
ধারাবাহিকভাবে।

এককালে 'ঈশ্বরতত্ত্ব' মহান মিথ্যে হিসেবে যতখানি কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল এখন আর ততখানি জোরাল ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রশক্তির কাছে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে অবতারদের হাজির করার

প্রয়োজনীয়তা তাই অনেক কমেছে। রাষ্ট্র শক্তি এখন বিজ্ঞান বিরোধিতা করতে বিজ্ঞানীদের উপরই বেশি করে নির্ভর করছে। এসেছে প্যারাসাইকোলজিস্টের দল, যাঁরা বিজ্ঞানের নামাবলী গায়ে দিয়ে বিজ্ঞানেরই বিরোধিতা করতে চায়। উদ্দেশ্য—বিজ্ঞান মনস্কতার ছোঁয়া থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখা।

সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি ঘোষণা করেছে, তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়ে কুলাগিনা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ইতিমধ্যে কুলাগিনাকে নিয়ে ফিল্ম তোলা হয়েছে। নিজের দেশে এবং বিদেশে দূরদর্শনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের সামনে কুলাগিনাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবেই হাজির করা হয়েছে। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় কুলাগিনা সম্পর্কে বিজ্ঞান-আকাদেমির সিদ্ধান্তের কথা অতি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হওয়ায় ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের অলৌকিক বিরোধী বক্তব্যের ক্ষেত্রে বহু মানুষের মধ্যেই যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের যুক্তি রুশ সাইন্স আকাদেমি কি আর মিথ্যে বলেছে ? ওঁদের কাছে আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান আন্দোলনকারীরা তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ি না। ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্রকাশিত 'যুব সমীক্ষা'য় কুলাগিনাকে নিয়ে একটি বহু ছবি সহ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনেও বিজ্ঞান আকাদেমির পরীক্ষা গ্রহণ ও সিদ্ধান্তের কথা লেখা ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে 'যুব সমীক্ষা'কে এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি আমাদের সমিতির কর্মপদ্ধতি। জানিয়েছি, আমাদের সমিতির একটি দল কুলাগিনার অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। এও জানিয়েছি, কুলাগিনার ঘটানো তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা লৌকিক উপায়েই আমি ঘটাতে সক্ষম। শেষ পংক্তিতে ছিল—আপনাদের তরফ থেকে সহযোগিতা না পেলে ধরে নিতে বাধ্য হবো—আপনারা সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক এবং একই সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কালো দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। দূতাবাস আমাদের চিঠি পেয়েছে ফেব্রুয়ারি '৯০-এ। এখনও পর্যন্ত কোনও রকমের সারা না পেয়ে আমাদের মনে সেই সন্দেহটাই গভীরতা পাচ্ছে—সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতে বিজ্ঞানকেই কাজে লাগিয়েছে।

এই ধরনের উদাহরণ দেওয়া যায় ভূরি ভূরি। শুধু সোভিয়েত দেশেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশের রাষ্ট্রশক্তিই বিজ্ঞান মনস্কতা থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখতে বিজ্ঞানীদেরই কাজে লাগাচ্ছেন, প্যারাসাইকোলজি বা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে গবেষণাকে নানাভাবে উৎসাহিত করছেন। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়।

যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে বহু ধরনের প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে সেই সব রাষ্ট্রশক্তি, যারা সাধারণ মানুষের চেতনাকে বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভয় পায়, যারা জানে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগতাড়িত মানুষগুলোকে 'মহান মিথ্যে'র সাহায্যে অবহেলে শাসনে রাখা যাবে, শোষণ করা যাবে। পরিণতিতে 'যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি'কে কাজে লাগাতে রাষ্ট্র যন্ত্রকে সচেষ্ট হতে দেখছি।

এখন রাষ্ট্র শক্তিগুলি টিকে থাকার পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে। যুক্তির বিরুদ্ধে বিপরীত যুক্তির আক্রমণ চালিয়ে সরাসরি লড়াইতে নামার চেয়ে যুক্তি নির্ভর কোনও আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে আপাতদৃষ্টিতে সমধর্মী যুক্তি নির্ভর সাজান আন্দোলনকে গতিশীল করাকে অনেক বেশি কার্যকর মনে করছে।

তারই প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইউরোপে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেই আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দিতে 'যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি'কে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়া যুক্তভাবে প্রচারে নেমেছিল নিউক্লিয়ার বোমের বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষে অসমান বিকাশের ফলে কোনও অঞ্চলে পুরোহিত তন্ত্র প্রবল বিক্রমে বিরাজ করছে, কোথাও পরাবিদ্যা সে জায়গা দখল করতে হাজির করেছে কম্পিউটার জ্যোতিষ, আস্ট্রোপামিস্ট, বিজ্ঞান সম্মতভাবে জ্যোতিষ চর্চার নানা প্রকরণ, আবার কোথাও যুক্তিবাদের সম্প্রসারণ ঠেকাতে মুখোসধারী যুক্তিবাদীদের পথে নামিয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তি মহান মিথ্যে হিসেবে এ সবের সঙ্গে আসরে নামিয়েছে লটারি, জুয়া, টেলিভিশন স্ক্রিনে রামায়ণ, মহাভারত, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন যুগে 'মহান মিথ্যে' পাল্টায়, যুক্তিবাদ কখনই একটা স্তরে থাকতে পারে না। প্রতিটি স্তরের যুক্তিবাদের পাশাপাশি 'মহান মিথ্যে' পাল্টায়, পাল্টায় কুসংস্কার।

আমাদের দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করতেই কোনও কোনও বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি এবং আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তি অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র শক্তির কাছে এ এক বিপদ সংকেত। কুসংস্কার ও জাতপাতের বিশ্বাস যতদিন শোষিত মানুষগুলোর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগোতে পারবে না। শোষিত একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর একটি গোষ্ঠীর অবিশ্বাস ও ঘৃণাকে যতদিন বজায় রাখা যাবে, ততদিন তাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ পাবে না।

শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পেলে কুসংস্কার, জাতপাতের মত বিষয়গুলো দূরে সরে যায়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রেণী চেতনাই হিন্দু মুসলমানদের একসঙ্গে লড়াইতে নামিয়ে ছিল। মাও সে তুং এর 'হোনান' রিপোর্টেও দেখি শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কৃষকেরা নিজেরাই বাড়ির ও 'থানের' অধিষ্ঠিত কাঠের দেবমূর্তিগুলিকে অপ্রয়োজনীয় এবং কুসংস্কার প্রসূত জ্ঞান করে চ্যালা কাঠ করে জ্বালানী বানিয়েছিল।

আমাদের দেশে 'যুক্তিবাদ' এখন আন্দোলন গড়ার স্তরে। প্রতিরোধে স্বার্থান্বেষী মহল অতি সচেতন। 'যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে কাজে লাগাবার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। মেকি আন্দোলন সৃষ্টি করতে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা, রাষ্ট্রশক্তি। বিদেশী সাহায্যে বা রাষ্ট্র যন্ত্রের সহযোগিতায় শুরু হয়ে গেছে তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলন।

জনগণের মধ্যে যুক্তিবাদী চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একান্তভাবেই প্রয়োজন একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টার। এরজন্য প্রয়োজন অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ না পাওয়া তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের মধ্যে হাজির হয়ে তাদেরই সঙ্গে আপনজনের মত মিশে-গিয়ে কুসংস্কার ও তার মূল কারণগুলো বিষয়ে সচেতন করা। প্রয়োজনে তাদের সামনে হাতে-কলমে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়গুলো হাজির করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই নিরক্ষর। আমাদের লেখা তাদের মধ্যে সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারে না। সমাজ সচেতন মানুষরা নিজেদের তৈরি করে নিয়ে তাদের কাছে আহরিত জ্ঞান বিতরণ করলে তবেই সাধারণ বঞ্চিত মানুষদের চেতনার বিকাশ সম্ভব, যুক্তিবাদী চিন্তাকে জনগণের আন্দোলনে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর জন্য চাই বহু সমাজ সচেতন কর্মী। কিছু কিছু মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে যতটুকু কাজ করছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল।

আমাদের সমিতি বহু সহযোগী ও সম-মনোভাবাপন্ন সংগঠনের সাহায্যে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে যাচ্ছে, মানুষের মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, সক্ষমও হচ্ছে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি কৃষক-শ্রমিক ঘরের নিরন্ন ছেলে-মেয়েরা কী অসাধারণ দক্ষতায় প্রাণঢালা আন্তরিকতায় মানুষের ঘুম ভাঙাতে গান বেঁধেছে, গাইছে, নাটক করছে, আলোচনাচক্রে অন্যদের বোঝাচ্ছে, হাতে কলমে ঘটিয়ে দেখাচ্ছে অনেক বাবাজী-মাতাজীদের বুজরুকি। সাধারণ মানুষদের দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—যে-কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা তারা দেবে। গ্রহণ করবে যে কোনও অবতার বা জ্যোতিষীদের চ্যালেঞ্জ। এদের প্রত্যেকটি আশ্বাস ও চ্যালেঞ্জকে মূল্য দিতে, রক্ষা করতে আমি ও আমাদের সমিতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা প্রয়োজনে প্রতিটি সহযোগী সংস্থার এই জাতীয় দায়-দায়িত্ব অতি আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করে থাকি। পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও সম-মনোভাবাপন্ন মানুষদের নিয়ে স্টাডি ক্লাসের ব্যবস্থা করি, নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানকে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও স্বচ্ছ করতে।

শুধু সহযোগী সংস্থার ক্ষেত্রেই নয়, যে ব্যক্তি বা সংস্থা আমাদের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করেছেন, তাঁরাও যখনই কোনও অলৌকিক বিষয়ক ব্যাখ্যা চেয়েছেন অথবা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন—আমরা সহযোগিতা করেছি।

আমরা জানি, তবুও আমরা অনেকেরই দাবি মেটাতে পারছি না, অনেকেরই বিশাল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছি না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে যখনি কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়, সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি আসতে থাকে উৎসাহী, জিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছ থেকে। তাঁরা চান পত্র-পত্রিকাগুলোয় এই বিষয়ে আমার বা আমাদের মতামত যেন জানাই। বিশেষ করে যখন কোনও পত্র-পত্রিকায় আমাকে বা আমাদের সমিতিকে আক্রমণ চালিয়ে বা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চিঠিপত্র, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই আমার এবং আমাদের সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল সর্বশ্রেণীর মানুষ প্রত্যাশার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোন—আমি নিশ্চয়ই কিছু উত্তর দেব। সহৃদয় উৎসাহী পাঠক এবং বিজ্ঞানকর্মী ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীরা আমার এবং আমাদের সমিতির উত্তরের প্রত্যাশায় পত্র-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য রাখেন। উত্তর প্রকাশের প্রত্যাশিত সময় পার হয়ে গেলে নিরাশ, সহৃদয়, সহানুভূতিশীল মানুষগুলো আমাকে চিঠিও দেন। নীরবতার কারণ জানতে চান। জানি, চিঠি দেন না এমন আশাহত মানুষের সংখ্যা আরও বহুগুণ বেশি। বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে এই নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হয়। মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তরে যা জানাই, এখানেও সমস্ত সহানুভূতিশীল শ্রদ্ধেয় প্রতিটি জিজ্ঞাসু পাঠকদের, মানুষদের তাই জানাচ্ছি।

অতি স্পষ্ট ভাবেই জানাতে চাই, আমি জেনেছি, শুনেছি অথবা পড়েছি অথচ উত্তর দিইনি, এমন ঘটনা একটিও ঘটেনি। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সেগুলো প্রকাশ না করে ধারাবাহিকভাবে আশ্চর্যজনক নীরবতা পালন করে চলেছেন।

এমনকি এমন ঘটনাও
বহুবার ঘটেছে, আমাদের বিরুদ্ধে
চ্যালেঞ্জ জানানো চিঠি যে পত্রিকা
প্রকাশ করেছেন, তাঁরাই কিন্তু
এই বিষয়ে আমাদের উত্তর
প্রকাশ করার সামান্যতম
নৈতিক দায়িত্বটুকুও
পালন করেননি।

সত্যতা বিচার করার সামান্যতম চেষ্টা না করে মিথ্যে খবর প্রকাশ করার প্রবণতা বহু পত্র-পত্রিকাতেই বিপদ্‌জনক ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতাকে রোধ করার

দায়িত্ব কিন্তু প্রতিটি সমাজ সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের, শুধুমাত্র আমাদের নয়।

আমরা যখন এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষিত নিরন্ন মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংস্কৃতি ও চেতনাকে তুলে আনতে চেষ্টা করছি, সমাজ সচেতন করে তুলতে চাইছি, ঠিক তখনই আমাদের সামনে এলো বিদেশী সাহায্যের প্রলোভন। আমাদের স্পষ্টতই মনে হয়েছিল, সাহায্য পাওয়ার বিনিময়ে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে যুক্তিবাদী আন্দোলনের মৃত্যুবাণ। বিদেশী সংস্থারা যেমন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে, যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিকে নিয়োজিত করতে সাহায্যের ঝুলি হাতে ব্যক্তি ও সংস্থাকে ধরতে বেরিয়ে পড়েছে, তেমনই কিছু সংস্থার কর্ণধার ও কিছু ব্যক্তি বিদেশী সাহায্য শিকার করতে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছে। আমরা যে আমেরিকান সংস্থার সাহায্য ঠেলে দিয়েছি অবহেলে পরম ঘৃণায়, সে সাহায্য নিয়েই স্বগর্বে নিজেদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে চলেছে এক স্বঘোষিত যুক্তিবাদী সমাজসচেতন পত্রিকাগোষ্ঠি ও তাদের গুরু—বিদেশী প্রেমে আনন্দমুখর মহান যুক্তিবাদী নেতা। এই পত্রিকাগোষ্ঠি সোচ্চারে ঘোষণা করেন, জেমস র‍্যাণ্ডি, মার্ক প্লামার ও তাঁদের ভারতীয় এজেন্টদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে বিপ্লব আনবেন। আমেরিকা থেকে যাঁরা বিপ্লব আমদানীর কথা বুক ঠুকে ঘোষণা করেন, তাঁরা এক নিশ্বাসে আরও দুটি কথা ঘোষণা করে থাকেন—অবতার ও জ্যোতিষী বিরোধী ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জ 'মহান' এবং প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ 'অশোভন'। বিচিত্র এঁদের 'মহান' যুক্তি। এঁদের এই স্ববিরোধিতা ও যুক্তিহীনতার পিছনে দুটি বিষয় কাজ করতে পারে। এক : তীব্র ঈর্ষাকাতরতা। দুই : বিদেশী সাহায্যকারীরা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগতে যে যোগ্য ও অপরিহার্য মানুষদেরই বেছে নিয়েছেন, এই বিষয়ে তারা যে সর্বোত্তম, এমনটা প্রমাণ করতে গিয়ে উচ্ছ্বাস মাত্রা ছাড়িয়েছে। এমনও হতে পারে, দুটো কারণই কাজ করেছে।

এই মেকী আন্দোলনকারীরা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার আয়াসসাধ্য ব্যাপার-স্যাপারে আগ্রহী নন। ওঁরা নিরাপদ দূরত্বে বসে মহানগর থেকে পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়েই নিজেদের পক্ষে হাওয়া তুলতে আগ্রহী। ওঁদের কাছে 'আন্দোলন', 'সংগঠন' ইত্যাদি শব্দগুলো বড় বেশি স্বার্থ-বিরোধী। তাই মূল যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে, একজনকে কিংবদন্তী পুরুষ করে তুলতে প্রতিনিয়ত ব্যাপক ও নিবিড় প্রচার চালিয়েই যান। যাঁর পক্ষে এই প্রচার তিনি কিন্তু একদিনের জন্যেও সমাজ সচেতনতার প্রতি পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে উচ্চারণ করেননি—ঈশ্বর, অবতার, জ্যোতিষী, অলৌকিক, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদির প্রতি সাধারণ মানুষের, শোষিত মানুষের প্রবল অন্ধ-বিশ্বাসের কারণগুলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, পালিত হচ্ছে, পুষ্ট হচ্ছে শোষকশ্রেণী ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীদের স্বার্থে। শোষক শ্রেণী চায় শোষিত মানুষ তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী না করে দায়ী করুক নিজেদের ভাগ্যকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে এবং ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে।

ওই কিংবদন্তীর নায়কও যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার আয়াসসাধ্য ব্যাপার-স্যাপারে

আগ্রহী ছিলেন না। নিজের প্রয়াসকে নিয়োজিত রেখেছিলেন শুধুমাত্র বাবাজী-মাতাজীদের চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যেই।

সাধারণ মানুষরা ওই অসাধারণ বিজ্ঞান পত্রিকা গোষ্ঠির চোখে কেমন ?—তারই একটা উদাহরণ পেশ করছি। '৮৯-তে উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রামে সাত-আটটি বিজ্ঞান সংস্থা মিলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন, শিরোনাম ছিল 'বিজ্ঞান আন্দোলন কী ? ও কেন ?' আমন্ত্রিত ছিলেন এই পত্রিকা গোষ্ঠি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং আমাদের সমিতি। পত্রিকাগোষ্ঠিকে বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানাতে পর্যায়ক্রমে উঠলেন এক ডাক্তার ও এক ডক্টরেট। তাঁরা দর্শকদের বললেন—'বিজ্ঞান আন্দোলন কী ? ও কেন ?' ও-সব নিয়ে আলোচনা, এ সভায় অর্থহীন বলেই মনে করি। কারণ ও-সব ভারী ভারী কথা বললে আপনারা কিছুই বুঝবেন না। তার চেয়ে বরং আপনাদের কোনও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিন, উত্তর দিচ্ছি।'

ওঁদের নাক উঁচু ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যে দর্শকরা অপমানবোধ করেছিলেন। আমরাও হত-চকিত হয়েছিলাম এমন চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন, নাক তোলা বক্তব্যে। ওঁরা তবে সাক্ষরতার সুযোগ না পাওয়া মানুষদের কী বলবেন ? তাঁদের বাদ দিয়েই শুধু উচ্চকোটির মানুষদের নিয়েই কি ওঁরা বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ার স্বপ্ন দেখেন ? সেদিন ওঁদের ধৃষ্টতার জবাব শ্রোতারাই দিয়ে দিয়েছিলেন তীব্র ধিক্কারে।

আবার আর এক ধরনের সদা-সতর্ক বিজ্ঞান আন্দোলনের স্রোতও এদেশে লক্ষ্য করছি। যাঁরা অবতার বা জ্যোতিষীদের বুজরুকি ফাঁস করার নামে মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত হানতে নারাজ। তাঁদের ধারনায় এই পথ 'হটকারি' পথ। এতে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। এঁদের চোখে বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলন।

আমাদের সমিতির দৃষ্টিভঙ্গিতে সে কাজ সরকারের প্রশাসনের। গ্রামে গ্রামে টিউব-কল, বিদ্যুৎ, ফোন, দূরদর্শন ইত্যাদি বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধে পৌঁছে দেওয়া যদি বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য হয়, তবে তো রাজীব গান্ধীকেই ভারতের বিজ্ঞান আন্দোলনের সবচেয়ে বড় নেতা হিসেবে ওই বিজ্ঞান আন্দোলন গোষ্ঠির পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

আমাদের চোখে বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ—বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ার আন্দোলন, সাধারণ মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ করার আন্দোলন।

বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিজ্ঞান

আন্দোলনের জন্য অর্থের প্রয়োজনের চেয়ে, অর্থের জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন করাটা বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

মুখোশধারী যুক্তিবাদীদের ভিড় যত বাড়বে, সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের বিপদও ততই বাড়বে। ভারতীয় উপমহাদেশে কম্যুইনিজমের হাওয়া পৌনে এক শতাব্দি ধরে বইলেও, এই অঞ্চলে যুক্তিবাদী মানুষ আজও দুর্লভ। যুক্তিবাদী বলে পরিচয় দিয়ে যাঁরা সমাজে বিচরণ করেন তাঁদের বেশির ভাগই রত্নধারী যুক্তিবাদী, তাবিজধারী যুক্তিবাদী, হিন্দু যুক্তিবাদী, মুসলমান যুক্তিবাদী, ব্রাহ্মণ যুক্তিবাদী, তপসিলী যুক্তিবাদী, বাঙালী যুক্তিবাদী, বিহারী যুক্তিবাদী, পারলৌকিক কর্মে মুণ্ডিত-মস্তক যুক্তিবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা একই সঙ্গে বিজ্ঞান মেলা ও ধর্মসভা উদ্বোধন করেন, পুজো কমিটি ও বিজ্ঞান সংস্থার চেয়ারম্যানের চেয়ারটি কৃপা করে অলংকৃত করেন, জ্যোতিষ সভা ও বিজ্ঞান সভা দুয়েরই সমৃদ্ধি কামনা করে বাণী পাঠান। এরই সঙ্গে আর এক নতুন হুজুক—আধ্যাত্মিক জগতের রাজা-মহারাজাদের দিয়ে বিজ্ঞান সভার উদ্বোধন করানো। এইসব রাজা-মহারাজের দল 'অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার কোনও বিরোধ নেই' ইত্যাদি বলে শ্রোতাদের চিন্তাকে আরো বেশি বিভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ করে তুলছেন।

'৮৮-র একটি ঘটনা। স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শীর্ষক আলোচনা সভায় গেছি। সেখানে আমার বক্তব্যের সূত্রে ধরে এক স্বীকৃত মার্কসবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বললেন, 'আমি প্রবীরবাবুর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। বস্তুবাদে বিশ্বাসী মানুষও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতেই পারেন।'

বছর দুয়েক আগে জনৈক প্রগতিশীল বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক একটি আড্ডায় বলেছিলেন, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেও যুক্তিবাদী হওয়া যায়।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতাকে বলতে শুনেছিলাম, 'বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বা অধ্যাত্মবাদের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। বরং অধ্যাত্মবাদই পরম বিজ্ঞান।

'৮৩ সালে তপসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ডাইনিবিদ্যা ও ডাইনি বিশ্বাসের রূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এক আলোচনাচক্রে যোগ দেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষণাগারের গবেষকবৃন্দ, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ ও বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এইসব সমাজ সচেতনতার দাবিদার ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেরই আলোচনায় যুক্তির পরিবর্তে একান্ত বিশ্বাসের কথাই উঠে এসেছিল। এঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী জানগুরুরাও। ডাইনিবিদ্যার অপকারিতা বিষয়ে ডাইনিদের সচেতন করতে নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বললেন কেউ। কারো বা ধারণা, এখনকার জানগুরুদের আগেকার দিনের জানগুরুদের মতন অতটা অলৌকিক ক্ষমতা নেই। তবে জানগুরুদের ঠেকাতে তাদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বুঝুন! আলোচকদের ধারণাটাই যদি এমনতর ভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ হয়, তবে আদিবাসীরা রোগের ও মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডাইনিদের দোষী সাব্যস্ত করলে সেটা খুব

একটা অস্বাভাবিক ঘটনা বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে কী ?

এতক্ষণ যেসব মুখোসধারী যুক্তিবাদীদের, অস্বচ্ছ চিন্তার যুক্তিবাদীদের, ভ্রান্ত চিন্তার যুক্তিবাদীদের কথা বললাম, জানি না এঁদের কত জন অস্বচ্ছচিন্তার শিকার, কতজন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার ঠিকা নিয়েছেন।

বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যেও চিন্তার স্ব-বিরোধিতা, স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির অভাব, আদর্শহীনতা এবং নেতা সাজার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীরা সচেতন না হলে, যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ভুল পথে চালিত করতে সদা সচেষ্ট, যাঁরা শোষিত শ্রেণীর চেতনাকে বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভীত, তাঁরাই কিন্তু বিজ্ঞান আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে মেকি আন্দোলনের পালে ঝড় তুলবে।

আপনি আমি আমরা যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে, বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, সেই আমরা যদি নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

আমরা অর্থাৎ বিভিন্ন গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে ব্রতী বা ইচ্ছুক, সেই আমরা যদি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, গণসংগঠন ও ক্লাবগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাধারণ মানুষদের সামনে হাজির করি কুসংস্কার বিরোধী আলোচনা, শিক্ষণ-শিবির, নাটক, মাইম, গান, পোস্টার ইত্যাদি, যদি হাতে কলমে ঘটিয়ে দেখাই অলৌকিক বাবাদের সব কাণ্ডকারখানা, যদি স্পষ্ট ঘোষণা রাখি—আপনাদের এলাকার কোনও অলৌকিক বাবাজী-মাতাজীদের লৌকিক কৌশল জানতে চাইলে আমরা অবশ্যই জানাবো। আপনার এলাকার কোনও অবতার বা জ্যোতিষী তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা বা জ্যেতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে চাইলে সে চ্যালেঞ্জ আমরা নেবো——তবে নিশ্চিতভাবে দেখবেন আমরা স্থানীয় মানুষদের দীর্ঘ দিনের অন্ধ বিশ্বাসকে নিশ্চয়ই নাড়া দিতে পেরেছি। কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যার প্রশ্নে, কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রয়োজনে অথবা আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোনও সহযোগিতার প্রশ্নে আমি ও আমাদের সমিতি আপনাদের পাশে আছি, থাকবো। আসুন আমরা সকলে মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনের শরিক হই।

কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনে নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা নিজেরা নিশ্চয়ই আমাদের নিজেদের নিজেদের এলাকার মানুষদের নিয়ে বসতে পারি সপ্তাহে বা মাসে অন্তত একটি করে দিন। সাধারণ মানুষদের পাশাপাশি ডাকি না কেন দল-মত নির্বিশেষে আমাদের পাড়ার শিক্ষক, ছাত্র, অধ্যাপক, চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীদের। আলোচনায় বসার আগে সুযোগ-থাকলে আলোচ্য বিষয় নিয়ে সাধ্যমতো পড়াশুনো করে নিলে প্রয়োজনে প্রশ্ন তুলে, অথবা নিজের পড়ে জানা মতকে সাধারণের সামনে তুলে ধরে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনাসভাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি। আর, একান্ত পড়ার সুযোগ না পেলে আলোচকদের কথা শুনে নিজেদের জ্ঞান বর্ধিত ও পরিমার্জিত করতে পারি। মনে কোনও প্রশ্ন হাজির হলে, নিশ্চয়ই আমরা তা হাজির করবো। না জানা বিষয় জানার চেষ্টায় প্রশ্ন করা বিজ্ঞতার এবং না জেনে

জানার ভান করা মূর্খতারই লক্ষণ। আলোচনার বিষয়ের তো অভাব নেই—যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান আন্দোলন, ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র, আত্মা, জাতিস্মর, প্ল্যানচেট, ভর, বিশ্বাসে রোগ মুক্তি, এমনি কত বিষয়ই পাওয়া যাবে।

আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেই নিশ্চয়ই কুসংস্কার বিরোধী বুলেটিন, বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করতেই পারি, তা সে যত কৃশ কলেবরের বা হাতে লেখাই হোক না কেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা চেষ্টা করলে কিছু লিখতে পারি, আসুন না তাঁরা সাধারণের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে সাধ্য-মতো কলম ধরি সংস্কার মুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে। এই জাতীয় লেখার বিষয়ের তো শেষ নেই। শেষ কথা তো কোনও দিনই বলা হবে না বা লেখা হবে না। যুক্তিবাদ এগুবে, প্রতিটি স্তরের যুক্তিবাদের পাশাপাশি ভাববাদী দর্শনও যুক্তিবাদকে রোখার স্বার্থে পাল্টাবে, এগুবে নতুন নতুন রূপে।

শত-সহস্র বছর ধরে আমরা ভাববাদী সাহিত্য, সংগীত, নাটক, শিল্প ইত্যাদি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই বেড়ে উঠছি। সেই পরিমণ্ডলের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে চাই যুক্তবাদী মুক্ত-চিন্তার এক পরিমণ্ডল। এর জন্য সাহিত্য, সংগীত,নাটক ইত্যাদিতে চাই ভাববাদী চিন্তার বিরোধিতা, যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার। এর জন্য চাই বেশি বেশি করে ভাববাদ বিরোধী বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হোক, রচিত হোক সংগীত, নাটক, শিল্প।

বহু সংস্থা ও ব্যক্তি এ-বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের সাধ্যমত বিজ্ঞানমনস্ক বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন, যদিও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পক্ষে বর্তমানের এই সামগ্রিক প্রচেষ্টাও প্রয়োজনের তুলনায় যৎ-সামান্য। তবুও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে প্রচণ্ড রকমের আশাব্যঞ্জক। আশা রাখি, নতুন চেতনার পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে আরো বেশি বেশি করে মানুষ ও সংস্থা এগিয়ে আসবেন এবং তাঁদের সাধ্যমত নিজেদের ভূমিকা পালন করবেন।

আমাদের সমিতি এবং আমি মনে করি, শুধুমাত্র কোনও সংস্থার ওপর বা সেই সংস্থার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলে তা শুধুমাত্র স্বপ্নই থেকে যাবে। কারণ, ভাববাদী দর্শনের ওপর আক্রমণ যখন তীব্রতর হবে তখন শোষক শ্রেণী-স্বার্থ বা রাষ্ট্রশক্তি কঠিন প্রত্যাঘাত হানবে। এরা আন্দোলনের মূল উৎপাটন করতে নেতৃত্বদানকারী সংস্থা ও ব্যক্তিদেরই চিহ্নিত করে তাদের উপরও সর্বপ্রকার নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাবে। এই জাতীয় আক্রমণে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি শেষ হয়ে গেলেই যাতে আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে না যায় তারই জন্য প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংস্থার যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী হওয়া একান্তই প্রয়োজন। এমনটি হতে পারলে, শোষক শ্রেণী ও রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্বকে আঘাত হেনে আন্দোলন শেষ করে দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই একটি মাত্র কারণে আমরা সংগঠনের তরফ থেকে কোনও মুখপত্র প্রকাশ থেকে বিরত ছিলাম এতদিন। জানতাম, আমরা প্রথম থেকেই আমাদের মুখপত্র 'যুক্তিবাদী' প্রকাশ করতে থাকলে আমাদের সহযোগী, সহযোদ্ধা বহু সংগঠন ও শাখা

সংগঠন আমাদের ওপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আমরা বরং বিভিন্ন সংগঠন ও সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করেছি পত্র-পত্রিকা ও বই প্রকাশে। আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

আমাদের সমিতি যখন সামগ্রিকভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন সংস্থার সহযোগী ও সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে চলেছে, বিভিন্ন সংস্থাকে নানা ধরনের কার্যক্রমে, অনুসন্ধানে, পরিসংখ্যান গ্রহণে ও গবেষণা কাজে, বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে, নাটক করতে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করে চলেছে, ঠিক তখনই একটি কুসংস্কার বিরোধী গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদকারী জনৈক বিজ্ঞান লেখক তাঁর বইটির ভূমিকায় সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, তাঁর বইয়ের (অনুবাদ কর্মটির) জনপ্রিয়তায় অনেকেই নাকি স্রেফ কিছু কামানোর ধান্দায় অথবা ব্যক্তি প্রচারের জন্য এইজাতীয় বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে মন দিয়েছেন।

অনুবাদকের এই ধরনের রুচিহীন মন্তব্যে বহু সংস্থা ও ব্যক্তি ব্যথিত হয়েছেন—আমরা জানি, আমাদের সমিতিও একইভাবে ব্যথিত। তাঁর এইজাতীয় অশালীন মন্তব্যকে উপযুক্ত ধিক্কার জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই। ওই অনুবাদক যদি মনে করে থাকেন, কুসংস্কার বিরোধী বই লেখার ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি এবং তাঁর ক্ষুদ্র পত্রিকাগোষ্ঠিই একচেটিয়া 'ঠিকা' নিয়ে রেখেছেন, তবে বলতেই হয়, তিনি ভাববাদী পরিমণ্ডল বজায় রাখার ক্রীড়নক হিসেবে শোষণ শ্রেণী ও রাষ্ট্র ক্ষমতারই সহায়তা করছেন। অনুবাদকের কাছে আমাদের একটি বিনীত জিজ্ঞাসা—তিনি যে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলেন, সেই মূল গ্রন্থটি অনুবাদের বহু বছর আগে থেকেই যুক্তিবাদী নির্ভর দর্শন, রচনা, শ্লোক, গ্রন্থ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সেইসব রচনার জনপ্রিয়তার কারণেই কি মূল গ্রন্থের লেখক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন বলে অনুবাদক একান্তভাবে বিশ্বাস করেন ? বিনীতভাবে আর একটি কথা নিবেদন করি—এই লেখক ওই অনুবাদকের দ্বারা গ্রন্থটি অনুবাদের বহু আগে থেকেই বাংলা ভাষার এক সময়কার জনপ্রিয়তম সাপ্তাহিক 'পরিবর্তন' পত্রিকায় 'লৌকিক-অলৌকিক' শিরেনামে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জের 'প্লাস পয়েন্টকে' কিছু অক্ষম ঈর্ষাকাতররা 'ব্যক্তি প্রচার' অশোভন' ইত্যাদি ভাষায় ভূষিত করে নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকতে অতিমাত্রায় সচেষ্ট।

আমরা মনে করি, এক-তরফাভাবে যুক্তিবাদী আলোচনায় সাধারণ মানুষের ওপর যতটা প্রভাব ফেলা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি প্রভাব ফেলা যায় জ্যোতিষী, অবতার, অলৌকিক ক্ষমতাধর ও ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তাদের মুখোমুখি হয়ে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে পারলে। আমরা তাই বার বার জ্যোতিষীদের মুখোমুখি হয়েছি বেতারে, জ্যোতিষ সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে, আমরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে হাজির হয়েছি আলোচনায়, আমাদের সমিতির আয়োজিত বিতর্ক সভায় ধর্মের পক্ষে আমন্ত্রণ করে এনেছি তাবড় ধর্মবেত্তাদের, আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে শ্রোতাদের সামনে আনতে পেরেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রথম শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের। আমরা প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতাবান ও জ্যোতিষীদেরও

মুখোমুখি হয়েই তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে চাই। এ-পথে তাঁরা কিছুতেই এগুতে চাইবেন না, যাঁদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আছে, যাঁদের অনেক জায়গাই হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিজেদের খামতিকে আড়াল করতে তাই গোয়েবেলেসর কায়দায় প্রচারে নেমে পড়েন অক্ষমরা। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর পাগল মেহের আলির মতই রেকর্ড বাজিয়েই চলেন—'চ্যালেঞ্জ-ট্যালেঞ্জ সব ফালতু হ্যায়', বলে এক নাগাড়ে।

সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার দায়-দায়িত্ব শুধুমাত্র যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী বা বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের নয়। এগিয়ে আসতে হবে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের দৃঢ় প্রত্যয়ে বুঝে নিতে হবে সত্যিই তাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসারে কী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সাধারণ মানুষদের মধ্যে, অক্ষরজ্ঞানের সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতা গড়ে তুলতে কী পথনির্দেশ দিতে পেরেছেন? শিক্ষক-অধ্যাপক, যাঁদের হাতে রয়েছে শিক্ষিত করে তোলার ভার, তাদের ওপর স্বভাবতই আমাদের কিছুটা বাড়তি প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক যে, তাঁর ছাত্রদের অন্ধ-বিশ্বাস, ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দূর করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। শিক্ষা দেওয়ার অর্থ শুধু বইয়ের পড়া বোঝান নয়, কুসংস্কার দূর করাও শিক্ষা প্রসারেরই অঙ্গ। আমরা যারা আজ শিক্ষায় ও কর্মজীবনে কিছুটা অন্তত প্রতিষ্ঠিত, তাদের এ কথা মনে রাখা একান্তই প্রয়োজনীয় যে, আমাদের দেশের সংখ্যাগুরু শোষিত শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষদের করের টাকায় গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি। সেই ঋণের কিছুটাও কি আমরা শোষিত মানুষদের শোধ দেওয়ার চেষ্টা করব না? সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টাও কি আমরা করব না?

আমাদের দেশে কিছু নামী-দামী বিজ্ঞান সংস্থা রয়েছে—ছোট ছোট অসংখ্য বিজ্ঞান সংস্থা, যুক্তিবাদী সংস্থা ও অসংখ্য মানুষ ওইসব জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোর দিকে সঠিক পথনির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। জ্যেষ্ঠদের পথনির্দেশ যদি ভুল পথে বা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হয় তবে কনিষ্ঠদের এবং সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্তির পথে পা বাড়াবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোর সদস্যদের উচিত সংস্থার নেতৃত্ব এমন হাতে ন্যস্ত করা, যাঁরা কথায় ও কাজে বিপরীত মেরুতে বিচরণ করেন না।

'৮৭-তে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ছাব্বিশটি বিজ্ঞান সংগঠন একসঙ্গে মাসাধিককালব্যাপী সারা ভারত জন-বিজ্ঞান জাঠার আয়োজন করেছিলেন। দেশের পাঁচটি ভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচটি আঞ্চলিক জাঠা মোট প্রায় পঁচিশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলেন। বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে, বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলতে যে সব বিষয় জাঠা বেছে নিয়েছিল সেগুলো হলো: স্বনির্ভরতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, জন-বিজ্ঞান আন্দোলন, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্র, বিজ্ঞান ও ভারতবর্ষ, স্বাস্থ্য ও ঔষধ, পরিবেশ দূষণ, জল, গৃহ, শিল্পক্ষেত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শান্তি।

না, মানুষের কুসংস্কার বিষয়ের কোনও স্থান ছিল না জাঠার বিষয়গুলোর মধ্যে। বিপুল অর্থব্যয়ের এই জন-বিজ্ঞান জাঠা তাদের কাছে এগিয়ে আসা শোষিত

অন্ধ-সংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে বিজ্ঞানমনস্ক করার চেষ্টা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু জায়গায় অবতারদের কিছু কিছু কৌশল সাধারণ মানুষদের কাছে ফাঁস করার অনুষ্ঠান হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো হয়েছিল নেহাৎই হালকা চালে, সাধারণ মানুষকে ম্যাজিক দেখাবার মত করে, অবসর বিনোদনের অনুষ্ঠানের মত করে। পশ্চিমবঙ্গে এই জাঠা ছিল ধর্ম ও জ্যোতিষ বিশ্বাসের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে। ২ অক্টোবর মালদায় জাঠা উদ্বোধন করলেন এমন এক বিজ্ঞানী যাঁর নাম আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখেছি ধর্মানুষ্ঠান, ভাগবতপাঠের আসর, অবতারের জন্মদিন, ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে। ৭ অক্টোবর কলকাতার টালাপার্কে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-জাঠার এক অনুষ্ঠানে একটি পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 'শক্তি' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই বললেন, 'যবে থেকে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি.....।' বাক্যটা শেষ হবার আগেই সভার গুঞ্জনে সচেতন হয়ে উঠলেন। বক্তব্য পাল্টে বললেন...., 'অবশ্য আমরা বিবর্তনবাদে পড়েছি কেমন করে মানুষ এলো.....।' জাঠার উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি দাপটে বিজ্ঞান সভার পরিচালনা করলেন, দু'হাতের আঙুলে গোটা চার-পাঁচেক গ্রহরত্নের আংটি ধারণ করে।

এমন দ্বিচারিতার উদাহরণ এখানে শেষ নয়। এবার আপনাদের যাঁর কথা বলছি, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত বামবুদ্ধিজীবী লেখক। বস্তুবাদ প্রসঙ্গ-টসঙ্গ নিয়ে অনেক বইও লিখেছেন। এই বুদ্ধিজীবী 'জন-বিজ্ঞান' আন্দোলনের নেতাদের আমন্ত্রণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোচ্চারে জানালেন, বিজ্ঞান আন্দোলনের নামে ধর্মকে কোনও আঘাত নয়।

মাস কয়েক পরে তিনিই আবার 'গণ-বিজ্ঞান' মঞ্চে উঠে ঘোষণা করলেন, সাধারণের কাছে ধর্মের বিজ্ঞান-মনস্কতা বিরোধিতার স্বরূপকে তুলে ধরতে হবে, চিনিয়ে দিতে হবে, আঘাত হানতে হবে।

পরজীবী এইসব বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিবাদী আন্দোলনের পক্ষে নিঃসন্দেহে ভয়াবহ বিশাল বাধা হয়ে উঠতে পারেন। কারণ পরিচিত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ, অপরিচিত শত্রু চিরকালই ভয়াবহ।

অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার ও জ্যোতিষীদের বিরোধিতার স্বরূপ আমাদের জানা, তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাও তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু এইসব ভণ্ড যুক্তিবাদীদের মুখোসের আড়াল সরাতে না পারলে তাদের অজ্ঞাত শত্রুতা, গোপন আঘাত আমাদের আন্দোলনকে বহুগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

'৮৯-র পিপলস্ সাইন্স কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমি এবং

আমাদের সমিতি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। অধিবেশনে আমাদের সমিতির বক্তব্য ছিল—বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশ দূষণ, জল সমস্যা, বাসগৃহ ইত্যাদি সমস্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েও আমাদের সমিতি মনে করে এর সঙ্গে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করা উচিত। বিজ্ঞান আন্দোলনে যদি বিজ্ঞান-মনস্কতা গড়ার আন্দোলনের, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের স্থান না থাকে, তবে সেটা আর যাই হোক, বিজ্ঞান আন্দোলন নয়। পিপলস্ সাইন্স কংগ্রেস আন্দোলনের বিষয় হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু যুক্তিবাদী চেতনা গড়ার আন্দোলনকে পাশে সরিয়ে রেখে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা গড়ার আন্দোলন, গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মতই বাতুলতা। 'কুসংস্কার মুক্তি' এবং 'বিজ্ঞান-মনস্ক চেতনা'কে স্থান না দিয়ে আপনারা যদি আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান, তবে সেটা হবে মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞান আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান আন্দোলন।

আমাদের বক্তব্যেরই জের টেনে বক্তব্য রাখলেন কেরলের 'শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর প্রতিনিধি। কেরল শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদ কাগজে-কলমে ভারতবর্ষের বৃহত্তম বিজ্ঞান সংগঠন। তাঁদের প্রতিনিধি সোচ্চারে জানালেন—আমরা আপনাদের সমিতির কর্মধারা সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি। আমাদের পক্ষে এখুনি কুসংস্কার বিরোধী কোনও কর্মসূচী গ্রহণ করা অসম্ভব। কারণ এর দ্বারা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আমাদের পক্ষে কারও ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করার কথা অচিন্তনীয়। আমাদের পরিষদকে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান সব ধর্মের সভ্যদের নিয়েই চলতে হয় এবং হবে।

পরিষদের প্রতিনিধি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলনের নামে অনেক কিছু করলেও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার বিষয়টা, সাধারণ মানুষের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টা সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতে চান।

**বিজ্ঞান আন্দোলনকে
ঘোলা করে অনেক স্বার্থান্বেষী
ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছেন। এইসব
স্বার্থান্বেষী বহুরূপীদের চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব
বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী, যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মী এবং
সমাজ সচেতন সংস্থা ও মানুষদেরই শক্ত হাতে
পালন করতে হবে। কারণ এইসব বহুরূপীরা
অবতার ও জ্যোতিষীদের চেয়েও
অনেক বেশি বিপদ্জনক।**

আন্দোলন গড়ার স্বার্থে, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে আমাদের অনেক বেশি সং.

সতর্ক, আপোশহীন এবং নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে—এর কোনও বিকল্প নেই।

আজ হাজারে হাজারে দামাল ছেলে-মেয়েরা শহরে গ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষদের সামনে ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন অনেক তথাকথিত অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। ফাঁস করছেন অলৌকিক-বাবাদের বুজরুকি। এইসব অলৌকিক বিরোধী প্রদর্শনীগুলো 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে আমাদের সমিতি, সহযোদ্ধা সহযোগী সংস্থাগুলো এবং খাতায় কলমে সহযোগী না হলেও সহমত পোষণকারী বহু সংস্থা পরিবেশন করে থাকেন। 'অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক' শিরোনামেও কিছু কিছু সংগঠন কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করে থাকেন। কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে 'অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক' স্লোগান থেকে আমাদের বিরত থাকতেই হবে। 'ভূতে ধরা', 'ঈশ্বরে ভর', 'বিশ্বাসে রোগ আরোগ্য', 'সম্মোহন' ইত্যাদি কী ম্যাজিক? অলৌকিক সব কিছুর ব্যাখা কি বাস্তবিকই শুধুমাত্র ম্যাজিকের সাহায্যেই দেওয়া যায়? কোনও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী যদি এমনটা ভেবে থাকেন তবে সেটা তাঁর জানার অসম্পূর্ণতা।

আমার সম্পর্কে এক দিদি প্রাইভেট বাসকে বলেন, 'পাবলিক বাস'। তাঁকে প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর নিয়ে অনেক বোঝানোর পরও দেখেছি, তিনি নিজের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করেননি। কারণটা দিদির চোখে ছিল এই—ভুল সংশোধন করা মানে ছোট ভাইয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। তাঁর এই মিথ্যে অহমিকা বোধ এখনও তাঁকে ভুল বলিয়েই চলেছে।

এই ঘটনাটা বলার কারণ, আমাদের ভয় হয়, আমার সেই দিদিটির মত এঁরাও না অহং বোধে প্রতিনিয়ত ভুল করে যেতেই থাকেন। ভয় হয়, কারণ বিজ্ঞানকর্মীদের এমন মারাত্মক ভুলে সাধারণ মানুষরা বিভ্রান্ত হবেন। আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে অলৌকিক বিরোধী আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী ও শিক্ষাচক্র পরিচালনা করি। শিরোনামেই বক্তব্য স্পষ্ট। প্রতিটি আপাত-অলৌকিকই বাস্তবে লৌকিক অর্থাৎ আপাত-অলৌকিকের পিছনে কোনও কৌশল থাকতে পারে, অথবা থাকতে পারে শরীর ধর্মের কোনও বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবাংলার একটি নামী বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত এক গণ-জাদুকরের মতে অবতার ও জ্যোতিষীদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ নাকি নেহাৎই 'সস্তা চমক' আমাদের নাকি চ্যালেঞ্জের 'নেশা' পেয়ে বসেছে।

ওই গণ-জাদুকরের প্রতি আমার ও আমাদের সমিতির একটিই জিজ্ঞাসা, আপনি যখন কুসংস্কার বিরোধী কোনও অনুষ্ঠানে সোচ্চারে ঘোষণা করতে থাকেন, 'অলৌকিক বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, নেই, থাকবেও না' তখন যদি কোনও বে-রসিক ব্যক্তি আপনারই সভায় বুক ঠুকে ঘোষণা করেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং প্রমাণ দিতে প্রস্তুত, তখন হে মহান আন্দোলনের নেতা আপনি কী করবেন? চ্যালেঞ্জের মত 'সস্তা চমক' ও 'অশোভন' ব্যাপার থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন?

একটি অপ্রিয় সত্য বলতে বাধ্য হচ্ছি,

'অক্ষম' ও 'ঈর্ষাকাতর'দের কাছে 'চ্যালেঞ্জকে 'অশোভন' বলে প্রচার চালানোই অক্ষমতাকে আড়াল করার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বিবেচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

চ্যালেঞ্জ আমাদের সমিতির কর্মধারার বিভিন্ন পর্যায়ের একটি পর্যায় মাত্র। 'চ্যালেঞ্জ' অক্ষমদের কাছে 'সস্তা চমক' অবশ্যই, তবে আমাদের কাছে আন্দোলনের 'হাতিয়ার'। 'চ্যালেঞ্জ'কে যে সব ধান্দাবাজরা 'নেশা' বলে প্রচার করতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাই—সাধারণ মানুষকে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' মুক্ত করতেই আমাদের চ্যালেঞ্জ। যতদিন সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' থাকবে, ততদিন 'নেশা' কাটাতে আমাদের চ্যালেঞ্জের নেশাও থাকবে।

তাঁদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁদের প্রতিটি চিঠি, প্রতিটি যোগাযোগ, প্রতিটি উষ্ণ অভিনন্দন, প্রতিটি গঠনমূলক সমালোচনা, প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি সহযোগিতা আমাকে এবং আমাদের সমিতিকে প্রেরণা দিয়েছে, সঠিক পথে এগোতে সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, গতিশীল রেখেছে। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রতিবেশী বাংলাদেশের লড়াকু সাচ্চা যুক্তিবাদী মানুষদের উদ্দেশ্যে যাঁদের লড়াইয়ের অদম্য শক্তি, যাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাকে দিয়েছে প্রেরণার চেয়েও বেশি কিছু। তবুও এর পরও অকৃতজ্ঞের মত যাঁদের কাছ থেকে শুধু নিয়েইছি, দিতে পারিনি চিঠির উত্তরটুকুও, তাঁদের কাছে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী। পত্র লেখক-লেখিকাদের কাছে বিনীত অনুরোধ চিঠির সঙ্গে অনুগ্রহ করে একটি জবাবী খামও পাঠাবেন।

এমন কিছু চিঠির উত্তর দিতে পারিনি—যার উত্তরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল, যা চিঠির স্বল্প পরিসরে সম্ভব ছিল না। বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এবং পরবর্তী খণ্ডগুলোতে তাঁদের সকলের জিজ্ঞাসা নিয়েই আলোচনা করেছি এবং করব।

আমার সংগ্রামের সাথী, প্রেরণার উৎস প্রত্যেককে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০ ০৭৪

এক

ভূতের ভর

ভূতের ভর : বিভিন্ন ধরন ও ব্যাখ্যা

ভূত আছে, কি নেই, এই নিয়ে তর্কেরও শেষ নেই। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ভূত নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কে মেতেছে। একদল মানুষ আছেন, যাঁরা ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ ও অবতারদের অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। আর একদল আছেন যাঁরা প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে নারাজ এবং স্বভাবতই ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ শাস্ত্রে অবিশ্বাসী। আবার এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, সাধু-সন্তদের অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থাশীল নন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দিহান, কিন্তু ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কারণ এঁরা নিজের চোখে ভূতে পাওয়া মানুষের অদ্ভুত সব কাণ্ড কারখানা দেখেছেন।

এমনই একজন গোবিন্দ ঘোষ। কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করে বর্তমানে ব্যাঙ্কে পদস্থ কর্মী। ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও অবতারদের অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী। জ্যোতিষীদের বলেন বুজরুক। কিন্তু ভূতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ, তবে তো নিজের চোখে দেখা কাকীমাকে ভূতে পাওয়ার ঘটনাকেই অস্বীকার করতে হয়। ব্যাখ্যা পাওয়ার আশায় গোবিন্দবাবুই আমাকে ঘটনাটা বলেন।

সালটা সম্ভবত '৫৬। স্থান—হাসনাবাদের হিঙ্গলগঞ্জ। গোবিন্দবাবু তখন সদ্য-কিশোর। একান্নবর্তী পরিবার। গোবিন্দবাবুর কাকার বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক। কাকীমা সদ্য তরুণী এবং অতি সুন্দরী। অনেকখানি জায়গা নিয়ে নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক ঘর, ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, আতুরঘর নিয়ে বাড়ির চৌহদ্দি। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে পুকুর পাড়ে পায়খানা। পায়খানার পাশেই একটা বিশাল পেয়ারা গাছ। গাছটায় ভূত থাকত বলে বাড়ির অনেকেই বিশ্বাস করতেন। তাই সন্ধ্যের পর সাধারণত কেউই, বিশেষত ছোটরা আর মেয়েরা প্রয়োজনেও পায়খানায় যেতে চাইত না। এক সন্ধ্যের ঘটনা। কাকীমা পায়খানা থেকে ফেরার পর অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে লাগলেন। ছোটদের দেখে ঘোমটা টানতে লাগলেন। কথা বলছিলেন নাকী

গলায়। বাড়ির বড়রা সন্দেহ করলেন কাকীমাকে ভূতে পেয়েছে। অনেকেই কাকীমাকে জেরা করতে লাগলেন, 'তুই কে ? কেন ধরেছিস বল ?' ইত্যাদি বলে। একসময় কাকীমা বিকৃত মোটা নাকী গলায় বললেন, 'আমি নীলকান্তের ভূত। পেয়ারা গাছে থাকতাম। অনেক দিন থেকেই তোদের বাড়ির ছোট বউয়ের উপর আমায় নজর ছিল। আজ সন্ধ্যে রাতে খোলা চুলে পেয়ারা তলা দিয়ে যাওয়ার সময় ধরেছি। ওকে কিছুতেই ছাড়ব না।'

পরদিন সকালে এক ওঝাকে খবর দেওয়া হল। ওঝা আসবে শুনে কাকীমা প্রচণ্ড রেগে সকলকে গাল-মন্দ করতে লাগলেন, জিনিস-পত্তর ভাঙতে লাগলেন। শেষে বড়রা কাকীমাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

ওঝা এসে মন্ত্রপড়া সরষে কাকীমার গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন, সেই সঙ্গে বেতের প্রহার। কাকীমার তখন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ক্লান্ত নীলকান্তের ভূত কাকীমাকে ছেড়ে যেতে রাজী হল। ওঝা ভূতকে আদেশ করল, ছেড়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে একটা পেয়ারা ডাল ভাঙতে হবে, আর একটা জল ভরা কলসী দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে যেতে হবে।

সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে বিশাল একটা লাফ দিয়ে কাকীমা একটা পেয়ারা ডাল ভেঙে ফেললেন। একটা জলভরা কলসী দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে গেলেন। তারপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান। যখন জ্ঞান এল তখন কাকীমা আবার অন্য মানুষ। চিঁ চিঁ করে কথা বলছেন, দাঁড়াবার সাধ্য নেই।

এরপর অবশ্য কাকীমার শরীর ভেঙে পড়েছিল। বেশিদিন বাঁচেননি।

এই ধরনের ভূতে পাওয়ার কিছু ঘটনা আমি নিজেই দেখেছি। আপনাদের মধ্যেও অনেকেই নিশ্চয়ই এই ধরনের এবং আরও নানা ধরনের ভূতে পাওয়ার ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন বা শুনেছেন। এ সব ঘটনাগুলোর পিছনে সত্যিই কি ভূত রয়েছে ? না, অন্য কিছু ? বিজ্ঞান কি বলে ? এই আলোচনায় আসছি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ভূতে পাওয়া কী ?

আপনারা যাঁদের দেখে মনে করেন, এঁদের বুঝি ভূতে পেয়েছে, আসলে সেইসব তথাকথিত ভূতে পাওয়া মানুষগুলো প্রত্যেকেই রোগী, মানসিক রোগী। এই সব মানসিক রোগীরা এমন অনেক কিছু অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেন, যে সব ঘটনা সাধারণভাবে স্বাভাবিক একজন মানুষের পক্ষে ঘটান অসম্ভব।

যে হেতু সাধারণভাবে আমরা বিভিন্ন মানসিক রোগ এবং মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তাই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিশৃঙ্খলার জন্য ঘটা অদ্ভুত সব ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা নিজেদের কাছে হাজির করতে পারি না। কিছু কিছু মানসিক রোগীদের ব্যাপার-স্যাপার তাই আমাদের চোখে যুক্তিহীন ঠেকে। আমরা ভেবে বসি—আমি যে হেতু এর ব্যাখ্যা পাচ্ছি না, তাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝি এর ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিটি ভূতে পাওয়া ঘটনারই ব্যাখ্যা আছে। বুদ্ধিতেই এর ব্যাখ্যা মেলে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা হল, আগ্রহ, ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার আগ্রহ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান 'ভূত পাওয়া' বলে পরিচিত মনের রোগকে তিনটি ভাগ ভাগ করেছে। এক : হিস্টিরিয়া (Hysteria), দুই : স্কিটসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia), তিন : ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac depressive)।

হিস্টিরিয়া থেকে যখন ভূতে পায়

প্রাচীন কাল থেকেই হিস্টিরিয়া নামের মানসিক রোগটির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখনকার দিনের ওঝা, গুনীন বা জাদুচিকিৎসকরা সঠিক শরীর বিজ্ঞানের ধারণার অভাবে এই রোগকে কখনও ভূতে পাওয়া কখনও বা ঈশ্বরের ভর বলে মনে করেছে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চোখে হিস্টিরিয়া বিষয়টাকে একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। সাধারণভাবে সংস্কারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত বা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই হিস্টিরিয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে এইসব মানুষের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার চেয়ে বহুজনের বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ক কোষে সহনশীলতা যাদের কম তারা নাগাড়ে একই কথা শুনলে, ভাবলে বা বললে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বার বার উত্তেজিত হতে থাকে, আলোড়িত হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় উত্তেজিত কোষগুলো অকেজো হয়ে পড়ে, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে, ফলে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। গোবিন্দবাবুর কাকীমার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারই ঘটেছিল।

কাকীমা পরিবেশগতভাবে মনের মধ্যে এই বিশ্বাস লালন করতেন ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। মানুষ মরে ভূত হয়। ভূতেরা সাধারণত গাছে থাকে। সুন্দরী যুবতীদের

প্রতি পুরুষ-ভূতেরা খুবই আকর্ষিত হয়। সন্ধ্যের সময় খোলা-চুলের কোনও সুন্দরীকে নাগালেন মধ্যে পেলে ভূতেরা সাধারণত তাদের শরীরে ঢুকে পড়ে। ভূতেরা নাকী গলায় কথা বলে। পুরুষ ভূত ধরলে গলার স্বর হয় কর্কশ। মন্ত্র-তন্ত্রে ভূত ছাড়ান যায়। যারা এ সব মন্ত্রতন্ত্র জানে তাদের বলে ওঝা। ভূতের সঙ্গে ওঝার সম্পর্কে—সাপে নেউলে। ওঝা এসে ভূতে পাওয়া মানুষটিকে খুব মার-ধোর করে তাই ওঝা দেখলেই ভূত পাওয়া মানুষ প্রচন্ড গালাগাল করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জাতীয় অনেক কথাই কাকীমা তাঁর কাছের মানুষদের কাছ থেকে শুনেছেন এবং বিশ্বাসও করেছেন। শ্বশুর বাড়িতে এসে শুনেছেন পেয়ারা গাছে ভূত আছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ভুল করে অথবা তাড়াতাড়ি পায়খানা যাওয়ার তাগিদে কাকীমা চুল না বেঁধেই পেয়ারা গাছের তলা দিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল তাড়াতাড়ি পায়খানায় যেতে হবে। তারপর হয় তো পেট কিছুটা হালকা হতেই চিন্তা এসেছে—আমি তো চুল না বেঁধেই পেয়ারা তলা দিয়ে এসেছি। গাছে তো ভূত আছে। আমি তো সুন্দরী, আমার উপর ভূতটা ভর করেনি তো? তরপরই চিন্তা এসেছে—নিশ্চয় ভূতটা এমন সুযোগ হাতছাড়া করেনি। আমাকে ধরেছে। ভূতের পরিচয় কী, ভূতটা কে? কাকীমা নিশ্চয়ই নীলকান্ত নামের একজনের অপঘাতে মৃত্যুর কথা শুনেছিলেন, ধরে নিলেন নীলকান্তের ভূত তাঁকে ধরেছে। তারপর ভূতে পাওয়া মেয়েরা যে ধরনের ব্যবহার করেন বলে শুনেছিলেন, সেই ধরনের ব্যবহারই তিনি করতে শুরু করলেন।

গোবিন্দবাবু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কাকীমা অতি ভদ্র পরিবারের মেয়ে। ভূতে পাওয়া অবস্থায় তিনি ওঝাকে যে সব গালাগাল দিয়েছিলেন সে-সব শেখার কোনও সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না। তবে সে সব গালাগাল তিনি দিয়েছিলেন কি ভাবে?'

আমার উত্তর ছিল—শেখার সম্ভাবনা না থাকলেও শোনার সম্ভাবনা কাকীমার ক্ষেত্রে আর দশজনের মতই অবশ্যই ছিল। ভদ্র মানুষেরা নোংরা গালাগাল করেন না। এটা যেমন ঠিক, তেমনই সত্যি, ভদ্র মানুষও তাঁদের জীবনের চলার পথে কারুকে না কারুকে নোংরা গালাগাল দিতে শুনেছেন।

কলসী দাঁতে করে তোলা বা লজ্জা ভুলে প্রচণ্ড লাফ দেওয়ার মত প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ

হিস্টিরিয়া রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। মানসিক অবস্থায় রোগী নিজেকে অর্থাৎ নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যান। গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলে—তাঁকে ভূতে ভর করেছে। তাঁর মধ্যে রয়েছে ভূতের অসাধারণ ক্ষমতা ও বিশাল শক্তি। ফলে সামান্য সময়ের জন্য শরীরের চূড়ান্ত শক্তি বা সহ্য

শক্তিকে ব্যবহার করে স্বাভাবিক অবস্থায় যা অসাধ্য, তেমন অনেক কাজ করে ফেলেন ।

হিস্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে ভালমত জানা না থাকায় হিস্টিরিয়া রোগীদের নানা আচরণ ও কাজকর্ম সাধারণ মানুষদের চোখে অদ্ভুত ঠেকে । তাঁরা এগুলোকে ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানা বলে ধরে নেন ।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এমন কিছু সৈনিক চিকিৎসিত হতে আসে যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে অথবা ডান হাত পক্ষাঘাতে অবশ কিংবা অতীত স্মৃতি হারিয়েছে । এদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা একমত হন এরা কোনও শারীরিক আঘাত বা অন্য কোনও শারীরিক কারণে এইসব রোগের শিকার হয়নি । রোগের কারণ সম্পূর্ণ মানসিক । এরা হিস্টিরিয়ায় ভুগছে । অনবরত রক্তপাত, হত্যা গোলা-গুলির শব্দ রোগীদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল । কিছুতেই তারা এত রক্তপাত, এত হত্যা, এত শব্দ সহ্য করতে পারছিল না । মন চাইছিল যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে । বাস্তবে যা আদৌ সম্ভব ছিল না । যুদ্ধ ছেড়ে পালানো মানেই দেশদ্রোহিতা, ধরা পড়লেই কঠোর শাস্তি। পালাবার ইচ্ছা ও পালাতে ভয়—দুয়ের সংঘাত রূপান্তরিত হয়েছে হিস্টিরিয়ায় ।

যে কোনও সমস্যায় দুই বিপরতীধর্মী চিন্তার সংঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের অসাড়তা ঘটতে পারে । প্রতি বছরই প্রধানতঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক-জাতীয় পরীক্ষার আগে মনোরোগ চিকিৎসকদের কাছে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী চিকিৎসিত হতে আসে যারা স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বা যাদের ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে । পরীক্ষার সময় অনেকে নিজেকে অত্যধিক পড়া ও লেখার চাপের মধ্যে রাখে । চাপ অত্যধিক হলে শরীরে আর সয় না । মন বিশ্রাম নিতে চায় । আবার একই সঙ্গে ভাল ফলের জন্য মন বিশ্রামের দরুন সময় নষ্ট করতে চায় না । অর্থাৎ একই সঙ্গে মন বিশ্রাম নিতে চাইছে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছে না । এ ধরনের পরিস্থিতিতেই হিস্টিরিয়াজনিত সমস্যাগুলো প্রকট হয় । হিস্টিরিয়াজনিত কারণে বাক্‌রোধের সমস্যাতেও কিছু কিছু নবীন আবৃত্তিকারেরা ভোগেন ।

যে সব জায়গায় গ্রাম ভেঙে খনি বা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, সে সব অঞ্চলের মানুষ কৃষি নির্ভরতা ছেড়ে খনির কাজে ও শিল্পের কাজে লেগে পড়তে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে । এই মানসিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে ঘটছে তীব্র আলোড়ন । এমন পরিস্থিতিতেই মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা কম থাকার দরুন, যুক্তি-বুদ্ধি কম থাকার দরুন এইসব মানুষদের মধ্যে ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা ।

নাম-গান করতে করতে আবেগে চেতনা হারিয়ে অদ্ভুত আচরণ করাও হিস্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি । সভ্যতার আলো ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার প্রকোপ কমায় । কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সভ্য মানুষগুলোই হিস্টিরিয়াজনিত কারণে দলে দলে অদ্ভুত সব

আচরণ করে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টায় দিল্লিতে কয়েক হাজার শিখকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় যারা হত্যা করেছিল, তারা কিছুটা সময়ের জন্য অবশ্যই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

ধর্মান্ধতা থেকে অন্য ধর্মের মানুষদের হত্যার পিছনেও থাকে হিস্টিরিয়া, গণ-হিস্টিরিয়া সৃষ্টিকারকের ভূমিকায় থাকে ধর্ম, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

'৮৭-র জানুয়ারিতে কলকাতার টেলিফোন অপারেটারদের মধ্যে তড়িতাহতের ঘটনা এমনই ব্যাপকতা পায় যে, অটোম্যানুয়েল এক্সচেঞ্জ, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের টেলিফোন অপারেটররা আন্দোলনে নেমে পড়েন। কানের টেলিফোন রিসিভার থেকে তাঁরা এমনভাবে তড়িতাহত হতে থাকেন যে অনেককে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি করা হয়। পরে মেডিকেল রিপোর্টে তড়িতাহতের কোনও সমর্থন মেলেনি। বরং জানা যায় তড়িতাহতের ঘটনাগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভয়জনিত। এটা গণ-হিস্টিরিয়ার একটি উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ হাজির করার লোভ সামলাতে পারলাম না। কয়েক বছর আগে কলকাতা ও তার আশেপাশে এক অদ্ভুত ধরনের রোগের আবির্ভাব ঘটেছিল। জনতা নাম দিয়েছিল 'ঝিন্‌ঝিনিয়া' রোগ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়। রোগী হঠাৎ কাঁপতে শুরু করত অথবা সারা শরীরে ব্যথা শুরু করত। সেই সঙ্গে আর এক উপসর্গ রোগী নাকি অনুভব করত তার লিঙ্গ শরীরের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। গণ-হিস্টিরিয়ার থেকেই এই উপসর্গগুলো রোগীরা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল।

এক ধরনের ভূতে পাওয়া রোগ স্কিটসোফ্রেনিয়া

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের বিষয়ে বোঝার সুবিধের জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। গতিময়তা মস্তিষ্ককোষের একটি বিশেষ ধর্ম। সবার মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা সমান নয়। যাদের গতিময়তা বেশী, তারা যে কোনও বিষয় চটপট্ বুঝতে পারে। বহু বিষয়ে জানার ও বোঝার আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভাবেই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গের চিন্তায় বা আলোচনায় নিজের মস্তিষ্ককোষকে নিয়োজিত করতে পারে।

সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ্, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা বেশি। এই ধরনের মস্তিষ্ককোষের অধিকারীদের বলা হয় প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguineous)।

চিন্তাবিদ্, গবেষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণীর মানুষরা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান, বুঝতে চান। এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না। এরা আত্মস্থ বা ফ্লেমেটিক (Phlegmatic) ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারী।

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের শিকার হন সাধারণভাবে আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা। তারা কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পারলে, অথবা কোনও সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেও সমাধানের পথ না পেলে অথবা কোনও রহস্যময়তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন রহস্যময়তার মধ্যে থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা আরও কমে যায়। তারা আরও বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করে। মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (sensorium) ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে এরা প্রথমে বাইরের কর্মজগৎ থেকে, তারপর নিজের পরিবারের আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তারপর এক সময় এরা নিজেদের সত্তা থেকেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, রোগীর মস্তিষ্ককোষ ঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালন করতে পারছে না বা ছড়িয়ে দিতে পারছে না। ফলে একটি কোষের সঙ্গে আর একটি কোষের সংবাদ আদান-প্রদান ব্যাহত হতে থাকে। মস্তিষ্ক কোষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুন রোগীর ব্যবহারে বাস্তববিমুখতা দেখতে পাওয়া যায়। রোগীরা এই অবস্থায় অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে অলীক বিশ্বাসও (Hallucination) পাঁচ রকমের হতে পারে : ১· দর্শনানুভূতির অলীক বিশ্বাস (optical hallucination), ২· শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (auditory hallucination), ৩· স্পর্শানুভূতির অলীক বিশ্বাস (tactile hallucination), ৪· ঘ্রাণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (olfactory hallucination) ও ৫· স্বাদ গ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির অলীক বিশ্বাস (taste hallucination)।

গুরুর আত্মার খপ্পরে জনৈকা শিক্ষিকা

সম্প্রতি ভূতে পাওয়া একটি পুরো পরিবার এসেছিলেন আমাদের কাছে। গৃহকর্তা ইকনমিক্সে এম-এ, মফস্বল শহরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বয়স পঞ্চান্নর আশে-পাশে। গৃহকর্ত্রী বাংলা সাহিত্যের ডক্টরেট। কলকাতার একটি মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। দুই ছেলে। বড় ছেলে চাকরী করেন। ছোট এখনও চাকরীতে ঢোকেনি। বেশ কিছু ভাষা জানেন। একাধিকবার বিদেশ গিয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভূতের (?) খপ্পরে পড়ে এমনই নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিলেন যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ১৯৮৭-র ৭ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেন।

বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ছিল—এক অশরীরী আত্মার দ্বারা আমাদের পারিবারিক শান্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

বিজ্ঞাপনটি দেখে আমাদের সংগঠনের জনৈক সদস্য নেহাতই কৌতূহলের বশে একটি চিঠি লিখে জানায়—বিস্তৃতভাবে ঘটনাটি জানান। হয়তো সাহায্য করা সম্ভব হবে।

ইনল্যান্ডে উত্তর এলো। পত্র-লেখিকা ও তাঁর পরিবারের সকলেরই নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায় আমরা আমাদের বোঝার সুবিধের জন্য ধরে নিলাম পত্র-লেখিকার নাম মঞ্জু, বড় ছেলে চন্দ্র, ছোট ছেলে নীলাদ্রী, স্বামী অমরেন্দ্র।

মঞ্জু দেবী জানালেন—'প্ল্যানচেট' নামে একটা বই পড়ে ১৯৮৪ সনের ২৫ আগস্ট শনিবার তিনি, স্বামী ও দুই ছেলে প্ল্যানচেট করতে বসেন। প্রথমে একটি বৃত্ত এঁকে রেখার বাইরের দিকে A থেকে Z পর্যন্ত এবং রেখার ভিতরের দিকে ১ থেকে ৯ এবং ০ লিখে বৃত্তের কেন্দ্রে একটা ধূপদানীতে ধূপ জ্বেলে সবাই মিলে ধূপদানীকে ছুঁয়ে থেকে এক মনে কোনও আত্মার কথা ভাবতে শুরু করতেন। এক সময় দেখা যেত ধূপদানীটা চলতে শুরু করেছে এবং একটি অক্ষরের কাছে যাচ্ছে। অক্ষরগুলো পর পর সাজালে তৈরি হচ্ছে শব্দ। শব্দ সাজিয়ে বাক্য। একটি বাক্য হতে এত দীর্ঘ সময় লাগছিল যে ধৈর্য্য রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

তাই প্ল্যানচেট বইয়ের নির্দেশমতো একদিন ওঁরা বসলেন রাইটিং প্যাড ও কলম নিয়ে। প্রথম কলম ধরেছিলেন মঞ্জু দেবী। প্রথম দিন বেশ কিছুক্ষণ বসার পর এক সময় হাতের কলম একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করল। মঞ্জু দেবীই প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে ? উত্তরে লেখা হল রবীন্দ্রনাথ। আরও কিছু প্রশ্নোত্তরের পর একে একে প্রত্যেকেই কলম ধরেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আত্মারা এসে রাইটিং প্যাডে লিখে তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে যায়। আত্মা আনার জন্য বেশ কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করতে হত বটে, কিন্তু একবার আত্মা এসে গেলে হুড়মুড় করে লেখা বের হত। প্রথম দিন ভোর রাত পর্যন্ত কলম চলতে থাকে তারপর থেকে প্রতিদিনই গভীর রাত পর্যন্ত চলতো আত্মা আনার খেলা। এ এক অদ্ভুত নেশা।

এমনিভাবে যখন আত্মা আনার ব্যাপার প্রচণ্ড নেশার মত পেয়ে বসেছে সেই সময় '৮৫-র জানুয়ারীর এক রাতে ছোট ছেলে নীলাদ্রী নিজের ভিতর বিভিন্ন আত্মার কথা শুনতে পান। '৮৫-র ৫ মার্চ থেকে মঞ্জু দেবীও একটি আত্মার কথা শুনতে পান। আত্মাটি নিজেকে তার গুরুদেব বলে পরিচয় দেয়। সেই আত্মার বিভিন্ন কথা ও নির্দেশ আজ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী, সেই সঙ্গে আত্মার স্পষ্ট স্পর্শও অনুভব করছেন, আত্মটি তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত অশ্লীলতাও করছে। মঞ্জু দেবী এক অতি বিখ্যাত ধর্মগুরুর শিষ্যা। গুরুদেব মারা যান ১৯৮৪-র ২১ এপ্রিল। মঞ্জু দেবী আমাদের সদস্যটিকে চিঠিটি লিখেছিলেন ২ জুলাই '৮৭।

চিঠিটি আমার কাছে সদস্যই নিয়ে আসে। আমাকে অনুরোধ করে এই বিষয়ে কিছু করতে।

আমার কথা মতে ১৯ জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় পরিবারের সকলকে নিয়ে মঞ্জু

দেবীকে আসতে অনুরোধ করেন সদস্যটি।

এলেন মঞ্জু দেবী ও তাঁর স্বামী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম প্ল্যানচেটের আসরে চারজনের কলমেই কোনও না কোনও সময় বিভিন্ন আত্মারা এসেছেন। আত্মাদের মধ্যে নেপোলিয়ন, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার, আলেকজান্ডার থেকে স্বরূপানন্দ অনেকেই এসেছেন, মঞ্জু দেবীর স্বামীর সঙ্গে বা বড় ছেলে চন্দ্রর সঙ্গে কোনদিনই কোন আত্মাই কথা বলেনি। অর্থাৎ তাঁরা আত্মার কথা শুনতে পাননি। আত্মার কথা শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী ও তাঁর ছোট ছেলে নীলাদ্রী, আত্মার স্পর্শ পেয়েছেন শুধু মঞ্জু দেবী। বড়ই অশ্লীল সে স্পর্শ।

পরের দিনই আমার সঙ্গে দুই ছেলে দেখা করলেন : কথা বললাম। সকলের সঙেগ কথা বলার পর বুঝলাম, চারজনই 'প্ল্যানচেট' বইটা পড়ে প্ল্যানচেটের সাহায্যে সত্যিই মৃতের আত্মাকে টেনে আনা সম্ভব এ কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। তারই ফলে অবচেতন মন সচেতন মনের অজ্ঞাতে চারজনকে দিয়েই বিভিন্ন মৃতের নাম ও নানা কথা লিখিয়েছে। ছোট ছেলে নীলাদ্রী সবচেয়ে বেশিবার মিডিয়াম হিসেবে কলম ধরার জন্য প্ল্যানচেট নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন—আমার হাত দিয়ে কেন আত্মাদের লেখা বের হচ্ছে ? এই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে বার বারই চিন্তাগুলো এক সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে। রহস্যের জাল খোলেনি। বুদ্ধিমান নীলাদ্রী নিজেই নিজের অজান্তে স্কিটসোফ্রেনিয়ার রোগী হয়ে পড়েছেন। ফলে শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়ে অলীক সব কথাবার্তা শুনতে শুরু করেছেন।

মঞ্জুদেবী সাহিত্যে ডক্টরেট, ভক্তিমতী আবেগপ্রবণ মহিলা। দীক্ষা নেওয়ার পরবর্তীকালে কিছু কিছু নারীর প্রতি গুরুদেবের আসক্তির কথা শুনেছিলেন। গুরুদেবে ছিলেন অতি সুদর্শন। মঞ্জুদেবীও এককালে সুন্দরী ছিলেন। প্ল্যানচেটের আসরে ধূপদানীর চলা দেখে মঞ্জুদেবী ধরে নিয়েছিলেন, দেহাতীত আত্মাই এমনটা ঘটাচ্ছে। এক সময় ধূপদানী ছেড়ে কলমের ডগাতেও বিভিন্ন আত্মাকে বিচরণ করতে দেখেছেন। গুরুদেবের আত্মা হাজির হতেই অনেক গোলমাল দেখা দিয়েছে। গুরুদেবের নারী আসক্তির যে সব কাহিনী শুনেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, সেই বিশ্বাস থেকেই এক সময় মঞ্জুদেবীর মনে হয়েছিল—গুরুদেবের আত্মা আমার আহ্বানে হাজির হওয়ার পর আমার প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়বেন না তো ? তাঁর নারী পিপাসা মিটে না থাকলে এমন সুযোগ কী ছেড়ে দেবেন ? আমাকেই ভোগ করতে চাইবেন না তো ?

এই সব চিন্তাই এক সময় স্থির বিশ্বাস হয়ে গেড়ে বসেছে—গুরুদেব এই সুযোগে নিজের কদর্য ইচ্ছেগুলোকে চরিতার্থ করে চলেছেন, আমার শরীরকে ভোগ করে চলেছেন।

প্ল্যানচেটের আসরে অংশ নেওয়ার অতি আবেগপ্রবণতা ও বিশ্বাস থেকেই এক সময় মঞ্জুদেবীর মধ্যে এসেছে শ্রবণানুভূতি ও স্পর্শানুভূতির অলীক বিশ্বাস।

২৬ জুলাই মঞ্জুদেবী ও ছোট ছেলেকে আসতে বললাম। ওঁরা এলেন। ওঁরা যেমন ভাবে কাগজ-কলম নিয়ে প্ল্যানচেটের আসরে বসতেন তেমনি ভাবেই একটা আসর বসালাম। দুজনের অনুমতি নিয়ে সে দিনের আসরে ছিলেন একজন সাংবাদিক,

একজন চিত্র-সাংবাদিক ও আমাদের সমিতির দুই সদস্য।

আসর বসার আগে মঞ্জুদেবী ও নীলাদ্রীর সঙ্গে আলাদা আলাদা আলাদা ভাবে কিছু কথা বললাম। টেবিলে বসলেন মঞ্জুদেবী ও নীলাদ্রী। রাইটিং-প্যাড আর কলম এলো। তিনটে ধূপকাঠি জ্বালান হলো। মঞ্জুদেবীর কথামতো নীলাদ্রী কলম ধরলেন। মিনিট দুয়েক পরেই দেখা গেল নীলাদ্রীর হাত ও কলম কাঁপছে। মঞ্জুদেবী বললেন,—উনি এসে গেছেন। তারপর তিনিই প্রশ্ন করলেন,—আপনি কে?

কলম লিখল—গুরুদেবের নাম।

এরপর মঞ্জুদেবী অনেক প্রশ্নই করলেন, যেমন—"আপনি আমাকে ছাড়ছেন না কেন?' 'প্রবীরবাবু বলেছেন, আপনি তাঁকে কথা দিয়েছেন আমাকে ছেড়ে যাবেন। কথা রাখছেন না কেন?' ইত্যাদি।

নীলাদ্রীর কলমের গতি বেশ দ্রুততর। গুরুদেবের আত্মা এক সময় লিখল মঞ্জুদেবীকে সে ছেড়ে যাচ্ছে। তারপর ইংরিজিতে লিখন—'লিভ দ্য পেন।' কলম ছাড়ার আদেশে কলম ছাড়লেন নীলাদ্রী।

মঞ্জুদেবী খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে তিনি যে আত্মাটিকে তাড়াতে আঠারো হাজার হাজার টাকার ওপর খরচ করেও কৃতকার্য হননি, সে কিনা এত দ্রুত এককথায় চলে যেতে চাইছে।
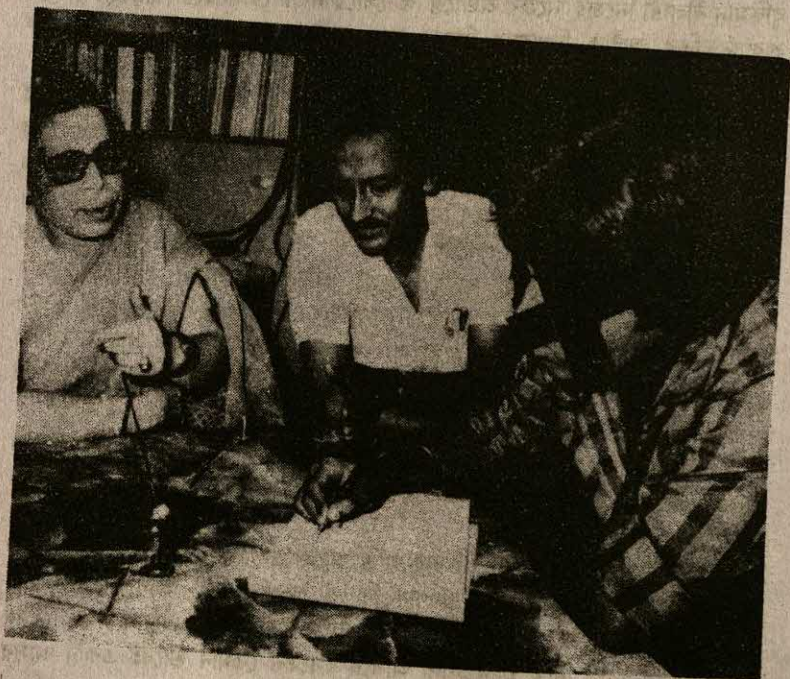
মঞ্জুদেবী তাঁর সন্দেহের কথাটি স্বভাবতঃই প্রকাশ করলেন। বললেন, আপনি ওকে সম্মোহন করে লিখতে বাধ্য করছেন না তো?

মা'য়ের এমনতর কথা নীলাদ্রীর ইগোতে আঘাত করল। নীলাদ্রী খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। কিছু তপ্ত কথা বলে ক্ষিপ্ত নীলাদ্রী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মঞ্জুদেবীর মস্তিষ্ক কোষে আত্মা ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি গেঁথে দেওয়ার জন্য নীলাদ্রীকে ঠাণ্ডা করে আবার এনে তথাকথিত প্ল্যানচেটের আসরে বসালাম। আমাদের অনুরোধে নীলাদ্রী কলমও ধরলেন। এবার মঞ্জুদেবী আত্মার উপস্থিতির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হতে এমন অনেক প্রশ্ন করলেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কলমের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন মঞ্জু। বিশ্বাস করলেন এ সব সত্যিই আত্মারই লেখা। গুরুদেবের আত্মাই কথা দিচ্ছেন, মঞ্জুদেবীর পরিবারকে আর বিরক্ত করবেন না।

মৃতের আত্মার কোনও অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অবচেতন মনের যে বিশ্বাস সচেতন মনকে চালিত করে অলীক কিছু লিখিয়েছে, অলীক কিছু শুনিয়েছে, অলীক কিছুর স্পর্শ অনুভব করিয়েছে, আমি আমার কথাবার্তা এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই অবচেতন মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলতে বা ধারণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, গুরুদেবের আত্মা আজই তাঁদের ছেড়ে যাবেন।

গত দু'দিন আমার সঙ্গে গুরুদেবের আত্মার এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ফলে নীলাদ্রীর মস্তিষ্ক কোষে আমার দ্বারা সঞ্চারিত দৃঢ় ধারণাই নীলাদ্রীকে দিয়ে লিখিয়েছে—'হ্যাঁ, বেশ চলে যাব'...এই সব কথাগুলো।

সচেতন মনের উপর অচেতন মনের প্রভাবের জন্য যে লেখাগুলো এতদিন আত্মা এসেছে বিশ্বাসে লেখা হয়েছে, যে কথাগুলো এতদিন আত্মা বলছে বিশ্বাসে শোনা গেছে, সেই সচেতন মনের উপর অবচেতন মনের প্রভাবকে কাজে লাগানোর ফলেই আজকের নীলাদ্রী আত্মার বিদায় নেওয়ার কথা লিখলেন।

অবচেতন মনের প্রভাবের একটা পরীক্ষা হয়েই যাক

সচেতন মনের ওপর অবচেতন মনের প্রভাব হাতে কলমে পরীক্ষা করতে চাইলে আসুন আমার সঙ্গে। একটা সাদা খাতা যোগাড় করে ফেলুন। খাতাটা বাঁধানো হলে ভালো হয়। খাতা না পেলে একটা সাদা কাগজ নিয়েই না হয় আমরা কাজটা শুরু করি। এবার একটা কলম, একটা আংটি ও সুতো। খাতায় বা কাগজে ইঞ্চি চারেক ব্যাসের একটা মোটামুটি বৃত্ত এঁকে ফেলুন। ব্যাস অবশ্য চারের বদলে দুই বা ছয় ইঞ্চি হলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। এবার গোটা বৃত্ত জুড়ে পরিধি ছুঁয়ে এঁকে ফেলুন একটা যোগ চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন। সরল রেখা দুটির নাম দেওয়া যাক A B ও C D। এখন আসুন, আমরা আংটিতে বেঁধে ফেলি সুতো। আংটিটায় কোনও পাথর বসান থাকলে সুতো আমরা বাঁধবো পাথরের বিপরীত দিকে।
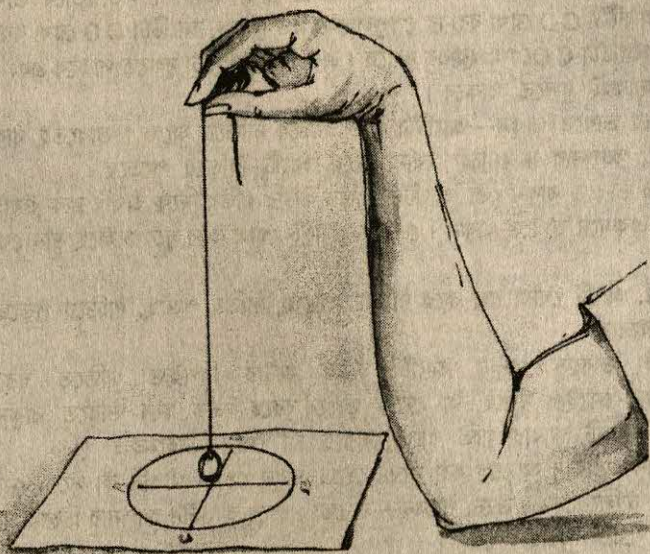
অবচেতন মনের পরীক্ষা

এবার আমরা বৃত্ত আঁকা খাতা বা কাগজটা টেবিলে পেতে নিজেরা চেয়ার টেনে বসে পড়ি আসুন। কনুইটা টেবিলে রেখে তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে আংটি বাঁধা সুতোটাকে এমনভাবে ধরুন যাতে আংটিটা ঝুলে থাকে যোগ-চিহ্নের কেন্দ্রে।

এবার শুরু হবে আসল মজা। আর মজাটা জমাতে প্ল্যানচেটের আসরের মতই চাই একটা শান্ত পরিবেশ। এমন শান্ত পরিবেশ পেতে প্রথম দিন শুধু আপনি একাই বসুন না একটা ঘরে, দরজা বন্ধ করে।

আপনি গভীরভাবে ভাবতে থাকুন আংটিটা A B রেখা ধরে A ও B-র দিকে দোল খাচ্ছে। ভাবতে থাকুন, গভীরভাবে ভাবতে থাকুন। ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হতে প্রয়োজনে দৃষ্টিকে A B সরলরেখা ধরে A ও B লেখার দিকে নিয়ে যান, মনে মনে বলতে থাকুন—আংটিটা A B ধরে দুলছে, পেণ্ডুলামের মত দুলছে। না বেশিক্ষণ আপানাকে ভাবতে হবে না। দু-চার মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাবেন স্থির আংটি গতি পাচ্ছে, A B রেখা ধরে আংটি পেণ্ডুলামের মত দুলে চলেছে।

আপনি এক সময় ভাবতে শুরু করুন—আংটি আবার স্থির হয়ে যাচ্ছে, আবার গতি

হারিয়ে স্থির হয়ে যাচ্ছে, স্থির হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাবেন আংটি স্থির হয়ে যাবে।

এবার আপনার চিন্তাকে নিয়ে আসুন C D রেখা বরাবর। গভীরভাবে ভাবতে থাকুন আংটিটা C D রেখা বরাবর পেণ্ডুলামের মত দুলছে, আংটিটা C D রেখা বরাবর দুলছে, আংটিটা C D রেখা বরাবর দুলছে। একসময় আংটিটা দুলতে থাকবে এবং CD রেখা বরাবরই দুলতে থাকবে।

আবার ভাবতে থাকুন—আংটিটা গতি হারিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবতেই থাকুন, দেখবেন, আপনার ভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে আংটি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এবার ভাবতে থাকুন তো, আংটিটা ঘড়ির কাঁটার গতির দিকে অর্থাৎ ক্লক-ওয়াইজ ঘুরছে। একমনে ভাবতে থাকুন। দেখবেন আংটি গোল করে ঘুরে চলেছে ডান থেকে বাঁয়ে।

ভাবুন, আংটি ঘোরা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ছে, দাঁড়িয় পড়ছে, দাঁড়িয়ে পড়ছে। আংটি দাঁড়াবে।

এবার ভাবতে থাকুন আংটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত গতিতে ঘুরছে, অ্যান্টি-ক্লক-ওয়াইজ ঘুরছে, বাঁ থেকে ডাইনে ঘুরছে। এক মনে ভাবতে থাকুন। দেখবেন আংটি আবার গতি পাচ্ছে, ঘুরছে, বাঁ থেকে ডাইনেই।

আপনি এবার দু-আঙুলে ধরা সুতো ছেড়ে ভাবুন তো—আপনি কী সুতো নেড়ে আংটিকে চালিয়েছেন ? উত্তর পাবেন—না তো ? তবে আংটিটা আপনার চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘুরছিল কেন ?

ঘুরছিল, কারণ আপনার অবচেতন মনই আপনাকে দিয়ে ঘোরাচ্ছিল। আপনিই সুতো নেড়ে আংটিকে চালিয়েছেন। কিন্তু সচেতনভাবে যেহেতু চালাননি, অর্থাৎ চালানোর ব্যাপারটা ঘটেছে আপনার সচেতন মনের সম্পূর্ণ অজান্তে, তাই সুতো যে আপনিই নেড়েছেন, সেটা আপনি নিজেই বুঝতে পারেননি।

এই একই কারণে বৃত্ত ঘিরে A থেকে Z লিখে ধূপদানী ছুঁয়ে যদি মনে মনে কোনও বিদেহী আত্মাকে আহ্বান জানাতে থাকি, এবং যদি গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করি যে আত্মা এলে প্রমাণ স্বরূপ ধূপদানী চলতে থাকবে, তাহলে দেখবো ধূপদানী এক সময় গতি পাবে।

উত্তমকুমারের মৃত্যুদিনে প্ল্যানচেটের আসর পেতে তাতে বসিয়ে দিন কোনও আবেগপ্রবণ আত্মা বিশ্বাসী মানুষকে। দেখবেন এক সময় তার হাতের ছোঁয়া পাওয়া ধূপদানী ধাবিত হবে 'U' শব্দের দিকে।

আবার কোনও জীবিত মানুষকে মৃত বলে বিশ্বাস তৈরি করে কাউকে মিডিয়াম হিসেবে বসিয়ে দিন। দেখবেন এ ক্ষেত্রেও একই ভাবে ধূপদানী গতি পাবে। বাস্তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধূপদানী চালায় ধূপদানী ছুঁয়ে থাকা মানুষটির অবচেতন মন, কোনও বিদেহী আত্মা নয়। আর এই অবচেতন মনকে চালায় বিশ্বাস, সংস্কার, আকুতি, আকাঙ্ক্ষা, একান্ত ইচ্ছা ইত্যাদি।

অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কেউ কেউ নিজেকে ভাল মিডিয়াম হিসেবে জাহির করতে ধূপদানী ঠেলে থাকে অতি সচেতনভাবেই। অর্থাৎ, সচেতনভাবেই তারা প্রতারক।

প্রেমিকের আত্মা ও এক অধ্যাপিকা

কিছুদিন আগে (২৪ ডিসেম্বর '৮৭) এক সন্ধ্যায় আমার কাছে নতুন বিবাহিত দুই তরুণ-তরুণী এসেছিলেন। ছেলেটি পেশায় সরকারী অফিসার, মেয়েটি অধ্যাপিকা। নাম জানালে দুজনেরই অসুবিধে হতে পারে। আমরা বরং ঘটনাটা বুঝতে ওঁদের দুটি নাম দিচ্ছি—জয় ও সুমনা।

ওঁদের শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলে রয়েছে দুজনের রঙিন ছবি। জয় মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করেছেন, সুমনা জয়ের ছবির দিকে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ভয় নিয়ে তাকিয়ে থাকেন, বিড়বিড় করেন নিজের মনে। একদিন জয়ের প্রশ্নের উত্তরে সুমনা বলেছিলেন, 'তোমার ছবিটা মাঝে মাঝে হঠাৎ অপরিচিত এক পুরুষের ছবি হয়ে যায়। সে আমাকে শাসায়, ভয় দেখায়।'

সুমনার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে জেনেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময় থেকে গৌরবের সঙ্গে সুমনার ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ভালবাসা দৈহিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়। সুমনা অধ্যাপনার কাজ পেলেন। দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা বছর। গৌরব কোনও কাজ জোটাতে পারেননি। আয় বলতে টিউশানি। ইতিমধ্যে জয়ের সঙ্গে আলাপ হলো সুমনার। বাস্তব জীবনে গৌরবের চেয়ে জয়কেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হলো। তরপর এক গোধূলী লগ্নে দুজনের বিয়ে। কয়েক দিন পরেই সুমনা খবর পেলেন তাঁদের বিয়ের রাতেই গৌরব আত্মহত্যা করেছে ঘুমের বড়ি খেয়ে। এর কিছু দিন পর থেকেই বর্তমান উপসর্গের শুরু। এক মধ্যরাতে জয় সুমনাকে যখন আদর-টাদর করছিলেন সেই সময় ড্রেসিং টেবিলে রাখা জয়ের ছবিটার দিকে তাকাতেই আতঙ্কে গা শির-শির করে ওঠে। জয়ের ছবিটা গৌরবের ছবি হয়ে গেছে। জীবন্ত ছবি। ছবির গৌরব তীব্র ঘৃণার চোখে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের পাতা পর্যন্ত পড়তে দেখেছেন সুমনা।

তারপর থেকে বহু বার জয়ের ছবিকে গৌরব হতে দেখেছেন সুমনা। সম্প্রতি জয়ের সঙ্গে মিলনের মুহূর্তে সুমনার কানের সামনে ফিসফিস করে ওঠে গৌরবের কণ্ঠস্বর। গৌরব ভর্ৎসনা করে। গৌরবের অতৃপ্ত আত্মাই যে এগুলো ঘটাচ্ছে সে বিষয়ে সুমনার বিশ্বাস হিমালয়ের মতোই অটল।

সুমনার এই ধরনের ভুল দেখা ও ভুল শোনা স্কিটসোফ্রেনিয়ারই লক্ষণ।

ভূতে পাওয়া যখন ম্যানিয়াস ডিপ্রেসিভ

সবার সামনে ভূত শাড়ি করে ফালা

গত বছর ১ বৈশাখ। এক তরুণ এলেন। সমস্যা, স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। পরিচয় গোপন রাখার প্রয়োজনে ধরে নিলাম মেয়েটির নাম টিংকু, ছেলেটির নাম চন্দন।

হারিয়ে স্থির হয়ে যাচ্ছে, স্থির হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাবেন আংটি স্থির হয়ে যাবে।

এবার আপনার চিন্তাকে নিয়ে আসুন C D রেখা বরাবর। গভীরভাবে ভাবতে থাকুন আংটিটা C D রেখা বরাবর পেণ্ডুলামের মত দুলছে, আংটিটা C D রেখা বরাবর দুলছে, আংটিটা C D রেখা বরাবর দুলছে। একসময় আংটিটা দুলতে থাকবে এবং CD রেখা বরাবরই দুলতে থাকবে।

আবার ভাবতে থাকুন—আংটিটা গতি হারিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবতেই থাকুন, দেখবেন, আপনার ভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে আংটি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এবার ভাবতে থাকুন তো, আংটিটা ঘড়ির কাঁটার গতির দিকে অর্থাৎ ক্লক-ওয়াইজ ঘুরছে। একমনে ভাবতে থাকুন। দেখবেন আংটি গোল করে ঘুরে চলেছে ডান থেকে বাঁয়ে।

ভাবুন, আংটি ঘোরা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ছে, দাঁড়িয় পড়ছে, দাঁড়িয়ে পড়ছে। আংটি দাঁড়াবে।

এবার ভাবতে থাকুন আংটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত গতিতে ঘুরছে, অ্যান্টি-ক্লক-ওয়াইজ ঘুরছে, বাঁ থেকে ডাইনে ঘুরছে। এক মনে ভাবতে থাকুন। দেখবেন আংটি আবার গতি পাচ্ছে, ঘুরছে, বাঁ থেকে ডাইনেই।

আপনি এবার দু-আঙুলে ধরা সুতো ছেড়ে ভাবুন তো—আপনি কী সূতো নেড়ে আংটিকে চালিয়েছেন ? উত্তর পাবেন—না তো ? তবে আংটিটা আপনার চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘুরছিল কেন ?

ঘুরছিল, কারণ আপনার অবচেতন মনই আপনাকে দিয়ে ঘোরাচ্ছিল। আপনিই সুতো নেড়ে আংটিকে চালিয়েছেন। কিন্তু সচেতনভাবে যেহেতু চালাননি, অর্থাৎ চালানোর ব্যাপারটা ঘটেছে আপনার সচেতন মনের সম্পূর্ণ অজান্তে, তাই সুতো যে আপনিই নেড়েছেন, সেটা আপনি নিজেই বুঝতে পারেননি।

এই একই কারণে বৃত্ত ঘিরে A থেকে Z লিখে ধূপদানী ছুঁয়ে যদি মনে মনে কোনও বিদেহী আত্মাকে আহ্বান জানাতে থাকি, এবং যদি গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করি যে আত্মা এলে প্রমাণ স্বরূপ ধূপদানী চলতে থাকবে, তাহলে দেখবো ধূপদানী এক সময় গতি পাবে।

উত্তমকুমারের মৃত্যুদিনে প্ল্যানচেটের আসর পেতে তাতে বসিয়ে দিন কোনও আবেগপ্রবণ আত্মা বিশ্বাসী মানুষকে। দেখবেন এক সময় তার হাতের ছোঁয়া পাওয়া ধূপদানী ধাবিত হবে 'U' শব্দের দিকে।

আবার কোনও জীবিত মানুষকে মৃত বলে বিশ্বাস তৈরি করে কাউকে মিডিয়াম হিসেবে বসিয়ে দিন। দেখবেন এ ক্ষেত্রেও একই ভাবে ধূপদানী গতি পাবে। বাস্তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধূপদানী চালায় ধূপদানী ছুঁয়ে থাকা মানুষটির অবচেতন মন, কোনও বিদেহী আত্মা নয়। আর এই অবচেতন মনকে চালায় বিশ্বাস, সংস্কার, আকুতি, আকাঙ্ক্ষা, একান্ত ইচ্ছা ইত্যাদি।

অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কেউ কেউ নিজেকে ভাল মিডিয়াম হিসেবে জাহির করতে ধূপদানী ঠেলে থাকে অতি সচেতনভাবেই। অর্থাৎ, সচেতনভাবেই তারা প্রতারক।

প্রেমিকের আত্মা ও এক অধ্যাপিকা

কিছুদিন আগে (২৪ ডিসেম্বর '৮৭) এক সন্ধ্যায় আমার কাছে নতুন বিবাহিত দুই তরুণ-তরুণী এসেছিলেন। ছেলেটি পেশায় সরকারী অফিসার, মেয়েটি অধ্যাপিকা। নাম জানালে দুজনেরই অসুবিধে হতে পারে। আমরা বরং ঘটনাটা বুঝতে ওঁদের দুটি নাম দিচ্ছি—জয় ও সুমনা।

ওঁদের শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলে রয়েছে দুজনের রঙিন ছবি। জয় মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করেছেন, সুমনা জয়ের ছবির দিকে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ভয় নিয়ে তাকিয়ে থাকেন, বিড়বিড় করেন নিজের মনে। একদিন জয়ের প্রশ্নের উত্তরে সুমনা বলেছিলেন, 'তোমার ছবিটা মাঝে মাঝে হঠাৎ অপরিচিত এক পুরুষের ছবি হয়ে যায়। সে আমাকে শাসায়, ভয় দেখায়।'

সুমনার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে জেনেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময় থেকে গৌরবের সঙ্গে সুমনার ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ভালবাসা দৈহিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়। সুমনা অধ্যাপনার কাজ পেলেন। দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা বছর। গৌরব কোনও কাজ জোটাতে পারেননি। আয় বলতে টিউশানি। ইতিমধ্যে জয়ের সঙ্গে আলাপ হলো সুমনার। বাস্তব জীবনে গৌরবের চেয়ে জয়কেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হলো। তরপর এক গোধূলী লগ্নে দুজনের বিয়ে। কয়েক দিন পরেই সুমনা খবর পেলেন তাঁদের বিয়ের রাতেই গৌরব আত্মহত্যা করেছে ঘুমের বড়ি খেয়ে। এর কিছু দিন পর থেকেই বর্তমান উপসর্গের শুরু। এক মধ্যরাতে জয় সুমনাকে যখন আদর-টাদর করছিলেন সেই সময় ড্রেসিং টেবিলে রাখা জয়ের ছবিটার দিকে তাকাতেই আতঙ্কে গা শির-শির করে ওঠে। জয়ের ছবিটা গৌরবের ছবি হয়ে গেছে। জীবন্ত ছবি। ছবির গৌরব তীব্র ঘৃণার চোখে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের পাতা পর্যন্ত পড়তে দেখেছেন সুমনা।

তারপর থেকে বহু বার জয়ের ছবিকে গৌরব হতে দেখেছেন সুমনা। সম্প্রতি জয়ের সঙ্গে মিলনের মুহূর্তে সুমনার কানের সামনে ফিসফিস করে ওঠে গৌরবের কণ্ঠস্বর। গৌরব ভর্ৎসনা করে। গৌরবের অতৃপ্ত আত্মাই যে এগুলো ঘটাচ্ছে সে বিষয়ে সুমনার বিশ্বাস হিমালয়ের মতোই অটল।

সুমনার এই ধরনের ভুল দেখা ও ভুল শোনা স্কিটসোফ্রেনিয়ারই লক্ষণ।

ভূতে পাওয়া যখন ম্যানিয়াস ডিপ্রেসিভ

সবার সামনে ভূত শাড়ি করে ফালা

গত বছর ১ বৈশাখ। এক তরুণ এলেন। সমস্যা, স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। পরিচয় গোপন রাখার প্রয়োজনে ধরে নিলাম মেয়েটির নাম টিংকু, ছেলেটির নাম চন্দন।

ভূতের কাণ্ড-কারখানাগুলো বড়ই অদ্ভুত রকমের। শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া নিজে থেকে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে আঁচড়ের দাগ। চুলগুলো নিজের থেকেই ছিঁড়ে যাচ্ছে। যখন তখন ঘরের মধ্যে ঢিল এসে পড়ছে। খাবার খেতে গেলেই খাবারে এসে পড়ছে চুল, ইটের টুকরো ইত্যাদি। এমনকি জল খেতে গেলেও পরিষ্কার গ্লাসে রহস্যময়ভাবে হাজির হচ্ছে চুল।

ভুতুড়ে উপদ্রবের শুরু '৮৭-র জানুয়ারিতে। ইতিমধ্যে জ্যোতিষী, তান্ত্রিক অনেকেই কাছেই টিংকুকে নিয়ে গেছেন চন্দন। কোনও ফল হয়নি।

কদমতলার ঠাকুরবাড়িতে টিংকুকে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠাকুরবাড়ি থেকে জানান হয়—একটি ছেলের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারই আত্মা টিংকুকে ধরেছে। কারও সাধ্য নেই টিংকুকে সেই আত্মার হাত থেকে রক্ষা করে।

কদমতলা থেকে ফিরে আসার দিন থেকে শুরু হয় আর এক নতুন উপসর্গ। সেইদিনই হাত থেকে চুড়ি, আংটি অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর থেকে বাড়ির বহু জিনিসই এমনি হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্য টিংকুর ভিতর থেকে ভূতটি বলে দিত কোথায় সে জিনিসগুলো ফেলেছে।

চন্দনের সমস্যা সমাধানের জন্য তার পরের রবিবার সকালেই গেলাম তাদের বাড়ি। না বাড়ি নয়, রেল লাইনের পাশে জবর-দখল করা জায়গায় সারি সারি ছাপড়ার বেড়ার কুঁড়ে। তারই একটায় চন্দনরা থাকেন। চন্দনরা বলতে—চন্দন, টিংকু, মা, বাবা, তিন বোন, দাদা ও দুই ভাই নিয়ে দশজন।

সেদিন আমার সঙ্গী ছিল আমার ছেলে পিনাকী ও আমাদের সমিতির সদস্য মানিক মৈত্র। চন্দনদের কুঁড়ের কাছে এক ঝাঁক তরুণ অপেক্ষা করছিলেন। প্রত্যেকেই চন্দনের বন্ধু বা পরিচিত। আমাকে দেখে প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। তাঁরা প্রত্যেককেই নাকি টিংকুর অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডের প্রতক্ষদর্শী। ওদের সকলের সামনেই নাকি টিংকুর শাড়ি আপনা থেকেই সশব্দে ছিঁড়ে গেছে। গায়ের গহনা অদৃশ্য হয়েছে।

কুঁড়ের সামনে একটা সজনে গাছ। তার উপর একটা কাক এসে বসতেই কয়েকজন তরুণ গভীরতর সন্দেহ প্রকাশ করলেন—এটা আদৌ কাক নয়। কাকের রূপ ধরে টিংকুর উপর ভর করা অতৃপ্ত আত্মা। আমি কেন এসেছি, এটা অতৃপ্ত সর্বত্রগামী আত্মার অজানা নয়। তাই কৌতূহল মেটাতে আমাকে দেখতেই টিংকুকে ছেড়ে বর্তমানে কাকরূপে আবির্ভূত হয়েছে।

ঘরে ঢুকলাম। টিংকু ও চন্দনের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বললাম। জানলাম কিছু কথা। চার বছর আগে নিজেদের আলাপেই দুজনের বিয়ে। চন্দন সে সময় এ-পাড়ায়, ও-পাড়া আবৃত্তি করতেন। টিংকু ওঁর আবৃত্তি ও সুন্দর কথাবার্তায় আকর্ষিত হয়েছিলেন।

টিংকুর বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। বাবা ব্যবসায়ী। ব্যবসার কল্যাণে গাড়ি-বাড়ি সবই আছে। দু'মেয়ের মধ্যে টিংকুই ছোট। বড় বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। টিংকু লেখা পড়ায় কোনওদিনই উৎসাহ বোধ করে না। তাই স্কুলের গণ্ডিটা পার হওয়ার আগেই গোটা আঠারো বসন্ত বিদায় নিয়েছে। বাড়ির তীব্র অমতে বিয়ে, তবু বাবা

গয়না, খাট ও কিছু নগদ অর্থ দিয়েছিলেন।

চন্দন বেশিদূর পড়াশুনো করেননি। হাওড়ার একটা কারখানায় কাজ করেন। বছরখানেক হল কারখানা বন্ধ। কারখানায় তালা ঝুলবার পর থেকে প্রতিদিনই আর্থিক সমস্যা তীব্রতর আকার ধারণ করছে। নগদ টাকার পুঁজি শেষ। স্ত্রীর গয়নায় হাত দিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে ভূতের সমস্যা। ভূত তাড়াতে তান্ত্রিকদের পিছনেই এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে হাজার সাতেক। বর্তমানে জমি-বাড়ি বিক্রির দালালী করার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক ছাপ না থাকায় এ লাইনেও তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

গত বছর টিংকুর গর্ভস্থ প্রথম সন্তান আকস্মিকভাবে নষ্ট হয়ে যায়। টিংকু আবার গর্ভবতী। চার মাস চলছে। ভূতের উপদ্রবও শুরু হয়েছে টিংকু দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার পর।

এই দারিদ্র্যতার মধ্যেও টিংকুর চেহারার ভিতর যথেষ্ট চটক রয়েছে। আড্ডার মেজাজে গল্প-সল্প করতে করতে জেনে নিলাম, টিংকু তাঁর বাপের বাড়ি থাকলে ভূতের উপদ্রবও বন্ধ থাকে।

টিংকুর ভূতের কাণ্ড দেখতে বেশ কিছুটা সময় ওর সঙ্গে ছিলাম। ঘরে শুধু আমি আর টিংকু। এরই মধ্যে ফ্যা-স্ করে শাড়ি ছেঁড়ার আওয়াজ পেলাম। শাড়ির ছেঁড়া জায়গাটা দেখালেন টিংকু। কিন্তু টিংকুর হাতগুলো পুরো সময় আমার সামনে ছিল না। তাই টিংকুর হাত যে তাঁর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শাড়ি ছেঁড়েনি, অলৌকিকভাবে ছিঁড়েছে—এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরপর অনেকটা সময় টিংকুর হাত দুটো আমার দৃষ্টির সামনে ছড়িয়ে রেখে বসলাম। শাড়ি আর ছিঁড়লো না। আর শাড়ি না ছেঁড়ায় টিংকু অস্বস্তি পাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমার ননদকে খাবার জল আনতে বলুন। আমি জল খেতে গেলেই দেখবেন জলে চুল পড়ে আমাকে জল খেতেও দেবে না।'

আমার কৌতূহল হলো। বললাম, 'বেশ তো, আপনার ননদকে খাবার জল আনতে বলুন।'

টিংকু ননদকে ডাকতেই পাশের ঘর থেকে উঁকি দিল একটি কিশোরী। এক গ্লাস খাবার জল চাইতে স্টিলের গ্লাসে জল নিয়ে এলো। আমি গ্লাসের জলটা পরীক্ষা করে এগিয়ে দিলাম টিংকুর দিকে। জলে চুমুক দিতে গিয়েই 'থু-থু' করে উঠলেন টিংকু। গ্লাসের জল থেকে গোটা দু-চার চুল তুলে ধরলেন ডান হাতের দু-আঙুলে। 'এই দেখুন চুল'। টিংকু আমার দিকে রহস্যময় হাসলেন।

আবার কিশোরীটিকে দিয়ে জল আনালাম। জল পরীক্ষা করলাম। টিংকুর হাতে তুলে দিলাম। টিংকু খেতে গিয়ে একই ভাবে 'থু-থু' করে দু-আঙলে তুলে ধরলেন চুল।

এইভাবে বার বার কিশোরীটিকে দিয়ে জল আনাচ্ছিলাম আর তুলে দিচ্ছিলাম টিংকুর হাতে। মোট দশ দফা জল তুলে দিয়েছিলাম টিংকুর হাতে সাতবারই জলে পাওয়া গিয়েছিল চুল। তিনবার পাওয়া যায়নি। সাতবার কিশোরীটির হাত থেকে জল নেবার সময় টিংকুর দিকে পিছন ফিরতে হয়েছিল। ওই সময়টুকুর টিংকুর সুযোগ ছিল নিজের চুল ছিঁড়ে আঙুলের ফাঁকে লুকিয়ে রাখার। তিনবার আমি জলের গ্লাস

নিয়েছিলাম টিংকুর দিকে পিছন না ফিরে। এই তিনবার টিংকুর পক্ষে আমার চোখ এড়িয়ে চুল ছেঁড়া সম্ভব ছিল না। এবং ওই তিনবারই জলে চুল পড়েনি।

ভূতের রহস্যটা পরিষ্কার হলো। মানসিক রোগটাও নির্ণয় করা গেল—ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ বা অবদমিত বিষণ্ণতা। টিংকু অতি গরীব পরিবার থেকে বিবাহ সূত্রে এই পরিবারে এলে বর্তমান দারিদ্র্যে নিশ্চয়ই তাঁকে অবদমিত বিষণ্ণতার শিকার হতে হতো না। টিংকু বিয়ের আগে পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও বিয়ের পরে ভালবাসার মানুষটির জন্য নিম্ন আয়ের পরিবারের সকলের সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর বন্ধ কারখানা কবে খুলবে সেই বিষয়ে অনিশ্চয়তা, আগত সন্তানের আর্থিক দায়িত্বের চিন্তা এবং প্রতিদিনের খাওয়া পরা জোটানোর তীব্র সমস্যা একসঙ্গে মিলে-মিশে টিংকুর চিন্তাকে অহরহ জর্জরিত করছিল। পরিণামে অবদমিত বিষণ্ণতার রোগী হয়ে নিজের অজান্তে অদ্ভুত সব আচরণ করে প্রতিদিনের সমস্যা ও চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে।

শাড়ি-ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলা, গায়ে আঁচড় দেওয়া, খাবারে চুল ফেলা সব কিছু নিজেই করেছে নিজের অজ্ঞাতে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

জীবন-ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন না মেটার ব্যর্থতাই যেখানে রোগের আসল কারণ, সেখানে শুধুমাত্র মানসিক চিকিৎসার সাহায্যে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া অসম্ভব। আমাদের সমিতির এক সভ্যের সহৃদয় সাহায্যে মেয়েটির স্বামীকে একটা কাজে লাগাবার পর মেয়েটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম সামান্য চেষ্টাতেই।

অবদমিত বিষণ্ণতা নানা কারণে একটু একটু করে গড়ে ওঠে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্বচ্ছতা পাবে আশা করি।

গ্রামে ফিরলেই ফিরে আসে ভূতটা

আমাদের অফিসেরই এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর বাড়ি উড়িষ্যার এক গ্রামে। একদিন সে আমাকে এসে জানাল, কিছু দিন হলো ওর স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। অনেক ওঝা, তান্ত্রিক, গুনিন দেখিয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই এরা দেখার পর খুব সামান্য সময়ের জন্য ভাল থাকে, অর্থাৎ বাঞ্ছিত ফল হয়নি। সহকর্মীটিকে বললাম, স্ত্রীকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে। নিয়েও এলো।

ওর স্ত্রীকে দেখে মনে হল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য কুড়ি বছরের কম নয়। বউটির বয়স বছর পঁচিশ। ফর্সা রঙ, দেখতে স্বামীর তুলনায় অনেক ভাল। দেশের বাড়িতে আর থাকে ওর দুই ভাসুর, এক দেওর, তাদের তিন বউ, তাদের ছেলে-মেয়ে ও নিজের দুই মেয়ে, এক ননদ ও শ্বাশুড়ী। বিরাট সংসারে প্রধান আয় ক্ষেতের চাষ-বাস। স্বামী বছরে দুবার ফসল তোলার সময় যায়। তখন যা স্বামীর সঙ্গ পায়। হাত-খরচ হিসেবে স্বামী কিছু দেয় না। টাকার প্রয়োজন হলে যৌথ-পরিবারের কর্ত্রী মা অথবা বড় জায়েদের কাছে হাত পাততে হয়।

প্রথম ভূত দেখার ঘটনাটা এই রকম : একদিন সন্ধ্যের সময় ননদের সঙ্গে মাঠ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এল। অথচ আশে-পাশে দুর্গন্ধ ছড়াবার মতো কিছুই চোখে পড়েনি। সেই রাতে খেতে বসে ভাতে গোরুর মাংসের গন্ধ পায় বউটি। খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে হল। গা-গুলিয়ে বমি। সেই রাতেই এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। জানলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে। বীভৎস একটা প্রেতমূর্তি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ওকেই দেখছিল। পরের দিনই ওঝা আসে। মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। কিন্তু কাজ হয় না। এখন সব সময় একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছে। খেতে বসলেই পাচ্ছে গোরুর মাংসের গন্ধ। আর মাঝে মাঝে প্রেতমূর্তিটি দর্শন দিয়ে যাচ্ছে।

বউটির মুখ থেকেই জানতে পারি তার মা ও বোনকেও এক সময় ভূতে ধরেছিল। ওঝারাই সারিয়েছে। বউটির অক্ষর জ্ঞান নেই। গোরুর মাংসের গন্ধ কোনও দিনও শুঁকে দেখেনি। প্রতিদিন অন্য তিন বউয়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় ওকে। তাদের স্বামীরা দেশেই থাকে, দেখাশুনা করে পরিবারের। অথচ বেচারী বউটিকে কোন সাহায্য করারই কেউ নেই। বরং মাঝে মধ্যে অন্য কোনও বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে কর্তামাও আমার সহকর্মীর বউটির বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দেন।

সব মিলিয়ে বউটির কথার বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায় : অন্য জায়ের স্বামীরা যে চাষ করে ঘরে ফসল তোলে। আমার বর কী করে ? টাকা না ঢাললে সবাই পর হয়। তা আমার উনি একটি টাকাও কস্মিনকালে উপুড়হস্ত করেন না। কিছু বললেই বলেন, দুই মেয়ের বিয়ের জন্য জমাচ্ছি।

বুঝলাম, অবদমিত বিষণ্ণতাই মহিলাটির মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে মহিলাটি অলীক বীভৎস মূর্তি দেখছেন, পাচ্ছেন অলীক গন্ধ। মহিলাটি গোরুর মাংসের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করে নিয়েছেন তাঁর নাকে আসা গন্ধটি গোরুরই।

সহকর্মীটিকে তাঁর স্ত্রীর এই অবস্থার কারণগুলো বোঝালাম। জানালাম চিরকালের জন্য স্ত্রীকে স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখতে চাইলে স্ত্রী-কন্যাদের কাছে এনে রাখতে হবে, তাদের দেখাশুনো করতে হবে, স্ত্রীর সুবিধে-অসুবিধেয় তার পাশে দাঁড়াতে হবে।

সহকর্মীটির টাকার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ। মধ্য কলকাতার নিষিদ্ধ এলাকা সোনাগাছিতে ওড়িশা থেকে আসা কিছু লোকেদের নিয়ে সামান্য টাকায় মেস করে থাকে। চড়া সুদে সহকর্মী ও পরিচিতদের টাকা ধার দেয়। দেশের সংসারে সাধারণত টাকা পাঠায় না। কারণ হিসেবে আমাকে বলেছিল, দেশের চাষের জমিতে আমারও ভাগ আছে। চাষ করে যা আসে তাতেই আমার পরিবারের তিনটে প্রাণীর ভাল মতই চলে যাওয়া উচিৎ। মেয়েমানুষের হাতে কাঁচা টাকা থাকা ভাল নয়, আর দরকারই বা কী ? শাশুড়ি, ননদ, জায়েদের সঙ্গে থাকতে গেলে একটু ঠোকা-ঠুকি হবেই। ও সব কিছু নয়। মেয়েদের ও-সব কথায় কান দিতে নেই।

হয় তো সহকর্মীটি এই মানসিকতার মধ্যেই মানুষ হয়েছে, অথবা অর্থ জমানোর নেশাতেই আমার যুক্তিগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে। জানে আমার যুক্তিকে মেনে নেওয়ার অর্থই খরচ বাড়ানো।

তবু শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধে বউকে কলকাতায় মাস চারেকের জন্য এনে

রেখেছিল। বউটিকে সম্মোহিত করে তার মস্তিষ্ক কোষে ধারণা সঞ্চারের মাধ্যমে অলীক গন্ধ ও অলীক দর্শনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম দু-মাসে, দুটি সিটিং-এ। স্ত্রী ভাল হতেই সহকর্মী তাকে গ্রামে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বউটি আমাকেও অনুরোধ করেছিল, আমি যেন ওর স্বামীকে বলে অন্য পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিতে বলি। পাড়াটা বড় খারাপ। নষ্ট মেয়েরা খিস্তি-খেউড় করে, ওদের এড়াতে দিন-রাত ঘরেই বন্দী থাকতে হয়।

অনুরোধ করেছিলাম। খরচের কথা বলে সহকর্মীটি এক ফুঁয়ে আমার অনুরোধ উড়িয়ে দিল। পরিণতিতে বউটিকে গ্রামে পাঠাবার দেড়মাসের মধ্যেই বউটি আবার অবদমিত বিষণ্ণতার শিকার হয়েছিল। সহকর্মীটিই আমাকে খবর দেয়, 'বউকে আবার ভূতে ধরেছে চিঠি এসেছে। কবে আপনি ওকে দেখতে পারবেন জানালে, বউকে সেই সময় নিয়ে আসবো।'

বলেছিলাম, 'আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। আমার অত নষ্ট করার মত সময় নেই যে, তুমি দফায় দফায় বউটিকে অসুস্থ করাবে, আর আমি ঠিক করব। তুমি যদি তোমার বউ ও মেয়েদের এখানে এনে স্থায়ীভাবে রাখ, তবেই শুধু ওকে স্থায়ীভাবে সুস্থ করা সম্ভব এবং তা করবও।'

'সহকর্মীটি আমার কথায় অর্থ-খরচের গন্ধ পেয়েছিল, স্ত্রীকে আর আনেনি।

যে ভূত দমদম কাঁপিয়ে ছিল

অতৃপ্ত বাসনা থেকেও আসে অবদমিত বিষণ্ণতা। কোনও অদম্য বাসনা যখন অপূর্ণ থেকে যায়, তখন সেই বাসনার তীব্রতা প্রতিনিয়ত মস্তিষ্ককোষকে উত্তেজিত করতে থাকে ; এই মস্তিষ্ককোষগুলোর উপর অতিপীড়ন চলতে থাকার ফলে এক সময় মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়াকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে।

অতৃপ্ত প্রেম অনেক সময়ই যে অবদমিত বিষণ্ণতার সৃষ্টি করে, তার থেকেও ভূতে ধরার তথাকথিত অনেক ঘটনা ঘটে থাকে।

এমনই একটা সত্যি ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি, শুধু পাত্র-পাত্রীদের নাম গোপন করে।

১২ জানুয়ারি '৯০-এর সন্ধ্যায় আমাদের সমিতির এক সদস্য মৈনাক খবর দিলেন—সত্য গাঙ্গুলীর বাড়িতে কয়েক দিন ধরে অদ্ভুত সব ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটে চলেছে। সত্য গতকাল রাতে মৈনাকের সঙ্গে দেখা করে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সত্য এক বিখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসকেরই ভাইপো, আমার সঙ্গে তেমন কোন পূর্ব পরিচয় না থাকলেও ওই মনোরোগ চিকিৎসক আমার পরিচিত ও শ্রদ্ধেয়।

ঘটনার যে বিবরণ মৈনাকের কাছ থেকে শুনলাম তা হল এই রকম—

ঘরে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ এসে জিনিস-পত্তর পড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ সবার সামনে থেকে জিনিসপত্র অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির অনেকেরই পোশাক-আষাকে

হঠাৎই দেখা যাচ্ছে কিছুটা অংশ খাব্‌লা দিয়ে কাটা। ঘটনাগুলোর শুরু গত মঙ্গলবার অর্থাৎ ৯ তারিখ থেকে। পরিবারের সকলেরই শিক্ষিত এবং মার্কসবাদী হিসেবে সুপরিচিত। গতকাল রাতে বাড়ির কাজের মেয়ে রেণু হঠাৎ চেতনা হারিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছিল। সত্যর বউদি দেখে দৌড়ে গিয়ে পিঠে একটা চড় মারতে মেয়েটি চেতনা ফিরে পায়। তারপরই কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সত্য ওঁদের পারিবারিক চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। প্রতিষ্ঠিত ওই চিকিৎসকই নাকি সত্যকে বলেন 'এটা ঠিক আমার কেস নয়, আপনি বরং প্রবীরদাকে ডাকুন।' তারপরই সত্য আমাকে আনার জন্য মৈনাকের স্মরণাপন্ন হন।

সে রাতেই গেলাম সত্যদের বাড়িতে। সত্যরা থাকেন দোতলায়।

বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললাম। বাড়িতে থাকেন সত্য, দাদা নিত্য, বউদি মালা, ভাই চিত্ত, দুই বোন রেখা ও ছন্দা, মা অলকা ও কাজের মেয়ে রেণু।

মা'র বয়েস ৬৫-র কাছাকাছি। ভুতুড়ে কাণ্ডের বিষয়ে অনেক কিছুই বললেন, স্পষ্টতই জানালেন, 'না, কারুর দুষ্টুমি বা কেউ মানসিক ভাবে নিজের অজান্তে এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে বিশ্বাস করি না।' জানালেন, নিজের চোখে দেখেছেন ঠোঙায় রেখে দেওয়া জয়নগরের মোয়ার মধ্য থেকে মুহূর্তে একটা মোয়াকে অদৃশ্য হতে। সেই মোয়াই আবার ফিরে এসেছে সকলের চোখের সামনে শূন্য থেকে। গত পরশু ওঁরা পরিবারের অনেকে টেলিভিশন দেখছিলেন, হঠাৎই ছাদ থেকে আমাদের সকলের চোখের সামনে মোয়াটা এসে পড়লো। মোয়াটার কিছুটা অংশই দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ধারাল দাঁত দিয়ে মোয়াটা কাটা হয়েছে।

আজই সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ঘটনার যা বর্ণনা দিলেন, সে আরও আকর্ষণীয়। ঘরে টেলিভিশন দেখছিলেন অলকা, ছন্দা, চিত্ত, রেণু ও মালা। হঠাৎই রেণুর হাত থেকে লোহার বালাটা নিজে থেকে খুলে এসে পড়লো মেঝেতে। লোহার বালাটা কালই রেণুকে পরানো হয়েছিল ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে। এই ঘটনা দেখার পর প্রত্যেকেই এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে চার মহিলাই চিত্তর পইতে ধরে বসেছিলেন এবং পইতে ধরেই চিত্ত করছিলেন গায়ত্রী জপ। আজই তিনবার রেণুর কানের দুল আপনা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছে।

বউদি মালা জানালেন অনেক ঘটনা। তার মধ্যে আকর্ষণীয় হলো, বাথরুম বন্ধ করে স্নান করছেন, হঠাৎ মাথার উপর এসে পড়লো কিছু ব্যবহৃত চায়ের পাতা ও ডিমের খোসা। কাল সন্ধ্যায় দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কিছু এসে প্রচণ্ড জোরে তাঁর পিঠে আছড়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখেন শ্যাম্পুর শিশি। শিশিটা থাকে বাইরের বারান্দার র‍্যাকে। সেখান থেকে কী করে বন্ধ ঘরে এটা এসে আছড়ে পড়লো, তার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও ব্যাখ্যা তিনি পাননি।

রেখার বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। তিনিও অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জানালেন। তার মধ্যে আমার কাছে যেটা আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, সেটা হলো, রান্নাঘরে আটা মেখে রেখেছেন, উঠে দাঁড়িয়েছেন গ্যাসটা জ্বালিয়ে চাটুটা চাপাবেন বলে, হঠাৎ দেখলেন আটার তালটা নিজের থেকে ছিটকে এসে পড়লো রান্নাঘরের দেওয়ালে। না, সে সময় রান্নাঘরে আর কেউই ছিলেন না। রান্নাঘরের বাইরে, কিছুটা

তফাতে বারান্দায় বসে কাঁচা-আনাজ কাটছিল রেণু। না, রেণুর পক্ষে কোনও ভাবেই নাকি রেখার চোখ এড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে আটা ছুঁড়ে মারা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া আরও একটা ঘটনা ঘটতে দেখেছেন রেখা। সেখানে রেখা ছাড়া রেণু কেন, কারোরই উপস্থিতি ছিল না।

এবারও ঘটনাস্থল রান্নাঘর। গ্যাসের টেবিলের ওপর একটা ঠোঙায় রাখা ছিল কয়েকটা বিস্কুট। হঠাৎ চোখের সামনে ঠোঙার মুখ খুলে গেল। একটা বিস্কুট ঠোঙা থেকে বেড়িয়ে এসে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে রান্নাঘরের জানালার শিক গলে বেড়িয়ে গেল।

ছন্দা'র বয়স বছর ষোল। ওর দেখা ঘটনাগুলোর মধ্যে যে ঘটনাটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টেনেছিল, সেটা আজই সন্ধ্যায় ঘটেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল হারমোনিয়ম বাজিয়ে। হারমোনিয়মের উপর ছিল কয়েকটা স্বরবিতান। ঘরে আর কেউ নেই। হঠাৎ লোড্‌শেড়িং। সেই মুহূর্তে তার গায়ের উপর আছড়ে পড়লো হারমনিয়ামের উপর রাখা স্বরবিতানগুলো। আতঙ্কে ছন্দা চেঁচিয়ে উঠলো, 'কে-রে ?' অমনি গালের উপর এসে পড়লো একটা বিশাল চড়।

রেণু'র বয়স বছর ষোল। ওর কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলোর আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল সেগুলো হলো, নিজের হাতের থেকে লোহার চুড়ি একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে—দেখেছে, কানের দুল হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে—অনুভব করেছে। গত পরশু এক সময় জামা পাল্টাতে গিয়ে দেখে অন্তর্বাসের বাম স্তনবৃন্তের কাছটা গোল করে কাটা। অথচ অন্তর্বাসটা পড়ার সময়ও ছিল গোটা।

রেখার এক বান্ধবী গীতা থাকেন, মধ্যমগ্রামে। রেখাদের সঙ্গে সম্পর্ক পরিবারের একজনের মতই। মাসের অর্ধেক দিনই কাটে রেখাদের বাড়িতে। গীতা'র সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। তিনি গত পরশুর একটা ঘটনা বললেন। একটা 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েছিল মেঝেতে। হঠাৎ দেশ পত্রিকা মেঝেতে চলতে শুরু করলো। থামল অন্তত হাত চারেক গিয়ে। না, হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। শীতের সন্ধ্যা। ঘরের প্রতিটি জানলা বন্ধ, বাইরের প্রকৃতি স্তব্ধ। ঘরে ফ্যানও চলছিল না। গত কালকের ঘটনাও কম রোমাঞ্চকর নয়। কাল সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখতে পেলেন একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরের মেঝেতে তৈরি হতে শুরু করলো। আতঙ্কিত চোখে দেখলেন কুণ্ডলীটা একটা বেড়াল হয়ে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভূতের একটা বৈশিষ্ট ছিল কাপড় কাটা, বাড়ির প্রায় সকলেরই পোশাক, গরম-পোশাক ভূতের কোপে পড়ে কাটা পড়েছে। আমি গোটা চল্লিশেক পোশাক পরীক্ষা করেছি। প্রত্যেকটাই প্রায় এক স্কোয়ার ইঞ্চির মত জায়গা নিয়ে ধারালো কিছু দিয়ে গোল বা ডিম্বাকৃতিতে কাটা। কাটাগুলোরও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। ব্লাউজ, ফ্রোক, টপ্ মেয়েদের কামিজের স্তনবৃন্তের কাছে কাটা। চিত্তের পাজামার লিঙ্গস্থানের কাছে কাটা, তবে এই কাটাটা একটু বড়—চার স্কোয়ার ইঞ্চির মত জায়গা জুড়ে।

ওঁদের সঙ্গেই কথা বলে জানতে পারলাম গীতা গতকাল সকালে সত্য ও রেখাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছে, গুরুদেব জানিয়েছেন—বাড়িওয়ালা এক তান্ত্রিকের সাহায্যে ওঁদের পিছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছে। ভূত তাড়ানো যাবে। তবে যাগযজ্ঞের খরচ খুব একটা কম হবে না। এই বিষয়ে কথা বলার জন্য মা ও বড়দাকে নিয়ে আগামী শনিবার যেতে বলেছেন। বাড়িওয়ালা এ বাড়িতে থাকেন না। থাকেন বৃহত্তর কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে। আর এ বাড়িটা বৃহত্তর কলকাতার উত্তর প্রান্তে, দমদমে।

বাড়ির তিন ছেলের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, তাঁরা প্রত্যেকেই অনেক ভুতুড়ে ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলো ঘটার সময় তাঁরা ছাড়াও বাড়ির কেউ না কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল বা ছিলেন।

পুরো বিষয়টা নিয়ে ভালোমত আবার নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাচ্ছি, পাঁচ জন মহিলা স্পষ্টতই দাবি করছেন, তাঁরা এক বা একাধিক ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটতে দেখেছেন, যেখানে তাঁরা প্রত্যেকেই একাই উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাগুলো ঘটার সময় আর কেউই সেখানে ছিলেন না। অর্থাৎ কি না, বাস্তবিকই ভুতুড়ে ঘটনা।

এবার এঁদের কথাগুলোর ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। এঁদের মধ্যে সম্ভবত একজন ইচ্ছে করে অথবা নিজের অজান্তে ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছেন। বাকি চারজন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে নিয়েছেন—এ বাড়িতে ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে। এই একান্ত বিশ্বাস থেকে তাঁরা হয়তো ধোঁয়ার কুণ্ডলী জাতীয় কিছু দেখেছেন, 'দেশ' সাপ্তাহিক যেন নড়েছে বলে মনে করেছেন, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই নিজেকেই ভুতুড়ে ঘটনার একক প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার লোভে কাল্পনিক গপ্পো ফেঁদেছেন। সাধারণভাবে মানুষের কোনও বিশেষ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার মধ্য দিয়ে লোকেদের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার একটা লোভ থাকে। এ ক্ষেত্রে সম্ভবত তেমনই কিছু ঘটেছে।

অবশ্য এমনটাও অসম্ভব নয়, শুরুতে একজন মস্তিষ্ক কোষের বিশৃঙ্খলার দরুন নিজের অজান্তে ভুতুড়ে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং এই মানসিক রোগই সংক্রামিত হয়েছে আরো এক বা একাধিক মহিলার মধ্যে।

উপায় একটা আছে, তবে সময়সাপেক্ষ। যে পাঁচজন মহিলা এককভাবে ভূতুড়ে কাণ্ডের দর্শক ছিলেন বলে দাবি করছে ও করছেন তাঁদের প্রত্যেককে দিয়ে সত্যি বলান।

নিত্য ও সত্যকে বললাম, "আপনারা সহযোগিতা করলে আজ থেকেই কাজ শুরু করতে পারি। তবে আজই ভূতের অত্যাচার বন্ধ হবে, এমন কথা বলছি না। মালা, রেখা, ছন্দা, রেণু ও গীতাকে সম্মোহন করে বাস্তববিকই ভূতুড়ে ব্যাপারগুলো কিভাবে ঘটছে সেটা জেনে নিতে চাই। আশা রাখি, অবশ্যই আসল-সত্যটুকু ওঁদের কাছ থেকেই জেনে নিতে পারব। কী করে ঘটছে জানতে পারলে, ঘটনাগুলো ভবিষ্যতে আর যেন না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হবে না। আজ আমি একজনকে সম্মোহন করবো। এমন হতে পারে বাকি চারজনকে সম্মোহন করতে আরও চারটে দিন আমাকে আসতে হবে।"

প্রথম যাকে সম্মোহন করার জন্য বেছে নিলাম, সে রেণু। রেণুর গায়ের রঙ মাজা, মোটামুটি দেখতে, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, রেণুকে সম্মোহন করতে রেণুর সহযোগিতাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। রেণুর অনুমতি নিয়েই ঘরে রাখলাম আমাদের সমিতির সদস্য মৈনাক, রঘু ও পিনাকীকে। উদ্দেশ্য, ওদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি।

রেণুকে একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সাজেশন দিতে লাগলাম বা ওর চিন্তায় ধারণা সঞ্চার করতে লাগলাম। শুরু করেছিলাম এই বলে, "তোমার ঘুম আসছে। একটু একটু করে চোখের পাতাগুলো ভারি হয়ে আসছে। ঘুম আসছে।" সম্মোহন প্রসঙ্গে 'অলৌকিক নয় লৌকিক' বইয়ের প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। তাই এখানে সম্মোহন বিষয়ে আবার বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না। এক সময় রেণুর বন্ধ চোখের পাতার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও এখন সম্মোহিত। চোখের পাতার নিচে মণি দুটো এখন স্থির।

টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিলাম। শুরু করলাম প্রশ্ন। উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল রেণু।

আমি—তোমাকে বাড়ির সকলে ভালবাসে? নাকি কেউ কেউ তোমাকে মোটেই পছন্দ করে না?

রেণু—বাড়ির সকলেই ভালবাসে।

আমি—আমি তোমাকে একটা করে নাম বলছি, তুমি বলে যাবে তারা ভালবাসে কি না? দিদা?

রেণু—ভালবাসে।

আমি—নিত্যদা?

রেণু—ভালবাসে।

আমি—বউদি?

রেণু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। আবার জিজ্ঞেস করলাম—বউদি?

রেণু—হ্যাঁ, ভালইবাসে।

বুঝলাম, রেণু বউদিকে তেমন পছন্দ করে না।

আমি—রেখাদি?

রেণু—ভালবাসে।

আমি—ছন্দা?

রেণু—ভালবাসে।

আমি—সত্যদা?

রেণু—ভালবাসে।

আমি—চিত্তদা?

রেণু—চিত্তদা, চিত্তদা, চিত্তদা সুজাতাকে ভালবাসে।

আমি—তুমি চিত্তদাকে ভালবাস?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিত্তদাকে খুব ভালবাস?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিত্তদার-পাজামাটার ওই রকম জায়গাটা কাটলে কেন?

বহু ভূতুড়ে ঘটনার অনুসন্ধান করেছি। বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি, অনেকের মিথ্যা ভাষণে, অতি সাধারণ ব্যাপার পল্লবিত হয়ে বিশাল ভুতুড়ে ঘটনার রূপ নিয়েছে। এই জাতীয় প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে দেখেছি, প্রত্যক্ষদর্শীর দাবিদারেরা হয় অন্যের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে গুরুত্ব পাওয়ার মানসিকতায় মিথ্যে বলেছে, নতুবা নিজেদের বিশ্বাসকে অন্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে মিথ্যে বলেছে। আজ পর্যন্ত পাওয়া কয়েক শো ভুতুড়ে ঘটনার প্রতিটি সমাধান করেই এ কথা বলছি।

অদ্ভুত জল ভূত

এগারো বছরের ঝক্‌ঝকে চোখের চট্‌পটে ছেলে অমিতকে (প্রয়োজনের তাগিদে নামটা পাল্টালাম) ঘিরে ৬ মার্চ ১৯৮৯ থেকে ঘটে চলেছিল কতকগুলো অদ্ভুত ভুতুড়ে ঘটনা।

অমিত গুপ্ত কলকাতার এক অতি বিখ্যাত স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। থাকে উত্তর কলকাতায়। কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতাবাসী। নিজেদের বাড়ি। বনেদী পরিবার। বাপ-ঠাকুরদার খেলার সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা। এক নামে খেলার জগতের সকলেই দোকান ও দোকানের মালিককে চেনেন।

অমিতকে ঘিরে ভুতুড়ে রহস্যের কাণ্ডটা জানতে পারি ১৫ মার্চ। 'আজকাল' পত্রিকার দপ্তরে গিয়েছিলাম। যেতেই আমার হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন পূষণ গুপ্ত। চিঠিটাই এখানে তুলে দিচ্ছি।

শ্রী অশোক দাশগুপ্ত সমীপেষু,
সম্পাদক, আজকাল পত্রিকা,
সবিনয় নিবেদন,

আমার পুত্র··· (নামটা দিলাম না) ···স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। তাকে কেন্দ্র করে কিছু অলৌকিক (?) কাণ্ড ঘটে চলেছে—যা আমার স্ত্রীর বয়ানে লিপিবদ্ধ। বয়ানটি

রেণু—বেশ করেছি।

আমি—বেশ মজাই হয়েছে। চিত্তদার উপর একচোট শোধ তুলে নিয়েছে। তুমি কি দিয়ে ওদের সব জামা-কাপড়গুলো কেটেছো? ব্লেড দিয়ে?

রেণু—না, কাঁচি দিয়ে।

আমি—ওরা কেউ তোমাকে সন্দেহ করেনি?

রেণু—না।

আমি—তুমি আজ সন্ধ্যায় লোডশেডিং-এর সময় ছন্দাকে চড় মেরেছিলে?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমিই মোয়া সরিয়ে পরে খাওয়া মোয়াটা ফেলেছিলে? হ্যাঁ, মাখা আটা রান্না ঘরের দেওয়ালে কে ছুঁড়েছিল?

রেণু—আমি।

আমি—বাথরুমে বউদির মাথায় চায়ের পাতা ছুঁড়ে মেরেছিলে?

রেণু—না।

আমি—তবে, কি করে বন্ধ বাথরুমে বউদির মাথায় চায়ের পাতা পড়লো?

রেণু—আমার মনে হয় বউদি নিজেই করেছে। ও খুব মিথ্যেবাদী।

রেণু—আর বউদিকে শ্যাম্পুর কৌটো ছুঁড়ে মারা?

রেণু—ওটা আমিই করেছিলাম।

আমি—বউদি বলছিলেন ঘর বন্ধ ছিল!

রেণু—মিথ্যে কথা।

আমি—তোমার হাত থেকে লোহার চুড়ি একটু একটু করে নিজে থেকেই বেরিয়ে আসছিল, অনেকে নাকি দেখেছেন? ব্যাপারটা কী বলতো।

রেণু—আমিই চুড়িটা খুলে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলেছিলাম—আরে আরে চুড়িটা নিজে থেকেই হাত থেকে খুলে বেড়িয়ে এলো। ওরা সকলেই টিভি দেখছিল। আমার কথায় মেঝের দিকে তাকায়। চুড়ি পড়ে থাকতে সকলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

আমি—ওদের ভয় দেখাতে তোমার ভালো লাগছে?

রেণু—মজা লাগছে।

রেণুর সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছিল। বুঝতে অসুবিধে হয়নি চিত্তকে ওর ভালো লাগে। চিত্তকে ঘিরে ও অনেক কথাই বলেছিল, যার কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে সেটা শুধু চিত্ত ও রেণুই জানে। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি রেণুর অতৃপ্ত প্রেম, তার অবদমিত যৌন আবেগ মস্তিষ্ককোষের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, তারই পরিণতিতে বিভিন্নজনের এবং নিজের পোশাকের যৌনস্থান ঢাকা পড়ার জায়গাগুলোয় কাঁচি চালিয়েছিল।

এটুকু জানান বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, রেণুকে সামাল দিতেই ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার বন্ধ হয়ে যায়। এই একই সঙ্গে আরো জানাই, ওই পরিবারের যাঁরা এককভাবে ভূতদর্শী ছিলেন, তাঁরাও পরবর্তী পর্যায়ের আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আগের ভূত দেখার দাবিগুলোকে হয় এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন, নয় স্বীকার করেছেন বলার সময় কিছু রঙ চড়িয়ে ফেলেছিলেন।

নিয়েছেন। এতদিনের বাস তুলে চলে যাবেন, সিদ্ধান্তটা প্রতিবেশীদের পছন্দ হয়নি। কয়েকজন শেষ চেষ্টা হিসেবে আমার সাহায্য নেওয়ার কথা জানান। অমিত আলোচনা শুনছিল। ও শারীরিকভাবে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করছিল। ঘটনাটা সুদীপবাবুর নজরে পড়ে। অমিতকে এক মগ জল এগিয়ে দিয়ে বলেন, "শরীর খারাপ লাগছে ? চোখে মুখে জলের ছিটে দে, ভাল লাগবে।" অমিত জলের ছিটে দিয়ে সবে ঘুরেছে, অমনি কে যেন ওর মাথায় ওপর ঝপ্‌ঝপ্‌ করে জল ঢেলে দিল। সারা শরীর ভিজে একশা। অবাক কাণ্ড ! অথচ ওপরেও কেউ ছিলেন না। সেই মুহূর্তে সুদীপ ও অনিতা একমত হলেন—আর নয়, প্রবীরবাবু যদি কিছু করতে পারেন ভাল, নতুবা যে কোনও দামে বাড়িটা বিক্রি করে অন্য কোথাও একটা ফ্ল্যাটই নয় কিনে নেবেন। উপস্থিত প্রত্যেকেই ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। সুদীপ, অনিতার মতামতের বিরোধিতা করতে একজনও এগিয়ে এলেন না।

সুদীপের চিঠি ও অনিতার লিপিবদ্ধ বয়ান পড়ে ঠিক করলাম আজ এবং এখনই অমিতদের বাড়ি যাব।'আজকাল'-এর গাড়িতেই বেড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গী হলেন দুই চিত্র-সাংবাদিক ভাস্কর পাল, অশোক চন্দ এবং আমার দেহরক্ষী বঙ্কিম বৈরাগী।

অমিত, ওর মা, বাবা জেঠু, ঠাকুমা, দাদু ও কিছু পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললাম। ওদের ধারণা, ঘটনাগুলোর পিছনে রয়েছে ভূতের হাত। গত কাল গীতা ও চণ্ডীপাঠ করে গেছেন হাওড়ার দুই পণ্ডিত। তাতে অবস্থার কিছুই পরিবর্তন ঘটেনি। ভূতের আক্রমণ সমানে চলেছে। দেখলাম দু-বাড়ির জল-পড়া চেয়ার, বিছানা, মেঝে, টেলিভিশন, উঠোন, এমনকি মামার বাড়ির বাথরুমটি পর্যন্ত। বাথরুমের চার দেওয়াল, ছাদ ও দরজা জানালা দেখে নিশ্চিত হলাম, বন্ধ বাথরুমে বাইরে থেকে জল ছুঁড়ে দেওয়া অসম্ভব। অতএব ?

ঠিক করলাম অমিতকে সম্মোহিত করব। তার আগে অমিতের সঙ্গে এটা এটা নিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম। অমিত আমার নাম শুনেছে। আমার সম্বন্ধে অনেক খবর জানে। এও জানতে পারলাম আমার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি পড়ে ফেলেছে। গল্পের বই পড়তে ভালবাসে, বিশেষ করে গোয়েন্দা কাহিনী ও অ্যাডভেঞ্চার। নিজেরও অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালবাসে।

আমিও আমার ওই বয়েসের গল্প শোনাচ্ছিলাম। কেমনভাবে মায়ের চোখ এড়িয়ে গল্পের বই পড়তে নানা ধরনের পরিকল্পনা করতাম, মা কেমন সব সময় 'পড়-পড়' করে আমার পিছনে টিক্ টিক্ করে লেগে থাকতেন, সেই সব গল্প। পরীক্ষার রেজাল্ট তেমন জুতসই হত না, আর তাই নিয়ে মা এমন বকাঝকা করতেন যে কি বলবো। একবার মাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। মা মারছিলেন, আমি হঠাৎ একটা চিৎকার করে এমন নেতিয়ে পড়েছিলাম যে মা ভেবেছিলেন মারতে মারতে আমাকে বুঝিবা মেরেই ফেলেছেন। তখন মা'র সেকি কান্না।

আমরা দুজনে গল্প করছিলাম। শ্রোতা আমার তিন সঙ্গী। ইতিমধ্যে ছবি তোলার কাজও চলছিল। যখন বুঝলাম আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তখন বললাম, "সম্মোহন তো আমার বইয়ে পড়েছ, নিজের চোখে কখনও দেখেছ ?"

আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সঙ্গে দিলাম। ঘটনাগুলোকে আমার যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে পারছে না। আবার তাকে অস্বীকার করে সত্য প্রতিষ্ঠা করাও আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বাড়িতে এ নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই অশান্তি। এই পরিস্থিতিতে আমি ও আমার স্ত্রী যুক্তিবাদী শ্রী প্রবীর ঘোষের শরণাপন্ন হতে চাই। এ বিষয়ে আপনার অনুমতি ও সাহায্য আমার পরিবারে শান্তি আনবে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার ও প্রবীরবাবুর সাহায্য পেলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। নমস্কার।

ঠিকানা...... স্বাক্ষর......

আমাদের সুবিধের জন্য ধরে নিচ্ছি অমিতের বাবার নাম সুদীপ, মা অনিতা। অনিতার তিন পৃষ্ঠার বয়ান পড়ে যা জানতে পারলাম, তার সংক্ষিপ্তসার—৬ থেকে ৯ মার্চ চারদিন রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ভিতরের উঠোনে, দরজার ঠিক সামনেই দেখা যেতে লাগল কিছুটা করে জল পড়ে থাকছে। ১০ তারিখ রাত ৮টা নাগাদ ঘরের আলো নিভিয়ে পর্দা সরিয়ে খাটে বসেছিলেন সৈকতের মা অনিতা ও বাবা সুদীপ। সামান্য সময়ের জন্য নিজেরা কথা বলতে বলতে বাইরে নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন বারান্দায় চোখ পড়ল তখন ওঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন উঠোনে পড়ে আছে কিছুটা পায়খানা। ১১ তারিখ সকাল ৯টা থেকেই শুরু হলো ভূতের (?) তীব্র অত্যাচার। অমিতের ঠাকুমা পুজো করছিলেন। হঠাৎ ভিতরের উঠোনে চোখ পড়তেই দেখলেন উঠোনে এক গাদা জল। তারপর থেকে সারা দিন রাতে প্রায় চল্লিশবার জল পড়ে থাকতে দেখা গেছে বিভিন্ন ঘরে, বিছানায়, টেলিভিশনের ওপরে। এই শুরু, এরপর প্রতিটি দিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলতেই থাকে ভূত্বের তাণ্ডব।

অনিতার জবানবন্দীতে, "চেয়ারে বসে অমিত পড়ছে, পাশেই বিছানা। কলমের ঢাকনাটা তুলতে বিছানার দিকে হাত বাড়াতেই দেখা গেল, বিছানা থেকে কলের জলের মত জল পড়ে অমিতের জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে দিল।"

অমিতদের ঠিক পাশেই অমিতের মামার বাড়ি। ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে অমিতকে মামার বাড়িতে রাখা হয়। সেখানেও ভূত অমিতকে রেহাই দেয়নি। সেখানেও শুরু হয় ভূতের উপদ্রব। নানা জায়গায় রহস্যজনকভাবে জলের আবির্ভাব হতে থাকে। অমিত বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করেছে সবে, হঠাৎ ওর মাথার উপর কে যেন হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল। অথচ বাথরুমের একটি মাত্র জানলাও তখন ছিল বন্ধ।

এরপর অমিতকে আবার নিজের বাড়িতেই ফিরিয়ে আনা হয়। বাড়িতে অনবরত চলতেই থাকে ভূতের জল নিয়ে নানা রহস্যময় খেলা। সেদিনই রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা নাগাদ গৃহ-শিক্ষক অমিতকে পড়াচ্ছিলেন। গৃহ-শিক্ষকের সামনেই অমিতের চেয়ারে হঠাৎ একগাদা জলের আবির্ভাব। সেই রাতেই বাড়ির ও পাড়ার লোকজন অমিতদের ভিতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে জল-ভূতের বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে বাড়িতে দু'জন তান্ত্রিক দিয়ে তন্ত্র-মন্ত্র পুজো হয়েছে। এক ব্রাহ্মণ আট ঘণ্টা ধরে যজ্ঞও করেছেন ভূত তাড়াতে। খরচ হয়েছে প্রচুর ; কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। এই আলোচনায় সুদীপবাবু জানান, বাড়িটাই বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

অমিত লাফিয়ে উঠলো, "আমাকে সম্মোহন করবে ?"

বললাম, "বেশ তো, তুমি বিছানাতে শুয়ে পড় ।" অমিত শুয়ে পড়লো । বললাম, "এক মনে আমার কথাগুলো শোন।" আমি মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'suggestion' দিচ্ছিলাম, সহজ কথায় বলতে পারি, ওর মস্তিষ্ককোষে কিছু ধারণা সঞ্চার করছিলাম । মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে অমিত সম্মোহিত হল । ঘরে দর্শক বলতে আমার তিন সঙ্গী । সম্মোহিত অমিত আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল । আমার বিশ্বস্ত টেপ-রেকর্ডারটা অমিতের বালিশের পাশে শুয়ে এক মনে নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিল । প্রশ্নগুলোর কয়েকটা নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি ।

আমি—কে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন ?

অমিত—বাবা ।

আমি—জেঠু ভালবাসেন ?

অমিত—হুঁ ।

আমি—ঠাকুমা ।

অমিত—হু ।

আমি—দাদু ?

অমিত—হুঁ ।

আমি—মা ?

অমিত—মাও ভালবাসে, তবে খুব বকে, খুব মারে ।

আমি—তোমার স্কুলের রেজাল্ট কেমন হচ্ছে ?

অমিত—মোটামুটি ।

আমি—আগে আরও ভাল হতো ?

অমিত—হ্যাঁ ।

আমি—তোমার মা যে এত বকেন, মারেন, তোমার রাগ হয় না ?

অমিত—হয় ।

আমি—প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয় না ?

অমিত—হয় ।

আমি—আমার মত দুষ্টুমি করে মাকে ভয় পাইয়ে দাও না কেন ?

অমিত—তাই তো দিচ্ছি ।

আমি—কেমন করে ?

অমিত—জল ভূত তৈরি করে ।

আমি—জল লুকিয়ে রাখছ কোথায় ?

অমিত—বেলুনে ।

আমি—আর ফাটাচ্ছো বুঝি সেপ্টিপিন দিয়ে ?

অমিত—ঠিক ধরেছেন ।

আমি—বেলুন লুকোতে শিখলে কী করে ? তুমি তো দেখছি দারুণ ম্যাজিসিয়ান !

অমিত—আমাদের স্কুলে সাইন্স ক্লাব আছে। সিনিয়ার স্টুডেন্টরা অলৌকিক-বাবাদের বুজরুকি ফাঁস করে দেখায় বিভিন্ন জায়গায়, নানা অনুষ্ঠানে ।

ওদের কাছ থেকে আমরা জুনিয়ার স্টুডেন্টরাও অনেক খেলা শিখেছি।

জল ভূতের রহস্য ফাঁস হওয়ার পরেও একটু কাজ বাকি ছিল। ছেলেটিকে সাময়িকভাবে তার মানসিক বিষণ্ণতা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। অনিতাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম—স্নেহশীল মায়ের সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার ব্যাপারে অতি উৎকণ্ঠা বা অতি আগ্রহের ফল সব সময় ভাল হয় না, যেমনটি হয়নি অমিতের ক্ষেত্রে।

সুদীপ ও অনিতার কাছে জল-ভূতের রহস্য উন্মোচন করে বুঝিয়ে ছিলাম, কেন অমিত এমনটা করল, তার কারণগুলো। স্থায়ীভাবে অমিতকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অমিতের প্রয়োজন মায়ের সহানুভূতি, ভালবাসা। সেই সঙ্গে সুদীপ ও অনিতাকে বলেছিলাম, জল ভূতের রহস্যের কথা তাঁরা যে জেনে ফেলেছেন, এ কথা যেন অমিতকে জানতে না দেন, কারও কাছেই যেন অমিতের এই দুষ্টুমির বিষয়ে মুখ খুলে অমিতকে তীব্র সমালোচনার মুখে ঠেলে না দেন।

অমিতের মা, বাবার অনুরোধেই 'আজকাল'-এর পাতায় জল ভূতের রহস্য প্রকাশ করা হয় নি, কারণ পত্রিকার প্রতিবেদন অমিতের নাম গোপন করা সম্ভব ছিল না, অমিতের নাম প্রকাশ করে ওকে মানসিক চাপের মধ্যেও ফেলা ছিল একান্তই অমানবিক।

গুরুদেবের আত্মা

এবারের ঘটনার নায়িকা এক বেতার সঙ্গীত-শিল্পী। '৮৮-র শীতের এক সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে এলেন। স্বামী একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদে কাজ করেন। নাম ধরা যাক চঞ্চল আদিত্য। স্ত্রী অপর্ণা। চঞ্চল ছোট্ট-খাট্ট চেহারার, বিরল দাড়ি-গোঁফের, শান্ত-শিষ্ট মানুষ। গায়ের রঙ ফর্সা। চুল আঁচড়ানো সুবোধ-বালক ধাঁচের। বয়স বছর পঞ্চাশ। যে চুলগুলো সাদা হয়ে আছে, সেগুলোতে কলপ দিলে সম্ভবত তিরিশ বলেও চালান যায়। অপর্ণা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির সুঠাম চেহারার রমণীয় রমণী। দৃষ্টিতে ও চোখের কোলে বিষণ্ণতার ছাপ লক্ষ্য করলেই ধরা পরে। দেহ-সৌন্দর্যে বহু সদ্য-যুবতীদেরও ঈর্ষা জাগাবার ক্ষমতা রাখেন। দুই সন্তানের মা। বড় ছেলে বি এস সি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছোট উচ্চমাধ্যমিক দেবে।

দুজনের সঙ্গে আলাদা করে কথা বললাম। চঞ্চল কথা-প্রসঙ্গে জানালেন, পুজো-আর্চা, জ্যোতিষ-বিশ্বাস, , সৎ-সঙ্গ, সৎ-চিন্তা, সৎ-জীবন, সংযম ইত্যাদিকে তিনি বিশেষ মূল্য দেন। স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক খারাপ নয়। তবে যৌন জীবনকে তিনি গুরুত্ব দিতে নারাজ। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হওয়া উচিত আত্মিক, শারীরিক নয়। বছর তিনেক আগে চঞ্চল স্ত্রীকে নিয়ে যান তাঁর গুরুদেবের কাছে। অপর্ণার সেই প্রথম চঞ্চলের গুরু দর্শন। গুরু জ্যোতিষ চর্চাও করেন। গুরুদেবের ইচ্ছেতেই অপর্ণা দীক্ষা নেন। চঞ্চল ছাড়াও অপর্ণা মাঝে-মাঝে গুরুদেবের আশ্রমে যেতেন, গান শোনাতেন। দু'বছর আগে গুরুদেব দেহ রাখেন। তারপর থেকেই অপর্ণা প্রায় গুরুদেবের আত্মাকে দেখতে পাচ্ছেন। **গুরুদেবের আত্মার কথা শুনতে পাচ্ছেন।** গত এক বছর তিন মাসে

দুজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে অপর্ণার চিকিৎসা করিয়েছেন। সামান্যতম উন্নতিও লক্ষ্য করা যায়নি। বরং আত্মার আবির্ভাব বর্তমানে অত্যাচারে দাঁড়িয়েছে।

অপর্ণা কথায় কথায়, গল্পে গল্পে অনেক কথাই জানালেন। চঞ্চলের পুজো-আর্চা, জ্যোতিষ-বিশ্বাস, সংযম ইত্যাদি পুরুষত্বহীনতা থেকেই এসেছে। অতিমাত্রায় কামশীতল এবং সংগমকালে বীর্য ধরে রাখার ক্ষমতা অতিমাত্রায় ক্ষণস্থায়ী। নিজের অক্ষমতার জন্যই অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ। ওঁর সন্দেহ থেকে সংসার বাঁচাতে জলসায় গাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে। রেওয়াজের সঙ্গে সংগত করার তবলচী পর্যন্ত নিজের ইচ্ছেয় ঠিক করতে পারিনি। ষাটের উর্ধ্বে এক বৃদ্ধকে বিপদ সম্ভাবনা নেই বিবেচনা করে চঞ্চল তবলচী রেখেছেন।

চঞ্চলের কাছে বেশ কয়েকবার গুরুদেবের কথা শুনেছেন অপর্ণা। কিন্তু একবারের জন্যেও আগ্রহ প্রকাশ করেননি, বরং সত্যি বলতে কি পূজা-আর্চা জ্যোতিষী, গুরু, এ সবের উপর এক বিতৃষ্ণাই তীব্রতর হচ্ছিল চঞ্চলের কাপুরুষতা ও হীনমন্যতা দেখে দেখে। তবু সংসারে সুখ ও শান্তি বজায় রাখতে এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী, পুত্রদের সেবার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নিজের সঙ্গেই নিজে সংগ্রাম করছিলেন অপর্ণা। কিন্তু যে দিন চঞ্চলের গুরুদেব আনন্দময়কে দেখন, সেদিন কিছুটা চমকে গিয়েছিলেন অপর্ণা। এঁকেই এত শ্রদ্ধা করেন চঞ্চল ? আনন্দময় অপর্ণার চেয়ে দু-চার বছরের ছোটই হবেন। আনন্দময় চালাক-চতুর সুদর্শন যুবক। মেয়েরা নাকি ছেলেদের চাউনি দেখলেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন। অপর্ণাও পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন আনন্দময় অপর্ণায় মজেছেন, অপর্ণাকেও মজাতে চান। কিছুটা বেপরোয়া আনন্দ- পেতে কিছুটা চঞ্চলের উপর প্রতিশোধ তুলতে চঞ্চলকে না জানিয়েই অপর্ণা গুরুদেবের আশ্রমে গিয়েছেন। গুরুদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন একটু একটু করে বাড়ছে সেই সময়ই তিনি দেহ রাখলেন। না, চূড়ান্ত দেহ মিলনের ইচ্ছে থাকলেও তেমন সুযোগ ঘটার আগেই আনন্দময়ের জীবনে শেষদিন ঘনিয়ে আসে। তারপর থেকেই আনন্দময়ের অতৃপ্ত আত্মা অপর্ণার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছায় ঘোরাঘুরি করে। অপর্ণার শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দেয়। ঘুমের মধ্যে অনেক দিন নাকি মৈথুনের চেষ্টা করেছে।

অতৃপ্ত যৌন-বাসনার থেকেই অপর্ণার বিষণ্ণতা। অপর্ণার আকর্ষণীয় সৌন্দর্যে যখন পুরুষরা স্বাভাবিক কারণেই আকর্ষিত, তখন অপর্ণার জীবনে এসেছেন এক নীতিবাগীশ যৌনসুখদানে অক্ষম সন্দিগ্ধ পুরুষ। অপর্ণা যখন নিজের জীবনকে গুটিয়ে নিয়ে সংসারের কাজেই নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার চিন্তাগুলোকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছে, তখনই জীবনে এসেছে চঞ্চলের গুরুদেব। গুরুদেব অপর্ণার সুপ্ত কামনা-বাসনাগুলোকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন। অপর্ণার অতৃপ্ত বাসনা যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, তখনই বাসনার আগুনে জল ঢেলে দিল গুরুদেবের মৃত্যু। এই মৃত্যু অপর্ণার জীবনে নিয়ে এসেছে হতাশা ও বিষণ্ণতার জমাট অন্ধকার। অপর্ণার জীবনে গুরুদেব মরীচিকার মতই এসেছেন, অপর্ণার পিপাসাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সন্দেহপ্রবণ স্বামীর দৃষ্টি এড়িয়ে জীবনকে ভোগ করার একমাত্র উপায়, একমাত্র নায়ক ছিলেন গুরুদেব। এখন কী হবে ? আবার সেই স্বামী নামক এক মেরুদণ্ডহীন মানুষের

ইচ্ছের কাছে নিজেকে তুলে দিতে হবে ? বলি দিতে হবে নিজের সদ্য নতুন করে জেগে ওঠা যৌবনকে ? গুরুদেবের মৃত্যু অপর্ণার হতাশাকে, বিষণ্ণতাকে বাড়িয়েই তুলেছে, জাগিয়ে তুলেছে এইসব প্রশ্নকে। ঘুরে ফিরে এসেছে গুরুদেবের চিন্তা। গুরুদেবের চিন্তা মস্তিষ্ককে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, অন্য কোনও জীবনধর্মী চিন্তা সেখানে স্থান পায়নি। একটু একটু করে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাপর শর্তাধীন প্রতিফলনগুলো বা conditioned reflexগুলো স্তিমিত হতে থাকে, দুর্বল হতে থাকে। অপর্ণা বিষণ্ণতা রোগের শিকার হয়ে পরেন। উপসর্গ হিসেবে অলীক শ্রবণ, অলীক দর্শন ইত্যাদি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

স্থায়ীভাবে অপর্ণাকে সুস্থ করে তোলার জন্য অপর্ণার স্বামী চঞ্চলের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, কেন এর আগে চিকিৎসকরা অপর্ণাকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। স্বামী হিসেবে তিনি চিকিৎসকের ও ওষুধের হাতে স্ত্রীকে সমর্পণ করে নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন। কিন্তু এভাবে স্ত্রীকে সুস্থ করে তোলা বা অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব। সহবাসে বীর্যক্ষয়ের জন্য দেহ-মনের ক্ষতি হয় এমন ভাবাটা যে একান্তভাবেই ভুল ও বিজ্ঞান-বিরোধী এই সত্যটুকু বোঝাতেই তাঁর সঙ্গে দুটি দিন বসতে হয়েছিল। বুঝিয়ে ছিলাম, একটা বিড়াল পুষলে, তাকেও খেতে দিতে হয়। না দিলে এর-ওর হেঁসেলে মুখ দেবে, এটাই স্বাভাবিক। যাকে জীবনসঙ্গিনী করে এনেছেন, তিনি পুতুল নন, রক্ত-মাংসের মানবী। তাঁকে যৌবনের স্বাভাবিক খোরাকটুকু না দিলে তিনি যদি অন্যের হেঁসেলে নজর দেন, তবে তার সম্পূর্ণ দায় আপনারই। আপনার ভিক্টোরিয়ান যুগের যৌনশুচিতার ধ্যান-ধ্যারণাগুলো পাল্টান। যদি আপনি নিজেকে পাল্টাতে সচেষ্ট হন, শুধুমাত্র তবেই আমি আপনার স্ত্রীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারি। নতুবা কয়েকদিনের জন্য তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে আমি শ্রম দিতে নারাজ।

চঞ্চল আন্তরিকভাবে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেছিলেন। আমি সাহায্য করেছিলাম মাত্র। চঞ্চল স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কের জীবনে ফিরেছিলেন। আমিও আমার কথা রেখেছিলাম। অপর্ণা বর্তমানে সুখী স্ত্রী।

একটি আত্মার অভিশাপ ও ক্যারাটে মাস্টার

'৮৭-র ১ জুলাই, প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে সন্ধে সাতটা নাগদ বাড়ি ফিরে দেখি লোডশেডিং-য়ের মধ্যে বৈঠকখানায় চার তরুণ আমারই অপেক্ষায় বসে। দুজন এসেছেন একটি সাইন্স ক্লাব থেকে, ওঁদের একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে। তৃতীয় তরুণ রবীন্দ্রনাথ পাইন জানালেন, তিনি এসেছেন একটা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। চতুর্থজন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী। দুই তরুণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সেরে বিদায় দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের দিকে মন দিলাম। রবীন্দ্রনাথের ডাক-নাম রবি। বয়েস জানাল একুশ। অনুমান করলাম লম্বায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে, ওজন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন

কে জি। পরনে সাদা টেরিকটনের ট্রাউজার ও কালো গেঞ্জি। ট্রাউজারের ফ্যাসানে আধুনিকতার ছোঁয়া ; উরুর পাশে কালো সুতোয় মোটা করে লেখা Ashihara Kai-Kan (Karate)। হাফ-হাতা গেঞ্জির জন্য বাহুর যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে হাউন্ডের মত পেশীর আভাস। রবির চোখের দৃষ্টি ও ফাঁক হয়ে থাকা এক জোড়া ঠোঁট স্পষ্টতই ওর মানসিক ভারসাম্যের অভাবের ইঙ্গিত বহন করছিল।

রবি কথা শুরু করল এইভাবে, "আপনি আমাকে বাঁচান, নইলে মরে যাব। আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই।"

বললাম, "আমার দ্বারা তোমাকে যদি বাঁচান সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই বাঁচাব। তোমার সব কথাই শুনব, তার আগে বলতো, আমার ঠিকানা কোথা থেকে পেলে ? কেউ তোমাকে পাঠিয়েছেন ?"

"জুন সংখ্যা 'অপরাধ' পত্রিকায় আপনার একটা ইন্টারভিউ পড়ি গতকাল। লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়, কেউ যদি আমাকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারেন, তবে সে আপনি। আমি অপরাধ পত্রিকার অফিস থেকেই আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি।"

ইতিমধ্যে আমাদের জন্য লেবু-চা এসে গেল। দুটো কাপ রবি ও রবির বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "বাঃ, তুমি তো খুব তৎপর ছেলে।"

রবি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, না, তা নয়, আপনি যদি আমার বর্তমান মানসিক অবস্থাটা বুঝতেন, মানে আমি যদি আমার মানসিক অবস্থা আপনার সামনে খুলে দেখাতে পারতাম, তাহলে বুঝতেন একান্ত বাঁচার তাগিদেই আমি আপনার ঠিকানার জন্য কালই লেখাটা পড়ে পত্রিকার অফিসে দৌড়েছি।"

"যাই হোক তুমি যখন আমার কাছে এসেছ, তোমার সব কথাই শুনবো এবং সাধ্যমত সমস্ত রকমের সাহায্য করব। ততক্ষণ বরং আমরা চা খেতে খেতে তোমাদের বাড়ির কথা শুনি।"

একটু একটু করে ওর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। মা, বাবা, সাড়ে চার বছরের ভাই পুকাই ও রবিকে নিয়ে ছোট সংসার। বাবা ঘনশ্যাম পাইন আপনভোলা মানুষ, গুণী যন্ত্রসংগীত শিল্পী। বহু ধরনের বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়েছেন বাংলা ও বোম্বাইয়ের বহু জনপ্রিয় লঘু-সংগীত শিল্পীর সঙ্গে। অনেক সিনেমা এবং নাটকেও যন্ত্রসংগীত শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন। স্থায়ী আবাস তৈরি করে উঠতে পারেননি। থাকেন কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে 'আলোছায়া' সিনেমা হলের কাছে ভাড়া বাড়িতে।

রবি 'আসিহারা কাইকান ক্যারাটে অরগানাইজেশন'-এর ফুলবাগান ব্রাঞ্চের নিষ্ঠাবান প্রশিক্ষক। পার্ক সার্কাসে অরগানাইজেশনের প্রধান কার্যালয়। প্রধান পরিচালক ভারতীয় ক্যারাটের জীবন্ত প্রবাদ পুরুষ দাদি বালসারা। ফুলবাগান ব্রাঞ্চটা এল' পার্কে। এখানে রবি ক্যারাটে শেখায় সপ্তাহে তিন দিন, রবি, বুধ ও শুক্র, সকাল ৬টা থেকে ৮-৩০। নিজে সিনিয়ার ব্রাউন বেল্ট। এবারই ব্ল্যাক বেল্ট পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। বর্তমান অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেনি।

কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে এমনকি বাংলার বাইরেও বহু ক্যারাটে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে রবি। কখনও দাদি বালসারার সঙ্গে, কখনও ব্যক্তিগতভাবে। শেষ প্রদর্শনী '৮৬-র সরস্বতী পুজোর দিন বেলেঘাটা কর্মী সংঘের মাঠে। সেদিন কনুইয়ের

আঘাতে রবি আটটা বরফের স্ল্যাব ভেঙে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল, ভালবাসা আদায় করেছিল। দুটো বিশাল বরফের চাঁই কেটে তৈরি হয়েছিল ওই আটটা স্ল্যাব।

রবি এবার আসল ঘটনায় ফিরল। বলতে শুরু করল, 'মাস'দুয়েক আগের ঘটনা, সে দিনটা ছিল এপ্রিলের ২৫, শনিবার। খবর পেলাম রবি নামে একটা ছেলে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবরটা পেয়ে যখন দেখতে হাজির হলাম তখন দেরী হয়ে গেছে, পুলিশ লাশ নিয়ে চলে গেছে।

"পরদিন রবিবার, সকালে ক্লাবে ক্যারাটে ট্রেনিং দিয়ে বাড়ি এলাম ন'টা নাগাদ। আমাদের বাড়িতে এক উঠোন ঘিরে কয়েক ঘর ভাড়াটে। ক্যারাটের ব্যাগ নিয়ে ঢুকলাম পাশের কার্তিক কাকুর ঘরে। এটা-সেটা নিয়ে গল্প করতে করতে এক বাটি মুড়ি এসে গেল। হঠাৎ গতকালের রেলে কাটা পড়ার কথা উঠল। কাকুকে বললাম, গতকাল যে ছেলেটা কাটা পড়েছে সে নাকি আত্মহত্যা করেছে, নাম ছিল রবি। ওই রবির বদলে আমি রবি গেলেই ভাল হত।

"ওই রবির বদলে আমি রবি মরলে ভাল হত, এই কথাটা ঘুরে ফিরে বার কয়েক প্রকাশ করতে হঠাৎই কাকু আমার চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, খুব মরার শখ হয়েছে, নারে ?

"কাকুর ওই কথাটা কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগিয়ে কেটে কেটে আমার মাথায় ঢুকে গেল। মাথার সমস্ত চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল। কাকুর চোখে দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল। মুহূর্তে আমার সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিল। থরথর করে কাঁপছিলাম। দু-পায়ের উপর নিজের শরীরকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। এক সময় দেখলাম হাতের বাটি থেকে মুড়িগুলো ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠল। ঘরের চৌকাঠ পেরুলেই এক চিলতে বারান্দা। কোনও মতে বারান্দায় গিয়ে হাজির হতেই হড় হড় করে বমি করে ফেললাম। আমার চোখের সামনে ছয়-সাত বছর আগে দেখা একটা দৃশ্য ছায়াছবির মত ভেসে উঠল।

"আশি বা একাশি সালের বর্ষাকালের সকাল। আনন্দ পালিত রোডের ব্রিজটার ওপর দিয়ে আসছিলাম বাজার করে। অনেক তলায় রেল লাইনের মিছিল, যথেষ্ট ব্যস্ত লাইন। দু-পাঁচ মিনিট পরপরই ট্রেন চলাচল করে, একটু দূরে লাইনের ধারে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটা আত্মহত্যা করবে না তো ?

"মিনিটখানেক অপেক্ষা করতেই একটা ট্রেন আসতে দেখলাম। লোকটা চঞ্চল হল। ট্রেনটা কাছাকাছি হতেই লোকটা লাইনের উপর গলা দিয়ে দু'হাত দিয়ে লাইন আঁকড়ে রইল।

"তীব্র সিটি বাজিয়ে ব্রেক কসল ট্রেনটা। দু-পাশের চাকা থেকে আগুনের ফুলকি ছিটোতে ছিটোতে ট্রেনটা লোকটার উপর দিয়ে চলে গেল। গলাহীন শরীরটা পাথরের টুকরোর ঢাল বেয়ে নেমে এল। গাড়িটা যখন থামল তখন শেষ কামরাটাও লোকটার দেহ অতিক্রম করে গেছে। গার্ড নেমে দেহটা দেখে খাতায় কী নোট করে সিটি বাজিয়ে দিল। বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টের দরজা জানলা দিয়ে উঁকি মারা অনেক উৎকণ্ঠিত মাথা নিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। এবার আমি কাটা মুণ্ডুটাকে দেখতে পেলাম। দু-পাশের

রেললাইনের মাঝামাঝি পড়ে রয়েছে।

"আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার এই দৃশ্যটা সেইদিনে সেই রাতে বহুবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সারাটা রাত প্রচণ্ড আতঙ্কে জেগে কাটালাম।

"সকালে সকলের যখন ঘুম ভাঙল তখন আমি এক অন্য মানুষ। ক্যারাটে ইনস্ট্রাক্টর রবিন পাইন তখন ভয়ে জবুথুবু একটা নব্বই বছরের বুড়ো।

"আমার অবস্থা দেখে বাড়িওয়ালা কৃষ্ণগোপাল দেবনাথ আমাকে নিয়ে গেলেন কাঁকুড়গাছিতে তাঁর পরিচিত এক তান্ত্রিকের কাছে। প্রণামী হিসেবে দিতে হল এক কেজি চিনি, একটা মোমবাতি, একপ্যাকেট ধূপকাঠি ও একশো টাকা। তান্ত্রিকের নাম ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ঠিকানা ৬৮ মানিকতলা মেন রোড।

"তান্ত্রিকবাবা ধূপ মোমবাতি জ্বালিয়ে মড়ার খুলি নিয়ে কী সব মন্ত্র পড়লেন, ওটাকে নাকি খুলি চালান বলে। তারপর জানালেন—আনন্দ পালিত রোডের ওই ট্রেনে কাটা পড়া লোকটার আত্মাই আমার এই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অতৃপ্ত আত্মা তিনজনকে রেল লাইনে টেনে নিয়ে আত্মহত্যা করাবে। তৃতীয় যে ব্যক্তিকে মারবে সে হল আমি।

তান্ত্রিক ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও লেখক

"এই কথাগুলো শোনার পর আমার জিব শুকিয়ে গেল। কিছু বলতে পারছিলাম না। মাথায় যেন কেমন একটা অদ্ভুত শুন্যতা। শিরশিরে ভয়টা আরও বেশি করে মাথাচাড়া দিল। এরই মধ্যে শুনতে পেলাম ট্রেনের আওয়াজ। দেখতে পেলাম আনন্দ পালিত রোডের লোকটাকে। লোকটা লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। বাঁ হাতটায় ধরে রাখল লাইন। ডান হাতটা তুলে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম—না, যাব না।

"তান্ত্রিকবাবার ছেলে আমার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিল। শুনতে পেলাম তান্ত্রিকবাবার গলা—'আত্মাটা ওকে ডাকছে। ব্যাটা একে ছাড়বে না।'

"কৃষ্ণগোপালবাবু বললেন, 'একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে বাবা। কী করতে হবে বলুন।'

"একটা যজ্ঞ করতে হবে। তবে, ভূত ব্যাটা বড় সহজ পাত্র নয়।"

"বাড়ি এলাম আরও খারাপ অবস্থা নিয়ে। এসেই বিছানা নিলাম। ওই ২৬ এপ্রিলই ছিল শেষ ক্লাবে যাওয়া। শেখাবার মত শারীরিক ও মানসিক জোর সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। মাঝে মধ্যে বন্ধুরা জোর করে বাইরে নিয়ে যায়, চুপ-চাপ বসে থাকি। গলায় হাতে কয়েকটা তাবিজ কবজ চেপেছে। কাজ হয়নি কিছুই। প্রচণ্ড ভয়ের শিরশিরানি নিয়ে প্রতিদিনই আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার ঘটনাটা ছায়াছবির মতই আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। ট্রেনের প্রচণ্ড ব্রেক কসার আওয়াজ, আগুনের ফুলকি আর রেললাইনে গলা দেওয়া লোকটার হাতছানি আমাকে ভয়ে পাগল করে তুলেছে।

"একদিনের কথা, আমার এক ছাত্রের বাড়িতে গেছি। আমাদের দু-চারটে বাড়ির পড়েই থাকে। বাড়িতে এক নাগাড়ে শুয়ে-বসে অস্থির হয়ে পড়ছিলাম বলেই যাওয়া। এটা-ওটা নিয়ে কথা বলছিলাম। ছাত্রের ছোট ভাই খাতাতে একটা কী আঁকছিল। ঝুঁকলাম দেখতে। একটা ট্রেনের ছবি। মুহূর্তে আমার কানে ভেসে এল ট্রেনের প্রচণ্ড আওয়াজ। চোখের সামনে দেখতে পেলাম একটা ট্রেন প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষল। চাকা আর লাইনের তীব্র ঘষটানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম দু-পাশে আগুনের ফুলকি। ভয়ে শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। মাথাটা কেমন চিন্তাশূন্য হয়ে গেল, চিৎকার করে উঠলাম। পরে শুনেছি, আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

"আমি বুঝতে পারছিলাম, একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছি। এমনিভাবে বেশি দিন বাঁচা যাবে না। আত্মার ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে মৃত্যুই সবচেয়ে সুন্দর পথ বলে এক সময় ভাবতে শুরু করলাম। এই সময় এক প্রতিবেশীর উপদেশে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলজ ও হাসপাতালে মানসিক চিকিৎসার জন্য হাজির হলাম। দিনটা ছিল ৪ জুন।

"ডাক্তারবাবু সব শুনে বোঝালেন—আত্মা-টাত্মা কিছু নেই, এটা মনের ভয়। ওষুধ লিখে দিলেন। মানসিক রোগের চিকিৎসার শুরু হল। ওষুধ খেয়ে ঘুমোই খুব, কিন্তু জাগলেই সেই প্রচণ্ড ভয়ের মুহূর্তগুলো হাজির হতে থাকে। প্রচণ্ড পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় জিবটা কে যেন পেছন দিকে টানছে। আত্মহত্যার দৃশ্যটা আমাকে মুক্তি দেয়নি একটি দিনের জন্যেও। দিন দিন শক্তি কমেছে, কমেছে স্মরণশক্তিও।

আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করলাম চিকিৎসা-বিজ্ঞান আমাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। প্রতিটি দিনের অসহ্য যন্ত্রণার থেকে নিজেকে মুক্ত করার পথ নিজেই বেছে নিলাম। তিরিশে জুন সকালে সিদ্ধান্ত নিলাম আত্মহত্যা করব। সেদিন দুপুরে আমার এক বন্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার হাতে তুলে দিল জুন সংখ্যা 'অপরাধ' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। বলল, পড়ে দেখ ভূত-প্রেত, আত্মা কিছুই নেই, বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন প্রবীর ঘোষ। লেখাটা পড়লে আমাদের পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলো বড় বেশি মিথ্যে মনে হয়।

"লেখাটা পড়ে ফেললাম। বারবার পড়লাম। কেমন যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলাম। মনে হল, আপনি আমাকে ঠিক করতে পারবেন। আপনার ঠিকানা চাই। বন্ধুকে নিয়ে কাল বিকেলেই গেলাম 'অপরাধ' পত্রিকার অফিসে। ঠিকানাটা পেয়ে আজ আপনার কাছে এসেছি। আজকাল আমি পথে বেরুতে ভয় পাই। একটা মোটরের হর্ন বা সাইকেলের ঘণ্টা শুনলেই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠি।"

"হাসপাতালের প্রেসক্রিপসন সঙ্গে এনেছো?" জিজ্ঞেস করলাম।

"প্রেসক্রিপসনটা আপনার কাজে লাগাতে পারে ভেবে নিয়ে এসেছি। এই যে"

দেখলাম। ৪।৬।৮৭ লেখা আছে—

Tryptanol 25 mg.
1 tab at noon
2 tabs at evening
for 3 days.

পরবর্তী এক তারিখে লেখা—

Tryptanol 25 mg.
1 tab at noon
3 tabs at evening

পরবর্তী এক তারিখে লেখা আছে—

Tab tryptanol 25 mg.
1 tab 3 times daily
Tab Eskazine 1 mg.
1 tab 3 times daily

রবির সঙ্গে গল্প-সল্প করতে করতে খোলা-মেলা একটা সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললাম। কথাবার্তার মধ্য দিয়েই ওদের পারিবারিক জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কথা জানতে পারলাম।

রবির কথামত—জ্ঞান হয়ে অবধি বাবার কাছ থেকে শুনে আসছে, তার দ্বারা কিছু হবে না। বাবা ছেলেকে যতটা না মানুষ হওয়ায় সুযোগ দিয়েছিলেন, যতটা না পড়াশুনার সুযোগ দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি ভর্ৎসনাই করেছেন। যত্ন করে বাজনার তালিম না দিয়েই বারবার ঘোষণা করেছেন, বাজনা বাজানো তোর কর্ম নয়, আমার

ঘাড়ে বসে না থেকে এখন থেকে চরে খাওয়ার চেষ্টা কর। রবি তার শিল্পী-বাবাকে ভালবাসে কিন্তু তার শাসক বাবাকে একটুও শ্রদ্ধা করতে পারে না। রবি চরে খাওয়ারই চেষ্টা করেছে। বেছে নিয়েছে বেপরোয়া জীবন। খেলা হিসেবে নিয়েছে ক্যারাটেকে। জীবনচর্চাতেও প্রতি পদে পদে পেশীশক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছে। এক সময় পড়াশুনোয় আকর্ষণ হারিয়েছে। স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার উৎসাহ হারিয়েছে। রবির ষোল-সতের বছর বয়সে পৃথিবীর আলো দেখেছে রবির ভাই। রবিকে বাবার কাছে শুনতে হয়েছে, দুনিয়ার ছেলেরা টুকে পাশ করছে, তুই এমনই অপদার্থ যে টোকার ক্ষমতাটুকুও নেই। স্কুলের গণ্ডি পেরুতে না পারলে কোন কাজই জুটবে না। তখন হয় ভিক্ষে করে খেতে হবে না হয় চুরি ডাকাতি করে।

রবির জীবনে একমাত্র প্রেরণা ছিলেন দাদি বালসারা। খুব উৎসাহ দিলেন। বালসারা ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রীকে হারালেন। স্ত্রী ছিলেন দাদি বালসারার জীবনের অনেকটা জুড়ে। বালসারার ক্যারাটের প্রতি উৎসাহ, ছাত্রদের প্রতি উৎসাহ হঠাৎ কেমন যেন নিভে গেল। রবির জীবনের প্রেরণার আলোটুকুও নিভে গেল। নেমে এলো অন্ধকার। বাবার অনিয়মিত আয়, আর্থিক অনটন, দীর্ঘদিনের বাকি পড়া ভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালার বাড়ি-ছাড়ার নোটিশ। সকালে ঘুম থেকে উঠে গঞ্জনা, দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাইয়ের দেখাশুনো করা, স্নান করান, খাওয়ান ; নিজে আধপেটা খাওয়া অথবা একেবারেই না খেয়ে থাকা, বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বাউণ্ডুলের মত উদ্দেশ্যহীন ঘোরা, রাতে ফিরে আবার সেই অনটনের সংসারে গাল-মন্দ শোনা এটাই প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবি নিজের চোখে নিজেকে ছোট করে ফেলেছিল।

রবির সঙ্গে অনেক কথা হলো, অনেক গল্প। ভূত প্রসঙ্গে 'অপরাধ'-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটির কথাও এলো। বুঝতে অসুবিধে হলো না, সাক্ষাৎকারটি রবিকে জোর নাড়া দিয়েছে। ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ চেপে বসেছে ওর মনে। ভূত ভর, আত্মা নিয়ে নানা প্রসঙ্গ টেনে আলোচনায় মেতে উঠলাম, ভূতে ভরের কিছু কিছু নেপথ্য কাহিনী শোনালাম। ও সব নিয়ে ওর মনে জেগে থাকা প্রশ্নগুলো একে একে বেড়িয়ে এলো। ওর যুক্তির কাছে যাতে গ্রহণযোগ্য মনে হয় সে কথা মাথায় রেখেই উত্তর দিলাম। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, "২৬ এপ্রিলের পর কোন দিন ট্রেনে উঠেছ?" রবি উত্তর দিল, "না। ট্রেনকে এখন আমি এড়িয়ে চলি। মনে হয় ট্রেন চড়লে আমি বোধহয় চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

রবিকে বললাম, "তুমি কী এই ঘটনার পর কখনও রেল লাইনের ধারে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছ।"

"না। অসম্ভব! ও আমি কিছুতেই পারব না। ওই সময় লাইনে ট্রেন এসে পড়লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারবো না। ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়বই।" বলল, রবি।

বললাম, "তোমার সঙ্গে যদি আমি থাকি এবং তোমার দু-হাত দূর দিয়ে একটা ট্রেন ঝড়ের গতিতে চলে যাওয়া সত্ত্বেও ভয় না পাও বা ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে না পড়, তাহলে তোমার ভয় কাটবে তো?"

রবির চোখে উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করলাম, "আপনি পারবেন আমার সামনে দিয়ে চলন্ত

ট্রেন পাস করিয়ে দিতে ? যদি পারেন তবে নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পাব, ভয় কেটে যাবে।”

“ঠিক আছে, আগামী রবিবার সকাল ৯টার মধ্যে এখানে চলে এস। তুমি আর আমি যাব এমন কোনও একটা স্পটে, যেখান দিয়ে তীব্র গতিতে ট্রেন চলাচল করে। দু-তিনটে ট্রেন তোমার সামনে দিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। আমরা অপেক্ষা করব ট্রেনের হাত দুয়েক দূরে। প্রতিবারই ট্রেন চলে যাওয়ার পর দেখতে পাবে তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই আছ, ঝাঁপিয়ে পড়নি।”

“আঙ্কল, আপনি যদি সত্যিই এমনি করতে পারেন তবে আশা করি আমার ভয়টা কেটে যাবে। আর ভাল হয় যদি আপনি আমাকে আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার স্পটে দাঁড় করিয়ে ট্রেন পাস করিয়ে দিতে পারেন। এমনটা পারলে আমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাব, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব।”

বললাম, “বেশ তাই হবে, তবে ওই কথাই রইল, তুমি আগামী রবিবার সকাল ৯'টার মধ্যে এখানে চলে এস।”

কলকাতার বাইরে না থাকলে রবিবার সকাল থেকেই বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, অপরিচিতদের ভিড় হয় আমার ফ্ল্যাটে। সেই রবিবারেও সকাল থেকে বন্ধুদের আসা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে ৯টায় তখনও রবি এলো না। ঠিক করলাম আমিই ওর বাড়ি যাব। ঠিকানা জানি, অতএব সমস্যা নেই।

“আমার এখনই একবার বের হতে হবে।” এ কথা বলে আসরের ছন্দপতন ঘটালাম। দু-একজন কারণ জানতে চাওয়ায় সংক্ষেপে রবির ঘটনা জানালাম। বেশ কয়েকজন আমার সঙ্গী হতে চাইলেন, এঁদের মধ্যে একজন হলেন ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট লোলিত সাউ।

লোলিত বলল, “দাদা, আমি আপনার সঙ্গে যাই। রবি যাতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে সে আমি দেখব। এমনভাবে ধরে রাখব যে ও লাফাবার সুযোগই পাবে না।”

বললাম, “লোলিত, তোমার ধারণাই নেই এই ধরনের মানসিক রোগীরা কী অসম্ভব ধরনের শক্তি বিশেষ মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারে। এই ধরনের একজন মানসিক রোগগ্রস্ত দুর্বল শরীরের মহিলাও বিশেষ মানসিক অবস্থায় যেমন ভূতে পেয়েছে ভাবলে, এতই সবল হয়ে ওঠে যে পাঁচজন সবল পুরুষও তাকে শক্তি প্রয়োগে সামাল দিতে পারে না।”

সবচেয়ে বড় কথা হল, এমনি করে ওকে ধরে-বেঁধে ট্রেনের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে ওর মনের ভয় দূর হবে না।

“তাছাড়া যেভাবে ওর মানসিক চিকিৎসা করতে চাই, তাতে বহুর উপস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। এতে ও আপনাদের দিকে, আপনাদের কথার দিকেও আকর্ষিত হবে। ফলে আমার কথাগুলোকে ওর চিন্তায় গভীরভাবে ঢোকাতে ব্যর্থ হবো। আর এই ব্যর্থতা মানেই, ট্রেন আসবে, রবি আতঙ্কিত হবে, আত্মার আহ্বান শুনতে পাবে, ঝাঁপাবে এবং মরবে। পরিণতিটা আমার এবং সমিতির পক্ষেও ভাল হবে না।”

শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলাম মধুসূদন রায় ও চিত্র-সাংবাদিক কুমার রায়কে।

রবি বাড়িতেই ছিল। বাবা সকালেই বেরিয়েছেন রিহারসাল দিতে। মা যোগমায়া দেবীকে পরিচয় দিতে ঘরে নিয়ে বসালেন। রবি চৌকিতে জবুথবু হয়ে বসেছিল। যোগমায়া জানালেন, "কাল সারা দিনরাত রবি শুধু কেঁদেছে। ওর মত একটা জোয়ান ছেলে বাচ্চাদের মত কাঁদছে এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। আজ ওর যা শরীর ও মনের অবস্থা তাতে ওর পক্ষে একা আপনার বাড়ি যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওর বাবার আজ রিহারসালে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। যাওয়ার সময় বলে গেছেন, ফিরে এসে রবিকে নিয়ে আপনাদের বাড়ি যাবেন। সাড়ে আটটার সময় আমি রবিকে বললাম, চল্ আমি তোকে প্রবীরবাবুর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। রবি কিছুতেই রাজি হল না। কাল থেকে রবি বারবার বলছে, আমি আর বাঁচব না, মরবই। এই কষ্ট সহ্য করার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভাল।"

ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রতিবেশী এলেন আমার আসার খবর পেয়ে। আমি আর সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলাম না। রবির সঙ্গে দু-একটা কথা বলে বললাম, "চল, আনন্দ পালিত রোড থেকে ঘুরে আসি।"

রবিকে নিয়ে আমি, কুমার আর মধুদা (মধুসূদন রায়) এলাম আনন্দ পালিত রোডে। চার দিন আগে রবির মানসিক অবস্থা যেমন দেখেছিলাম, আজকের অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ বলে মনে হল।

এক সময় সেই ব্রিজের উপর উঠলাম, যে ব্রিজ থেকে রবি আত্মহত্যা করতে দেখেছিল। ব্রিজের একটু দূরে বাঁদিকের একটা জায়গা দেখিয়ে রবি বলল, "ওইখানে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেনটা আসতেই লোকটাকে চঞ্চল হতে দেখেছিলাম। তারপর····।"

তারপরের কথাগুলো না শুনে ব্রিজের দু-পাশে আনাজপাতি, শাকশব্জি নিয়ে বসা লোকগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললাম, "এখানে আনাজপাতির দাম কেমন ?"

রবি বলল, "অ্যাঁ, কী ?"

আমি একটা দোকানীর সামনে দাঁড়িয়ে পেঁপে আর থোড়-এর দাম করতে শুরু করলাম, কিনলাম পাকা কলা।

এক সময় আমরা কলা খেতে খেতে হাঁটতে শুরু করলাম। কথা বলছিলাম সেই সঙ্গে, "এখানে জিনিসপত্তর তো খুব সস্তা। তোমরা আগে এখানে কোথায় থাকতে ?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

দূরে দৃশ্যমান একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওই বাড়িটার দুটো বাড়ি পরেই।"

ব্রিজ পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে রেল-লাইনের ওপর এসে পড়লাম। আমি ওকে শোনাচ্ছিলাম, আমার একটা কাহিনীর ওপর ফিল্ম তোলার ইচ্ছের কথা। কাহিনীটার একটু একটু অংশ ওকে শোনাচ্ছিলাম।

লাইনের পাশ দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। আমি বলে চলেছিলাম আমার কাহিনীর কথা। সেখানেও ফিল্মে রেল লাইন ও ট্রেনকে কীভাবে ব্যবহার করবো, ট্রেনের চলার

গতির সঙ্গে কী ধরনের আবহ সঙ্গীত প্রয়োগ করবো বলে ভেবে রেখেছি, তাও শোনাতে লাগলাম।

রবি সিনেমা, শুটিং, আবহ সঙ্গীত এইসবের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে। এসবের সঙ্গে ওর একটা গোপন ও গভীর সখ্যতা আছে। রবি শুনছিল, মতামত জানাচ্ছিল। আমি কথার মাঝেই হালকাভাবেই ছ-সাত বছর আগের আত্মহত্যার স্পটটা জানতে চাইলাম।

স্পটে এসে আমি ও রবি দাঁড়ালাম। মধুদা ও কুমার দাঁড়ালেন কিছুটা দূরে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি রেল লাইনের হাত দেড়েক দূরে। এখান থেকে পাথরের টুকরোগুলো ঢিবির আকারে রেল লাইন পর্যন্ত উঠে গেছে।

ব্যস্ত লাইন। মিনিট তিনেকের মধ্যে আমাদের লাইনে গাড়ি আসতে দেখলাম। আমার কাহিনী ঘিরে সিনেমা তোলার গল্প কিন্তু চালুই ছিল। রবিকে ট্রেনটা দেখিয়ে বোঝাতে লাগলাম, ঠিক কি ভাবে ক্যামেরা প্যান করার কথা ভেবেছি। নিজের একটা চোখ বন্ধ করে খোলা চোখের সামনে আমার একটা হাতকে দূরবীনের মত করে দেখতে লাগলাম। রবিকেও দৃশ্যটি বোঝার স্বার্থে আমার মত করে ট্রেনের দিকে দৃষ্টি দিতে বললাম। বলে চললাম, "এবার লাইনের ওপর দিয়ে চাকাগুলো গড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা লক্ষ্য কর। এমন দৃশ্যই তুলব।"

ট্রেন ইতিমধ্যে অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল। রবিকে বললাম, "লক্ষ্য কর, ট্রেনের চাকা যতই আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে ততই দেখতে পাচ্ছি ছন্দোবদ্ধভাবে লাইনগুলো মাটিতে বসে যাচ্ছে এবং উঠে আসছে। এই যে এখন চাকাগুলো আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। দেখ, প্রতিটি চাকা আমাদের কাছে যখনই আসছে তখনই লাইনটা মাটিতে চেপে বসছে। চাকাটা চলে যেতেই কেমন সুন্দর বুক ফুলিয়ে উঠে আসছে। লাইনের ওঠা-নামার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে কেমন সুন্দর ট্রেনের ও লাইনের আওয়াজ হচ্ছে। এর সঙ্গে একটু মজার এফেক্ট মিউজিক কম্পোজ করলে দৃশ্যটা দারুণ উতরোবে।" ট্রেনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা সুর কণ্ঠ থেকে বের করছিলাম। ট্রেনটা যতক্ষণ না আমাদের অতিক্রম করে গেল ততক্ষণই আমি গলা থেকে আবহ সঙ্গীত বের করে গেলাম। ট্রেনটা আমাদের অতিক্রম করে যেতে রবিকে বললাম, "রবি, ট্রেন কিন্তু আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

আমার কথায় রবির ঘোর কাটলো। অদ্ভুত উচ্ছলতার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আঙ্কল, আমার কিছু হয়নি। ট্রেনে ঝাঁপাইনি। আমি ভাল হয়ে গেছি।"

ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার সঙ্গে দৃঢ় করমর্দন করল। মধুদা ও কুমার এগিয়ে এলেন। ঘটনার পরিণতিতে ওঁরাও খুশি। মধুদা রবিকে বললেন, "কী হলো, ভয় কেটেছে ?"

আমরা কাছের একটা গাছের তলায় বাঁধান বেদীর ওপর বসলাম। কিছুক্ষণ চারজন হালকা মেজাজে গল্প করলাম। এক সময় রবি বললো, "আঙ্কল, আর একটা ট্রেন পাশ করিয়ে দেবেন ?"

বুঝলাম, রবি তার আত্মবিশ্বাসকে আরও একটু বাড়িয়ে নিতে চায়। উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "বেশ তো চলো।"

আমরা দুজনে আবার লাইনের সামনে দাঁড়ালাম। এবারও হাঁটতে হাঁটতে সেই ফিল্মের কাহিনীতে রবিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। লাইন দিয়ে চাকা গড়িয়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে লাইনের ওঠা-নামা এবং ঘটাং ঘট্ ঘট্ একটানা শব্দ, এরই সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমার গলার সুরকে। এবারও ট্রেন চলে গেল রবির কোনও বিপদ না ঘটিয়ে।

ট্রেন চলে যেতে রবি উল্লাসে লাফিয়ে উঠল, "ওঃ, এবারও আমার কিছু হয়নি। অর্থাৎ আমার আর কিছু হবে না।"

তারপর সে এক অন্য রবি। শিথিল ঠোঁট, ঝুলে পড়া চোয়াল ও ফ্যালফ্যালে দৃষ্টির রবি পাল্টে গেছে। হৈ-চৈ তুলে আমাদের একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। ওই চা খাওয়ালো। ট্যাক্সি ডাকতেই হাত নেড়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিদায় করে বললো, "বাসেই ফিরবো।"

রবিদের স্ট্যান্ডে বাস দাঁড়াতে রবি নেমে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করলো প্রবল শব্দে। বাস চলতে শুরু করতেই চলন্ত বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ে চেঁচালো, "আঙ্কল, মাঝে মধ্যে আপনার বাড়িতে গিয়ে একটু জ্বালিয়ে আসবো।"

বললাম, "বেশ তো, যখন ইচ্ছে চলে এসো।"

চলন্ত বাস থেকে টুক করে নেমে পড়ে রবি জানিয়ে দিয়ে গেল ও সম্পূর্ণ সুস্থ।

রবি ও লেখক
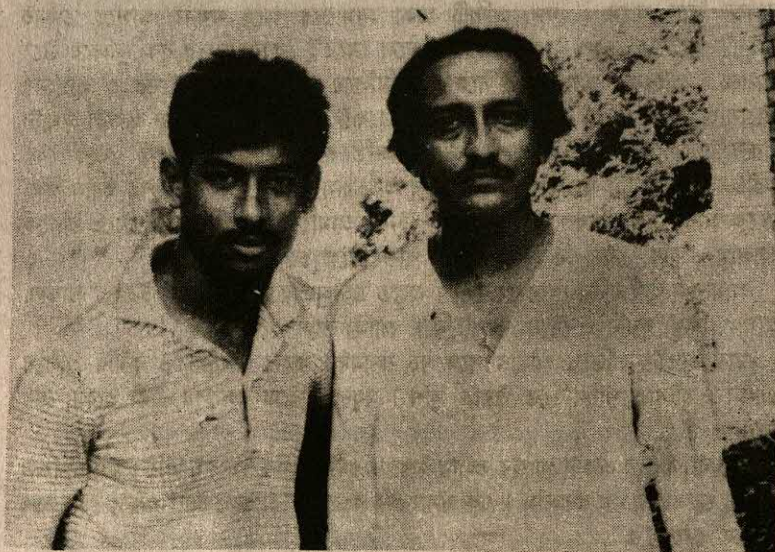
২১ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রবি আবার এলো। বসার ঘরে তখন মেলা ভিড়। পাক্কা তিন ঘণ্টা সকলকে নানা ধরনের ক্যারাটে আর আইকিদো দেখিয়ে জমিয়ে রেখে বিদায় নিল। যাওয়ার আগে দুটো কথা জানিয়ে গেল, এক, আগামী ব্ল্যাক বেল্টের পরীক্ষায় রবি নামছে, প্র্যাকটিসও শুরু করেছে। দুই, ৬ জুলাই তারিখেই কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল-এ মনোরোগ বিভাগে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেমন আছ?"

"কেমন দেখছেন?"

"ভালই তো দেখছি।"

"সত্যিই ভাল আছি, একদম ভাল।"

"দিনে দিনে তো তোমার অবস্থার অবনতিই হচ্ছিল, হঠাৎ এমন আশ্চর্যজনক পরিবর্তন?"

আমার সঙ্গে যোগাযোগ এবং আমার মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতির পুরোটাই ডাক্তারবাবুকে জানিয়েছে রবি।

প্রেসক্রিপসনে ডাক্তারবাবু লিখেছেন "stop medicine"।

ইতিমধ্যে রবির কাজের একটা সুরাহা হয়েছে। রবি মাঝে মধ্যে আমার কাছে আসে। আমার সঙ্গে, আমার স্ত্রী সীমা ও আমার ছেলে পিনাকীর সঙ্গে গল্প করে। লক্ষ্য করেছি, রবি আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। বিশ্বাস করে ও আর অপদার্থ নয়। সমাজে ওরও কিছু দেওয়ার আছে। ও কারও বোঝা নয়, বরং সংসারকে সাহায্য করবে।

রবির মুখ থেকে যে দিন ওর ব্ল্যাক-বেল্ট পাওয়ার খবরটা পেলাম সেদিন সম্ভবত রবির চেয়ে কম আনন্দ আমি পাইনি।

মনোরোগ তৈরির ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, হিংসাত্মক ঘটনাবলী, বেকারত্বের ও দারিদ্র্যের বিভীষিকা, জীবন নির্বাহে প্রতিনিয়ত ব্যয় বৃদ্ধি, ধর্ম-বর্ণ বা রাজনৈতিক অত্যাচার, ভয়, শোষণ, প্রতিবাদহীনভাবে অন্যায়কে মেনে নিতে বাধ্য হওয়া এসব থেকেও আসে মনের রোগ। আমরা মনোরোগীর আশে-পাশের সুস্থ মানুষরা রোগীদের প্রতি মানবিক হয়ে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার মত পরিবেশ সৃষ্টিতে কিছুটা সাহায্য করতে পারি কি না—নিশ্চয়ই দেখতে পারি। আমরা মানবিক হবার শিক্ষা দিতে পারি ঘরে, শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, খেলার মাঠে, জীবনের চলাফেরার প্রতিটি ক্ষেত্রে, 'মূল্যবোধ' 'শিক্ষার সার্থকতা' মানবিকতার বিকাশে প্রাচীন সংস্কৃতির গালভরা দৃষ্টান্ত টেনে নয়।

চিকিৎসার কথা এলেই চিকিৎসকের কথাও এসে যায়, এসে যায় তাঁদের অনেকেরই পেশাগত অসাধুতার কথা। এঁরা অনেকেই মানসিক রোগীদের সঙ্গে বক্‌বক্ করে অর্থ প্রসবকারী সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক। অথচ মানসিক রোগীদের কথা বিস্তৃতভাবে না শুনেই বিধান দেওয়া অসম্ভব। বিধান ঠিক কি ভুল, বিধানে রোগীর ক্ষতি হবে কি অক্ষতি, সে প্রশ্ন অর্থলোলুপ চিকিৎসকদের কাছে একান্তই গৌণ।

এ বিষয়ে আমার-আপনার সচেতনতা, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধই পারে অর্থলোভী চিকিৎসকদের কাজে মনোযোগী হতে বাধ্য করতে।

দুই

পত্র পত্রিকার খবরে ভূত

ট্যাক্সিতে ভূতের একটি সত্যি কাহিনী ও এক সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক

বেশিদিনের কথা নয় । পঞ্চাশ বছর আগেও কলকাতা আর তার আশেপাশে সন্ধ্যার পর শ্যাওড়া কি তেঁতুল গাছের তলা দিয়ে যেতে গা ছমছম করত । মাঝে মধ্যে নাকি সে-সব জায়গায় অদ্ভুত সব ভূতদের দেখা পাওয়া যেত । এক সময় কলকাতায় ভুতুড়ে বাড়িও কম ছিল না । এককালে খাস কলকাতাতেই নাকি দেখা যেত সাহেব ভূত ভুতুড়ে ঘোড়ায় চেপে জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে টগবগিয়ে চলে যাচ্ছে । কলকাতার বহু বনেদী বাড়ির জলসা ঘরে বেলোয়ারী কাচের টুং-টাং আওয়াজের সঙ্গে ঘুঙুরের বোল তুলত কোন বিদেহী বাঈজী । বহু পাষাণ-প্রাসাদেই ঘুরে বেড়াত ক্ষুধিত আত্মা ।

আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই । আগের সেই রহস্যময় কলকাতা আজ বড় বেশি শুষ্কং কাষ্ঠং হয়ে পড়েছে । কলকাতা আজ এত বেশি মুখর হয়ে উঠেছে যে আজকাল সেই সব ভূতদের আর দেখাই পাওয়া যায় না । জানি না কলকাতা থেকে উদ্বাস্তু হওয়া ভূতদের কোথায় পুনর্বাসন হয়েছে আজ ? শহর কলকাতা যখন ভূতদের বিরহে নেহাতই কাঠ-কাঠ, এমনই সময়ে ১৯৮২-র ২১ এপ্রিল আনন্দবাজার দারুণ এক স্কুপ নিউজ ছাড়ল । সকালে আনন্দবাজার হাতে পেতেই বাড়িতে, চায়ের আড্ডায়, পাড়ার মোড়ে, স্কুল-কলেজে, অফিস-পাড়ায়, হৈ হৈ পড়ে গেল—আলিপুরে পুলিশ ভূত পাওয়া গেছে । প্রথম পাতায় চার কলম জুড়ে দারুণ গুরুত্বের সঙ্গে খবরটা প্রকাশ করেছে আনন্দবাজার—

গভীর রাতে ট্যাকসির এক নিরুপদ্রব সওয়ার

"স্টাফ রিপোর্টার : এক পুলিশ অফিসারকে নিয়ে পুলিশমহল তোলপাড় । হাজার মাথা ঘামিয়েও তার রহস্যের কিনারা করতে পারছেন না গোয়েন্দারা। সম্প্রতি কয়েকজন ট্যাক্সিচালক পুলিশকে জানিয়েছেন : আলিপুর চিড়িয়াখানার কাছে পেটরোল-পাম্পের সামনে থেকে রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে খাকি পোশাকের এক

পুলিশ অফিসার হাত দেখিয়ে ট্যাকসি থামাচ্ছেন। গাড়ির পিছনের সিটে বসেই তিনি ফিসফিসিয়ে ড্রাইভারকে বলছেন : 'কোই ডর নেহি।' তারপর কিছুদূরে রেসকোর্সের কাছে বাঁক নেবার জন্য গতি সামান্য কমাতেই খুট করে শোনা যাচ্ছে দরজা খোলার শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে ড্রাইভার দেখছেন কেউ নেই। ওই 'অফিসার' মিলিয়ে যাচ্ছেন অন্ধকারে। প্রথমে এ ধরনের অভিযোগে তেমন আমল না দিলেও সংশ্লিষ্ট থানায় পরপর দু'তিনজন ট্যাকসি চালক এসে একই কথা বলায় পুলিশ খোঁজখবর নিতে শুরু করে। নানাভাবে নানা দিক থেকে শুরু হয় এ রহস্যের জট খোলার। সন্তোষজনক কোনও সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌঁছাতে পারেন নি এখনও। যে সব অভিযোগ থানায় এসেছে তা খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে। ওই 'পুলিশ অফিসারটির' কোনও ক্ষতিক্ষারক প্রবণতা নেই। পরপর একই জায়গা থেকে তিনি ট্যাকসি থামিয়ে একইভাবে হঠাৎ নেমে পড়ছেন ট্যাকসি থেকে। তাঁর চেহারার যা বর্ণনা মিলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি লম্বা-চওড়া সুপুরুষ। অতঃপর মাটির পৃথিবী ছেড়ে তাঁদের তদন্ত এগিয়েছে অন্য জগতে। পুরানো অফিসারদের একজন নথি ঘেঁটে বের করেছেন : চুয়াত্তর সালে ঠিক ওইখানেই এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন সশস্ত্র এক পুলিশ ইন্সপেক্টর। বর্ণনার সঙ্গে তাঁর চেহারার অবিকল মিল। গভীর রাতে লাইটপোস্টের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ওই ইন্সপেক্টর মারা যান। তিনি থাকতেন বডি-গার্ডস লাইনে। পরতেন খাকি পোশাক। নিঃসন্তান ওই ইন্সপেক্টরের স্ত্রীও ছিলেন এক সাব-ইন্সপেকট্রেস। তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক পরে তাঁর স্ত্রীও মারা যান। গোয়েন্দা অফিসাররা এখন শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা ভাবছেন।"

চোর ভূত, ডাকাত ভূত, প্রেমিক ভূত, প্রেমিকা ভূত, নর্তকী ভূত, সাহেব ভূত, কুকুর ভূত, বন্ধু ভূভ এ সবের অনেক গপ্প পড়েছি ও শুনেছি। কিন্তু পুলিশ ভূত নিয়ে খবর কাগজের ঢাউস খবর বাস্তবিকই ফ্যানটাস্টিক! একটা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় পরিবেশিত খবর মানেই সত্যির গ্যারান্টি!

অনেকেই বললেন, "আত্মা যে অমর, ভূতের অস্তিত্ব যে বাস্তবিকই আছে আনন্দবাজার তা হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিল।"

রাস্তায়-ঘাটে অফিস কাছারিতে আমাকেও কম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল না—"এবারও কি বলবেন, ভূত বলে কিছু নেই? আনন্দবাজারের কথা মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবেন?"

বাড়িতে স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই নেই। বাইরে সেও নাকি আমার জন্য অপদস্থ হচ্ছে, আর আমি নাকি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছি। এক প্রবীণ ও বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী নাকি সীমাকে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, "কী হে, তোমার কর্তা এখন কী বলেন? ভূত আছে তো? নাকি খবরটাকেই মুখের জোরে অস্বীকার করতে চান?"

সেখানে উপস্থিত সীমার কিছু বান্ধবীও ওই সঙ্গীতশিল্পীকে সমর্থন করে এই বিষয়ে আমাকে মুখ খুলতে বলেছেন।

আনন্দবাজারে প্রকাশিত খবরটিকে বিশ্বাস করলে বিজ্ঞানকেই অবিশ্বাস করতে

হয়। কিন্তু প্রকাশিত খবরটি যে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে—এই সত্যটুকু অস্বীকার করার উপায় নেই।

এক্ষেত্রে অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে না এসে শুধুমাত্র লেখার অক্ষরকে বিশ্বাস করলে অনেক আদ্যন্ত মিথ্যেকে নির্ভেজাল সত্য বলে বিশ্বাস করতে হয়।

সত্যি ভূতের ও সত্যি অলৌকিক ঘটনার কল্প কাহিনী প্রতিনিয়ত ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েই চলেছে এবং যতদিন পাঠক-পাঠিকারা এই ধরনের অলৌকিক কিছুর খবর তীব্র আগ্রহ নিয়ে পড়বেন, ততদিন পত্র-পত্রিকাগুলোও পাঠক-পাঠিকারা 'যে খবর খান' সে ধরনের খবরই ছেপে যাবেন আর্থিক লাভের আশায়। অথচ আজ পর্যন্ত একটি অলৌকিক ঘটনা বা আত্মার অস্তিত্ব কোনও ধর্মগুরু, প্যারাসাইকোলজিস্ট বা কোনও পত্র-পত্রিকা বিজ্ঞানের দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধরা পড়েছে ফাঁক আর ফাঁকি।

* * *

ভূতের বিষয়ে সঠিক খবর পাওয়ার আশায় প্রথমেই যোগাযোগ করলাম সে সময়কার কলকাতার পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রী শিবনাথ রায়ের সঙ্গে। সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার পেলাম তাঁর কাছে।

প্রকাশিত পুলিশ ভূতের খবরটার সম্বন্ধে তিনি কিছু খবর রাখেন কি না জিজ্ঞেস করতেই বললেন,—"হ্যাঁ, পত্রিকায় খবরটা পড়েছি বটে, তবে ওই পর্যন্তই—"

"সে কী!" আমি আঁৎকে ওঠার ভান করি, "এই ব্যাপারে পুলিশমহল তোলপাড়। পরপর কয়েকজন ট্যাক্সিচালক নাকি সংশ্লিষ্ট থানায় এসে ভূত সম্বন্ধে অভিযোগও করে গেছে—"

"না মশাই, আলিপুর থানা কেন, কোন থানাতেই এই ধরনের রিপোর্ট বা ডাইরীর খবর আমাদের কাছে নেই।"

"এই বিষয়ে আপনার নিজস্ব কোন মতামত...."

"এই বিষয়ে কী আর বলব? বলতে পারি, খবরটা শুধু পত্রিকায় দেখেছি। আমাদের কাছে ভূতের কোন খবর নেই। এই বিষয়ে আরও খবর পেতে আপনি বরং সরাসরি আলিপুর পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করুন।"

যোগাযোগ করলাম আলিপুর পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে।

উনত্রিশে জুনের দুপুর। অফিসার ইনচার্জ শ্রী তারক গাঙ্গুলী সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন না থানায়। কোন কাজে বেরিয়ে ছিলেন। ডিউটি অফিসার এ· এস· আই· শ্রী পি· কে· নাগের সঙ্গে কথা হল। যথেষ্ট সহযোগিতা করলেন তিনি।

শ্রী নাগ জানালেন, "না মশাই, এ যাবৎ এই থানায় কোন ট্যাক্সি-ড্রাইভার এই ধরনের কোন ডাইরি তো দূরের কথা কোন রিপোর্টও করেনি। পত্রিকা বিশেষ করে যে জায়গাটার কথা বলেছে সেখানে আমাদের পুলিশ কনস্টেবল সারারাত পাহারা দেয়। তারাও ভূত নিয়ে কোন দিন কোন রিপোর্ট করেনি।"

হায়! ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো আমার বুক ঠেলে। শেষ পর্যন্ত

এমন একটা রোমাঞ্চকর ভুতুড়ে ব্যাপার নেহাৎই মাঠে মারা যাবে ?

শেষ চেষ্টা হিসেবে জলে ডোবার আগে খড়কুটো ধরার মত ধরলাম কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার নম্বর ওয়ান শ্রী সুবিমল দাশগুপ্তকে। স্মার্ট চেহারার অসাধারণ ঝকঝকে চোখের অধিকারী সুবিমলবাবুকে পুলিশ ভূতের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের গোয়েন্দারা নাকি হাজার মাথা ঘামিয়েও এই ভৌতিক রহস্যের কিনারা করতে পারেননি ? এখন একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা ভাবছেন ?"

সপ্রতিভ কণ্ঠে শ্রী দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন, "ওই ভূতের ব্যাপারটা পুরোপুরি মিথ্যে। এমন কোন ঘটনাই আদপে ঘটেনি, সুতরাং আমাদের দপ্তরের মাথা ঘামাবারও কোন প্রশ্নই ওঠে না।"

এরপর যোগাযোগ করি ট্যাক্সি-ড্রাইভারস ইউনিয়নের সঙ্গে। সাধারণ সম্পাদক শিশির রায় জানান, তাঁরা অনেকেই ঘটনাটা শুনেছেন, কিন্তু কেউই প্রত্যক্ষদর্শী নন। অনেকে অবশ্য ঐ পথ বর্জন করে চলেছেন।

আমার কাছে যেটা বিস্ময়কর মনে হয়েছে সেটা হল, এমন একটা বিদ্‌ঘুটে মিথ্যে খবর আনন্দবাজারের মত নামী-দামী পত্রিকা এত গুরুত্ব দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপাল কী করে ? অদ্ভুতুড়ে খবরটি দেখে বার্তা-সম্পাদক বা সম্পাদকের কারোও কি একবারের জন্যেও মনে হয়নি, খবরটির সত্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে ?

এক সত্যি ভূতের কাহিনী ও এক বিজ্ঞানী

ভূত নেই নেই করে যাঁরা চেঁচাচ্ছেন, যাঁরা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলছেন, "মৃত্যুর পরেই মানুষের সব শেষ", "আত্মা মোটেই অমর নয়," তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েই একটি ভূতের "সত্যি কাহিনী" প্রকাশিত হলো "পুলিশ ফাইল" নামের একটি মাসিক পত্রিকায়। পুলিশ ফাইল পত্রিকার সম্পাদক মোটেই এলে-বেলে লোক নন, দস্তুর মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক অনীশ দেব। ভৌতিক ঘটনাটির নায়ক দেবেন, নায়িকা অনুরাধার ছবিও সম্পাদক প্রকাশ করেছিলেন, সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন দেবেনের পুরো ঠিকানা।

ঘটনাটা ছোট্ট করে জানাচ্ছি।

দেবেন থাকেন 'কলকাতার কাশীপুরের ২৬ নং শ্যামল মুখার্জী লেনে। দেবেনের বাবা রামদেববাবু পুরসভার কেরানী। দেবেন বয়সে তরুণ। বিয়ে করে ১২ জুন ১৯৮৫। স্ত্রীর অনুরাধা ভুবনেশ্বরের কাজী লেনের বাসিন্দা ছিলেন। বাবার নাম জগদেব নারায়ণ।

বিয়ের পর দিন ১৩ জুন প্রথম ভৌতিক ঘটনাটা ঘটল। ফুলশয্যার রাতে দেবেন অনুরাধাকে একা পেয়ে অনুরাধার গলা এবং শরীরের নানা অংশে প্রচণ্ড জোরে কামড়ে রক্তাক্ত করে তুলল। সেই সঙ্গে ভয় দেখিয়ে বলল, "তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন বাঁচতে পারবে না। আমি তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাব।" আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার

হল, দেবেন যখন এই কথাগুলো বলছিল তখন তা দেবেনের গলার স্বর ছিল না, মেয়ের কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছিল।

অনুরাধা ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। চিৎকারে অনুরাধার শাশুড়ী ও ননদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

শাশুড়ীর কাছে এসে ঘটনাটুকু সংক্ষেপে বলে অনুরাধা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অনুরাধাকে শুইয়ে দিয়ে দেবেনের মা বাবা ও দুই বোন ফুলশয্যার ঘরে ঢুকে দেখেন দেবেন ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে তুলে দেবেনকে কামড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করায় দেবেন বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, এমন কিছু সে করেইনি। সকলে এবার এলেন অনুরাধার কাছে। ঘুমন্ত অনুরাধার ক্ষত থেকে আবরণ সরাতেই আর এক বিস্ময় ? কোথায়ই বা ক্ষত ? কোথায়ই বা রক্ত ?

দ্বিতীয় রাতে অনুরাধাকে একা পেয়ে দেবেন আবার আক্রমণ চালাল। কামড়ে নাক আর দুটো কান কেটে নিল।

অনুরাধার চিৎকারে এ রাতে দেবেনের বাড়ির লোক ছাড়া প্রতিবেশীরাও ছুটে এলেন। অনুরাধাকে নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি করা হল। কাশীপুর থানায় খবর গেল। পরদিন সকালে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর পঙ্কজকুমার লাহা তদন্ত করতে হাসপাতালে গেলেন। সেই সময় অনুরাধার নাক কান আর বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য জানালেন বেশি রক্তপাতের জন্য অনুরাধার বাঁচার আশা নেই।

শ্রীলাহা এবার এলেন কাশীপুরে দেবেনের বাড়িতে। দেবেন জানালেন, তিনি এইসব ঘটনার কিছুই জানেন না। শ্রীলাহা দেবেনকে নিয়ে গেলেন মৃত্যুর প্রহর গোনা অনুরাধার কাছে। কিন্তু কী আশ্চর্য ? হাসপাতালে অনুরাধাকে পাওয়া গেল সম্পূর্ণ সুস্থ এবং অক্ষত অবস্থায়। নাক কানের অংশ যে কয়েক ঘণ্টা আগে কামড়ে কেটে নেওয়া হয়েছিল, তার সামান্যতম প্রমাণও পাওয়া গেল না অনুরাধার শরীরে।

খবর পেয়ে অনুরাধার বাবা এসেছিলেন ভুবনেশ্বর থেকে। সন্দেহ প্রকাশ করলেন দেবেনের উপর ভূতে ভর করেছে। পরের দিন সকালে তিনি উত্তরপাড়া থেকে তান্ত্রিক অঘোর স্যান্যালকে নিয়ে এলেন। দেবেনের বাড়িতে ঢোকার মুখে বিশাল ভীড়। পুলিশ এসেছেন। এসেছেন ডাক্তারও। জানতে পারলেন গতরাতে অনুরাধা শুয়েছিলেন শাশুড়ীর ঘরে। শ্বাশুড়ী নাকি গলা টিপে মেরে ফেলেছেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানিয়েছেন অনুরাধা মৃত।

অঘোর তান্ত্রিক জানালেন এসবই এক ভূতের কারসাজি। পুলিশ 'লাশ' না নিয়ে গিয়ে যদি তাঁকে পুজো করার জন্য কিছুটা সময় দেন, তবে তিনি অনুরাধাকে বাঁচিয়ে দিতে পারবেন; সেই সঙ্গে এই পরিবারের সকলকে চিরকালের জন্য ঐ ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন।

পুলিশের অনুমতি মিলল। দ্রুত পুজোর আয়োজন করা হল। অঘোর তান্ত্রিক যজ্ঞ শুরু করতেই দেবেন মেয়ের গলায় চিৎকার করতে লাগল, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে মের না।" শেষ পর্যন্ত জানা গেল শাকিলা নামের একটি মেয়ে '৮৫-র ৮ জানুয়ারি আত্মহত্যা করেছিল। তারই আত্মা এইসব কাণ্ড ঘটিয়েছিল। একসময় মৃত অনুরাধা সবাইকে আশ্চর্য করে উঠে বসল।

অনুরাধাকে মৃত ঘোষণা করা ডাক্তার অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, অলৌকিক আজও

ঘটে। মন্ত্রশক্তিতে মৃতকেও বাঁচান যায়।

কাহিনীর শেষে লেখা রয়েছে : "এ এক অবিশ্বাস্য কাহিনী হলেও সত্য।"

কাহিনীর শুরুতেই লেখা ছিল "পুলিশ ফাইল থেকে", অর্থাৎ, পুলিশ ফাইল থেকেই এইসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

লেখাটি সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, বেশ কিছু চিঠি এই প্রসঙ্গে আমি পেয়েছিলাম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পত্র লেখক-লেখিকারা জানতে চেয়েছিলেন আমি এই "সত্য ঘটনা"কে স্বীকার করি কি না এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করি কিনা ভূতের অস্তিত্বকে। যুক্তিবাদী বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেও লেখাটি পড়ে, বিভ্রান্ত হয়ে এই বিষয়ে আমার মতামত ও ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। যুক্তিবাদীদের মনেও বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ার কারণ : ১। পত্রিকাটির সম্পাদক পরিচিত বিজ্ঞান পেশার মানুষ। ২। ঘটনাটি পুলিশ ফাইল থেকেই নেওয়া বলে ঘোষণায় জানান হয়েছে। ৩। কাহিনীর শেষাংশে বলা হয়েছে—"ঘটনাটি অবিশ্বাস্য কাহিনী হলেও সত্যি।" ৪। ঘটনার প্রধান চরিত্র দেবেন এবং অনুরাধার ফটোও ছাপা হয়েছে।

ভূতে পাওয়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই হয় মানসিক রোগ, নয় তো অভিনয়। মস্তিষ্ক-কোষ থেকেই আমাদের চিন্তার উৎপত্তি। একনাগাড়ে ভূতের কথা ভাবতে ভাবতে অথবা কোনও বিশেষ মুহূর্তে ভূতে ভর করেছে ভেবে কোনও কোনও আবেগপ্রবণ মানুষের মস্তিষ্ক-কোষে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যাকে চলতি কথায় বলতে পারি মাথার গোলমাল। এই সময় মানসিক রোগী 'তার উপর ভূতে ভর করেছে' এই একান্ত বিশ্বাসে অদ্ভুত সব ব্যবহার করে। ভূতে পাওয়া যদি মানসিক রোগ না হয় তবে অবশ্যই ধরে নেওয়া যায় রোগী বা রোগিণী ভূতে পাওয়ার অভিনয় করছে। এখানে অনীশ দেবের পত্রিকায় লেখক অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের 'সত্যি কাহিনী'টিতে এমন অনেক কিছু ঘটেছে, বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা মেলে না। কাটা নাক কান জুড়ে যাচ্ছে, ক্ষত চিহ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে, মৃত জীবিত হচ্ছে ইত্যাদি।

আমার মনে হয়েছিল-এর একটাই ব্যাখ্যা হয়, সম্পাদক ও লেখক আমাদের প্রত্যেককে প্রতারিত করেছেন। সত্যি কাহিনীর নামে আগাগোড়া মিথ্যে কাহিনী বলে গেছেন। কিছু বিজ্ঞানকর্মীর তাও সন্দেহ ছিল এমন একজন পরিচিত বিজ্ঞান পেশার মানুষ ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক কি পাত্র-পাত্রীর নাম ঠিকানা ছবি ছাপিয়ে থানার সাব-ইন্সপেক্টরের নাম, হাসপাতালের নাম, ঘটনার তারিখ উল্লেখ করে পুরোপুরি মিথ্যে লিখবেন? রহস্য থাকলে তা হয় তো অন্য কোনও জায়গায়।

স্ট্রিট ডাইরেক্টরিতে শ্যামল মুখার্জি লেনের নাম খুঁজতে গিয়ে প্রথম ধাক্কা খেলাম। এমন নাম কোথাও নেই। ঠিক করলাম ঠিকানা যখন পেলাম না, এবার কাশীপুর থানা থেকে খোঁজ করা শুরু করি। দেখি তাঁরা এই ঘটনা সম্পর্কে কতটা আলোকপাত করতে পারেন। ঠিকানাটার হদিশও ওদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে।

প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভার তুলে দিলাম আমাদের সমিতির এক তরুণ বিজ্ঞান কর্মীর হাতে। তার হাত দিয়েই 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র রাইটিং প্যাডে কাশীপুর পুলিশ স্টেশনের অফিসার ইনচার্জকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠি

পাঠাই। সঙ্গে পুলিশ ফাইলের তথাকথিত সত্যি ভূতের কাহিনীটির ফটো কপিও। চিঠিতে জানাই 'পুলিশ ফাইল' পত্রিকার জুন ১৯৮৮ সংখ্যায় একটি ভুতুড়ে ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ২৬ নং শ্যামল মুখার্জী লেন কাশীপুর পুলিশ স্টেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে বলা হয়েছে। পত্রিকাটির ফটো কপি আপনার পড়ার জন্য পাঠালাম।

আমাদের সমিতি নানা অলৌকিক ঘটনার সত্যানুসন্ধান করে থাকে। আপনার এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনার বিষয়ে আমরা অনুসন্ধানে উৎসাহী। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সমিতির সদস্যকে পাঠান হলো। তাঁকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সহায়তা করলে বাধিত হবো। চিঠির তারিখ ছিল ৫।৬।৮৮।

পরের দিনই বিজ্ঞানকর্মীটি কাশীপুর থানায় যোগযোগ করে, চিঠিটি দেয় এবং প্রধানত তিনটি বিষয়ে জানতে চায় : ১। শ্যামল মুখার্জী লেন নামের কোনও ঠিকানা আদৌ এই থানা এলাকায় আছে কি না ? ২। ঘটনাকাল ১৯৮৫ সালে পঙ্কজকুমার লাহা নামের কোনও সাব-ইন্সপেক্টর আদৌ কাশীপুর পুলিশ স্টেশনে কাজ করতেন কি না ? ৩। জুন ১৯৮৫-তে এই ধরনের কোনও ঘটনা থানার ডাইরিতে বা অন্য কোনও নথিতে আছে কি না ?

৯ জুন আমাকে লেখা এক চিঠিতে থানার অফিসার ইন-চার্জ স্পষ্ট ভাষায় যা জানালেন, তার সংক্ষেপ-সার—১। কাশীপুর পুলিশ স্টেশনের অধীনে এমন কোনও ঠিকানা নেই। ২। ১৯৮৫ সালে পঙ্কজকুমার লাহা নামের কোনও সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন না। ৩। এই ঘটনার কোনও তথ্য আমাদের পুলিশ স্টেশনের নথিতে নেই।

আমি বিস্মিত হলাম। কী চূড়ান্ত মিথ্যেকে সত্যি বলে চালবার চেষ্টা করেছেন সম্পাদক ও লেখক। এর পরও কি আমার দেখা উচিত, সম্পাদকের ও লেখকের তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কিছু বলার আছে কি না ? একাধিক দিন আমি এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির একাধিক সদস্য সম্পাদক অনীশ দেবের বাড়ি গিয়েছি। ওই বাড়িই পুলিশ ফাইল পত্রিকার অফিস। কোনও দিনই অনীশ দেবের দেখা পাইনি। আমাদের আসার উদ্দেশ্য প্রতিবারই অফিসের জনৈক কর্মীকে জানান হয়েছে। জানিয়ে ছিলাম, দেবেন-অনুরাধার 'সত্যি কাহিনী'র ওপর আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধান এবং কাশীপুর থানার লিখিত উত্তর বলছে লেখাটির সঙ্গে বাস্তব সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা স্রেফ গল্পকথা। এই বিষয়ে অনীশবাবুর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও প্রমাণ থাকলে তিনি প্রমাণ সহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে বাধিত হবো।

অনীশ দেব আমার সঙ্গে দেখা করেননি। পরিবর্তে ১৮ জুন তারিখে লেখা তাঁর একটি পোস্ট কার্ড পাই। তাতে শুরুতে লেখা, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি বলে দুঃখিত।" মাঝখানে এক জায়গায় লেখা, "আমরা লেখাটি গল্পকথা হিসেবেই প্রকাশ করেছি।" শেষ অংশে লেখা, " 'পুলিশ ফাইল' আপাতত আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। ফলে আগামী সংখ্যাতে যে কোনও ত্রুটি স্বীকার করব সে সুযোগও নেই। সুতরাং এজন্য দুঃখপ্রকাশ করছি। আপনার পরিচালনায় যুক্তিবাদী আন্দোলনের

সাফল্য কামনা করে শেষ করছি।।”

চিঠিটা অনীশ দেবের ডিগবাজীর সাক্ষ্য হিসেবে সযত্নে রেখে দিয়েছি। এর পরেও অনীশবাবুর কাছে কয়েকটি জিজ্ঞাসা আমার থেকেই গেল। অনীশবাবু, সত্যিই কি ‘গল্পকথা’ হিসেবেই লেখাটি প্রকাশ করেছিলেন ? তবে আবার ‘সত্যি কাহিনী’ প্রমাণের জন্য ভূরি ভূরি বাক্যি খরচ করলেন কেন ? কেনই বা কাল্পনিক দুটি চরিত্রের ফটোগ্রাফ প্রকাশ করলেন ? ফটোগ্রাফ দুটি তবে কার ? অনীশবাবু, আপনার কথাই যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ কাহিনীটা ‘গল্পকথা’ই হয়, তবে ত্রুটি স্বীকারের প্রশ্ন আসছে কেন ? আপনার কথাই আপনার মিথ্যাচারিতাকে ধরিয়ে দিচ্ছে না কি ?

অনীশবাবু, আপনাকে শেষ প্রশ্ন, সত্যিই কি আপনি যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেন ? যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাফল্য মানেই আপনার মতো অপ-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক ও মিথ্যাচারীদের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা।

বেলঘরিয়ার গ্রীন পার্কে ভুতুড়ে বাড়িতে ঘড়ি ভেসে বেড়ায় শূন্যে

’৮৭-র আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে বেলঘরিয়ার গ্রীন পার্কের একটি বাড়ি ঘিরে রহস্যজনক অনেক কাণ্ড-কারখানা নাকি ঘটতে থাকে। খাবার-দাবার উল্টে যাচ্ছে, হাতা, খুন্তি, থালা, বাসন এমনকি বাড়ির দেওয়াল ঘড়িটি পর্যন্ত নাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। ভুতুড়ে কাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী মেলা। প্রতিদিন ভূতের নাচন দেখতে শয়ে শয়ে মানুষ ভীড় জমাতে লাগলেন।

আমাদের সমিতির সেই সময়কার সহ-সম্পাদক বিজয় সেনগুপ্ত ১৭ আগস্ট গেলেন একটি নিরীহ প্রস্তাব নিয়ে। পাড়ার ছেলেরা তখন বাড়ি ঘিরে ব্যারিকেড তৈরি করেছেন। তার বাইরে বিশাল জনতা ভুতুড়ে বাড়ির দিকে তাকিয়ে। আমাদের সমিতির নাম করে ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেলেন বিজয়। বাড়ির মালিক দিলীপ ঘোষ বাড়িতেই ছিলেন। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। বাড়ির প্ল্যান তৈরি করেন। দুই বিয়ে। সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি চলছে।

বিজয় ভূতের কাণ্ড-কারখানার কথা দিলীপবাবুর কাছ থেকে যা শুনলেন, তা আগে শোনা ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। ইতিমধ্যে তান্ত্রিকের পিছনে অনেক টাকাও নাকি বেকার খরচা করেছেন দিলীপবাবু।

বিজয় আমাদের সমিতির তরফ থেকে প্রস্তাব দিলেন, সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ এখানে একনাগাড়ে তিন দিন তিন রাত থাকবেন, এরমধ্যে কোনও ভৌতিক ঘটনা ঘটলে আমাদের সমিতির তরফ থেকে প্রবীর ঘোষ দেবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। ভূতের উপদ্রব না হলে বাড়ি ভূত মুক্ত করার জন্য আপনি আমাদের সমিতিকে দেবেন মাত্র পাঁচ হাজার। যুক্তিবাদী সমিতির তিনজন সদস্য প্রবীরবাবুর সঙ্গী হবেন।

প্রস্তাবে দিলীপবাবু চম্‌কালেন, বললেন, “না, না, আজ থেকে ভূতের উপদ্রব বন্ধ হয়ে গেছে তো।’

অগত্যা বিজয়কে বিদায় নিতে হলো, নীচে নামতে উৎসুক দর্শকরা জানতে

চাইলেন, যুক্তিবাদী সমিতির এ বাড়ির ভূত তাড়াতে নামছে না কি ? বিজয় জানালেন, যুক্তিবাদী সমিতির নামেই ভূতের উপদ্রব বন্ধ হওয়ার কাহিনী। দিলীপবাবুর উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ জনতার গালাগাল ও ধিক্কার শুনতে শুনতে বিজয় বিদায় নিয়েছিলেন।

নিউ জলপাইগুড়িতে ভূতের হানা

মাসকয়েক আগের ঘটনা, নিউ জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কলোনীর যুবতী রূপাকে ভূতে ধরেছে, অতিপ্রাকৃতিক যত ঘটনা ঘটে চলেছে রূপাদের বাড়িতে। মুহূর্তে খবর এতই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে ঘটনাটার রহস্য অনুসন্ধানে নিউ জলপাইগুড়ি ফাঁড়িকে নামতে হয়। শোনা যায় বাল্ব, কৌটো, শিশি এবং অন্যান্য জিনিসপত্তর আপনা থেকেই ছিটকে ছিটকে যেখানে সেখানে এসে পড়ছিল।

আমাদের সমিতির সহযোগী সংস্থা শিলিগুড়ির নবোদয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে প্রলয় চৌধুরী, পঙ্কজ বসু, বিশ্বদীপ রায় মুহুরী সত্যানুসন্ধানে নেমে পড়েন। ঘটনার বিবরণ জানতে রূপার বাবা এ কে ব্যানার্জি, মা রেখা, রূপা, রূপার বন্ধু কমলেশ রায়, পাশের কোয়ার্টারের পরিমল চন্দ্র পাল এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলেন ও· সি· রাজকুমার ঘোষের সঙ্গেও।

ঘটনার সকলের বিবরণগুলো পরপর সাজানোতে যে চিত্রটা ভেসে উঠল সেটা হল এই—রূপাদের বাড়িতে কমলেশ ও তার বন্ধু-বান্ধবীদের হৈ-হুল্লোড়ে বিরক্ত পরিমলবাবু প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। সে চুরাশি সালের ঘটনা। প্রতিবাদ জানাবার পর থেকে পরিমল বাবুর কোয়ার্টারের উঠোনে বোতল, টিন ইত্যাদি পড়তে থাকে। পরিমলবাবু কাউকে হাতে-নাতে ধরতে না পারলেও এগুলোকে মানুষেরই কীর্তি অনুমান করে ৬ এপ্রিল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করেন। আশে-পাশের কিছু মানুষজন রূপা-কমলেশদের সন্দেহ করতে থাকেন। ব্যানার্জি পরিবার অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ব্যাপারটা হয় তো কোনও মানুষেরই কাজ নয়।

ভূতের উপদ্রব বন্ধ হয়। '৮৮-এর সেপ্টেম্বরের শুরুতেই পরিমলবাবুর সঙ্গে ব্যানার্জি পরিবারের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ভূতের উপদ্রবও শুরু হয়। ৪ সেপ্টেম্বর পরিমলবাবু পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। ভূত তার পরে পরেই উপদ্রব বন্ধ রাখে। আবার শুরু '৮৯-এর সেপ্টেম্বরে। ২৫ সেপ্টেম্বর পরিমলবাবু আবার ফাঁড়িতে দৌড়লেন। আশে-পাশের জনমতও পরিমলবাবুর বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পিছনে ভূতের বদলে মানুষেরই হাত আছে বলে সন্দিগ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকেন। অবস্থা ঘোরাল হচ্ছে দেখে পুলিশ অনুসন্ধানে নামে। আর এই সময়ই শুরু হয় ব্যানার্জি বাবুদের বাড়িতেও ভূতের নানা উপদ্রব। সঙ্গে বাড়তি বোঝা—রূপার উপর ভূতের ভর। ভূত তাড়াতে ওঝা আসে, ঝাড়ফুঁকও চলে। ভূত বিদায় নেয়।

স্থানীয় মানুষ ও নবোদয় বিজ্ঞান পরিষদ কিন্তু অনুমান করে জনরোষ ও পুলিশের হাত থেকে বাঁচতেই ব্যানার্জিবাবুর বাড়িতে এবং রূপার উপর ভূতের অত্যাচার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

দমদমের কাচ-ভাঙা হল্লাবাজ-ভূত

তামাম পাঠকদের অবাক করে দিয়ে ২৭ নভেম্বর '৯০ 'গণশক্তি'র প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলম জুড়ে বিশাল ছবি সহ এক অদ্ভুত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। এই বিশাল জায়গা খরচ করার পরও সপ্তম পৃষ্ঠার পাঁচ কলম জুড়ে প্রকাশিত হলো শেষাংশ। পাঠকদের অবগতির জন্য খবরটি তুলে দিলাম।

প্রতিবেশীরা অবাক, গৃহস্বামী চিন্তিত

দমদমের একটি বাড়িতে আপনা থেকেই ভাঙছে কাচের সামগ্রী

কলকাতা, ২৬শে নভেম্বর—দমদম এলাকার এক বাড়িতে বাল্ব, টিউব, আয়না সহ যাবতীয় কাচের সামগ্রী আপনা থেকেই ভাঙতে শুরু করেছে। ঐ তিনতলা বাড়িটির দোতলার একটি ছোট্ট ঘরে এই ঘটনা ঘটে চলেছে প্রায় দেড়মাস ধরে। এই আশ্চর্য ঘটনার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ ইতিমধ্যেই সত্তরটি বাল্ব, ষোলটি টিউবলাইট, তিনটি চিমনি ও অন্যান্য কাচের জিনিসপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। বাড়ির গৃহকর্তা নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক। তাই কেবল ঘটনাটিরই বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

এই অদ্ভুত ঘটনাটির সূত্রপাত গত ১৮ই অক্টোবর রাতে। সেদিন প্রথম ওই ঘরটির বাসিন্দা স্বামী-স্ত্রী ও পুত্র খেয়েদেয়ে শুয়েছেন। হঠাৎ দুম করে আওয়াজ। ঘর অন্ধকার। আর টুকরো কাচের মাটিতে পড়ার শব্দ। দেশলাই ঘষে আলো জ্বালিয়ে ভদ্রলোক অবাক। নাইট ল্যাম্পটি ভেঙে টুকরো হয়ে পড়ে গেছে। শুধু হোল্ডারে বাল্বের ক্যাপ ও ফিলামেন্টটি আটকে আছে। যাই হোক এটি নানা কারণে ঘটে থাকে তাই কেউই বিশেষ আমল দেননি। পরদিন নতুন একটি বাল্ব কিনে লাগানো হয়। সেদিন রাতেও কিছুক্ষণ জ্বলার পর হঠাৎই একই রকমভাবে বিস্ফোরিত হয়ে বাল্বটি ভেঙে গেল। পরপর দু'দিন একই ঘটনা ঘটতে দেখে পরদিন ভদ্রলোক একজন স্থানীয় ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে ডাকলেন। ঘরে ডি সি বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। মিস্ত্রীর পরামর্শে সুইচ বক্স পালটানো হলো কারণ বক্সটি নাকি আলগা হয়ে গেছে এবং সেকারণেই যত বিপত্তি। বক্স পালটানোর পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতেই লাগলো। অর্থাৎ দুটো তিনটি করে ছোট বাল্ব প্রতিদিন ফেটে যায়। এভাবে দিন দশেকের মধ্যে প্রায় কুড়িটি বাল্ব ভেঙে যাওয়ার পর তিনি বাল্ব লাগানোই বন্ধ করে দিলেন। এবারে

আক্রমণ শুরু হল টিউব লাইটের ওপর। পর পর তিনটি টিউবলাইট ভেঙে যাওয়ার পর ডি সি লাইনের একজন দক্ষ মিস্ত্রিকে ডেকে আনা হয়। তাঁর পরামর্শে টিউবের চোক বদলানো হয়। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। এর মধ্যে পাড়ার কিছু লোকজন ভুতুড়ে বাড়ি বলে বাড়িটিকে চিহ্নিত করে ফেলতে শুরু করলেন এবং তাঁদের ও বাড়িওয়ালার চাপে ভদ্রলোক জনৈক ওঝাকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে বাধ্য হন। ওঝা প্রচুর মন্ত্র পড়ে কিছু লেবু ও লঙ্কা ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু ঘটনা থেমে থাকলো না। বরং পরবর্তী ঘটনাগুলি বিচার করলে বলা যায় যে ওঝার মন্ত্র পড়ার পর তাণ্ডব আরও বৃদ্ধি পেল। এরপর একদিন লোডশেডিং চলাকালীন বাড়িতে ডিমলাইট বা কেরোসিনের বাতি জ্বলছিলো। হঠাৎ চিমনীর কাঁচটি শব্দ করে ফেটে গেল। দেওয়ালের একটি ছোট বুক-শেলফ্ শক্ত করে লাগানো ছিল। শেলফ্‌টিতে দুটি কাচের ঢাকনা ছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় দুটি কাচের ঢাকনাই কিছু সময়ের ব্যবধানে ভেঙে গেল। ঘরের মেঝেতে একটি কাচের কাপ-ডিস বোঝাই ছোট আলমারি ছিল। একদিন রাত্রিবেলা গোটা আলমারিটা আছাড় খেয়ে পড়ে গেল এবং তার ভেতরের সমস্ত কাচের জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কাচের উপর এই অদৃশ্য শক্তির আক্রমণ ইদানীং চরম আকার ধারণ করেছে। সেই ঘরে তিনটি বড় আলমারি আছে। দুটি কাচবিহীন। একটিতে কাচের আয়না ছিল। গোটা আলমারিই জিনিসপত্রে ঠাসা। এই ভারি আলমারিতে হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় দেখা গেল আলমারির কাচে, ভেতরদিক থেকে গোল হয়ে একটি গর্ত হয়ে গেল এবং কাচ গুঁড়ো হয়ে পড়তে শুরু করলো। এর কিছুক্ষণ পরে গোটা আলমারি মাটি থেকে উঠে উলটে পড়ে গেল। কাচের আয়নাটির উপরদিকটি ভেঙে গেলো। যাই হোক আলমারিটিকে যথাস্থানে আবার বসানো হলো। এরপর দু'দিন আলমারিটি পড়ে গেছে এবং শেষবারে সমস্ত কাচের অংশটিই গুঁড়িয়ে গেছে। যদিও আলমারিটি প্রায় দশ বছর ধরে ওই জায়গাতেই রয়েছে এবং কোনভাবেই সেটিকে ভারসাম্যবিহীন অবস্থা বলা যায় না। এখন ঘরটির মধ্যে আর কোন কাচের সামগ্রী অক্ষত অবস্থায় নেই। অবশ্য চশমার কাচ এখনও ভাঙেনি। প্রায় দেড়মাসব্যাপী এই অদ্ভুত ঘটনায় সত্তরটি বাল্ব, ষোলটি টিউব, তিনটি চিমনি ও অন্যান্য কাচের জিনিসপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। এবং প্রথম দিকের ঘটনার থেকে এখনকার ঘটনার সংখ্যা এবং জোর অনেক বেশি। যেমন প্রথম দিকে বাল্বগুলি ফুটো হয়ে যাচ্ছিল এখন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে হঠাৎ ঘরের পাখাটি অস্বাভাবিক ভাবে দুলতে শুরু করে। যদিও সেসময় কোন হাওয়া বইছিলো না এবং পাখাটিও চলছিলো না। দুর্ঘটনা এড়াতে এরপর পাখাটি খুলে রাখা হয়। এর মধ্যে অনেক দক্ষ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ঘরটি দেখে গেছেন। গোটা ঘরে ওয়্যারিং বা সরবরাহ লাইনের পরিবর্তন করে নতুন তার লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বৈদ্যুতিক সংযোগে কোন আপাত-গণ্ডগোল নেই। ঘরে রেডিও বা টেপরেকর্ডারে কোন সমস্যা নেই। বাসিন্দা তিনজনের শরীরেও কোনো অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নেই। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো একসাথে কোন জিনিস ভাঙছে না। একটি একটি করে কাচের জিনিস ফেটে যাচ্ছে। বাল্ব ভাঙার ক্ষেত্রে আলোর জোরটা প্রথমে বেড়ে যাচ্ছে এবং তারপরে বাল্ব ফেটে যাচ্ছে। প্রথম দিকে

কাচগুলি খণ্ডে খণ্ডে ভাঙছিলো। এখন মিহি গুঁড়ো হয়ে ভাঙছে।

ঘরটি দোতলায় অবস্থিত। এর নিচে ও উপরে দুটি একই আয়তনের ঘর রয়েছে। ঘরটির দু'পাশেও ঘর রয়েছে। এই সমস্ত ঘরগুলিতে এই ধরনের কোন অসুবিধার নেই। ঘরটির সুইচ বোর্ড থেকে লাইন টেনে বারান্দায় আলো জ্বালানো হচ্ছে, সে আলো একবারও ভেঙে যায়নি। এমনকি ঘরের দরজায় পরীক্ষামূলক ভাবে একটি বাল্ব জ্বলানো হয়েছিলো সেটিও এখন পর্যন্ত অক্ষত। প্রকৃতপক্ষে এই আলোটিই বাসিন্দাদের রাত্রিবেলার একমাত্র সহায়। এযাবৎ এই ধরনের কোন ঘটনাই শুধু সে বাড়ি কেন গোটা অঞ্চলের কোন বাড়িতেই দেখা যায়নি। ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে দেখার জন্য একটি বাল্ব এবং একখণ্ড কাচ সে ঘরে রাখা হয় এবং দেড়ঘণ্টার মধ্যে সেগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই অদ্ভুত রহস্যের খবর ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী মহলেই কিছু পরিমাণে পৌঁছেছে এবং সকলেই এই রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিতে বিভিন্ন পরীক্ষাও শুরু করেছেন। কিছুদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের তৎপরতায় এই ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এই দেড়মাস ধরে ঘরটির তিন বাসিন্দা এক অদ্ভুত উত্তেজনা ও মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কিছু ব্যক্তি ঘটনাটিকে ভুতুড়ে বলে চিহ্নিত করে তাঁদের উপর নানা রকম চাপ সৃষ্টি করছেন। কিন্তু তাঁরা একমুহূর্তের জন্যও মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ করেননি এবং তাঁরা স্থিরনিশ্চিত যে, ঘটনাটির সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই বের হবে।"

'গণশক্তি'র সংবাদ সূত্র ধরে পরের দিনই দমদমের ভুতুড়ে বাড়ির বড়সড় এক খবর ছাপল 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা। এতে দু-চারটি নতুন তথ্য পরিবেশিত হলো। অমিয়শংকর রায় একজন সক্রিয় সি পি আই (এম) সদস্য। থাকেন দক্ষিণ দমদমের একটি ত্রিতল বাড়ির এক ঘরের ফ্ল্যাটে। গত ১৮ অক্টোবর ঘটনার শুরু। অমিয়বাবু গিয়েছিলেন নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে সম্বর্ধনা জানাতে। সে রাতে বাল্ব ফাটা দিয়ে কাচ ভাঙার শুরু।

ইতিমধ্যে ২৮, ২৯ এবং ৩০ তারিখেও গণশক্তি পত্রিকায় এই ঘটনা ছবিসহ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হলো। ডঃ এস· পি· গণচৌধুরী, ডঃ দিলীপ বসু, ডঃ মধুসূদন ভট্টাচার্য, ডঃ তারাশঙ্কর ব্যানার্জির মত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার রহস্য ভেদ করতে কাচ-হন্তা ঘরটিতে পরীক্ষা চালিয়েছেন বলে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে কখনও প্রকাশিত হলো—তাঁরা কারণ খুঁজে বের করতে পারেননি, কখনও প্রকাশিত হলো—ঘরে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন।

ইতিমধ্যে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতা রহস্য উন্মোচনে আমার সাহায্য চাইলেন। ২৭ নভেম্বর আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে ঘরটি দেখতে যাব জানাই। সেদিন সন্ধ্যায় ঘরটি ও তার আশপাশের পরিবেশের উপর পরীক্ষা চালাই।

কাচ ভাঙে কিসে ? অবধারিতভাবে এটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কাচ ভাঙতে পারে অনেক কারণে। কারণগুলো একটু দেখা যাক : (১) উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে। (২) বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ কাচে লাগিয়ে রাখলে। (৩) কাচের তাপমাত্রার হঠাৎ প্রচণ্ড রকম পরিবর্তন ঘটলে। (৪) আঘাত করলে। (৫) কোয়ার্জ

(কাচ-কাটা পাথর) দিয়ে আঁচড় কাটলে।

কাচের বাল্ব ভাঙতে পারে কী কী কারণে, একটু দেখা যাক : (১) কোন কারণে যদি বৈদ্যুতিক লাইনে বেশি ভোল্টেজ প্রবাহিত হতে থাকে তবে অনেক সময় বাল্ব ফেটে যায়। (২) জ্বলন্ত গরম বাল্বে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিলে বাল্ব ফাটবে। (৩) আঘাত করে বাল্ব ফাটানো সম্ভব। তবে ওভার-ভোল্টেজে বা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে থাকা নিয়নে ঠাণ্ডা জল ছিটোলে নিয়ন ফাটবে না।

কাচগুলো কেমনভাবে ভাঙছে, এটা বোঝার জন্য ভাঙা কাচের টুকরোগুলো পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কাচ ভেঙে যাওয়ার আগে-পরে কাচগুলো যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলাও একইভাবে প্রয়োজনীয়।

অমিয়শঙ্করবাবু দমদম স্টেশনের লাগোয়া কালীকৃষ্ণ শেঠ লেনের ৯১/৬ নম্বর বাড়ির দোতলার একটি ঘর নিয়ে থাকেন। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম দরজার ওপরে তথাকথিত 'লাকি নাম্বার' ৭৮৬ লেখা। আনুমানিক ১০ ফুট বাই ৮ ফুট ঘরের মধ্যেই অমিয়বাবুর পুরো সংসার।

অমিয়বাবু সকালেই খবর পেয়েছিলেন সন্ধ্যায় যাবো। পরিচয় দিতেই আপ্যায়িত
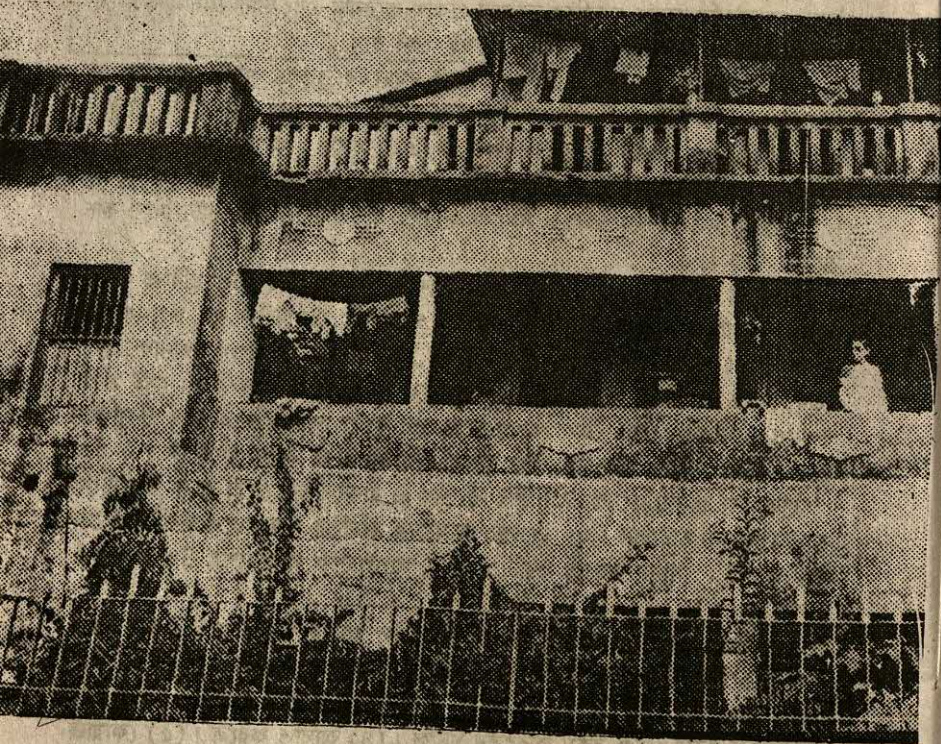
করলেন। অমিয়বাবু দক্ষিণ দমদম পুরসভার হিসেবরক্ষকের চাকরি করেন। স্ত্রী তৃপ্তি রায় দমদমের প্রাচ্য বাণীমন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ান। ছেলে সৌম্য দমদমের কে· কে· হিন্দু আকাডেমীর ছাত্র, এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। অমিয়বাবু সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। সি পি আই (এম)-এর স্থানীয় কমিটির সদস্য। তৃপ্তি দেবীর হাতে গ্রহরত্নের আংটি। দেখলেই বোঝা যায় দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহার করছেন। ছেলে সৌম্য বাড়ি ছিল না। শুনলাম, পড়াশুনোর অসুবিধে হচ্ছিল বলে তাকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাখা হয়েছে কাল বিকেল থেকে।

অমিয়বাবুর বাড়ির অবস্থান দেখে নিশ্চিত ছিলাম—কাচ ভাঙার ক্ষেত্রে শব্দতরঙ্গের কোনও ভূমিকা নেই। অনেক সময় বিমানবন্দরের খুব কাছের বাড়ির কাচের শার্সি বা জিনিস-পত্তর ভাঙে বিমানের তীব্র শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে। অমিয়শঙ্করবাবুর এই ঘরটি বিমান বন্দরের কাছে নয়। বিমানের শব্দ এখানে বাসের শব্দের চেয়েও মৃদু। কাছেই রেললাইন। কিন্তু ট্রেনের শব্দে ঘর কাঁপে না, কাঁপে না সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া পাতলা কাচের শিশি—পরীক্ষা করে দেখেছি। বাড়ির ধারে-কাছে কোনও কারখানা নেই, যেখান থেকে তীব্র শব্দতরঙ্গ তৈরি হতে পারে। অতএব শব্দতরঙ্গকে ভাঙার কারণ হিসেবে বাদ দিতেই হয়।

রাসায়নিক পদার্থ যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কাচে দিলে কিছু সময় পরে কাচ ফাটতে পারে। এ-ক্ষেত্রে অ্যাসিড প্রয়োগের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি মানুষের উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন।

অমিয়শঙ্করবাবুর ঘরের বাল্বের কাচ ওভার-ভোল্টেজের দরুন ভাঙতে পারে। কিন্তু ৭১ বার ওভার ভোল্টেজে ভাঙা সম্ভব নয়। কারণ ইতিমধ্যে ভোল্টেজ বহুবার মাপা হয়েছে। বহু বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি, সংস্থা ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভোল্টেজের বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন। লাইন-লিকেজ কি না, সে বিষয়েও পরীক্ষা চালান হয়েছে। ভোল্টেজে কোনও অস্বাভাবিকতা বা লাইনে কোনও লিকেজ পাওয়া যায়নি। গোটা ঘরের ওয়্যারিং করা হয়েছে নতুন করে। ভোল্টেজ পরীক্ষা করে দেখেছি, ১৭৫। অতএব অমিয়বাবুর ঘরের ওয়্যারিং নতুন করার পরও কাচের বাল্ব ফাটার জন্য বাড়তি ভোল্টেজকে আদৌ দায়ী করা চলে না। কিন্তু অমিয়বাবুর দাবি মত নতুন ওয়্যারিং-এর পরও বাল্ব ফেটেছে। আরও একটা তথ্য অমিয়বাবু জানালেন, এই ঘরের লাইন থেকে তার টেনে বাইরের বারান্দায় বাল্ব জ্বালালে তা ভাঙছে না। বৈদ্যুতিক লাইনের ত্রুটিতে বাল্ব ফাটলে সেই ত্রুটিপূর্ণ লাইন থেকে টানা বাইরের বাল্বও ফাটবে। একই লাইন থেকে টানা সত্ত্বেও ঘরের বাল্ব ফাটছে, বাইরের বাল্ব নয়, এমনটা হতে পারে বাল্ব ফাটানোর পিছনে মানুষের হাত থাকলে। ঘর স্যাঁত-স্যাঁতে বা দূষিত গ্যাসে পূর্ণ নয়। যথেষ্ট খোলামেলা।

বিদ্যুতের গোলমালে বাল্ব ফাটতে পারে, কিন্তু বুক-কেস, আলমারির কাচ বিদ্যুতের গোলমালে ফাটার কোনও সম্ভাবনা নেই। চিমনি, আয়না এবং অন্যান্য কাচের জিনিস ফাটার ক্ষেত্রেও বিদ্যুতের ত্রুটিকে কোনওভাবেই দায়ী করা যায় না। কাঠের আলমারি নাকি আপনা থেকেই চারবার পড়ে গেছে। সিলিং ফ্যান আপনা থেকে দুলেছে। ঘরে তখন কোনও জোরালো হাওয়া ছিল না। ফ্যানও ঘুরছিল না। বিদ্যুতের গোলমালে

এমন কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। কাঠের আলমারিতে ভারসাম্যের কোনও অভাব ছিল না। পরীক্ষা করে দেখেছি। আরও লক্ষ্যণীয়, ঘরে একটি বড় স্টিলের আলমারি ছিল। স্টিলের আলমারি কিন্তু একবারও পড়েনি। কারণ একজনের পক্ষে স্টিলের আলমারি ঠেলে ফেলে দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। ছোট কাঠের আলমারি ফেলা যথেষ্ট সহজসাধ্য। ফ্যান দোলাতে, আলমারি ফেলতে একান্তভাবে প্রয়োজন মানুষের। যে ফ্যান দোলাবে, আলমারি ফেলে দেবে।

আলমারির কাচ ভেঙেছে অদ্ভুতভাবে। একদিকের পাল্লা কাঠের। অন্য দিকের পাল্লায় ওপরে-নীচে দুটি কাচ। হঠাৎ একদিন বাড়ির লোকদের চোখে পড়লো, ওপরের কাচে একটা বৃত্তাকার দাগ। দাগের আশেপাশে কয়েকটা আঁচড়। দিনদুয়েক পরেই তলার কাচেও গোল দাগ দেখা গেল। দাগের আশেপাশে কিছু আঁচড়। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওপরের কাচটা ভেঙে পড়েছে। দু-একদিন পরেই ভাঙলো নীচের কাচটা। এ-কথাগুলো অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবীর কাছ থেকেই শোনা।

আলমারির কাচের কয়েকটা টুকরো হাতে নিয়ে সামান্য নজর দিতেই বুঝলাম আলমারির কাচ সরাসরি আঘাত করে ভাঙা নয়। প্রথমে কোয়ার্জ (কাচ-কাটা পাথর) দিয়ে গোল দাগ ফেলা হয়েছে এবং আঁচড় কাটা হয়েছে। তারপর একসময় সুযোগ বুঝে সামান্য আঘাত করা হয়েছে। ফলে কাচ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। টুকরোগুলোর ভাঙা অংশের কিছুটায় কোয়ার্জে কাটার চিহ্ন স্পষ্ট। বাকি অংশ আঘাত করে ভাঙার ফলে চল্‌টা উঠে গেছে।

ওপরে দেওয়ালে টাঙানো ছোট্ট বুক-কেসটার পাশাপাশি দুটো কাচ লাগান ছিল। কাচগুলো দু'দিকে সরান যায়। ওগুলোর ভাঙা টুকরো দেখিনি। শুনেছি প্রথমে একপাশের কাচ ভেঙে পড়েছিল। তারপর অন্য পাশের। দেখিনি, তাই বোঝা সম্ভব ছিল না ওই কাচ ভাঙার ক্ষেত্রেও 'কাচ-কাটা পাথর' ব্যবহার করা হয়েছিল অথবা সরাসরি আঘাত করা হয়েছিল অথবা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল।

অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ১৮ অক্টোবর রাতে প্রথম বাল্বটা ফাটার ক্ষেত্রেই শুধু তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী। ঘরে ঢোকার মুহূর্তে বাল্বটা বিরাট শব্দ করে ফেটে গিয়েছিল। আর কোনও একটি দুর্ঘটনারও তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী নন। সিলিং ফ্যান দুলেছে—অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবী দেখেছেন। কিন্তু ছেলের চিৎকারে ঘরে ঢুকে দেখেছেন। আলমারি পড়তে তাঁরা দু'জনের কেউই দেখেননি। দেখেছেন পড়ার পর। ঘরে তখন ছিল ছেলে সৌম্য।

দু'জনে ঘটনাগুলো নিজের চোখে ঘটতে দেখেছেন বললেও অবশ্য তাঁদের কথাকে অভ্রান্ত সত্যি ধরে নিয়ে বিচার করতে বসতাম না। কারণ মানুষের বাড়িয়ে বলার প্রবণতা, প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার প্রবণতা থেকে মিথ্যে বলার বিষয়ে যথেষ্ট অবগত। আমি জেরা করার মত করে প্রশ্নের ঝড় তুলিনি। নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার প্রয়োজনীয় উত্তরগুলো বের করে নিচ্ছিলাম। সম্ভবত অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবী সচেতন ছিলেন না, আমি ঠিক কী জানতে চাইছি।

ঘরে বর্তমানে কোনও কাচের জিনিস নেই বাল্ব ছাড়া। পরীক্ষা করতে কোনও কাচের জিনিস নিয়ে যাইনি। শুনলাম, কাচের জিনিস রাখলে নাকি আধ ঘণ্টা থেকে

দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভেঙে যায়। একটি বাল্ব অবশ্য গতকাল বিকেল থেকে অক্ষত অবস্থায় ঘরে বিরাজ করছে। বাল্বটি নাকি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া হয়েছে। এও শুনলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বেই নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু বিজ্ঞানী কাচ ভাঙার রহস্য অনুসন্ধানে নেমেছেন। কিন্তু এ কথার মধ্য দিয়েও একটা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ পেল—কাল সন্ধে থেকে সৌম্য বাড়িতে নেই, কাল সন্ধে থেকে আজ রাত পর্যন্ত বাল্বটি ভাঙেনি।

অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবীকে ভরসা দিলাম, কোনও চিন্তা নেই। ভাঙার কারণ ধরতে পেরেছি বলে আশা করছি। আপনারা যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে আগামী রবিবার থেকেই কাচ ভাঙা বন্ধ করতে পারবো।

পরিপূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস পেলাম। বললাম, রবিবার সকাল দশটায় আসবো। আলমারি ও বুক-শেল্‌ফের সমস্ত কাচ সেদিন আবার লাগাবার ব্যবস্থা করুন। ঘণ্টা-ছয়েক থাকব। নিশ্চিন্তে থাকুন, সে-সময়ের মধ্যে কিছুই ভাঙবে না।

কেন ভাঙছে ? দু'জনের প্রশ্নের উত্তরেই জানালাম, সে-দিনই ছ-ঘণ্টা পার করে দিয়ে তারপর জানাবো।

অমিয়বাবু জানালেন, শনিবারই সব কাচ লাগিয়ে রাখবেন। বললাম, তেমনটি করবেন না। শনিবার কাচ ভাঙতেই পারে। এমনকি সব কাচই। কাচের মিস্ত্রিকে এনে মাপ দিয়ে কাচ কাটিয়ে রাখুন। রবিবার আমার সামনে লাগান হবে। মিস্ত্রিকে বলবেন দশটায় আসতে।

ঘর থেকে বেরতেই উপস্থিত সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলেন। জানতে চাইলেন, ভাঙার কারণ ধরতে পেরেছি কি না। জানালাম, আগামী রবিবার সকাল দশটায়-আমাদের সমিতির তরফ থেকে কয়েকজন আসছি। আমাদের সামনে আবার নতুন করে ভেঙে যাওয়া সব কাচ লাগানো হবে। ছ'ঘণ্টা থাকবো। এতদিন পর্যন্ত ঘরের কাচ আধ ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভাঙছিল। কিন্তু আশা করছি সে-দিন ওই দীর্ঘ ছ'ঘণ্টার মধ্যেও কোনও কাচই ভাঙবে না। বিকেল চারটের সময় জানাব কেন ভাঙছিল। এর আগে আর কিছু জানাচ্ছি না। সাংবাদিকরা এ প্রশ্নও করছেন, রবিবার কেন ? কেন এই চারদিন সময় চেয়ে নিচ্ছেন ? কেন কালই বন্ধ করতে আসবেন না ?

বললাম, আগামীকাল রবিবার হলে আগামী কালই আসতাম। ছুটির দিন ছাড়া আমার এবং আমাদের সমিতির অনেকের পক্ষেই দীর্ঘ ছ-আট ঘণ্টা সময় বের করা খুবই অসুবিধেজনক।

পরের দিন গণশক্তির প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমাদের সমিতির পক্ষে আমার 'কাচ ভাঙা রহস্যময় বাড়িতে যাওয়ার কথা' এবং 'কয়েক দিনের মধ্যেই রহস্য উন্মোচিত হবে' বলে আশা প্রকাশ করার কথা প্রকাশিত হলো।

ইতিমধ্যে আমাদের সমিতির কিছু সদস্য অমিয়বাবুর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললো। কথা বললো সৌম্যের স্কুলের কিছু ছাত্রের সঙ্গে। গণশক্তির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—প্রতিবেশীদের চাপেই অমিয়বাবু ওঝা ডেকেছিলেন। প্রতিবেশীদের বক্তব্য, এমন চাপ তাদের দিক থেকে কখনই দেওয়া হয়নি। সৌম্যের বিষয়েও প্রতিবেশী বা ছাত্রদের ধারণা মোটেই ভাল নয়।

শনিবার সন্ধ্যায় অমিয়বাবুর বাড়ি হাজির হলাম, কাচ লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে কি না জানতে। বাড়িতে ছিলেন শুধু তৃপ্তি দেবী। জানালেন, মিস্ত্রি মাপ নিয়ে গেছে। কাল দশটার মধ্যে ওরা চলে আসবে। আপনার সামনেই কাচ লাগান হবে। আপনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন এবং রবিবার আসবেন শুনে সৌম্য আপনাকে দেখবে বলে দারুণ বায়না ধরেছে। আসলে আপনার কথা তো অনেক পড়েছে, তাই আপনাকে দেখতে চায়। আপনি কিভাবে কাচ ভাঙা বন্ধ করেন, সেটা নিজের চোখে দেখার লোভ সামলাতে পারছে না। বললাম, বেশ তো, ওকে নিয়েই আসুন।

তৃপ্তি দেবী জানালেন, দূরদর্শন থেকে একজন এসেছিলেন। রবিবার কিছু ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে জানিয়েছি, সে-দিন প্রবীরবাবু সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এ-বাড়িতে একটা পরীক্ষা চালাবেন। অতএব প্রবীরবাবুর সঙ্গে কথা না বলে, তাঁর অসুবিধে হবে কিনা না জেনে ওইদিন আপনাদের ছবি তোলার অনুমতি দিতে পারছি না।

১ ডিসেম্বর শনিবার বসুমতী পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবর পরিবেশিত হয় ২ ডিসেম্বর কাচভাঙা ঘরে কাচের জিনিসপত্র রাখা হবে এবং সেই সঙ্গে আলমারির ভেঙে যাওয়া কাচও নতুনভাবে লাগান হবে। সমিতির প্রতিনিধিরা ঐদিন ঘরে ৬ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করবেন, ইত্যাদি।

২ ডিসেম্বর রবিবার সকালে The Telegraph পত্রিকার প্রায় আধ পৃষ্ঠা ধরে প্রকাশিত হলো একটি সচিত্র প্রতিবেদন "POLTERGEIST"। প্রতিবেদক প্রণয় শর্মা প্রতিবেদনটিতে জানালেন, "ইতিমধ্যে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংস্থার তরফ থেকে বিজ্ঞানীরা ঘরটি দেখতে গিয়েছিল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

"কিন্তু গত কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, সাইন্স অ্যাণ্ড র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীর ঘোষের দৃশ্যপটে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। এই যুক্তিবাদী ওই পরিবারের সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি ২ ডিসেম্বরের মধ্যে রহস্যভেদ করবেন। তিনি শ্রীরায়কে বাল্ব টিউবলাইটসহ সমস্ত কাচের সামগ্রী তাঁর উপস্থিতির দিন লাগাতে বলেছেন।"

২ ডিসেম্বর রবিবার সকাল দশটায় অমিয়বাবুর ফ্ল্যাটে হাজির হলাম আমি ও আমাদের সমিতির কিছু সদস্য। আজই প্রথম দিনের আলোয় ঘরটি দেখলাম। অমিয়বাবুর ঘরের দরজায় পাশেই কালো কালি দিয়ে কাঁচা হাতের কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা। বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে আলমারি ও বুক-কেসের সব কাচ লাগান হলো। তবে কাচ লাগাবার আগে প্রতিটি কাচ ভালোমত স্পিরিট দিয়ে মুছে নিয়েছিলাম। ঘরের বাল্ব ও টিউবলাইট জ্বেলে দেওয়া হল। ঘরের বাল্বের হোল্ডার থেকে দড়ি দিয়ে একটা আয়না ঝুলিয়ে রাখা হয়। যে আলমারি উল্টে পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, সেই আলমারির মাথায় রাখা হয় কেরসিন ল্যাম্পের একটি চিমনি। তারপর চলে অপেক্ষা। ঘরে সাংবাদিকরা, অমিয়বাবু ও সৌম্য ছাড়া মাঝে-মধ্যে ছিলেন তৃপ্তি দেবী ও অমিয়বাবুর পরিচিত কেউ কেউ। ভি ডি ও-তে ছবি তোলা

হয়েছে 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে। সৌম্যের ডান বাহুতে একগাদা তাগা-তাবিজ ঝোলান। শেকড় ঝোলান ছিল বারবার উল্টে পরা কাঠের আলমারিতে। অমিয়বাবু আন্তরিক আতিথেয়তা দেখিয়ে আমাদের দফায় দফায় চা, সিগারেট ও রসগোল্লা খাইয়েছেন। ঘরে আমাদের সমিতির পক্ষে ছিলেন জ্যোতি মুখার্জি, কমল বিশ্বাস, আশিস মুখার্জি, দেবু হালদার ও জাদুকর শুভেন্দু পালিত। ওদের ওপর দায়িত্ব ছিল প্রতিটি কাচের জিনিসের ওপর লক্ষ্য রাখা। সমিতির সভ্য ছাড়া যাঁরাই ঘরে উপস্থিত থাকবেন তাঁদের কারো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ধাক্কায় বা আঘাতে যেন কোনও কাচের জিনিস ভেঙে না যায় অথবা কোনও আসবাব উল্টে না পড়ে, এ-দিকে নজর রাখার দায়িত্বও ছিল ওদের ওপর। সারা ঘরে ছড়িয়ে রাখা কাচের সামগ্রীর কোনও একটিকে ঠাসা ভিড়ের সুযোগে স্রেফ আঘাত হেনে ভেঙে ফেলা বা কোনও জিনিস উল্টে ফেলে দেওয়া এমন কোন কঠিন কাজ নয়। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন নজর রাখা। এই ঘটনার পিছনে মানুষের হাত থাকলে, সেই হাতের মালিক কে হতে পারেন, এ বিষয়ে যুক্তিগুলো সাজালেই অনুমান করা যায়, এটা যেমন সত্য, তেমনই সত্য অনুমানের হদিশ পেয়ে ঘটনার নায়ককে বাঁচাতে আমাদের ধোঁকা দিতে আজ অন্য কেউ কাচ ভঙ্গকারীর ভূমিকা নিতে পারে। আর এটা মাথায় রেখেই দু'দিন আগে নজরদারির দায়িত্ব যাঁদের দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের নিয়ে ক্লাস করেছি। ব্ল্যাক-বোর্ডে রহস্যময় ঘরটির কোথায় কি আছে এবং কোথায় কোথায় কাচ লাগান হবে, কাচের সামগ্রী রাখা হবে তার ছবি এঁকে কে কেমনভাবে নজর রাখবেন, তা বুঝিয়েছি। নজরদারদের কেউ কিছু সময়ের জন্য বাইরে গেলে পরিবর্ত হিসেবে দায়িত্ব নেবার জন্য কয়েকজনকে 'রিজার্ভ' রেখেছি। বাইরে দর্শকদের মধ্যে মিশে থাকা সমিতির সদস্যদের পরিচলনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শশাংক মণ্ডলকে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে সমিতির পক্ষ থেকে কাচ ভাঙার রহস্যের আবরণ সরালাম। বললাম কাচ ভাঙে কী কী কারণে। জানালাম, এ ঘরের কাচ শব্দ-তরঙ্গে ভাঙছিল না। এমন সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে যুক্তিগুলো হাজির করলাম। ওভার-ভোল্টেজে ঘরের যে কোনও কাচের জিনিস ভাঙা, আলমারি বারবার উল্টে দেওয়া, চালু না হওয়া সিলিং ফ্যান দোল খাওয়ানো অসম্ভব। ওভার-ভোল্টেজের দরুন কাচের বাল্ব প্রথম দু-একবার ভাঙলেও ভাঙতে পারে। কিন্তু প্রতিটি বাল্ব ও টিউবলাইট যে ওভার-ভোল্টেজে ভাঙছিল না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভোল্টেজ পরীক্ষা করা হয়েছে, লাইন পাল্টান হয়েছে। অথচ লাইন পাল্টানোর পরও বাল্ব ও নিয়ন ফেটেছে। অথচ লক্ষ্য করুন, এই একই লাইন থেকে তার টেনে বাল্ব বাইরে সবার চোখের সামনে রাখলে ও জ্বালালে ফাটছে না। বিদ্যুৎ লাইনে গোলমাল থাকলে, এক্ষেত্রে বাইরের বাল্বও ফাটতো।

তীব্র শব্দের প্রভাবে কাচ ভাঙার সম্ভাবনা এখানে শূন্য। আশে-পাশে কল-কারখানা রেল ও বিমানের এমন কোনও তীব্র শব্দ সৃষ্টি হয় না, যার দরুন কাচ ভাঙতে পারে। রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কাচ ভাঙা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আপনারা ভাঙা কাচের টুকরোগুলো একটু লক্ষ্য করুন।

'বর্তমান' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক রূপকুমার বসুর হাত থেকে তাঁর সংগৃহীত

দু'টুকরো কাচ নিয়ে সাংবাদিকদের দেখালাম। কাচগুলো দেখলেই বোঝা যায় এই কাচগুলো ভাঙার আগে কিছু দিয়ে অনেকটা কেটে রাখা হয়েছিল। বাকিটা ভেঙেছে আঘাতে, চল্‌টা ওঠা দেখলেই বোঝা যায়। এই যে টুকরোগুলো দেখালাম, এগুলো কাঠের আলমারির ভাঙা কাচের টুকরো। আলমারির কাচ ভেঙেছে একটু অদ্ভুত ভাবে। আলমারির এক দিকের পাল্লায় ওপরে-নীচে কাচ লাগান দেখতে পাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওপরের কাচে একটা স্পষ্ট গোল দাগ কাটা, তার আশে-পাশে কয়েকটা আঁচড়। তারপর একদিন তলার কাচেও একই ধরনের দাগ দেখা গেল। একদিন দেখা গেল ওপরের গোল দাগের অংশটা ভেঙে পড়েছে। তলার কাচটাও একদিন ওভাবেই ভাঙলো—কাচের মাঝখানে একটা বড় গোল ফুটো। কাচের ওপর কী দিয়ে দাগ কাটা যায় ? কোয়ার্জ (কাচকাটা পাথর) পাথর দিয়ে কাটা যায়। এই শহরে অনেক জায়গাতেই কাচকাটা পাথর বিক্রি করেন কিছু ভিন্‌ প্রদেশী মহিলারা। এক টাকা থেকে দু-টাকা দাম। এমনকি দমদম স্টেশন চত্বরেই ওই পাথর বিক্রি হয়। ফটোর দোকানে কাচ কাটার জন্য ছোট একটুকরো কাঠের আগায় হীরে লাগান থাকে। অমন একটা কাচ-কাটার যন্ত্র যোগাড় করা এমন কিছুই কঠিন নয়। কোয়ার্জ জাতীয় কোনও কিছু দিয়ে কাচে গোল করে দাগ কেটে রাখলে কাচের অনেকটাই কেটে যাবে। তারপর সুযোগ বুঝে বৃত্তের মাঝে একটি আঘাত করলেই কাচ ভেঙে যাবে বৃত্তের আকারে। আলমারির কাচ ভাঙার ক্ষেত্রে কোয়ার্জ জাতীয় পাথরই ব্যবহৃত হয়েছিল।

কথার মাঝখানে প্রতিবাদ করলেন উত্তেজিত অমিয়বাবু, আপনি এভাবে কাচ কেটে দেখাতে পারবেন ?

বললাম, নিশ্চয়ই পারবো। আপনি অনুমতি দিলে করে দেখাতে পারি।

না, অনুমতি দেননি অমিয়বাবু। বরং বললেন, বুক কেসের কাচ তো গোল হয়ে ভাঙছিল না ! ওটার কী ব্যাখ্যা দেবেন ?

বলেছিলাম, ভাঙা কাচগুলোর একটা অংশ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে। জোরালো আঘাত করলে আঘাতস্থলের কাচ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে।

অমিয়বাবুর আত্মীয় বলে পরিচিত এক ভদ্রলোক জোরালোভাবে আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, কাচগুলো কেউ আঘাত দিয়ে ভাঙার সময় তার পক্ষে আদৌ কি এমন ক্যালকুলেশন করে আঘাত করা সম্ভব যার দরুন গুঁড়ো হয়ে যাবে ? আপনার এই থিয়োরি আদৌ মানতে পারছি না।

অমিয়বাবু মুখ খুললেন, আপনি এই রকম গুঁড়ো করে ভেঙে দেখাতে পারবেন ?

বললাম, আমি আপনাদের দু'জনের কথারই উত্তর দেব। অমিয়বাবুর আত্মীয়কে বললাম, আঘাতে কাচটা সাত টুকরো হয়ে ভাঙলে আপনি প্রশ্ন করতেন, কাচটা ঠিক সাতটুকরো হয়ে ভাঙলো কেন ? কেন দু'টুকরো বা পাঁচ টুকরো নয় ? এ-ভাবে ক্যালকুলেশন করে কি ভাঙা সম্ভব ? ভাঙার সময় কেউ ক্যালকুলেশন করে ভাঙে না, এক্ষেত্রেও ক্যালকুলেশন করে ভাঙেনি। মেরেছে এবং ভেঙেছে। আর অমিয়বাবুর উত্তরে জানাচ্ছি, উনি অনুমতি দিলে ওইভাবে গুঁড়ো-গুঁড়ো করেই ভেঙে দেখিয়ে দিতে পারি।

অমিয়বাবু আর এগোলেন না। তবে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আর আলমারিটা

পড়ল কী করে ?

ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তাই পড়েছে।

একজনের পক্ষে ঠেলে ফেলে দেওয়া আদৌ সম্ভব ? আপনি ফেলতে পারবেন ?

বললাম, আমি তো পারবোই, এখানে উপস্থিত আমাদের সমিতির যাকে সবচেয়ে দুর্বল বলে আপনার মনে হয়, তাকেই ডেকে নিন, দেখবেন সেও ফেলে দেবে।

আর বাল্বগুলো ফাটছিল কী করে ? অমিয়বাবু প্রশ্ন করলেন।

এখানেও মানুষের হাত ছিল। ফাটান হচ্ছিল বলেই ফাটছিল।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অমিয়বাবু জানালেন তাঁর ধারণা বাল্ব থেকে কোনও একটা অজ্ঞাত রশ্মি বেড়িয়ে এসে আলমারি উল্টে দিয়েছে, কাচগুলো ভেঙেছে। সৌম্যেরও বক্তব্য ছিল ওই ধরনের। সৌম্যের কথা মত ও দেখেছে বাল্ব থেকে একটা হলদে রশ্মি বেরিয়ে এসে আলমারিতে আঘাত করেছে।

ফ্যান দোলার ব্যাখ্যাও চেয়েছিল অমিয়বাবুর ঘনিষ্ঠ একজন। জানিয়েছি ফ্যান দোলালেই দোলে। কেউ দুলিয়ে দিয়েছিল।

কে এমনটা করেছে ? আমাদের এ ঘরে থাকি মাত্র তিনজন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমরাই। সুতরাং আপনার কথা মেনে নিলে এটাই দাঁড়ায় আমার স্ত্রী বা ছেলে কেউ এ-সব করেছে। আমার স্ত্রী কী পাগল যে ধুম্-ধুম্ করে জিনিস-পত্তর ভাঙবে। আমার ছেলেও যদি ভেঙে থাকে, তবে একবারও কি আমরা দেখতাম না। অমিয়বাবু বললেন।

বললাম, গত বুধবার প্রথম সাক্ষাৎকারে আপনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন ম্যাণ্ডেলাকে সম্বর্ধনা দেবার দিন সন্ধ্যায় ঘরে ঢোকার সময় বাল্বটা দুম্ করে ফেটে যেতে দেখেছিলেন, তারপর আর একটি ঘটনাও আপনি নিজের সামনে ঘটতে দেখেননি। দেখেছেন ঘটে যাওয়ার পর। আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাদা করে কথা বলেছি। উনিও কোনও ঘটনা নিজের চোখে ঘটতে দেখেননি, দেখেছেন ঘটে যাওয়ার পর। ঘটনাগুলো ঘটার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী কিন্তু আপনার ছেলে। আজও সাংবাদিকদের সামনে বহুবার বলেছেন, কাচের জিনিস ঘরে রাখলে আধ-ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে। গতকাল সন্ধেয় এসে বউদির (তৃপ্তি দেবী) কাছ থেকে জানতে পারি, কোনও এক জ্যোতিষী না বাবাজী কি একটা জিনিস দিয়ে বলেছেন, সৌম্যের ওপর কার্ একটা কোপদৃষ্টি পড়েছে। তাইতেই এইসব অঘটন। কিছুটা ওঁর কথা মতই এ-বাড়ি থেকে সৌম্যকে দূরে রাখতে গত মঙ্গলবার বিকেলে সাতগাছি এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। তৃপ্তি দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সৌম্যকে পাঠাবার পর আর কোনও কাচের জিনিস কি ভেঙেছিল ? তিনি জানিয়েছিলেন, ঘরে বর্তমানে ভাঙার মত কোনও কাচের জিনিস নেই, তাই ভাঙারই প্রশ্ন নেই। কাচের জিনিস রাখলে ভাঙবে, এতদিন ধরে যা ঘটছে, তাতে এটা ধরে নেওয়াই যায়। আবার সত্যি এমনও হতে পারে, এই জ্যোতিষী যা বলেছেন, তাই সত্যি। সৌম্য এ-ঘরে উপস্থিত হলে ওর শরীর থেকে কোনও রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে আবার অঘটন ঘটতে থাকবে। তৃপ্তি দেবীরও ইচ্ছে ছিল, আমাদের এই ছ'ঘণ্টা পরীক্ষা চালাবার সময় সৌম্য উপস্থিত থাকুক। সৌম্যকে আনতে বলেছিলেন। ও এই ছ'ঘণ্টা ছিল, কিন্তু তবু কাচ ভাঙেনি।

আসলে কাচগুলো মানুষই ভাঙছিল। আজ সে ভাঙার সুযোগ পায়নি। ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে যুক্তি এ-কথাই বলে ঘটনাগুলো ঘটিয়েছেন অমিয়বাবুর পরিবারেই কেউ। প্রশ্ন উঠেছে, কেন ভাঙবে ? আপনাদের দুটি তথাকথিত ভুতুড়ে ঘটনা বলছি। শুনলে ভাঙার কারণেই কিছুটা হদিশ পেতে পারেন।

'জল-ভূত' ও 'পোশাককাটা-ভূত'-এর ঘটনা দুটির উল্লেখ করে বললাম, জলভূতের সৃষ্টি করে বালকটি তার মায়ের কড়া শাসনের প্রতিশোধ তুলতে চেয়েছিল, শাস্তি দিতে চেয়েছিল। আর পোশাককাটা ভূতের সৃষ্টি হয়েছিল বাড়ির কাজের কিশোরী মেয়েটির হতাশা থেকে। কিশোরীটির কথা মত বাড়ির ছোট ছেলেকে সে ভালবাসে। ছোটছেলে তাকে আদর-টাদর করে বটে, কিন্তু ভালবাসে অন্য একটি মেয়েকে। কিশোরীটির ইচ্ছে হয়, ছোটছেলের মুখোশ খুলে দেয় তার প্রেমিকার কাছে। কিশোরীটি বিশ্বাস করে, মুখোশ খুলতে গেলে লাভ হবে না কিছুই। বড়জোর ছোটছেলের সঙ্গে তাঁর প্রেমিকার বিচ্ছেদ হবে। কিন্তু তাতে ছোটছেলে তাকে আদৌ বিয়ে করবে না। বরং ঘটনাটা জানাজানি হলে যে কোনও একটা অপবাদ দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিশোরীটি মেয়েদের পোশাক আর ছোটছেলের পাজামার ওপর আক্রোশ মিটিয়েছে তার অবদমিত যৌন আবেগ, ক্রোধ, ঈর্ষা ও হতাশা থেকে। অনেক সময়ই কিশোর-কিশোরীদের ক্ষোভ, হতাশা, অবদমিত আবেগই রূপ পেতে পারে এই ধরনের নানা কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে বড়দের উত্যক্ত করার মধ্যে।

এখানে কে নিশ্চিতভাবে ঘটনা ঘটাচ্ছে, তা বলার মত কোনও অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই বটে, কিন্তু যুক্তিগুলো পরপর সাজালে মনে হয় ঘটনাগুলো ঘটানোর সম্ভাবনা কিশোরটিরই সবচেয়ে বেশি। কিশোর বয়সে বা যৌবন সন্ধিক্ষণে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, একাকিত্বের সমস্যাও এর মধ্যে অন্যতম। কিশোরটি সেই সমস্যাতে পীড়িত হতেই পারে। তারই হয়তো বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বড়দের পীড়িত করার চেষ্টায়। এ-ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনাও রয়েছে। অমিয়বাবু রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মা তাঁর স্কুল নিয়ে। বাবা মা'র স্নেহ থেকে, তাঁদের কাছে পাওয়া থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। যখন বাবা ঘরে থাকেন, তখনও তাঁকে ঘিরে থাকে অন্য মানুষেরাই। ব্যস্ত রাজনীতিবিদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক জীবন, এ-কথা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি এক ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাটে মা-বাবার অনুপস্থিতির একাকিত্ব যেমন সৌম্যকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলতে পারে, তেমনই বহুজনের ভিড়ে বড় বেশি একা করেই বার বার নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে সৌম্য। ঘরে পড়াশুনোর মত পরিবেশের অভাব তাকে একটু একটু করে লেখাপড়ার জগৎ থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে। অনুষঙ্গ হিসেবে পাল্টাতে পারে বন্ধুজগতের পরিবেশ। ওর ক্ষোভ, হতাশা থেকে বড়দের উত্যক্ত করার জন্য ও এমনটা করতেই পারে।

অমিয়বাবু সরাসরি প্রায় চ্যালেঞ্জ জানালেন, স্বীকার করছি কাচ আধ ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভাঙতো। আজ ছ'ঘণ্টা পর্যন্ত ভাঙেনি। কিন্তু আপনারা চলে যাবার পর আবারও ভাঙতে পারে। আমার ছেলেকে ঘরে রাখবো না। অন্য কোথায় পাঠিয়ে

আলমারির কাচ পরীক্ষা করছেন লেখক
খাটে বসে অমিয়শংকর রায়

দেবো। কিন্তু তারপরও যে ভাঙবে না, সে গ্যারান্টি আপনি দিতে পারবেন ?

বললাম, আপনার চ্যালেঞ্জ আমাদের সমিতি গ্রহণ করছে। কিন্তু ঘরে কেউই থাকবে না। ঘর 'সিল্'করে দেবো। ছ'দিন, ছ'সপ্তাহ, ছ'মাস—যতদিন সিল্ থাকবে কিছু ভাঙবে না, উল্টোবে না। আপনি কি এই সর্তে রাজী হবেন ?

না, রাজি উনি হননি।

পরের দিন 'The Telegraph', 'আজকাল', 'বর্তমান', 'বসুমতী' পত্রিকায় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আমাদের সমিতি কর্তৃক কাচ ভাঙা রহস্যভেদের খবর প্রকাশিত হয়।

খবরটা কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। ৫ ডিসেম্বরের গণশক্তিতে আবার একটি খবর প্রকাশিত হয়। তাতে জানান হয় অমিয়শংকর রায় জানিয়েছেন "রবিবার প্রায় জোর করেই প্রবীর ঘোষ নামে এক ব্যক্তি এ সম্পর্কে পরীক্ষা করতে ঘরে ঢোকেন। সঙ্গে কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেরও ডেকে নিয়ে আসেন। পরের দিন সংবাদপত্রে তাঁর ভাষ্য পড়ে বিস্মিত।"

অর্থাৎ আমি কিছু সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রায় জোর করে তাঁর ঘরে ঢুকে দীর্ঘ ছ-সাত ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা চালিয়েছিলাম। এবং সাংবাদিকদের কী বলেছি, তিনি জানতেন না। পরের দিন সংবাদপত্র পাঠে প্রথম জানলেন এবং বিস্মিত হলেন। এত মিথ্যা ভাষণের আগে অমিয়বাবুর খেয়াল করা উচিত ছিল, ওইদিন 'আজকাল' পত্রিকা ভি ডি ও তে যতটা সময় ধরে রেখেছে, তা অমিয়বাবুর মিথ্যাচারিতার মুখোশ খোলার পক্ষে যথেষ্টর চেয়ে বেশি। এটা অবশ্য অমিয়বাবুর বোধহয় জানা ছিল না, তাঁদের সঙ্গে একাধিক দিন আমার যে সব কথাবার্তা হয়েছে, তার অনেকটাই ক্যাসেটবন্দী করে রেখেছি। জানা থাকলে এমন আদ্যন্ত মিথ্যাভাষণ থেকে নিশ্চয়ই সংযত হতেন—মুখোশ খুলে পড়ার ভয়ে।

জানি না, অমিয়বাবুর এই ধরনের মিথ্যাচারিতার সঙ্গে সৌম্য পরিচিত কি না ? দীর্ঘ বছর কাছাকাছি থেকে বাবাকে দেখার দরুন বাবার এই দুর্বলতার কথা সৌম্যের অজানা না থাকতেই পারে। দেখা দিতে পারে বাবার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, ক্ষুব্ধতা ইত্যাদি। পাশাপাশি বাবার এই ধরনের মিথ্যাচারিতা ছেলেকে অন্যভাবেও প্রভাবিত করতে পারে।

**হতাশা, ঈর্ষা, অবদমিত
আবেগ, ক্রোধ, শ্রদ্ধাহীনতা
ইত্যাদি থেকে এই ধরনের হল্লাবাজ ভূত
সৃষ্টির বহু ঘটনা মনোরোগ চিকিৎসকদের
অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে। এমন অবস্থায় মা-বাবার
উচিত ভালবাসা ও সহানুভূতি নিয়ে সন্তানের পাশে
দাঁড়ানো। ঠুন্‌কো সম্মানবোধের দ্বারা**

পরিচালিত হয়ে কেউ সন্তানের ভ্রান্তিকে, অন্যায়কে আড়াল করতে চাইলে সে তৈরি হয়ে উঠতে পারে আর এক 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'।

এটা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ৯ ডিসেম্বর '৯০ 'আজকাল' পত্রিকায় 'রবিবাসর'-এর দুটি রঙিন পৃষ্ঠা ছিল 'মানুষ ভূত' নিয়ে। অমিয়বাবুর মিথ্যাচারিতার মুখোশ খোলার পক্ষে পৃষ্ঠা দুটির ভূমিকা ছিল যথেষ্টর চেয়েও বেশি।

তিন

যে ভুতুড়ে চ্যালেঞ্জের মুখে বিপদে পড়েছিলাম

ভূত আনলেন বিজয়া ঘোষ

এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় আর কোনও দিন পড়িনি। দর্শকদের একাংশ আমাদের সমিতির আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাকেই এমন তীব্র আক্রমণ চালাবে, এটা আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না। আমাদের বারাসত শাখার ছেলেদের যথেষ্ট লড়াকু বলেই জানি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের যথেষ্ট বিভ্রান্ত বলে মনে হলো। বারাসত শাখার সম্পাদক শুভাশিষ ইন্দু কয়েকজন সঙ্গীসহ দ্রুত পায়ে মঞ্চে উঠে এলেন। পরিস্থিতিকে সামাল দিতে মাইকের মাউথপিস নিজের হাতে তুলে নিলেন। মেঘের মতো ভারী গলায় বলে চললেন, "আপনারা এত উত্তেজিত হবেন না। যাঁরা যুক্তিবাদী সমিতির অনুষ্ঠানে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা নি চয়ই ন্যূনতম যুক্তিবাদী মানসিকতা প্রত্যাশা করতে পারি। আপনারা দেখলেন, আপনারা শুনলেন একটু আগে বিজয়া দেবী প্রবীরবাবুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, তিনি প্ল্যানচেট করে আত্মা এনে সবার সামনে প্রমাণ করবেন প্ল্যানচেট, দেহাতীত আত্মা ও ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। বিজয়া দেবীর এই চ্যালেঞ্জের উত্তরে প্রবীরবাবু এখুনি আপনাদের সামনে স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন, তাঁর একটা চ্যালেঞ্জ আছে, পৃথিবীর যে কেউ অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারলে প্রবীরবাবু তাঁকে দেবেন ৫০ হাজার টাকা এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্র সহ প্রতিটি শাখা ভেঙে ফেলা হবে। কিন্তু কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে কয়েকটি পূর্বশর্ত পালন করতে হবে। শর্ত এক : চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে ৫ হাজার টাকা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কাছে অথবা প্রবীর ঘোষের কাছে জামানত হিসেবে দিতে হবে। শর্ত দুই : চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে অবশ্যই জানাতে হবে তিনি ঠিক কী ঘটনা অলৌকিক উপায়ে ঘটাতে চাইছেন। অতএব এখন চ্যালেঞ্জের বিষয়টা পুরোপুরি নির্ভর করছে বিজয়া দেবীর ওপর। তিনি জামানত হিসেবে ৫ হাজার টাকা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বারাসত শাখাতেও জমা দিতে পারেন। টাকা জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে আমরা

এই বিধান সিনেমা হলেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করবো।"

শুভাশিসের কথা অসাধারণ গোলমাল ভেদ করে সাধারণের মধ্যে কতখানি পৌঁছেছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছিল। আর কথাগুলো কানে ঢুকলেও সেগুলো মেনে নিতে যে গোলমালের নায়করা রাজি নন, তা তাদের ঘুসি পাকিয়ে হাত ছোঁড়া, স্টেজের দিকে ধেয়ে আসা এবং আমাকে ও আমার পুর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ গালি-বর্ষণের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ওঁদের দাবি আমাকে এখুনি এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে।

এই ধরনের কোনও চ্যালেঞ্জের তাৎক্ষণিক মোকাবিলা করতে যাওয়া নিঃসন্দেহে ঝুঁকির। অলৌকিক যে সব ঘটনা বিভিন্ন তথাকথিত অবতাররা ঘটিয়ে দেখান, সে গুলোকে দুভাগ ভাগ করা যায় : ১। কৌশলের সাহায্যে ২। শরীর বৃত্তির সাহায্যে।

বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি। একজন অবতার বা ধর্মগুরু যখন নাড়ির গতি স্তব্ধ করেও বেঁচে থাকেন, জীবন্ত সমাধিতে থেকে প্রমাণ করতে চান যোগবলে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে শূন্যে ভেসে থাকেন, মন্ত্র শক্তিতে যজ্ঞের আগুন জ্বালান, শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করেন, মনের কথা পড়ে ফেলেন, তখন সেগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি করেন স্রেফ কৌশলের সাহায্যে। আবার একজন রোগী যখন কোনও ধর্মগুরুর পা ধোয়া জল খেয়ে বা তাবিজ-কবজ নিয়ে অথবা জল-পড়া তেল-পড়া খেয়ে রোগ মুক্ত হল, তখন কিন্তু সেগুলোর মধ্যে থাকে না কৌশলের সামান্যতম ছোঁয়া। এইসব ধর্মগুরু, অবতার বা ওঝারা রোগমুক্তির ক্ষেত্রে কোনও ম্যাজিক কৌশলের সাহায্য নেন না। শুধুমাত্র বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই যে কত রকম রোগ সারান যায় সে বিষয়ে ভালোমতো জানা না থাকলে মনে হতেই পারে অলৌকিক ক্ষমতাই রোগ মুক্তির কারণ। রোগ সৃষ্টি বা নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের বহু রোগের উৎপত্তি ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে। মানসিক কারণে যে সব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, মাথার ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, স্পণ্ডালাইটিস, স্পন্ডালেসিস, অরথ্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, কাশি, ব্রোঙ্কাইটিস, অ্যাজমা, ব্ল্যাডপ্রেসার, অবসাদ, ক্লান্তি ইত্যাদি। যখন এইসব রোগ মানসিক কারণে হয়, তখন রোগীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে মূল্যহীন ঔষধ, ক্যাপসুল ইনজেক্শন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করেই বহুক্ষেত্রে রোগীদের রোগ মুক্ত করা সম্ভব হয়। এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে প্ল্যাসিবো (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। উপরে বর্ণিত রোগে পীড়িত কেউ যদি পরম বিশ্বাসে কোনও ধর্মগুরু বা তান্ত্রিকজাতীয় কারো কাছে আরোগ্যের প্রার্থনা জানিয়ে পরম আশ্বাস লাভ করেন, "যা, তুই ভালো হয়ে যাবি" জাতীয় কথার মাধ্যমে, তবে অনেক সময় দেখা যায় রোগী রোগমুক্তও হয়ে যাচ্ছেন—এই একই কারণে জল-পড়া তেল-পড়া, তাবিজ কবজেও অনেক সময় দেখা যায় রোগ সারছে। এই জাতীয় রোগমুক্তির পিছনে কখনই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা কাজ করে না, কাজ করে ধর্মগুরু, তান্ত্রিক বা ওঝাদের প্রতি রোগীদের অন্ধ বিশ্বাস। প্রথম খণ্ডে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

আবার মস্তিষ্ক কোষের বিশেষ গঠন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বা হিস্টিরিয়া রোগীরা বিভিন্ন ধরনের অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও সংবেদনশীলতার জন্য এমন অনেক কিছু ঘটিয়ে দেন, যেগুলোকে সাধারণ মানুষ শারীরবৃত্তি বিষয়ে অজ্ঞতার দরুন ভূতে ভর বা ঈশ্বরে ভর বলে ধরে নেন, ফলে বহু ক্ষেত্রেই হিস্টিরিয়া রোগীরা পূজিত হয় বা নিন্দিত হয় ঈশ্বরের বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে। সাধারণভাবে অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা প্রগতির আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই এই ধরনের হিস্টিরিয়া রোগীর সংখ্যা বেশি। সাধারণভাবে এই শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করার ক্ষমতা অতি সীমিত। বহুজনের বিশ্বাসকে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা যাদের কম তারা এক নাগাড়ে একই ধরনের কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময় মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। একান্ত ঈশ্বর বিশ্বাস বা ভূতে বিশ্বাসের ফলে রোগী ভাবতে থাকে তার শরীরে ঈশ্বরের বা ভূতের আবির্ভাব হয়েছে, ফলে রোগী ঈশ্বরের বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভুত সব আচরণ করতে থাকে।

এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মস্তিষ্ক কোষের অধিকারীদের কেউ কেউ নিজের অজান্তে স্ব-নির্দেশ (auto-suggestion) পাঠিয়ে অন্যের ব্যথার চিহ্ন নিজের শরীরে গ্রহণ করেন। মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শরীর বৃত্তির এই অস্বাভাবিকতাকেই অনেকে অলৌকিক ঘটনা বলে ধরে নেন। এ বিষয়েও আগে দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

তাই অনেক সময় তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা দেখার সঙ্গে সঙ্গে কৌশল ধরে ফেলা এবং একই ঘটনা ঘটিয়ে দেখান সম্ভব নাও হতে পারে। দু-পাঁচদিন দেরী হতেই পারে। শুধুমাত্র এই কারণে, কেউ কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে চাইলে তাঁকে জানাতে বলি তিনি কী ঘটিয়ে দেখাবেন। তিনি যদি বলেন, জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন বা শূন্যে ভেসে থেকে দেখাবেন, সে ক্ষেত্রে বাস্তবিকই তিনি এ সব অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যেই যদি দেখান তবে আমার পক্ষে তাঁর লৌকিক কৌশল ধরে ফেলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কী ঘটিয়ে দেখাবেন জানা থাকলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার সময়ের ব্যবধানের মধ্যে সম্ভাব্য কৌশলগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ আমি পেতে পারি এবং সেই ভাবনা-চিন্তার ফসল হিসেবেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের পরাজিত করা আমার পক্ষে সম্ভব।

এই মুহূর্তে দর্শকদের একাংশ যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপস্থিত দর্শকদের প্ররোচিত করছেন এবং সভায় একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছেন সেটা আমাদের সমিতির সভ্যদের দিয়ে জোর করে বন্ধ করতে চাইলে একটা অসুবিধে হতেই পারে। দর্শকদের মধ্যে অনেক মহিলা আছেন। গোলমালের সূচনা হলে তাঁদের অবস্থাটা কী হতে পারে সেটাও যেমন ভাবার বিষয়, তেমনই ভাবার বিষয় হলো বন্ধ প্রেক্ষাগৃহে গণ্ডগোল শুরু হলে আমরা দ্রুত গণ্ডগোল বন্ধ করতে না পারলে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে? একটা দুর্ঘটনা আমাদের সমিতির সম্মানকে অনেকটাই নষ্ট করে দিতে পারে। আর বেশি ভাববার মত সময় ছিল না। ঘোষণা করলাম, "আপনাদের দাবীর প্রতি সম্মান জানাতে আমি এই মুহূর্তেই বিজয়া দেবীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি।"

গোটা প্রেক্ষাগৃহ উল্লাসে যেন ফেটে পড়লো। এবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা বিজয়া ঘোষের দিকে ফিরলাম, "আপনি কী ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে চাইছেন ?"

মাউথপিস মুখে বন্দী করে বিজয়া দেবী শুরু করলেন, "এতক্ষণ আপনি আপনার বক্তব্যে বললেন, ধর্মশাস্ত্রগুলোতে আত্মার বিষয়ে বলা হয়েছে, আত্মা মানে চিন্তা, চৈতন্য বা মন। বিজ্ঞান বলছে মন বা চিন্তা হলো মস্তিষ্ক কোষেরই অ্যাকশন, মস্তিষ্ক কোষের অ্যাকশন্ ততো দিনই থাকবে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক কোষেরও অ্যাকশন শেষ হয়, অর্থাৎ আত্মাও মারা যায়। আপনি এতক্ষণ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন আত্মা মরণশীল। আমি উপস্থিত দর্শকদের সামনে আপনাকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবো আত্মা অমর। প্রমাণ করে দেবো

বিজয়া ঘোষ

বিজ্ঞানের যেখানে শেষ সেখান থেকেই আধ্যাত্মবাদের শুরু।"

বিজয়াদেবীর কথা শুনতে শুনতে আমি তাঁকেও লক্ষ্য করছিলাম। উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো। ওজন সম্ভবত পঁচাত্তর কেজির কম নয়। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, রঙ্ ফর্সা। গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। কথাবার্তায় আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ স্পষ্ট। সম্ভবত বারাসতের কাছাকাছিই থাকেন, তাই প্রেক্ষাগৃহে প্রচুর জঙ্গী ভক্ত সমাবেশ ঘটাতে পেরেছেন। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। বারাসত শাখার বিলি করা প্রচারপত্রের ও পোস্টারের দৌলতে জানতেন আমার কাছে পরাজিত অবতার ও জ্যোতিষীদের নাম। আজ ২৬ মার্চ '৮৯। গত মাসখানেক ধরে অবতার গৌতম ভারতীর সঙ্গে আমার গোলমালের খবরটা পেশাদার অলৌকিক মাতাজী বিজয়া দেবীর অজানা থাকার কথা নয়, বিশেষত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যখন এই নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চৈ চলছে। এত কিছু জানার পরেও তিনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর এই এগিয়ে আসার মধ্যে যথেষ্ট পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে। তিনি ভাল মতই জানেন, ভাববার মত যথেষ্ট সময় সুযোগ না দিলে পৃথিবীর সেরা জাদুকরকেও পরাজিত করা যায় জাদু-কৌশল দিয়েই। এটা জানেন বলেই তাঁর লোকজন দিয়ে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যাতে বাধ্য হই এই মুহূর্তে তাঁর মুখোমুখি হতে। স্বাভাবিক কারণেই আমি নিশ্চয়ই এমন একটা অসম্ভব ঝুঁকি নিতে রাজি হবো না, এটাও বিজয়া দেবীর জানা। রাজি না হলে গণ্ডগোল পাকিয়ে আমাদের আলোচনাচক্র ও অলৌকিক বিরোধী বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবিরের কাজ ভণ্ডুল করে দিতে পারলে এটাই বিশাল করে প্রচার করা যাবে—বিজয়া ঘোষের চ্যালেঞ্জের মুখে প্রবীর ঘোষের পলায়ন, ফলে ক্ষুব্ধ দর্শকদের হামলায় যুক্তিবাদী সভা পণ্ড।

বিজয়া দেবীর কথা শেষ হতেই প্রচুর হাততালি পড়লো। প্রশ্ন করলাম, "আপনি কোথায় থাকেন ?"

"বারাসতের বালুরিয়ায়।"

"আপনি এর আগে কখনও আত্মা এনেছেন ?" প্রশ্ন করলাম।

বিজয়া দেবী তাঁর ডান হাতের মাউথপিসটা মুখের কাছে এনে শ্রোতা ও দর্শকদের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমি প্ল্যানচেট করে আত্মা আনি। অনেকেই আমার কাছে আসেন তাঁদের প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছেয়। মৃত্যুর আগে যে কথা জেনে নেওয়া হয়নি তেমন অনেক কথাই জেনে নিতে চান অনেকে। অনেকে জানতে চান, তাঁদের প্রিয়জনের আত্মা এখন কেমন আছে। অনেকে শুধুমাত্র প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগটুকু পেতেই আকুল হয়ে ছুটে আসেন।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এর জন্য আপনি কি কোন পারিশ্রমিক নেন ?"

"না, না, আমি কিছুই দাবী করি না। ভালবেসে যে যা দেন, তাই নিই।" বিজয়া দেবী জানালেন।

সম্প্রতি আনন্দবাজারে প্রকাশিত আচার্য গৌতম ভারতীর সাক্ষাৎকারটির কথা মনে পড়লো। গৌতম ভারতীও বিজয়া দেবীর মতোই বলেছিলেন ভক্তরা ভালোবেসে যে যা দেন, তাই গ্রহণ করেন। কেউ দু'হাজার টাকা দিলেও নেন, কেউ পঁচিশ হাজার দিলেও।

বললাম, "আপনি কি বাস্তবিকই এই হল ভর্তি দর্শকদের সামনেই আত্মা এনে দেখাবেন ?

"নিশ্চয়ই ।"

"শুনেছি ভূতেরা ভীড়-টিড় পছন্দ করে না । যাঁরা প্ল্যানচেটে আত্মা আনেন বলে দাবী করেন, তাঁরাই আমাকে এ ধরনের কথা বলেছেন । যাই হোক, প্ল্যানচেটে আত্মা না হয় আনলেন, কিন্তু আত্মা যে বাস্তবিকই এসেছে, তা আমরা বুঝবো কী করে ?"

"আপনার যে কোনও প্রশ্নের উত্তর আত্মা দেবে । আত্মা সূক্ষ্মদেহী, সর্বত্রগামী, তাই যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ।"

"এই মঞ্চেই তো দেখাবেন, কী কী ব্যবস্থা করতে হবে বলুন, আমাদের সমিতির ছেলেরা...."

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বিজয়া দেবী বললেন, "যা যা প্রয়োজন সবই নিয়ে এসেছি ।"

একটুক্ষণের মধ্যে মঞ্চে একটা ছোট এবং চওড়া বেঞ্চ উঠে এলো । বেঞ্চটাকে সামনে রেখে চেয়ারে বসলেন বিজয়া দেবী । বেঞ্চের উপর পাতলেন বিশাল একটা সাদা কাগজ ও তার উপর তিন-কোনা প্ল্যানচেট টেবিল । ত্রিভুজ আকৃতির প্ল্যানচেট টেবিলের তিনটি দিকের দৈর্ঘ্যই আনুমানিক ৬ ইঞ্চি করে । তলায় পায়ার বদলে তিনটি লোহার বল লাগানো । প্ল্যানচেট টেবিলের এক কোণে একটা ফুটো । ফুটোয় একটা ডট পেন গুঁজে দিলেন বিজয়া দেবী । পেনের মুখ রইল কাগজ ছুঁয়ে ।

মাথাটাকে বার কয়েক জোরে জোরে নেড়ে বিজয়া দেবী প্ল্যানচেট টেবিল দু'হাতে ছুঁয়ে স্থির হয়ে রইলেন । মিনিট তিন চার । প্ল্যানচেট টেবিল থরথর করে বার কয়েক কেঁপে উঠেই গতি পেল, কাগজের উপর দ্রুত ওঠানামা করলো ।

কাগজটা তাঁরই এক ভক্তের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "আত্মার লেখাটা সমস্ত দর্শকদের দেখান ।"

ভক্ত দু'হাতে কাগজটা মেলে ধরলেন দর্শকদের দিকে । বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, অরবিন্দ বিশ্বাস । চিৎকার ও হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ ভরে গেল । এক উৎসাহী দর্শক মঞ্চে উঠে এলেন । বিজয়া দেবীকে প্রশ্ন করলেন, "বলুন তো আমার পেশা কী ?"

বিজয়া দেবী তৎপর হলেন । নতুন একটা কাগজে অরবিন্দের আত্মা লিখলো "সাংবাদিক" । বিজয়া দেবী এবার প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন করলেন, "উত্তর ঠিক হয়েছে ?"

প্রশ্নকর্তা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ ।"

আর এক প্রস্থ প্রচণ্ড হাততালিসহ চিৎকার ।

এবার আরও কয়েকজন মঞ্চে উঠে এলেন । উদ্দেশ্য প্রশ্ন করা । আমার সমিতির সদস্যদের দু-একজনও বিজয়া দেবীর দিকে এগিয়ে এসেছে । তাঁদেরও উদ্দেশ্য সম্ভবত বিজয়া দেবীকে কঠিন কিছু প্রশ্ন করে আমাকে সাহায্য করা । অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আমার মুঠোবন্দী মাউথপিসকে কাজে লাগালাম, "আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, আপনারা কেউ মঞ্চে ওঠার চেষ্টা করবেন না, বা বিজয়া দেবীকে কোনও প্রশ্ন করার চেষ্টা করবেন না । আপনাদের কারও প্রশ্নের সঠিক উত্তর

দিলেই প্রমাণিত হবে না যে, আমি পরাজিত হয়েছি। আমাদের দুজনের মোকাবিলা আমাদেরই করতে দিন। সেই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার পর লিখে আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দেব। লিখে সঠিক উত্তর দিলেই প্রমাণ হয় না যে আত্মা আছে বা অলৌকিক ক্ষমতা আছে। স্রেফ কৌশলের সাহায্যেই এমন উত্তর দেওয়া সম্ভব। অতএব প্রত্যেকের কাছে আবারও অনুরোধ করছি, আপনারা আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন। আমি একটি প্রশ্ন করব, সঠিক উত্তর দিতে পারলে, আমার হাত ঘড়িটা অবশ্যই দিয়ে যাব, এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেব।"

মঞ্চে উঠে আসা উৎসাহীরা বিদায় নিতে বিজয়া দেবীকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার আনা আত্মাটি তো সূক্ষ্মদেহী। একটা নোটের (টাকার) নম্বর জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই বলতে পারবে ?"

"অবশ্যই পারবে।" প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো বললেন বিজয়া দেবী।

পকেটের মানিব্যাগ থেকে একটা দু'টাকার নোট বের করে ডান হাতের মুঠোয় রেখে বললাম, "আমার ডান হাতে রয়েছে দু'টাকার এই নোটটা। প্ল্যানচেটের সাহায্যে নোটের নম্বরটা বলে দিলেই পরাজয় স্বীকার করে নেব।"

এখন গোটা প্রেক্ষাগৃহে গ্রামের শ্মশানের স্তব্ধতা। বিজয়া দেবী প্ল্যানচেট টেবিলে মগ্ন। ইতিমধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দুজন দর্শক এগিয়ে এলেন আমার মুঠোয় সত্যিই টাকা আছে কি না দেখতে। মুঠো খুলে তাঁদের সন্দেহ মুক্ত করলাম।

একসময় বিজয়া দেবীর মাউথপিসের শব্দ প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়লো, "কী বলছেন ? কী বলছেন ? আপনি উত্তর দেবেন না বলছেন ?"

বিজয়া দেবী এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, "আত্মা উত্তর দেবে না বলছে ?"

বললাম, "অন্য কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে কি আপনার আত্মা রাজি আছে ?"

বিজয়া ঘোষ আবার মাথা ঝাঁকিয়ে মনোসংযোগ করে : প্ল্যানচেট টেবিলে দুহাতের আঙুল ছুঁইয়ে বসলেন। তারপর একসময় বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "আপনি আর কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে রাজি নন ? আপনি চলে যাচ্ছেন ?"

প্ল্যানচেট টেবিল থেকে হাত তুলে বিজয়া দেবী ঘোষণা করলেন, "আত্মা বিদায় নিয়েছে। সুতরাং এখন আর কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।"

চিৎকার, হাততালি, চেয়ার বাজিয়ে প্রায় গোটা হল বিজয়া দেবীকে ধিক্কার ও আমাদের সমিতির জয়কে অভিনন্দিত করলো।

আমি ওই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের উত্তরে সমিতির তরফ থেকে শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ঘোষণা করলাম, "এই বিশ্বাসটুকু আপনারা নিশ্চিন্তে রাখতে পারেন যে, কোনও অবতার বা জ্যোতিষী আমাদের চ্যালেঞ্জ করার বা আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ধৃষ্টতা জানালে তাঁর মাথা এই পায়ে তথা যুক্তিবাদী আন্দোলনের কাছে নত করতে হবেই।"

পরাজিত বিজয়া দেবী শেষ পর্যন্ত লিখিত ভাবেই পরাজয় স্বীকার করে শকুন্তলা দেবী, ঈপ্সিতা, সাঁইবাবা, পারমিতা, গোবিন্দদের দলেই নাম লেখালেন।

পরাজিত বিজয়া দেবী শেষ পর্যন্ত জনতার দাবীতে লিখেছিলেন—

বিজয়া ঘোষ, স্বামী সমীর ঘোষ, উত্তর বালুরিয়া, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা।
আমি আজ ২৬।৩।৮৯ বেলা বারোটা কুড়ি, বিধান হল, বারাসত, মৈত্রী সংঘ বনমালীপুর আয়োজিত 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষকে আত্মা এনে সব প্রশ্নের উত্তর দেব বলে যে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম তাতে হেরে গেছি।

স্বাক্ষর—বিজয়া ঘোষ
উত্তর বালুরিয়া

সাক্ষী :—

১। সঞ্জয় ব্রহ্ম
দৈনিক বসুমতী পত্রিকা

২। অনিলকুমার দাশ
সংস্কার মুক্তি,
কলকাতা-২৮

৩। প্রেমেন্দ্র মজুমদার
সদস্য, সম্পাদকমণ্ডলী
'প্রতিবেদন', বারাসত

৪। অসীম গণ
সদস্য,বারাসত বিজ্ঞান সংঘ
বারাসত

৫। স্বপন স্বর্ণকার
ইভনিং ব্রিফ
কলকাতা-১৩

**ভূত বাসা বাঁধে আমাদের
মনের অন্ধকারে। সেখানে জ্ঞানের আলো
আনলেই ভূতেরা পালায়, ভূতেরা মারা যায়। অজ্ঞানতা
আনে ভয়, দেয় ভূতেদের জন্ম। জ্ঞান আনে সাহস,
ঘটায় ভূতেদের মৃত্যু। ভূত কোনদিনই
ছিল না, নেই, থাকবেও না।**

চার

ভুতুড়ে চিকিৎসা

ফিলিপিনো ফেইথ হিলার ও ভুতুড়ে অস্ত্রোপচার

৩১ আগস্ট, ৮৬, রবিবারের সকাল। আর পাঁচটা রবিবারের সকালের মতই বৈঠকখানায় তখন গাদা-গাদা চায়ের কাপ আর রাশি রাশি সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে আড্ডা জমে উঠেছে। এমন সময় আমার ভায়রা সুশোভন রায়চৌধুরী এসে কোনও ভণিতা না করেই একটা দারুণ উত্তেজক খবর দিল—অতি সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে একজন অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তার এসেছেন কলকাতায় ; রোগীকে অজ্ঞান না করে, স্রেফ খালি হাতে, ব্যথাহীন অস্ত্রোপচার করে রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন। ওর পরিচিত একজন অস্ত্রোপ্রচার করিয়ে ভাল হয়ে গেছেন। অস্ত্রোপচারের দাগটি পর্যন্ত নেই। খরচ পড়েছে পাঁচ হাজার টাকা। সুশোভনের আমাকে খবরটা দেওয়ার কারণ, যদি এই অলৌকিক রহস্য উন্মোচন করতে পারি।

আমার কাছে কলকাতায় ম্যানিলার অলৌকিক চিকিৎসকের উপস্থিতির খবরটা অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয়। সুশোভন যাঁকে অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তার বলে অবহিত করল তিনি এবং তাঁর মত ক্ষমতাবান চিকিৎসকরা নিজেদের পরিচয় দেন 'ফেইথ হিলার' বলে। যে ফেইথ হিলারদের নিয়ে পৃথিবী জুড়ে হৈ-চৈ, তাঁদেরই একজন এই মুহূর্তে কলকাতার বুকে প্রতিদিন বহু রোগীর ওপর অলৌকিক (?) অস্ত্রোপচার করে চলেছেন—কথাগুলো আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। গোটা ব্যাপারটাই ব্যান্ডেজ ভূতের মতোই গুজব নয়তো ? খবরটা আমার কাছে অভাবনীয় এই জন্যে, মাত্র সপ্তাহতিনেক আগে আমার কিছু বন্ধুর কাছে বলেছিলাম, "ফেইথ হিলারদের হিলিং ব্যাপারটা এখনও কিছুটা রহস্যময় রয়ে গেছে। তাঁদের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে কৌশলটা ঠিক কী ধরনের এটা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার নয়। যদিও James Randi তাঁর 'Flim-Flam' বইতে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন, তবু তাঁর লেখাতে দুটি দুর্বল দিক রয়েছে। এক : তিনি নিজে ফেইথ হিলারদের মুখোমুখি হননি, দুই : তাঁর বর্ণিত কৌশলের সাহায্যে একজন ফেইথ হিলারের পক্ষে একটা অপারেশন টেবিলে দাঁড়িয়ে অন্যের চোখের সামনে পরপর একাধিক অপারেশন অসম্ভব।

অথচ আমি ম্যানিলা থেকে অলৌকিক অস্ত্রোপচার করিয়ে আসা তিনজনের সঙ্গে কথা বলে যা জেনেছি, তাতে ফেইথ হিলাররা স্থান ত্যাগ না করে অপারেশন টেবিলে এক নাগাড়ে দশ থেকে কুড়ি জনের ওপর অস্ত্রোপচার করেন। যদি কিছু টাকা যোগাড় করতে পরতাম, ফেইথ হিলিং রহস্যভেদের একটা চেষ্টা করতাম, ম্যানিলায় গিয়ে নিজের ওপর ফেইথ হিলিং করিয়ে।"

সেখানে উপস্থিত এক বন্ধু তখনই জানায়, সে আমার ম্যানিলায় যাতায়াতের খরচ বহন করতে রাজি আছে। বাকি ছিল কয়েক দিন হোটেলে থাকা ও ফেইথ হিলিং-এর খরচ বহন করার ব্যাপার। গত তিন সপ্তাহ ধরে টাকা যোগাড় করা এবং ফিলিপিন-এ যাওয়ার প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছিল। ঠিক এই সময় কলকাতায় ফেইথ হিলারের উপস্থিতি—এ যেন 'মেঘ না চাইতেই জল'। খবরটা আমার কাছে অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত এবং উল্লসিত হবার মত।

সুশোভনকে অনুরোধ করলাম ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারে ভাল হওয়া ওর পরিচিত লোকটির কাছ থেকে অলৌকিক ডাক্তারের ঠিকানাটা অবশ্যই এক দিনের মধ্যে যোগাড় করে দিতে।

সুশোভন অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঠিকানা দেয়নি, তবে আমারই এক বন্ধু দেবু দাস-এর কাছে ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার খবর পেলাম, ওর পরিচিত এক তরুণ তমনাশ দাস ফেইথ হিলারের রিসেপশনিস্ট-এর কাজ করছে।

দেবুর কাছ থেকে ঠিকানা ও একটা পরিচয়পত্র নিয়ে সেই রাতেই তমনাশের বাড়ি গিয়ে দেখা করলাম। স্মার্ট, ফর্সা, সুদর্শন তরুণ। হোটেল ম্যানেজমেন্টের পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে।

আমি দেবু'র বন্ধু, লেখালেখি করি এবং অলৌকিক বিষয়ে খুবই আগ্রহী জেনে আমার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন তমনাশ। জানালাম, "গলব্লাডার, হার্ট আর ফ্যারেনজাইটিস নিয়ে জেরবার হয়ে আছি। ফেইথ হিলারের সাহায্য চাই। সেই সঙ্গে এই অলৌকিক চিকিৎসা বিষয়ে পত্রিকায় কিছু লিখতে চাই।"

তমনাশ জানালেন, "কয়েকজন সাংবাদিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তরফ থেকে ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই হাত জোড় করে জানিয়েছি ক্ষমা করবেন। আমরা প্রচার চাই না। প্রচার ছাড়াই যে বিপুল সংখ্যক রোগী আসছেন, তার ভিড় সামাল দিতেই হিমসিম খাচ্ছি, অতএব মাপ করবেন। তবে আপনার চিকিৎসার বিষয়ে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। এ জন্য আপনাকে দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ।"

"যাঁরা চিকিৎসা করাতে আসছেন তাঁরা কেমন ফল পাচ্ছেন?"—জিজ্ঞেস করলাম।

"মিরাকল রেজাল্ট।" কয়েকজন রোগীর নাম ও তাদের আরোগ্যলাভের গল্প বলতে বলতে আমার মত একজন উৎসাহী শ্রোতাকে দেখাবার জন্য ঘরের ভিতরে গিয়ে নিয়ে এলেন কয়েকটা রঙিন ফটোগ্রাফ। তমনাশের উপর ফেইথ হিলিং চলাকালীন তোলা ছবি।

বললাম, "আপনার ছবি দিয়ে আপনার ফেইথ হিলিং-এর অভিজ্ঞতার কথাই

পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাই।”

আমার কথায় চিঁড়ে ভিজল মনে হল। খাতা কলম বের করে তমনাশের অভিজ্ঞতার কথা জেনে টুকে নিতে শুরু করলাম।

ফিলিপিন থেকে আসা এই ফেইথ হিলারের নাম Mr. Romeo P. Gallardo। সহকারী হিসেবে সঙ্গে এসেছেন Mr. Rosita J. Gallardo। উঠেছেন কলকাতার লিটন হোটেলে। এঁদের ভারতে নিয়ে আসার আর্থিক দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন গৌহাটির কোটিপতি ব্যবসায়ী রামচন্দ্র আগরওয়াল। কলকাতার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন রামচন্দ্র আগরওয়ালের শ্যালক অলোক খৈতান। শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও বেশি রকম সুস্থ ও চনমনে হতে গ্যালার্ডোর ফেইথ হিলিং-এর সাহায্য নিয়েছিলেন তমনাশ। দারুণ কাজ হয়েছে। তমনাশকে এ জন্য কোনও টাকা দিতে হয়নি। মিস্টার গ্যালার্ডোর সঙ্গে তমনাশের খুব ভাল ভাব হয়ে গেছে। ভিড় ভালই হচ্ছে। দিনে রোগী আসছেন একশো থেকে দেড়শো।

তমনাশের ছবিগুলো থেকে দুটো ছবি নিয়ে বললাম, “এই ছবি দুটো সহ লেখাটা ছাপতে চাই। লেখাটা আরও ভাল হত যদি গ্যালার্ডোর একটা সাক্ষাৎকার সঙ্গে ছাপতে পারতাম।”

তমনাশ বললেন, “কাল রাতে একবার আসুন। আমি গ্যালার্ডোর সঙ্গে কথা বলে দেখি কিছু করা যায় কি না।”

তিন তারিখ রাতে খবর পেলাম, মিস্টার গ্যালার্ডো জানিয়েছেন মিস্টার আগরওয়ালের অনুমতি ছাড়া তাঁর পক্ষে কোনও সাক্ষাৎকার দেওয়া সম্ভব নয়। তমনাশ মিস্টার আগরওয়ালের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। আগরওয়াল আমার বিষয়ে অনেক কিছুই জানতে চেয়েছিলেন। কাজ উদ্ধার করতে সত্যি-মিথ্যে কল্পনা সব মিশিয়ে যা হোক উত্তর খাড়া করে দিয়েছেন তমনাশ। মিস্টার আগরওয়াল কাল তাঁর মতামত জানাবেন বলেছেন।

চার তারিখ রাতে আবার গেলাম। খবর পেলাম, গ্যালার্ডোর সাক্ষাৎকার পাওয়ার অনুমতি মিলেছে। ছয় সেপ্টেম্বর শনিবার ২-৩০ মিনিটে লিটল হোটেলের ৪৬ নম্বর রুমে দেখা করতে বললেন তমনাশ। ওই রুমেই আপাততঃ আগরওয়াল, খৈতান ও তমনাশের আস্তানা। সেদিনই সাক্ষাৎকারের পরে আমার চিকিৎসাও করা হবে।

’৮৫-র এপ্রিলে ইংলন্ডের গ্রানেডা টেলিভিশন প্রোডাকশনের একটা তথ্যচিত্রের ভিডিও দেখি। নাম ছিল “World in Action”। ছবিটি ফিলিপিনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান চিকিৎসক ফেইথ হিলারদের নিয়ে তোলা। ফেইথ হিলাররা যে কোনও রোগেরই চিকিৎসা করেন তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার দ্বারা। চিকিৎসা পদ্ধতিও বিচিত্র। রোগীকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হয়। ফেইথ হিলার বিড়বিড় করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। তারপর শরীরের যে অংশে অস্ত্রোপচার করবেন, সেখানে দু-হাতে সামান্য জল ও এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ ছিটিয়ে সামান্য মালিশ করেন। এবার শুরু হয় অস্ত্রহীন অস্ত্রোপচার। ফেইথ হিলার নিজের হাতের আঙুলগুলো রোগীর শরীরের যে অংশে অস্ত্রোপচার করা হবে সেই অংশে ঢুকিয়ে

দিতে থাকেন। বেরিয়ে আসতে থাকে তাজা লাল রক্ত। ফিলিপিনো ফেইথ হিলারদের ভাষায় এগুলো "Devil Blood" বা 'শয়তানের রক্ত'।

হার্ট, লাংস, কিড্‌নি, অ্যাপেনডিকস্‌, টিউমার, গলব্লাডার প্রভৃতি বড়বড় অপারেশনও ফেইথ হিলাররা করে থাকেন। এইসব অপারেশনও করা হয় একইভাবে, রোগীকে অজ্ঞান না করে কোনও অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া এবং অবশ্যই ব্যথাহীন ভাবে। পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, তবে কি ওঁরা হাতের নখের সাহায্য নেন ? না, তাও নয়, নখ নিখুঁত ছাঁটা। স্রেফ দু-হাতের বা এক হাতের আঙুলের সাহায্যেই ওঁরা রোগীর শরীর কাটা ছেঁড়ার কাজ করেন। হাত তুললেই শুধু রক্ত। ফেইথ হিলারের সহকারী তুলো দিয়ে রক্ত মুছে নিতেই দেখা যায় অস্ত্রোপচারের কোনও চিহ্ন নেই, আপনা থেকেই কাটা জায়গা জোড়া লেগে গেছে। যত বড়ই অস্ত্রোপচার হোক না কেন, রোগীকে একটুও ব্যথায় কাতর হতে দেখা যায় না। ফেইথ হিলিং চিকিৎসার সাহায্য নেওয়ার পর অনেকেরই বক্তব্য—তাঁরা ভাল আছেন।

'ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন' ছবিতে গ্রানাডা টিভি প্রোডাকশনের ভাষ্যকার বা narrator ছিলেন মাইক স্কট। টিভির সামনে একজন ফেইথ হিলার একটি বালিকার গলা থেকে একটা 'গ্রোথ' (growth) অস্ত্রোপচার করলেন স্রেফ খালি হাতে। এক্ষেত্রেও অজ্ঞান না করে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচার। অস্ত্রোপচার শেষ হতেই মাইক স্কটের সহকর্মীরা ওই গ্রোথটি এবং রক্তাক্ত তুলো সংগ্রহ করেছিলেন।

ফেইথ হিলার ও মাইক স্কট

জোস মার্কাডো

ফেইথ হিলার Jose Mercado এবার যাঁর উপর অস্ত্রোপচার করলেন তিনি বেশ মোটাসোটা মানুষ। পেটে নাকি টিউমার। কিছুটা তেল আর জল পেটে ছড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে মালিশ ও প্রার্থনা চলল। একসময় "রোগীর পেটের উপর মার্কাডো নিজের হাত দুটো পাশাপাশি রাখলেন। তারপর মুহূর্তে বাঁ হাত দিয়ে পেটে চাপ দিয়ে ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন রোগীর পেটে। বেরিয়ে এল রক্ত। সহকারী তুলো দিয়ে রক্তগুলো মুছতে লাগলেন। মার্কাডো পেট থেকে হাত বের করলেন। হাতে ধরা রয়েছে টিউমার। সহকারী রক্তধারা মুছিয়ে দিতেই কোন্ জাদুবলে অস্ত্রোপচারের চিহ্ন অদৃশ্য হল। পেট দেখলে বোঝার উপায় নেই কখনও এখানে অস্ত্রোপচার হয়েছিল।"

দূরদর্শনের ভাষ্যকার স্কট অতি তৎপরতার সঙ্গে টিউমারটি মার্কাডোর হাত থেকে তুলে নিলেন, সেই সঙ্গে কিছুটা রক্তাক্ত তুলো।

মেয়েটির গ্রোথ এবং রক্তাক্ত তুলো পরীক্ষার জন্য পাঠান হয় Guy's Hospital London-এর ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেনসিক মেডিসিনে। মেয়েটির গলার গ্রোথ বায়পসি করে জানা যায় দেহাংশটি একটি পূর্ণবয়স্ক যুবতীর স্তনের অংশ এবং রক্তের নমুনা মানুষের নয়।

পুরুষ মানুষটির টিউমার ও রক্তাক্ত তুলো পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছিল লন্ডন হসপিটাল মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার P. J. Lincoln-এর কাছে। পরীক্ষার পর লিংকন মত দেন তথাকথিত টিউমারটি আসলে মুরগীর দেহাংশ এবং রক্তের নমুনা গরুর।

দেহাংশ ও রক্ত নমুনার পরীক্ষার ফল স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয় এগুলো রোগিণী ও

রোগীর দেহাংশ বা রক্ত আদৌ নয়। অর্থাৎ রোগীর দেহে কোনও অস্ত্রোপচারই করা হয়নি এবং অস্ত্রোপচার করে বার করে আনা হয়নি কোনও দেহাংশ। তবে এতগুলো অনুসন্ধিৎসু চোখ ও টি ভি ক্যামেরা যা দেখল সেটা কী ? রোগীরা যা অনুভব করলেন তার কী কোনই গুরুত্ব নেই ?

এ ক্ষেত্রে অবশ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না—ফেইথ হিলার প্রতারক। কারণ, পরীক্ষা গ্রহণকারীদের পক্ষে দেহাংশ ও রক্তের নমুনা পাল্টে দেবার সুযোগ ছিল। যেহেতু সরকারীভাবে কোনও ফরেনসিক বিভাগ অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ ও রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে তা সিল করে পরীক্ষার দায়িত্বগ্রহণ করেননি, তাই সুনিশ্চিতভাবে কোনও কিছুই প্রমাণিত হয় না।

ফেইথ হিলারদের কাছে যে সব রোগী চিকিৎসা করিয়েছেন তাঁদের কিছু ঠিকানা যোগাড় করেন গ্রানেডা টিভি প্রোডাকশন। ফেইথ হিলিং-এর পর বর্তমানে তাঁরা কেমন আছেন, এই তথ্য সংগ্রহই ছিল গ্রানেডার উদ্দেশ্য। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। যাঁদের মতামত সংগ্রহ করা গিয়েছিল তাঁদের বেশির ভাগই জানান ফেইথ হিলিং-এর পর অনেকটা সুস্থ অনুভব করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে আবার উপসর্গগুলো ফিরে এসেছে। বাকি রোগীরা জানান—এখন সামান্য ভাল অনুভব করছেন ("felt a little better")।

দুই ফেইথ হিলার David Elizalde এবং. Helen Elizalde-এর অলৌকিক অস্ত্রোপচারের উপর B. B. C. একটা অনুষ্ঠান প্রচার করে। অনুষ্ঠানটির পরিচালক ডেভিড ও হেলেনকে জালিয়াত, ধোঁকাবাজ এবং প্রতারক বলে বর্ণনা করেন। কারণ, মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার করে তাঁরা যা বের করেছিলেন, পরীক্ষার ফলে তা শুয়োরের দেহাংশ বলে B. B. C. জানান। এই ক্ষেত্রেও রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়—মানুষের রক্ত নয়। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি সংগৃহীত নমুনাই পরীক্ষিত হয়েছিল। কারণ এটাও আগের মতই সরকারি পরীক্ষা ছিল না। ছিল সম্পূর্ণ বে-সরকারী উদ্যোগে পরীক্ষা।

ফেইথ হিলিং ব্যাপারটার মধ্যে একটা ধোঁকাবাজি আছে এ কথা একাধিকবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও ওঁরা কী কৌশলে নিজেদের হাতের আঙুলগুলো রোগীর শরীরে ঢুকিয়ে দেন এবং কী কৌশলেই বা তৎক্ষণাৎ রক্তের আমদানী করেন, কেমন করেই বা আসে অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্ন করা দেহাংশ, এসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কেউই যুক্তিপূর্ণভাবে হাজির করতে পারেননি।

ফেইথ হিলারদের ফেইথ হিলিং-এর কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করে যিনি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছেন তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তিবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব James Randi। তিনি তাঁর 'FLIM FLAM' বইতে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ফেইথ হিলররা অস্ত্রোপচারের আগে নিজের বুড়ো আঙুলে একটা নকল বুড়ো আঙুলের খাপ পরে নেয়। নকল আঙুলের খাপে লুকোনো থাকে রক্ত এবং ফেইথ হিলারের সহকারীর তুলোয় জড়ানো থাকে মাংস।

র‍্যান্ডির লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল ফেইথ হিলিং-এর গোপন কৌশল বলে তিনি যা বর্ণনা করেছেন তাতে কিছু ফাঁক-ফোকর রয়েছে। এক : এভাবে দর্শকদের

সামনে পরপর একাধিক রোগীর ওপর অস্ত্রোপচার করা অসম্ভব। কারণ বুড়ো আঙুলের খাপে লুকিয়ে রাখা রক্তের পরিমাণ অতি সীমিত হতে বাধ্য। দুই : টিভি ক্যামেরার ক্লোজ-আপ এবং হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পরীক্ষক বা দর্শকদের নকল আঙুলের সাহায্যে ঠকান খুব একটা সহজসাধ্য বলে মনে হয় না।

জেমস র‍্যান্ডির অবশ্য এই বিষয়ে কিছু ভ্রান্তি হতেই পারে, কারণ তিনি নিজে ফেইথ হিলারদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাননি। র‍্যান্ডি ফিলিপাইনে গিয়ে ফেইথ হিলারদের উপর অনুসন্ধান চালাতে চেয়ে ফিলিপাইন সরকারের কাছে ভিসা প্রার্থনা করেন। ফেইথ হিলারদের উপর অনুসন্ধানের নামে তাঁদের কোনও রকমে অসম্মান জানালে ফিলপিনবাসীদের কাছে তা ধর্মীয় আঘাত বলে বিবেচিত হতে পারে, এই অজুহাতে ফিলিপাইন সরকার জেমস র‍্যান্ডিকে ভিসা দেননি বলে র‍্যান্ডি স্বয়ং অভিযোগ তুলেছেন।

ফেইথ হিলারদের অলৌকিক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সব বই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বিশ্বের জনপ্রিয়তম বইটি সম্ভবত "Arigo : Surgeon of the Rusty Knife"। লেখক John Fuller। Arigo ছদ্মনামের আড়ালে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান. ফেইথ হিলারটির নাম Jose Pedro de Feitas।

অ্যারিগো আর দশজন ফেইথ হিলারের মতই সাদা পোশাক পরে গ্ল্যাভস ছাড়াই রোগীদের উপর খালি হাতে দ্রুত অস্ত্রোপচার করেন, তবে অস্ত্রোপচারের আগে একটা ছুরির বাঁট দিয়ে রোগীর চামড়াটাকে একটু ঘষে নেন। অস্ত্রোপচার শেষে সেলাই না করেই একটু হাত ঘষে কাটাটা আবার জুড়ে দেন। তারপর অতি-জড়ান হাতের লেখায় যে প্রেসক্রিপশন লেখেন, সেটি নাকি তিনি তাঁর নিজের বিবেচনামাফিক লেখেন না। এক মৃত জার্মান ডাক্তার Dr. Fritz-এর আত্মা নাকি অ্যারিগোর বাঁ কানে ফিসফিস করে যে ওষুধের কথা বলেন অ্যারিগো তাই লেখেন।

অ্যারিগোর প্রেসক্রিপশনের লেখা এতই জড়ানো যে শহরের একটি মাত্র ফার্মেসিই সেই লেখা পাঠোদ্ধার করতে পারে। ফার্মেসির মালিক অ্যারিগোর ভাই।

জন ফাউলার তাঁর বইটির তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ধনকুবের বিজ্ঞানী ও অলৌকিকবাদের ধারক-বাহক ডঃ আন্ড্রুজা পুহারিক প্রযোজিত অ্যারিগোর ওপর তোলা একটি ফিল্ম দেখে।

অ্যারিগোর ফেইথ হিলিং ছাড়া আর যে "impossibilities" দেখে ডঃ পুহারিক বিহ্বল হয়েছিলেন তা হলো অ্যারিগোর একটি মুদ্রাদোষ। অ্যারিগো কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই নিজের চোখে ছুরি ঢুকিয়ে দেন, যেটা ডঃ পুহারিকের মতে কোনও মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ এক অলৌকিক ক্ষমতারই প্রকাশ।

ডঃ পুহারিকের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইতালির Piero Angela এক পদ্ধতিতে বারবার চোখে ছুরি ঢুকিয়ে প্রমাণ করেছেন, এই ধরনের কোনও কিছু ঘটালে সেটা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে না। এটা একটা কষ্টসাধ্য অনুশীলনের ফল মাত্র।

আর যাই হোক, এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে 'ফেইথ হিলার' নামক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান (?) কিছু চিকিৎসক তাঁদের অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশে প্রচণ্ড রকমের হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী

অ্যারিগো

পত্রিকায় এঁদের নিয়ে লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন ও ইতালীর মানুষ তাঁদের দেশের টিভিতে ফেইথ হিলারদের অলৌকিক কার্যকলাপ দেখে শিহরিত হয়েছেন, এই তথ্যটা আমার জানা। জানি না আরও কতগুলো দেশ ফেইথ হিলারকে টিভি ক্যামেরায় বন্দী করেছেন।

সম্পূর্ণ কষ্টহীন ও ঝুঁকিহীন ভাবে আরোগ্যলাভের আশায় প্রতি বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান এবং ইউরোপ ও আরবের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নানা রকমের দুরারোগ্য রোগ সারাতে ম্যানিলায় যান। এইসব দেশের মত এত বিশাল সংখ্যায় না হলেও ভারতবর্ষ থেকে, এমনকি আমাদের কলকাতা শহর থেকেই প্রতি বছর কিছু লোক চিকিৎসিত হতে ম্যানিলায় যান। এই লক্ষ লক্ষ আরোগ্যকামী বিদেশীদের কল্যাণে ম্যানিলায় গড়ে উঠেছে জমজমাট হোটেল ব্যবসা। আমদানী হচ্ছে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা।

চিকিৎসার জন্য কোনও অর্থ গ্রহণ করেন না ফেইথ হিলাররা। শুধু নাম তালিকাভুক্ত করার সময় '৮৬-তে ভারতীয় টাকায় আড়াইশো টাকার মত জমা দিতে হতো। সাধারণভাবে চিকিৎসা চলে রোগের গুরুত্ব অনুসারে তিন থেকে সাত দিন। প্রতিদিনই রোগীর দূষিত রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বের করে দেন ফেইথ হিলার। চিকিৎসা শেষে রোগীর কাছে দেশের গরীবদের সাহায্যার্থে সাধারণত ৫০০ ডলার সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ফিলিপিনস্ ফেইথ হিলারদের লীলাক্ষেত্র হলেও, এরা মাঝে-মধ্যে অন্য কোনও দেশের ধনকুবেরের সঙ্গে আর্থিক চুক্তি করে সেই দেশে দু-এক মাসের জন্য পাড়ি দেন অলৌকিক চিকিৎসার পসরা নিয়ে।

তেমন রমরমা প্রতিষ্ঠা না পেলেও, ব্রাজিল এবং পেরুর কয়েকজন আধ্যাত্মিক নেতা অলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে ফেইথ হিলিং শুরু করেছেন।

পাঁচ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই 'ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি'র (বর্তমান নাম—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি) কয়েকজন সদস্য পালা করে হোটেল লিটনের উপর নজর রাখতে লাগলেন। সন্ধের মধ্যে খবর পেলাম ওই ৪৬ নম্বর ঘরে অসম, অ·গ·প·-র জনৈক নেতাও নাকি প্রায় পুরো সময়ই ছিলেন। মিস্টার ও মিসেস গ্যালার্ডো আছেন ৪৪ নম্বর ঘরে। এছাড়া আর এমন কিছু খবর পেলাম যার ফলে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না যে আমাকে অস্ত্রোপচার করার পর সেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার চেষ্টা করাটা অত্যধিক ঝুঁকির ব্যাপারে হবে। কথাটা বোধহয় ভুল বললাম। বরং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে হোটেল লিটনের বাইরে আমাদের জীবিত দেহ আর কোন দিনই বের হবে না।

ছয় তারিখ বারোটা থেকে আমি লিটন থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত আর কয়েকজন অতিরিক্ত যুক্তিবাদী সদস্যকে লিটনে নজর রাখার জন্য নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এঁরা কেউই বিপদে খুব একটা ঘাবড়ে যাওয়ার মত নন।

সেদিন দুপুর সাড়ে এগারোটায় ফোন করলাম কলকাতা পুলিশের তৎকালীন যুগ্ম-কমিশনার সুবিমল দাশগুপ্তকে। ফেইথ হিলারদের রহস্যময় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে জানালাম, বর্তমানে আমাদের এই শহরের লিটন হোটেলে বিশ্বখ্যাত এক ফেইথ হিলার অবস্থান করছেন। আজ আড়াইটের সময় আমি তাঁর একটা সাক্ষাৎকার নেব, তারপর আমার উপর অপারেশন করাব। ইনিই সম্ভবত প্রথম ফিলিপিনো ফেইথ হিলার যিনি ভারতে এলেন।

সুবিমলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই বিষয়ে তোমার মত কী? সত্যিই কি ওঁরা খালি হাতে অপারেশন করেন?"

বললাম, "আমার ধারণা পুরোটাই একটা বিশাল ধাপ্পা। আমি আশা রাখি ওদের কৌশলটা ধরতে পারব। এই বিষয়ে আপনার একটু সাহায্য চাই বলেই ফোন করা। আমাকে অপারেশন করার পর আমার শরীর থেকে যে রক্ত বের হবে তার নমুনা আপনি ফরেনসিক টেস্টের জন্য সংগ্রহ করলে বাধিত হবো। কারণ এই রিপোর্টই পারে ঐ দীর্ঘদিনের এক সন্দেহের ও বিতর্কের অবসান ঘটাতে।"

ও প্রান্ত থেকে উত্তর এল, "মোস্ট ইন্টারেস্টিং। নিশ্চয়ই যাব। ক'টায় তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট?"

"দুটো তিরিশে, হোটেল লিটনে। একটি অনুরোধ, প্লেন ড্রেসে যাবেন।"

"তুমি ঠিক দুটোয় লালবাজারে চলে এসো।"

আড়াইটের আগেই হোটেল লিটনে পৌঁছলাম। সুবিমলবাবুর সরকারী অ্যামবাসেডার আর দেহরক্ষীদের আমরা ত্যাগ করলাম। গ্লোব সিনেমা হলের কাছে। হোটেলে ঢুকলাম আমরা পাঁচজন। আমি, সুবিমল দাশগুপ্ত, ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির দুই সভ্য প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জ্ঞান মল্লিক, চিত্র-সাংবাদিক সৌগত রায় বর্মন এবং দর্শক হিসেবে আমার অফিসের এক সহকর্মী।

প্রথমে হানা দিলাম ৪৪ নম্বর ঘরে। নক্ করতেই দরজা খুললেন মিস্টার গ্যালার্ডো। পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চাইলাম। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে মিস্টার গ্যালার্ডো জানালেন,

"আপনার কথা মিস্টার তমনাশের কাছে শুনেছি। আপনি আসায় খুশি হয়েছি, দয়া করে ৪৬ নম্বর রুমে মিস্টার আগরওয়ালের সঙ্গে আগে দেখা করুন। একটু পরেই আমি আসছি। মিস্টার আগরওয়ালের সামনে ছাড়া আমি কোনও ইন্টারভিউ দিতে অক্ষম।"

৪৬ নম্বর রুমে অনেককেই পেলাম। রামচন্দ্র আগরওয়াল, অলোক খৈতান, তমনাশ দাস এবং অসম অ·গ·প· নেতা বলে পরিচয় দেওয়া জনৈক বসন্ত শর্মাকে। তমনাশই ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমার চার সঙ্গীর সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। শুধু সুবিমল দাশগুপ্তের বেলায় মিথ্যে বললাম, "মিস্টার দাশগুপ্ত, আমার কাজিন ব্রাদার।"

আমরা সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে খুব দ্রুত খোলামেলা আলোচনায় মেতে উঠলাম। আগরওয়াল এবং অলোক খৈতান দুজনেই ভালই বাংলা বলেন।

একসময় আমার প্রশ্নের উত্তরে মিস্টার আগরওয়াল জানালেন, "আমার এক আত্মীয়ের একটা চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ম্যানিলায় গিয়ে ফেইথ হিলিং করিয়ে সে আবার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। তখনই আমার মাথায় একটা চিন্তা ঢোকে। বড়লোকেরা

শ্রী ও শ্রীমতী গ্যালার্ডোর দু'পাশে শ্রীআগরওয়ালা ও লেখক

না হয় রোগ সারাতে ম্যানিলায় যেতে পারে, কিন্তু গরীবদের কঠিন অসুখ হলে তারা কী করবে ? ভাবলাম দেশের সাধারণ মানুষদের জন্য না হয় কিছু খরচা করলামই। আমার আত্মীয়ের কাছ থেকে ডাক্তারের ঠিকানা নিয়ে 'ফেইথ হিলিং করতে যাচ্ছি' জানিয়ে ভিসা করে ম্যানিলায় চলে গেলাম। ওখানে মিস্টার গ্যালার্ডোর সঙ্গে দেখা করে আমার পরিকল্পনা জানাই। উনি খুবই ভাল লোক, আধ্যাত্মিক জগতের লোক তো। আমার কথায় ভারতে আসতে রাজি হলেন।

"৭ আগস্ট মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্যালার্ডো কলকাতায় আসেন। এই হোটেলেই ওঠেন। আমাদের চেনা-শুনা ও পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই ফেইথ হিলিং-এর সুযোগ নিতে শুরু করেন। এখানে বরো দিন থাকার পর ২০ আগস্ট আমি আর অশোক ওঁদের নিয়ে গৌহাটি যাই। ওখানে ওঁরা পাঁচ দিন ছিলেন। এত ভিড় হচ্ছিল যে, নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না। একদিন তো ২০০ রোগী নাম লিখিয়ে ছিলেন। টাকা রোজগারের ধান্দা থাকলে নিশ্চয়ই খুশি হতাম। তা যখন নয় তখন নিজেদের জান বাঁচাতে পালিয়ে এলাম। ২৭ তারিখ থেকে আবার কলকাতায়। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখানে থাকার পরিকল্পনা রয়েছে। তারপর হয় তো ওঁদের নিয়ে দিল্লি যেতে পারি।"

আগরওয়াল এই কথার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চাইলেন মিস্টার গ্যালার্ডোকে এদেশে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য টাকা রোজগার নয়, নেহাৎই সেবা। তাই আসামের বিশাল টাকার হাতছানিও তিনি অক্লেশে ছেড়ে আসতে পেরেছেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্যালার্ডোকে ১৮।৮।৮৬-তে ইস্যু করা পারমিটের একটি প্রতিলিপি আমার হাতে এসেছে যাতে দেখেছি তাঁদের ২০ আগস্ট '৮৬ থেকে ২৭ আগস্ট '৮৬ পর্যন্ত আসামে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব রোজগারের ধান্দা থাকলেও ২৭ আগস্টের পর মিস্টার ও মিসেস গ্যালার্ডোর আসামে থাকা সম্ভব ছিল না।

আগরওয়ালকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি একটু আগে বলছিলেন দেশের গরীব মানুষদের সেবার জন্য মিস্টার গ্যালার্ডোকে নিয়ে এসেছেন। তবে রোগীদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নিচ্ছেন কেন ?"

আমার প্রশ্ন শুনে প্রথমটায় আগরওয়াল সামান্য গুটিয়ে গিয়ে পরে সামলে নিয়ে বললেন, "যে বিশাল খরচ করে এঁদের এনেছি তাতে খরচের কিছুটা অংশ না তুলতে পারলে তো মরে যাব দাদা। হোটেল খরচই মেটাচ্ছি রোজ আট-হাজার টাকা। তার উপর এই হোটেলের মালিকের পাঠান দুজন করে রোগী প্রতিদিন বিনে পয়সায় দেখে দিচ্ছি।"

হাসলাম, বললাম, "আপনি তো প্রত্যেক রোগীকে দিয়েই একটা ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম ফিল-আপ করাচ্ছেন। আমাকে ফর্মের ফাইলটা একটু দেবেন। কিছু রোগীর ঠিকানা নেব। একটা সার্ভে করে দেখতে চাই তাঁরা ফেইথ হিলিং করিয়ে কেমন ফল পেয়েছেন।"

অলোক দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালেন, "ফাইলটা কালই হারিয়ে গেছে।"

কথায় কথায় মিনিট কুড়ি বোধহয় পার হয়েছে, একজন তরুণ ভেজান দরজা ঠেলে

ঘরে ঢুকে তমনাশকে ইশারায় ডেকে বেরিয়ে গেলেন। তমনাশও বেরোলেন। মিনিট দুয়েক পরেই তমনাশ ডাকলেন আগরওয়ালকে। তার মিনিট দুয়েক পরেই আগরওয়াল আমাকে বাইরে ডাকলেন। বাইরে এসে দেখি করিডোরে তমনাশ, আগরওয়াল ও যে ছেলেটি দরজা নক্ করেছিল সে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেই যেন কিছুটা অস্বস্তি ও চিন্তার মধ্যে রয়েছেন।

আগরওয়াল আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সঙ্গে কি সাদা পোশাকে পুলিশ কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনার রয়েছেন?"

"কেন বলুন তো?"

"না, খবর পেলাম কি, গ্লোব্ হলের কাছে ওই জাতীয় পদের কারো একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইউনিফর্ম পরা বডিগার্ড গাড়িতেই রয়েছে। কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনার যিনিই এসে থাকুন তিনি যখন বডিগার্ড সঙ্গে নেননি তখন প্লেন ড্রেসেই কাছাকাছি কোথাও আছেন। আমাদের মনে হচ্ছে তিনি আপনার সঙ্গে আছেন।"

"হ্যাঁ, মিস্টার দাশগুপ্তের সঙ্গে যে আলাপ করিয়ে দিলাম, তিনিই জয়েন্ট কমিশনার। তবে আপনার কোনও চিন্তার কারণ নেই। উনিও আমার মতই ফেইথ হিলারদের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে জানতে ও দেখতে উৎসাহী। আমি আজ ইন্টারভিউ নেব এবং অপারেশন করাব শুনে সঙ্গী হয়েছেন।"

ইনফরমার ছেলেটি বিদায় নিল। আমি, আগরওয়াল ও তমনাশ ঘরে ঢুকলাম। যে ঘটনাটা একটু আগে ঘটল সেটা সবার সামনে বলে পরিবেশটাকে হালকা করতে চাইলাম।

সুবিমলবাবুও হাসতে হাসতে আগরওয়ালকে বললেন, "আমি কিন্তু এখানে এসেছি পৃথিবী বিখ্যাত ফেইথ হিলিং নিজের চোখে দেখব বলে। পুলিশের তকমা এঁটে কারো মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করতে চাই না বলেই এই পোশাকে আসা। সুযোগ পেলে আমার কপালের একটা ব্যথা আপনাদের হিলিং-এ সারে কিনা একটু পরীক্ষা করে দেখতে পারি।"

এরপর আমাদের আগের মত খোলামেলা কথাবার্তা আর জমল না। মিনিটদশেক পরে দরজা খুলে মিস্টার ও মিসেস গ্যালার্ডো আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, "আসুন।"

আমরা হোটেলের কনফারেন্স রুমে এলাম। রুমের একপাশে একটা লম্বা টেবিলে প্লাস্টিকের নীল চাদর বিছানো। টেব্রিলের কাছে দাঁড়ালেন মিস্টার গ্যালার্ডো, পাশে মিসেস। করমর্দন করে দু'জনকে শুভেচ্ছা জানালাম। দেখলাম মিস্টার গ্যালার্ডোর প্রতিটি আঙুলের নখই নিখুঁত কাটা।

আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল, "ফেইথ হিলিং-এর সাহায্যে যে কোনও রোগীকে কি রোগমুক্ত করা সম্ভব?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই," গ্যালার্ডো উত্তর দিলেন।

"প্রতিটি ফেইথ হিলিং-এর ক্ষেত্রেই কী অপারেশন করার প্রয়োজন হয়?"

"না, না। শরীরের ভিতর থেকে কোনও দেহাংশ বিচ্ছিন্ন করে বের করতে হলেই শুধু 'ওপন' করার প্রয়োজন হয়। অবশ্য হিলিং করার সময় যে কোনও রোগের ক্ষেত্রেই রোগীর শরীর থেকে 'ডেভিল ব্লাড' বের করে দিই। সেটাকেও যদি

অপারেশন বলতে চান, তো বলতে পারেন।"

"একজন রোগীকে হিলিং করতে কত সময় লাগে ?"

"দেড় থেকে তিন মিনিট।"

"আপনি এই ফেইথ হিলিং কোথা থেকে শিখলেন ?"

আমার প্রশ্ন শুনে হাসলেন মিস্টার গ্যালার্ডো। বললেন, "এ তো শেখা যায় না। আর আমিও তো চিকিৎসা করি না। 'গড'ই রোগীদের চিকিৎসা করেন। আমি গডের হাতের যন্ত্র মাত্র। ঈশ্বর যাঁদের মাধ্যমে রোগীদের নিরাময় করান তাঁদের নির্বাচন করেন তিনি নিজেই।"

"যাঁরা আপনার কাছে আরোগ্যের আশায় আসেন, তাঁরা সকলেই কি রোগ মুক্ত হন ?"

"সারবেই, এমন গ্যারান্টি আমি কাউকেই দিচ্ছি না। আরোগ্য নির্ভর করে রোগীদের ওপর। রোগীর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, যদি ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস থাকে এবং এক মনে ঈশ্বরের কাছে নিজের আরোগ্য কামনা করে তবে নিশ্চয়ই সারবে। তবে এটা কয়েকদিনে সারবে, কি কয়েক সপ্তাহে অথবা কয়েক মাসে, তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে রোগীর বিশ্বাস ও প্রার্থনার ওপর।"

মিসেস গ্যালার্ডোকে এবার প্রশ্ন করলাম, "আপনিও ফেইথ হিলার ?"

মিসেস গ্যালার্ডো দু'পাশে মাথা ঝাঁকালেন, "না, না, আমি ঈশ্বরের সেই কৃপা পাইনি। স্বামীকে সাহায্য করি মাত্র।"

মিস্টার গ্যালার্ডোকে এবার প্রশ্ন করলাম, "আপনি নিশ্চয়ই পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"বিদেশে কোথাও কি কোনও বিজ্ঞান-সংস্থা, বিজ্ঞানী বা চিকিৎসক আপনার চিকিৎসা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চেয়েছেন ? অথবা ফেইথ হিলিংকে বুজরুকী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ?"

"Psychic (অতীন্দ্রিয়) কোনও কিছুরই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ফেইথ হিলিং-এর বিষয়ে আমাকে কয়েক জায়গায় এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। যাঁরাই এই ধরনের প্রশ্ন করেছেন বলেছি, দুঃখিত, ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। তাঁদের অনুরোধ করেছি ব্যাখ্যা চেয়ে আমার মেডিটেশন ও কনসেনট্রেশনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না।

"আরও একটা কথা কী জানেন মিস্টার ঘোষ, বিজ্ঞান এগিয়েছে বলে ঈশ্বর মিথ্যে হয়ে যায়নি। পৃথিবীর বহু দেশের টেলিভিশন কোম্পানী ফেইথ হিলিং-এর উপর ছবি তুলেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক উল্টোপাল্টা অভিযোগও তুলেছে। ওদের অভিযোগ, অস্ত্রোপচারের সময় যে রক্ত ও দেহাংশ ওরা সংগ্রহ করেছিল সেগুলো পরীক্ষা করিয়ে নাকি দেখছে ওসব মানুষের দেহাংশ বা রক্ত নয়। কিন্তু পৃথিবীর কোনও যুক্তিবাদী মানুষের কাছেই অভিযোগগুলো গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেনি। কারণ পরীক্ষার আগে সংগৃহীত নমুনা পাল্টে দেওয়ার সব রকম সুযোগই পরীক্ষকদের ছিল। এই সুযোগ যে তাঁরা গ্রহণ করেননি, তার গ্যারান্টি কে দেবে ?

"একটু সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করছি। আপনার ওপর অস্ত্রোপচার করলাম। আপনি সেই অস্ত্রোপচারের ছবি তুলে রাখলেন। আমাকে দিয়ে আজই যে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন, তার স্বপক্ষে আরও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখলেন। ধরুন, আপনি ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস করেন না। যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন না, তাই আপনি চান অন্যেরাও যাতে আমার হিলিংকে অবিশ্বাস করে, আমাকে প্রতারক ভাবে। আমাকে প্রতারক প্রমাণ করতে আপনি এক টুকরো তুলোয় মাছের রক্ত মাখিয়ে কোনও হাসপাতাল বা ল্যাব-এ পরীক্ষা করতে দিলেন। তাঁরা পরীক্ষা করে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন তুলোয় সংগৃহীত রক্ত মাছের। আপনি এর পর যদি কোনও নামী-দামী পত্রিকায় ঢাউস প্রবন্ধ লিখে আমাকে প্রতারক আখ্যা দেন এবং প্রমাণ হিসেবে আপনার শরীরে আমি অস্ত্রোপচার করছি এমন ছবি ছাপেন, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট ছাপেন, তাতে কিছু যুক্তিহীন মানুষ হয় তো বিভ্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু কোনও যুক্তিবাদী মানুষই আপনার কথাকে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে মেনে নেবেন না। কারণ এ ক্ষেত্রে নমুনা পাল্টাবার সুযোগ আপনার ছিল, এবং আপনার সততার বিষয়টি একেবারেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে।

"প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষ আপনার প্রমাণকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেন, আপনার কথায় আস্থা রাখতেন, যদি রক্তের নমুনা পুলিশ দপ্তর থেকে সংগৃহীত ও সরকারি ফরেনসিক দপ্তর থেকে পরীক্ষিত হতো। যে সব টিভি কোম্পানী বা ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, আসলে তাঁরাই মিথ্যাচারী, সস্তায় বাজিমাৎ করতে চেয়েছেন। তাই সংগৃহীত নমুনা পাল্টে দেওয়ার সুযোগও নিজেদের হাতে রেখেছিলেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তিবাদী বলে বিজ্ঞাপিত জাদুকর জেমস র‍্যান্ডি তাঁর লেখা একটা বইতে এক উদ্ভট তথ্য সরবরাহ করেছেন। বলেছেন—ফেইথ হিলাররা নাকি নিজেদের বুড়ো আঙুলে একটা নকল বুড়ো আঙুলের খাপ পরে থাকে। ওই খাপের মধ্যে লুকোনো থাকে রক্ত। তারপর তিনি আমাদের ঠগ, জালিয়াত ইত্যাদি বলে চেঁচিয়েছেন। আপনি আমার দু'হাত দেখুন। কোথাও বুড়ো আঙুলের খাপ দেখতে পাচ্ছেন ?" হাত দুটো এগিয়ে দিলেন মিস্টার গ্যালার্ডো।

"এই মুহূর্তে আপনি শুয়ে পড়ুন, আপনার শরীর থেকে এখনই ডেভিল ব্লাড বার করে দিচ্ছি, দেখতে পাবেন কোনও কৌশল নেই।" বললেন মিস্টার গ্যালোর্ডো।

আমি আশ্বস্ত করলাম, "আপনাকে অবিশ্বাস করার মত কোনও কিছুই ঘটেনি। কিন্তু একটা প্রশ্ন, আপনারা সাংবাদিকদের এড়াতে চাইছেন কেন ? এতে ফেইথ হিলিং-এর সত্যতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলোর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি ?"

"এই বিষয়ে বলতে পারবেন মিস্টার আগরওয়াল।"

আগরওয়ালকে প্রশ্নটা করতে বললেন, "যাঁরা সন্দেহ করতে চান করুন, তাঁদের মিথ্যে সন্দেহে আমাদের কিছুই আসে যায় না।"

"আমাকে কেন তবে সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনুমতি দিলেন ?"

"আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনার ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস আছে, নিজেরও চিকিৎসা করাবেন, তমনাশের রেফারেন্সের লোক, তাই আপনার অনুরোধ ঠেলতে

পারিনি। সত্যি বলতে কি, আপনি যদি খবরের কাগজে আমাদের সম্বন্ধে এক লাইনও না লেখেন তো খুবই উপকার হয়। খবর পড়ে যখন ভিড় বাড়বে তখন ভিড় সামলাবে কে? সবারই উপকার করতে ইচ্ছে তো হয়, কিন্তু আমাদের খাটার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে।" বললেন মিস্টার আগরওয়াল।

"পেশেন্টদের মধ্যে বাঙালী কেমন আসছেন?"

আগরওয়াল বললেন, "খুব কম। দিনে দু-একজন। কিছু মনে করবেন না, পাঁচ হাজার টাকা খরচ করার মত বাঙালী খুব কমই আছেন।"

মিস্টার গ্যালার্ডোকে এবার জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার বয়েস কত?"

"আমি তেতাল্লিশ, মিসেস উনচল্লিশ।"

"ফিলিপিনস্-এ কতজন ফেইথ হিলার আছেন?"

"প্রথম শ্রেণীর ফেইথ হিলারের সংখ্যা আমাকে নিয়ে দশ জন। এছাড়াও দ্বিতীয় শ্রেণীর জনা চল্লিশ ফেইথ হিলার আছেন।"

বললাম, "শুনেছি প্রথম শ্রেণীর ফেইথ হিলারদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অত্যধিক?"

"সব দেশের স্পিরিচুয়ালিস্টরাই এই ক্ষমতা পেয়ে থাকেন। আপনাদের দেশও

লেখকের গলায় অস্ত্রোপচার করে গ্যালার্ডো বের করলেন কালচেলাল থক্থকে কিছু

তার বাইরে নয়।" বললেন, মিস্টার গ্যালার্ডো।

আমাদের কথাবার্তার মাঝে ছবি তুলে যাচ্ছিল জ্ঞান ও সৌগত। মিস্টার গ্যালার্ডো বললেন, "লেখাটা প্রকাশিত হওয়ার পর একটা কপি মিস্টার আগরওয়ালকে দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলেই আমি পেয়ে যাব।"

"নিশ্চয়ই দেব।"

"এবার আপনার শারীরিক সমস্যাটা বলুন।"

বললাম, "সমস্যা তিনটি। গলায় ফ্যারেনজাইটিস, হার্টেও কিছু অসুবিধে রয়েছে, একটা স্ট্রোক হয়েছিল, গলব্লাডারের আশেপাশে মাঝে-মধ্যে খুব ব্যথা হয়।"

গ্যালার্ডোর আহ্বানে অপারেশন টেবিলে খালি গায়ে শুয়ে পড়লাম। এখন আমার টেবিলের এক পাশে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে মিস্টার গ্যালার্ডো। মাথার দিকে এক গাদা তুলো হাতে মিসেস গ্যালার্ডো। মিস্টার গ্যালার্ডোর বাঁ পাশে একটা টুলের উপর

বামজাতীয় স্বচ্ছ তরল ওষুধ

রয়েছে এক বালতি জল আর একটা বড় সাদা তোয়ালে। ডানপাশে আর একটা খালি বালতি। আমার সামনে ছোট-খাট একটা ভিড়। এঁদের অনেকেই রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন। আমাদের সমিতির এক নজরদার সভ্যকেও দেখতে পেলাম।

মিস্টার গ্যালার্ডো আমার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটো কিছুটা মেলে দিয়ে চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তারপর কিছুটা জল ও একটা বামজাতীয় স্বচ্ছ তরল ওষুধ নিয়ে আমার পেটে, বুকে ও গলায় আধ-মিনিটের মত মালিশ করলেন। হাত দুটো এবার জলের বালতিতে ডুবিয়ে আমার গলার বাঁ পাশে গ্যালার্ডো তাঁর দু-হাতের আঙুল চেপে ধরে হঠাৎ আঙুলগুলো কচ্‌লাতে লাগলেন। চট্‌চট্‌ করে একরকম আওয়াজ হচ্ছিল। অনুভব করলাম আমার গলা বেয়ে তরল কিছু নেমে যাচ্ছে। বুঝলাম রক্ত। মিস্টার গ্যালার্ডো তাঁর ডান হাতটা আমার চোখের সামনে ধরলেন। কালচে লাল থকথকে কিছু। হাতের থকথকে ময়লা ডান পাশের বালতিতে ফেলে হাতটা জলের বালতিতে ডুবিয়ে ধুয়ে নিলেন। পাশের তোয়ালেতে হাতটা মুছে নিলেন। ইতিমধ্যে গড়িয়ে পড়া রক্তধারার কিছুটা মিসেস গ্যালার্ডো পরম মমতায় তাঁর হাতের তুলো দিয়ে মুছে দিলেন।

পেটে অস্ত্রোপচারের মুহূর্তে

এরপর একে একে খালি হাতে আমার গলব্লাডার ও হার্টে অস্ত্রোপচার করলেন গ্যালার্ডো। অস্ত্রোপচার শেষে একটা ঘটনা ঘটল। মিসেস গ্যালার্ডো তুলো হাতে এগিয়ে এলেন রক্ত মুছিয়ে দিতে। এটাই সঠিক মুহূর্ত। শোয়া অবস্থাতেই আমি ওঁর হাতের তুলো থেকে কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে পেট থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত নিলাম। দ্রুত এগিয়ে এলেন সুবিমল দাশগুপ্ত। আমার হাত থেকে তুলোটা নিয়ে একটা টেস্ট টিউবে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে টেস্ট টিউবটা পকেটে পুরলেন। সকলের দৃষ্টি যখন পুরোপুরি এই ঘটনার দিকে তখন সাধ্যমত তৎপরতার সঙ্গে প্যান্টের ডান পকেট থেকে রুমালটা বের করে পেট থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তের কিছুটা মুছে নিয়ে রুমালটা আবার পকেটেই চালান করে দিলাম।

কিছুটা থতমত গ্যালার্ডো আমার গলায়, বুকে ও পেটের সামান্য উপরে জল ও বাম-জাতীয় স্বচ্ছ তেল আধ মিনিটের মত মালিশ করে ছেড়ে দিলেন।

উঠে বসে শার্ট গায়ে গলাতেই মিস্টার গ্যালার্ডো বললেন, "এখন কেমন লাগছে ?"

"ভাল, অনেকটা ভাল। এখন আমার শরীর ঘিরে বাম ঘষার মত একটা ঝাঁজালো ঝিরঝিরে ভাব।"

বুকে অস্ত্রোপচারের পর

"কাল আর পরশু আর দুদিন আসুন। বার-তিনেক হিলিং করালে আশা করি অনেক তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।" বললেন, মিস্টার গ্যালার্ডো।

আমি ঘড়ি দেখলাম। আমার উপর মোট তিনটে অস্ত্রোপচারে সময় লেগেছে পাঁচ মিনিট।

আমি ওঠার পর সুবিমলবাবু শুলেন। ওঁর কপালে ব্যথা। আরও দ্রুততর গতিতে হাত চালাতে লাগলেন বিশ্বখ্যাত ফিলিপিনো ফেইথ হিলার রোমেও পি· গ্যালার্ডো। এরপর আমরা আরও চারজন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার দেখলাম ও ছবি তুললাম। কয়েকজন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম অলোক খৈতান সত্যিই এমন রহস্যময় চিকিৎসার যোগ্য ব্যবস্থাপক। প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে নিখুঁৎ টিমওয়ার্ক মারফৎ মুখ খুলতে বারণ করে দিয়েছেন। একজন মাত্র মহিলার কাছ থেকে বহু কষ্টে তাঁর ঠিকানা যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই ঠিকানাও সেদিন যোগাড় করেছিলাম লিটন হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দূরে, হোটেলের চার দেওয়ালের ভিতর তিনিও কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাদের যথেষ্ট ভীতির চোখে দেখছিলেন। মহিলাটি তাঁর নাম বলেছিলেন অঞ্জলি সেন। রোগী তাঁরই ছেলে। দেখে মনে হল খুবই রুগ্ন এবং কিছুটা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন।

আমরা বিদায় নেওয়ার আগে অলোক আমাকে বললেন, "কাজটা ঠিক করলেন না। মিস্টার গ্যালার্ডো আপনাদের বলতে বলেছিলেন, শয়তানের রক্ত পকেটে নিয়ে ঘোরা ঠিক নয়, এতে অপঘাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ডেভিল ব্লাড মিস্টার গ্যালার্ডোর হাতে তুলে দিলেই বোধহয় ভাল করবেন।"

বুঝলাম প্রচ্ছন্ন হুমকী। হেসে 'গুডবাই' জানিয়ে বিদায় নিলাম আমরা।

পরের দিন ৭ তারিখ রবিবার বিকেল চারটের সময় আবার হোটেল লিটনে গেলাম। এই সময় সুবিমলবাবুরও থাকার কথা। গিয়ে তাঁর দেখাও পেলাম। হোটেলের উপর নজর রাখা সমিতির কিছু সভ্যদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েকটা খবরের ভিত্তিতে বুঝেছিলাম জল অনেক দূর গড়িয়েছে। যে খবরগুলো জানান প্রয়োজনীয় মনে হলো সুবিমলবাবুকে সেগুলি দিলাম। গ্যালার্ডো আমার ও সুবিমলবাবুর উপর হিলিং করলেন। আজ গ্যালার্ডো, অলোক এবং আগরওয়াল আমাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই প্রশ্ন করলেন, "ফেইথ হিলিং সম্পর্কে আপনার মতামত কী?"

বললাম, "সত্যিই বিস্ময়কর।"

তৃতীয় দিন, সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর, সকাল থেকে পরপর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল।

সকাল ৭টা ৫০। এক তরুণ আমার ফ্ল্যাটে এলেন বিশাল এক মোটর-বাইকে আরোহী হয়ে। এঁকে আমি হোটেল লিটনের কনফারেন্স রুমে দেখেছি। বসতে বলে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোথা থেকে আসছেন ভাই?"

নিজের কোনও পরিচয় বা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তরুণটি সরাসরি আমাকেই প্রশ্ন করলেন, "ব্লাড টেস্টে কী পেলেন খুবই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"এই কথা জিজ্ঞেস করতে আমার কাছে এসেছেন? আপনার তৎপরতার প্রশংসা

না করে পারছি না। এত তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে আপনাদের আশা করিনি। ব্লাড স্যাম্পেল যাঁর কাছে, প্রশ্নটা সেই সুবিমল দাশগুপ্তকেই করা উচিত ছিল আপনার।"

অফিসে যেতেই আমার ঘরে দেখা করতে এলো জ্ঞান। জানাল, আজ অফিস আসতে গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামতেই একটা মোটর পিছন থেকে এসে ওকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ ধরনের ভাবার কারণ, মোটরটাকে দেখেই জ্ঞানের মনে পড়েছে সকাল থেকে বার কয়েক বাড়ির ঝুল

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

PERMIT

No.15012/564/86-F.IV.
(Under paragraphs 3 and 4 of the Foreigners (Restricted areas) Order,1963).

Mr. Romeo P.Gallardo and his wife Mrs.Rosita J. Gallardo, Filipino nationals, holder of Passport Nos.C-954726 and B-328808 respectively are hereby permitted to enter the restricted areas via the shortest route and to reside in the said areas for purpose of meeting friends at Gauhati, Tinsukia and Dibrugarh in Assam from 20th August,1986 to 27th August,1986.

2. They shall, while residing in the said areas, comply with the conditions specified below.

3. Mr. Romeo P.Gallardo and Mrs.Rosita J.Gallardo shall not remain in the said areas after the 27th August,1986.

(T.O. KHAIJIA)
Under Secretary to the Govt. of Indi

T. O. KHAIJIA
Under Secretary
Ministry of Home Affairs

Place: New Delhi.
Dated: 18-8-1986.

গৌহাটি ও তিনসুকিয়ায় থাকার পারমিটের প্রতিলিপি

বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখার সময় এই গাড়িটাকে উল্টো ফুট্পাথ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল এবং গাড়িটা রং সাইডে ড্রাইভ করে জ্ঞানের ঠিক পিছনে নিয়ে আসা হয়। গাড়ি কোনও হর্ন দেয়নি। গাড়ির শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়েই ফুটপাতে লাফিয়ে পড়ে জ্ঞান। গাড়িটাও দ্রুত পালিয়ে যায়। নম্বর দেখার কোনও সুযোগ পায়নি।

সকালে আমার বাড়ির ঘটনা এবং জ্ঞান মল্লিকের ঘটনা ফোনে লালবাজারে সুবিমল দাশগুপ্তকে জানাই। সুবিমলবাবু আমাকে বললেন আজ যেন কোনও রকমভাবেই ফেইথ হিলিং না করাই। দুপুরের মধ্যে হোটেলে নজর রাখার দায়িত্বে থাকা সমিতির দুই সভ্য খবর দিলেন, আজ একটা বড় রকমের অঘটন ঘটতে পারে, আমি যেন সাবধান হই।

বিকেল ঠিক পাঁচটার সময় হোটেলের বাইরে জ্ঞান আর সৌগত রায় বর্মনকে পেলাম। দুজন আমাকে দেখে স্বস্তি পেল। ওদের কাছে খবর পেলাম দুজনকেই নাকি আজ বিভিন্ন জায়গায় অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা তিনজনে হোটেলের কনফারেন্স রুমে ঢুকলাম। ভিতরে যথেষ্ট ভিড়। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন মিস্টার অলোক খৈতান। বললেন, "আজ একটু দেরি হচ্ছে। আপনি আজও হিলিং করাবেন তো ?"

বললাম, "সেই জন্যেই তো আসা।"

অলোক বললেন, "একটু অপেক্ষা করতে হবে। মিস্টার গ্যালার্ডোর আজ মেডিটেশন ঠিক মত হচ্ছে না বলেই এই দেরি।"

ভিড়ের মধ্যে আমাদের সমিতির দু'জন সভ্যকেও দেখতে পেলাম।

আমরা তিনজন হোটেলের বাইরে এলাম। ঠিক করলাম ওয়াই এম সি এ-তে বসে কথা বলব। এখানেও আমাদের পিছনে টিকটিকি। ঝুলবারান্দায় বসে ওমলেট আর চা খেতে খেতে আমরা ঠিক করলাম আজ আর হিলিং করাব না, কারণ আজ হোটেলে যেন বড় বেশি সন্দেহজনক চরিত্রের আনাগোনা। শুধু বিদায় নিয়ে আসব ওদের কাছ থেকে। হোটেলে ঢোকার মুখেই অলোকের সঙ্গে দেখা, আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "দাদা, আজ দুপুরে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের সঙ্গে আপনি দেখা করেছেন খবর পেলাম। ডিরেক্টর সাহেবের ব্লাড রিপোর্ট কী বলছে ?"

"আমার শরীর থেকে আমারই রক্ত বের হবে। সুতরাং তার রিপোর্ট কী, এ নিয়ে আপনাদের কেন এত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হলো বুঝতে পারছি না। দেখা করেছি সে খবর জানতে পারলেন, আর তিনি কী বলেছেন, সে খবর জানতে পারলেন না ?"

আমার কাছ থেকে এই ধরনের কিছু উত্তরই বোধহয় প্রত্যাশা করেছিলেন। আমার কথা শোনার পরেও বিনয়ী হাসি হেসে বললেন, "আজ মিস্টার গ্যালার্ডো কারো হিলিং করবেন না। আপনি বরং কাল আসুন।"

একটি পত্রিকা অফিস থেকে সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ যোগাযোগ করলাম সুবিলমবাবুর সঙ্গে। পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল করে রাখলাম। সব শুনে সুবিমলবাবু বললেন, "ফরেনসিক রিপোর্ট পেতে একটু দেরি হবে। তোমার রুমালের দাগ দেখে ব্লাড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সত্যেনবাবু কী বললেন ?"

"বললেন, দাগ দেখে আমার মনে হচ্ছে এটা কোনও মানুষের রক্তের নয়। এই ধরনের রুমালের সামান্য দাগ পরীক্ষা করে বলার মত আধুনিক যন্ত্রপাতি আমাদের

নেই ! একমাত্র ফরেনসিক টেস্টই আসল সত্য নিখুঁতভাবে উদঘাটনে সক্ষম ।'

ফেইথ হিলার গ্যালার্ডো জলের সঙ্গে যে তেল মিশিয়ে রোগীর শরীরে মালিশ করে, তারই একটা শিশি রাত এগারোটায় আমার বাড়িতে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন খৈতান শিবিরেরই এক ব্যক্তি । বিনিময়ে তাঁর একটি উপকার অবশ্য আমাকে করতে হয়েছিল ।

চতুর্থ দিন, ৯ তারিখ, মঙ্গলবার দুপুরের পর খবর এলো গ্যালার্ডো দম্পতি লিটন হোটেল ছেড়ে, এয়ারপোর্ট হোটেলে উঠেছেন ।

সন্ধ্যায় একটি পত্রিকার অফিস থেকে ফোনে যোগাযোগ করলাম সুবিমলবাবুর সঙ্গে । ইতিমধ্যে আমার কাছে খবর এসেছে, আজই গ্যালার্ডো দম্পতি ভারত ত্যাগ করছেন । সুবিমলবাবু সেই সঙ্গে জানালেন, "প্রদীপ সরকারকে (জাদুকর) আজই ফেইথ হিলার আর তোমার কথা জানালাম । ওর ধারণা ফেইথ হিলার সম্ভবত নিজের আঙুলে ছুঁচ বা ওই ধরনের কোনও কিছু ফুটিয়ে রক্ত বের করে রোগীর শরীরে মাখিয়ে দিচ্ছে ।"

বললাম, "আপনি তো বেশ কয়েকটা অপারেশন দেখলেন । আর প্রতিটি অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেই বেরিয়ে আসা রক্তের পরিমাণ যথেষ্ট । একটা রোগীর ক্ষেত্রে যদিও এইভাবে রক্ত দেখান সম্ভব বলেও ধরে নিই, কিন্তু বহুজনের ক্ষেত্রে পদ্ধতি সম্পূর্ণ অসম্ভব ।"

আমার যুক্তিটা সুবিমলবাবুর মনে ধরেছে মনে হল । বললেন, "তা বটে । কিন্তু রহস্যটা তুমি ধরতে পেরেছ ?"

"নিশ্চয়ই । আগামী রবিবার সকালে আমার বাড়িতে চলে আসুন । ছেলের উপর একইভাবে অস্ত্রোপচার করে দেখাব ।"

রবিবার ১৪ সেপ্টেম্বর সুবিমলবাবু না এলেও ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির সভ্যদের সামনে ছেলে পিনাকীর উপর একই ভাবে অস্ত্রোপচার করে দেখালাম । পিনাকীর পেট ফুটো হয়ে আমার ডান হাতের আঙুলগুলো ঢুকে গেল । বেরিয়ে এলো রক্ত । তারপর শরীরের ভিতর থেকে বের করে আনলাম এক টুকরো মাংস । ছবি তুললেন চিত্র-সাংবাদিক গোপাল দেবনাথ । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমিতির সদস্য, কয়েকজন সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিক । সকলেই যদিও জানতেন আমি কৌশলের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করছি, তবুও উপস্থিত কেউই আমার কৌশলটা কোথায়, সেটা বুঝতে না পেরে যথেষ্ট অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ।

সব শেষে উপস্থিত দর্শকদের সামনে প্রকাশ করলাম কৌশলটা । অস্ত্রোপচারের পূর্ব মুহূর্তে আমার পোশাকের আড়াল থেকে খালি হাতে এসে গিয়েছিল একটা পাতলা রবারের ছোট্ট বেলুন । বেগুনী রঙের ওই বেলুনে পোরা ছিল নকল রক্ত । আমার হাতের ভিতর বেলুনটা এমন কৌশলে লুকিয়ে রেখেছিলাম যে দর্শকরা মুহূর্তের জন্যেও আমার হাতে বেলুনের অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারেননি । পিনাকীর পেটে হাতের আঙুলগুলোকে এমন কৌশলে স্থাপন করেছি, সাধারণের দৃষ্টিতে মনে হয়েছে ওর পেট ফুটো করেই বুঝি আমার আঙুলগুলো ঢুকে গেল । বেলুনটাকে চট্‌কে ফাটাতেই নকল রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে । বেলুনের ছেঁড়া কালচে-লাল রবারকেই থকথকে দেহাংশ বলে দেখিয়েছি । আর পিনাকীর পেট থেকে যে মাংসের টুকরোটা ছিঁড়ে
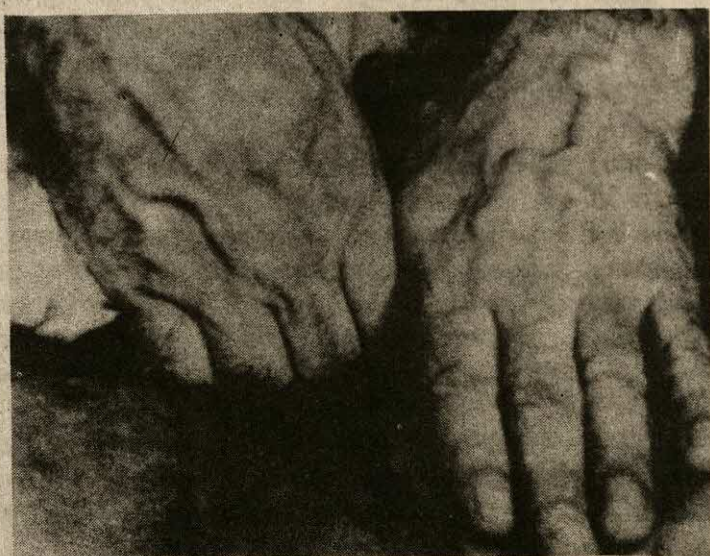
গ্রানাডা টেলিভিশন প্রোডাকশনের তোলা ফেইথ হিলিং-এর ছবি

পিনাকীর শরীরে লেখকের করা ফেইথ হিলিং-এর ছবি
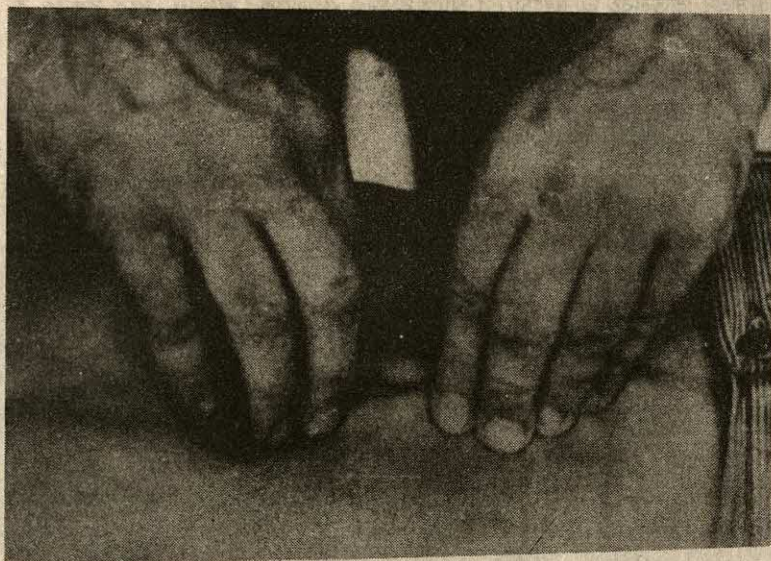
গ্রানাডা টেলিভিশন প্রোডাকশনের তোলা ফেইথ হিলিং-এর ছবি

পিনাকীর শরীরে লেখকের করা ফেইথ হিলিং-এর ছবি

এনেছিলাম আসলে সেটা ছিল তুলোর ভাঁজে লুকোন। গ্যালার্ডো অবশ্যই আমারই কায়দায় প্রতিবারই অস্ত্রোপচারের আগে কখনও পোশাকের আড়াল থেকে কখনও বা পাশের তোয়ালের ভাঁজ থেকে নকল রক্ত ঠাসা বেলুন তুলে নিয়েছেন এবং জাদুর পরিভাষায় যাকে বলে 'পামিং' সেই 'পামিং করেই বেলুন লুকিয়ে রেখেছেন দর্শকদের এবং ক্যামেরার চোখ এড়িয়ে তারপর যা করেছেন তার বর্ণনাতো আমার করা অস্ত্রোপচারের পদ্ধতিতেই দিয়েছি।

পোশাকের আড়ালে বিশেষ কৌশলে অনেক জাদুকরেরা অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখেন। একে ম্যাজিকের পরিভাষায় বলে 'লোড নেওয়া'। পোশাকের আড়ালে এ-ভাবেই জাদুকরেরা লুকিয়ে রাখেন পায়রা, খরগোশ, এমনি আরো কত না জিনিস-পত্তর।

ঘটনাটা এখানেই শেষ করা যেত, কিন্তু এরপর আরও দু-একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। প্রথম ঘটনাটি ঘটল ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ রবিবার দুপুর ২-১৫ মিনিটে। অলোক খৈতান আমার বাড়িতে এলেন। জানতে চাইলেন, ফেইথ হিলিং বিষয়ে আমার অভিমত কী।

বললাম, পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা। পিনাকীর ওপর আমার খালি হাতে অস্ত্রোপচারের (ফেইথ হিলিং-এর) ছবিও দেখালাম অলোককে। ধাপ্পাটা কেমনভাবে দেওয়া হয় সেটাও বোঝালাম।

সব শোনার পরে অলোক আমাকে জানালেন, এবার আমি গোলমাল পাকিয়ে দেওয়ায় পুরোপুরি পরিকল্পনা মাফিক চলতে না পারায় ওঁদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আমি সহযোগিতা করলে অলোক খৈতান ও রামচন্দ্র আগরওয়াল পরবর্তী পর্যায়ে ম্যানিলা থেকে দু-জন ফেইথ হিলার নিয়ে আসবেন এবং কলকাতায় এক মাস ধরে দু-জনকে দিয়ে ফেইথ হিলিং করাবেন। আমি সহযোগিতা করলে প্রতিদিন তিনজন রোগীর দেওয়া ফিস আমি পাব। অর্থাৎ প্রতিদিন ১৫ হাজার টাকা। এক মাসে ৪,৫০,০০০ টাকা। এছাড়া আমাকে ম্যানিলায় নিয়েও যাবেন যখন অলোক বা রামচন্দ্র ম্যানিলায় ফেইথ হিলারের সঙ্গে চুক্তি করতে যাবেন। আলোচনা চালিয়ে গেলাম—প্রস্তাবটা আর কত দূর পর্যন্ত ওঠে জানতে। শেষ পর্যন্ত অলোক আমাকে প্রতিদিন দশ জন রোগীর দেওয়া টাকা দেবেন বলে সর্বোচ্চ প্রস্তাব দিলেন, অর্থাৎ প্রতিদিন ৫০,০০০ টাকা। তিরিশ দিনে ১৫,০০,০০০ টাকা। আমার কথায়-বার্তায় অলোক যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েই অনেক খোলামেলা কথা বললেন, তিনি জানতেন না তাঁর ও আমার কথাগুলো টেপ রেকর্ডারে টেপ হয়ে যাচ্ছে।

২৯ তারিখ অলোক আমার অফিসে ফোন করেন আমার মতামত জানতে। তাঁকে জানাই, 'পৃথিবীতে চিরকালই কিছু বোকা লোক থাকে যাঁরা অর্থের কাছে নিজেদের বিক্রি করেন না। আমিও এই ধরনেরই একজন বোকা লোক বলেই ধরে নিন। আমি পত্রিকায় আপনাদের ফেইথ হিলিং নিয়ে লিখছি। আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবেন না। গতকাল আপনার সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল তা সবই টেপ করেছি। ইতিমধ্যে ক্যাসেটের কয়েকটা কপি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির হাতে চলে গেছে। আমার কোনও বিপদ হলে তাঁরা ক্যাসেটগুলো হাজির করবেন। টাকার জোরে এদের সকলকেই আপনি কিনে নেবেন ভেবে থাকলে ভুল করবেন, কারণ এঁদের পরিচয়

পিনাকীর দেহ অস্ত্রোপচার করে মাংসের টুকরো বের করছেন লেখক

রক্ত-ভরা বেলুন অস্ত্রোপচারের মুহূর্তে আঙুলের ফাঁকে যে-ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন লেখক
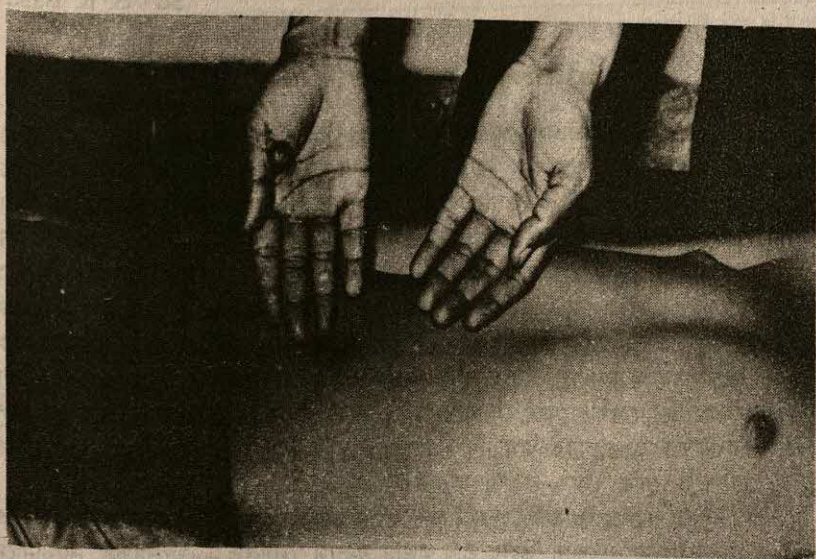
আপনি কোনও দিনই পাবেন না, আমি ছাড়া আর কেউই জানেন না কার কার কাছে ক্যাসেটের কপি আছে।"

অলোক আমার উপর একটা চ্যালেঞ্জই ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, "আপনি কোন্ পত্রিকায় ছাপবেন ? দেখুন আপনার লেখা ছাপান আমি বন্ধ করতে পারি কিনা।"

এর কয়েক দিন পরেই সৌগতের তোলা ফেইথ হিলিং-এর কিছু নেগেটিভ 'পরিবর্তন' পত্রিকা অফিসের নেগেটিভ লাইব্রেরি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল।

১৪ নভেম্বর মহাজাতি সদনের দোতলায় 'বর্তমান ফিলিপাইন' বিষয়ক এক আলোচনা চক্রে এবং ২৪ নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফোরাম অফ সাইন্টিফিক ভ্যালুজ' আয়োজিত এক অলৌকিক-বিরোধী আলোচনা চক্রে ফিলিপিনো ফেইথ হিলারের রহস্য নেগেটিভ-এর রহস্যময় অন্তর্ধান বিষয়ে শ্রোতাদের অবগত করি। ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অলোক খৈতানের সহযোগিতা প্রার্থনার ঘটনা উপস্থিত শ্রোতাদের জানিয়ে এই সংগ্রামে প্রয়োজনে আমার ও আমাদের সমিতির পাশে তাঁদের দাঁড়াতে আহ্বান জানাই।

২৪ ডিসেম্বর '৮৬, বুধবার আমার শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় সংগ্রহ করা রক্তের ফরেনসিক রিপোর্ট দেখতে পেলাম। তাতে পরিষ্কার বলা আছে, রক্তের নমুনাটি পশুর। রিপোর্টটার কিছুটা অংশ তলায় দিলাম—

Result of Examination

Ruminant animals blood was detected in the stains on 'A' (cotton) (Vide the enclosed original report No. 9053/MLR dt. 16.12.86. of the Serologist Govt. of India).

Sd/- S. K. Basu
22.12.86.

ফেইথ হিলার ও জাদুকর পি· সি· সরকার (জুনিয়র)

১৯৮৭-র ২০ আগস্ট আজকাল পত্রিকায় 'চিটিং ফাঁক' সিরিজে 'ছুরি-কাঁচি ছাড়া অপারেশন' শিরোনামে জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)-এর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মধ্যে তীব্র বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। শ্রীসরকার 'ফেইথ হিলার'কে 'স্পেশাল ডাক্তার' নামে অবহিত করে তাঁর প্রতিবেদনে জানান, রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় স্পেশাল ডাক্তার তার নিজের আঙুলের ফাঁকে একটা আলপিন ঢুকিয়ে নিজের শরীর থেকে রক্ত বের করে। সাধারণ দর্শক স্পেশাল ডাক্তারের শরীর থেকে বের হওয়া রক্তকেই রোগীর শরীর থেকে অস্ত্রোপচারের জন্য বেরিয়ে আসা রক্ত বলে ভুল করেন। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তাই রোগীর দেহে লেগে থাকা রক্তের নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষা করে স্পেশাল ডাক্তারের অস্ত্রোপচার ধাপ্পা কি না ধরতে গিয়ে ঠকে গেছেন। কারণ ফরেনসিক রিপোর্টে দেখা গেছে রক্তটা মানুষেরই।

শ্রীসরকারের এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার এক মাস আগে ২০ জুলাই '৮৭-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কলকাতার কড়চা' কলমে 'লৌকিক —অলৌকিক' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়, তাতে জানান হয়েছিল :

অজ্ঞান না করে, স্রেফ খালি হাতে, ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারে রোগ সারানোর কৌশল জানা আছে বলে দাবি করেন 'ফেইথ হিলার'রা। সেই ফেইথ হিলার'-দের নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে রীতিমতো হৈচৈ। সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় এসে রোমিও পি গ্যালার্ডো আর তাঁর স্ত্রী রোজিও গ্যালার্ডো অলৌকিক চিকিৎসক হিসেবে আসর জমিয়ে বসেছিলেন। ওঁরা দুজনে মিলে নাকি দিনে দুশজন পর্যন্ত রোগীর রোগমুক্তি ঘটাচ্ছিলেন। একেকজনের অস্ত্রোপচারে সময় লাগছিল মাত্র তিন থেকে পাঁচ মিনিট। আর ফি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। অস্ত্রোপচার শেষে রোগীর দেহে সামান্যতম দাগও নাকি খুঁজে পাচ্ছিলেন না কেউ। বেশ চলছিল এসব অবিশ্বাস্য কাজকর্ম। এমন সময়ে আসরে এলেন 'র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'র সম্পাদক প্রবীর ঘোষ। নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে তিনি উঠলেন গ্যালার্ডোর অপারেশন টেবিলে। অপারেশনের পুরো দৃশ্যটা ভিডিও ক্যামেরায় ধরে রাখলেন তাঁর দুই সঙ্গী। আর অস্ত্রোপচারের পর প্রবীরবাবু নিজের শরীরে লেগে থাকা রক্ত তুলোয় মুছে, তা তুলে দিলেন দুঁদে পুলিস অফিসার সুবিমল দাশগুপ্তের জিম্মায়। রক্তাক্ত তুলো 'সীল' করা হল ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য। ব্যাপার-স্যাপার দেখে গ্যালার্ডো দম্পতি তড়িঘড়ি কলকাতা থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালালেন ম্যানিলায়। ইতিমধ্যে ফরেনসিক রিপোর্টে মিলেছে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। রক্তের নমুনা মানুষের নয়। পশুর। যুক্তিবাদী প্রবীরবাবু বিভিন্ন সমাবেশে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন অলৌকিক বলে প্রচারিত লোক ঠকানো 'ফেইথ হিলিং' বা 'সাইকিক সার্জারি'-র লৌকিক কৌশল। আর এ কাজে প্রবীর ঘোষকে চিঠিপত্রে প্রায়শই উৎসাহ জোগাচ্ছেন অলৌকিক-বিরোধী জনপ্রিয় মার্কিন লেখক জেমস র‍্যান্ডি।

বিভ্রান্তির কারণ তিনটি। প্রথমতঃ প্রতিদিন একশো থেকে দুশোজন রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করার ক্ষেত্রে নিজের শরীরের রক্তকে রোগীর শরীরের রক্ত বলে বিশ্বাস স্থাপন করাতে কম করেও যে পরিমাণ রক্ত নিজের শরীর থেকে বের করা প্রয়োজন সেই পরিমাণ রক্ত বের করার পরও স্পেশাল ডাক্তারের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কি না ? বিশেষত স্পেশাল ডাক্তার যেহেতু প্রতিদিনই এই সংখ্যক রোগীদের শরীরে অস্ত্রোপচার করে চলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আঙুলের ফাঁকের অংশে শরীরের ভিতর আলপিন ফুটিয়ে অত বিপুল রক্ত বের করা আদৌ বাস্তবসম্মত চিন্তার ফসল নয়, বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ কলকাতার গোয়েন্দা দপ্তর যে রক্তের নমুনা অস্ত্রোপচারকালীন সংগ্রহ করেছিল তার ফরেনসিক রিপোর্ট বিষয়ে শ্রীসরকার বলছেন—রক্তের নমুনা ছিল মানুষেরই। আমার বক্তব্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে—ফরেনসিক রিপোর্ট ছিল রক্তের নমুনা পশুর। আমাদের দুজনের পরস্পরবিরোধী কথায় উভয় পত্রিকার পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। ফরেনসিক রিপোর্ট বিষয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে একজন কেউ নিশ্চয়ই ভুল বা মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করেছি।

জানতাম, আমার উপর মিথ্যা সন্দেহের বোঝা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়,

আমাদের সমিতির সততা বিষয়টিও আসতে বাধ্য, যা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, ব্যাহত করবে। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে নীরবতা পালন বিভ্রান্তিই বাড়াবে মাত্র। তাই বিজ্ঞান আন্দোলনের স্বার্থে, যুক্তিবাদী আন্দোলনের স্বার্থেই শ্রীসরকারের প্রসঙ্গকে টেনে আনতে বাধ্য হলাম।

বিভ্রান্ত পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে বেশ কিছু চিঠি এই প্রসঙ্গে পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকেরই মূল বক্তব্য ছিল—আমাদের দুজনের মধ্যে কে সত্য কথা বলছি। আমার বক্তব্য যদি সত্যিই হয়, তবে মুখ খুলছি না কেন ? বহু চিঠির ভিতর থেকে এখানে দেবদর্শন চক্রবর্তী, তথাগত চট্টোপাধ্যায় ও আদৃতা মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত চিঠিটির উল্লেখ করছি। চিঠিতে তাঁরা জানিয়েছেন :

আমরা যৌথভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে এবং আজকাল পত্রিকার 'প্রিয় সম্পাদক' বিভাগে দুটি চিঠি পাঠিয়েছি। চিঠি দুটির প্রতিলিপি আপনার কাছে পাঠালাম। এই বিষয়ে আপনার মতামত আমরা প্রকাশ্যে জানতে আগ্রহী, আপনি নীরব থাকলে আমরা অবশ্যই ধরে নেবো, আপনি মিথ্যা প্রচারের সুযোগ নিয়ে যশ, প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ইচ্ছুক একজন ধূর্ত ভণ্ড ও প্রতারক। এই একই ধরনের চিঠি আমরা জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)-কেও পাঠিয়েছি। আশা রাখি, আমাদের এই সত্যকে জানার যুক্তিনিষ্ঠ প্রচেষ্টাকে আপনারা দুজনেই স্বাগত জানিয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

যে দুটি চিঠি তাঁরা পাঠিয়েছিলেন, তার প্রতিলিপি এখানে তুলে দিচ্ছি—

'প্রিয় সম্পাদক'
আজকাল
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৯

৩১ আগস্ট ১৯৮৭

জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) 'চিটিং ফাঁক'-এর নামে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করছেন; সেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। যাদুকর সরকারকে বিনীত অনুরোধ, জাদু নিয়ে থাকুন, জাদু নিয়ে লিখুন, কিন্তু রাতারাতি বিজ্ঞানমনস্ক সাজতে যাবেন না। বিজ্ঞানমনস্ক সাজা যায় না, হতে হয়।

জাদুকর সরকার একজন অলৌকিকত্বের ধারক-বাহক। তাঁর কথায়–আমার মতে আত্মা জিনিষটা সম্পূর্ণ বাস্তব, কিন্তু চলতি বিজ্ঞান এখনও তাকে ঠিক মতো সমঝে উঠতে পারেনি। তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, "ভূত সম্পর্কে আমরা জানি না বুঝি না বলে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা কেউই কিন্তু উড়িয়ে দেননি।" আরো সুন্দর কথাও তাঁর কলমে আমরা পড়েছি—"আজকে যেটাকে ভৌতিক ভাবছি,, আগামী দিনে সেটা হয়ত পরিষ্কার বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে।"

এই তিনটি উক্তি তোলা হয়েছে, 'কিশোর মন' পত্রিকায় "অমর আত্মার কাহিনী" রচনা থেকে।

জাদুকর সরকারের এইসব বিজ্ঞান-বিরোধী কথার এখানে শেষ নয়। তিনি নিজেও নাকি এক ভূতের কাছ থেকে উপকার পেয়েছেন।

জাদুকর সরকার ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী ; অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী। তারও বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁরই বহু লেখায়। তাঁর মত এমন একজন বিজ্ঞান-বিরোধী শিবিরের মানুষকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্কদের পক্ষে প্রচার চালাতে দেখলে শঙ্কিত হই।

শঙ্কা আরো বাড়ে যখন দেখি ভেজাল ধরতে গিয়ে তিনি নিজেই ভেজাল দিচ্ছেন।

২০শে আগস্টের লেখায় যাদের তিনি "স্পেশাল ডাক্তার" বলেছেন, তাঁদের প্রকৃত টার্মটা তাঁর জানা ছিল না বলেই কি তাঁদের ওই নামে অবহিত করেছেন ? এনসাইক্লোপিডিয়ায় চোখ বুলোলে তিনি 'ফেইথ হিলার'দের কথা নিশ্চয়ই পেতেন। তিনি কি জানেন পৃথিবীর বহু দেশ ফেইথ-হিলারদের নিয়ে তথ্যচিত্রও তুলেছে ? ফেইথ হিলাররা ঠিক সেই ধরনের চিটিংবাজ নয়, অতিসরলীকরণ করে যে ভাবে জাদুকর সরকার তাঁদের চিত্রিত করেছেন।

জাদুকর সরকারের মতে, নিজের আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে স্পেশাল ডাক্তার অপারেশনের রক্ত বার করেন। এই পদ্ধতিতে কোন রকমভাবেই এক নাগাড়ে মাত্র পাঁচজন রোগীর উপরও অস্ত্রোপচার চালান সম্ভব নয় ; অথচ ফেইথ হিলরারা দিনে একশোর উপরও অপারেশন করে থাকেন। শ্রীসরকারকে বিনীত অনুরোধ, কোন বিষয় না জেনে সে সম্পর্কে অন্যকে জানাবার বাসনা সংযত করুন।

জাদুকর পি সি সরকারের যে বক্তব্যের সার অনুসন্ধানের জন্য মূলত আমাদের এই চিঠি লেখা, তা হলো, শ্রীসরকার তাঁর লেখাটিতে জানিয়েছেন, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ রোগীর দেহে লেগে থাকা রক্তের নমুনার ফরেনসিক পরীক্ষা করে দেখেছেন, এটি মানুষের রক্ত।

২০ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কলকাতার কড়চা'য় 'লৌকিক-অলৌকিক' নামে একটি ফিচার প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক প্রবীর ঘোষ নিজের পরিচয় গোপন করে, খালি হাতে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারের জন্য ফেইথ হিলার গাল্যার্ডোর অপারেশন টেবিলে ওঠেন। অস্ত্রোপচারের পর প্রবীরবাবুর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত সংগ্রহ করেন পুলিশ অফিসার সুবিমল দাশগুপ্ত। ফরেনসিক পরীক্ষায় দেখা যায় রক্তের নমুনা পশুর। ব্যাপার দেখে গ্রেপ্তার এড়াতে গ্যালার্ডো দম্পতি কারবার গুটিয়ে পালিয়েছেন ম্যানিলায়।

ফেইথ হিলারদের ফরেনসিক রিপোর্ট নিয়ে যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ ও জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)-এর মধ্যে যে কেউ একজন ভুল বা মিথ্যে খবর পরিবেশন করেছেন। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে শ্রীঘোষের বিজ্ঞানসম্মত

যুক্তিগুলি জাদুকর সরকারের অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলির ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে আমরা প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হতে চাই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলে সহযোগিতা করলে বাধিত হবো।

স্বাক্ষর : দেবদর্শন চক্রবর্তী
(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)
স্বাক্ষর : তথাগত চট্টোপাধ্যায়
(অর্থনীতি বিভাগ)
স্বাক্ষর : আদৃতা মুখোপাধ্যায়
(ইংরাজী বিভাগ)
প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা।

সম্পাদক সমীপেষু
আনন্দবাজার পত্রিকা
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

৩১ আগস্ট ১৯৮৭

২০ শে জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কলকাতার' কড়চা'য় 'লৌকিক-অলৌকিক' নামে একটি ফিচার প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক প্রবীর ঘোষ নিজের পরিচয় গোপন করে খালি হাতে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারের জন্য ফেইথ হিলার গ্যালার্ডোর অপারেশন টেবিলে ওঠেন। অস্ত্রোপচারের পর প্রবীর ঘোষের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত সংগ্রহ করে ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠান পুলিশ অফিসার সুবিমল দাশগুপ্ত। ফরেনসিক পরীক্ষায় দেখা যায় রক্তের নমুনা মানুষের নয়, পশুর।

২০ আগস্ট 'আজকাল' পত্রিকার 'চিটিং-ফাঁক' কলমে ফেইথ হিলারের উপরে 'ছুরি কাঁচি ছাড়া অপারেশন' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখক জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)। শ্রীসরকার জানিয়েছেন, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ রোগীর দেহে লেগে থাকা রক্তের নমুনার ফরেনসিক পরীক্ষা করে দেখেছেন, এটি মানুষের রক্ত।

দুই পত্রিকার দুই বিপরীত বক্তব্যে আমরা বিভ্রান্ত। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা দুটি এবং শ্রী ঘোষ ও শ্রী সরকারের সহযোগিতা কামনা করি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে
আদৃতা মুখোপাধ্যায় (ইংরাজী বিভাগ)
তথাগত চট্টোপাধ্যায় (অর্থনীতি বিভাগ)
দেবদর্শন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

আবারও বলি এই জাতীয় বক্তব্যের প্রচুর চিঠি আমি পেয়েছি। এর উত্তরে অতি স্পষ্ট করে বক্তব্য রাখার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জানাচ্ছি :

১। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর কলকাতায় আসা ফিলিপিনো ফেইথ হিলার বা 'স্পেশাল ডাক্তার'-এর অস্ত্রোপচার করার সময় একবারই মাত্র রক্ত সংগ্রহ করেছিলেন।
২। রক্ত সংগ্রহ করেছিলেন সেই সময়কার কলকাতা পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার সুবিমল দাশগুপ্ত।
৩। আমার শরীরে অস্ত্রোপচারকালে বেরিয়ে আসা রক্তই সুবিমল দাশগুপ্ত সংগ্রহ করেছিলেন।
৪। রক্তের নমুনার ফরেনসিক পরীক্ষার ফল আগেই তুলে দিয়েছি। তাতে স্পষ্টতই জানান হয়েছে রক্তের নমুনা ছিল পশুর।
৫। পি সি সরকার (জুনিয়র)-এর 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত ফেইথ হিলার সম্পর্কিত লেখাটির বিষয়ে সুবিমল দাশগুপ্ত অবহিত হয়েছিলেন। এবং শ্রীসরকারের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত জানাই, ফিলিপিন বেতার ও দূরদর্শন থেকে ফেইথ হিলার প্রসঙ্গে আমাকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় ১৯৯০ সালে।

পরলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তার

'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯৮৪ সালের ১৮ জানুয়ারি সংখ্যায় যে প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশিত হয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল সেটির শিরোনাম হলো—পরলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তার মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকেও বাঁচিয়ে তুলছেন। লেখক—আনন্দস্বরূপ ভাটনাগর। মূল প্রতিবেদনটি সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থান'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখান থেকে অনুবাদ করে লেখাটি প্রকাশ করে 'পরিবর্তন'। অনুবাদক রুমা শর্মা।

প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছিল এইভাবে :

যিনি রোগাক্রান্ত হন, তিনি সাধারণত চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যান। কেউ পছন্দ করেন অ্যালোপ্যাথি। কেউ হোমিওপ্যাথি কেউবা কবিরাজি। ইদানীং শোনা যাচ্ছে আকুপাংচার করে রোগ উপশমের কথা।

কিন্তু পরলোক থেকে ডাক্তার এসে রোগ নিরাময় করছেন এ খবর নতুন। বিদেশেও হ্যারি এডওয়ার্ড একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে হাজার হাজার মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে বাঁচিয়েছেন।

কী তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি ? রোগী রোগিণীদেরই বা প্রতিক্রিয়া কী ? তারই বিস্তৃত প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল :

"পরলোক সম্বন্ধে ধারণা"

বাস্তবে যে ব্যক্তি ইহলোকে সারা জীবন ডাক্তারী করে গেছেন পরলোকে গিয়েও তাঁর সে ইচ্ছা থেকে যায়। আমাদের চিন্তাই আমাদের ব্যক্তিত্বের আধার এবং ঠিক সেভাবেই আমরা নিজস্ব কার্যকলাপ অনুধাবন করি। সে চিন্তাচ্ছন্নতাই মৃত্যুর পরও

আমাদের সঙ্গে থেকে যায়। অধিকাংশ লোকের পরলোক সম্বন্ধে ভুল ধারণা রয়েছে। তাঁরা ভাবেন সূক্ষ্মলোকে হয়ত ভূত-প্রেত রয়েছে বা মৃত্যুর পর আত্মা খুব তাড়াতাড়ি অন্যত্র দেহধারণ করে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সূক্ষ্মলোকতত্ত্ব এবং তাতে জীবনের গতিবিধি একটি স্বতন্ত্র বিষয়। মূলত একথা বলা যেতে পারে যে এ জগতের শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র আত্মাগণ যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার, যোগী, কলাকার প্রভৃতি আপন সাধনায় নিমগ্ন থাকেন তাঁদেরই ভেতর থাকেন সে সব পরোপকারী আত্মা, যাঁরা ভূ-পৃথিবীতে নেমে এসে নানারকম ভাবে মানুষের সাহায্য করেন। পরলোকপ্রাপ্ত ডাক্তাররাও রোগীর সেবায় রত থাকতে চান। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা কোন সুপাত্রের মাধ্যমে লোক সেবা করেন। যারা উদার হৃদয় ও ধার্মিক স্বভাবসম্পন্ন তাদেরই মাধ্যমে তাঁরা রোগীর অসাধ্য রোগ উপশম করেন।

১৯৩৫-এর কথা। হ্যারি এডওয়ার্ডকে তাঁর এক বন্ধু একটি চার্চে নিয়ে যান। সেখানে এক আত্মার মাধ্যমে তাঁকে বলা হয় যে, তাঁর মধ্যে রোগ উপশম করার প্রতিভা রয়েছে। একই ভাবে অন্য চার্চেও সেই মাধ্যম দ্বারা তাঁকে একই কথা বলা হয়। তাই তিনি ভাবলেন, একটু চেষ্টা করে দেখাই যাক না। সে সময় তাঁরই এক বান্ধবীর বন্ধু ইংলন্ডের ক্রম্‌পটন হাসপাতালে মরণাপন্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন।
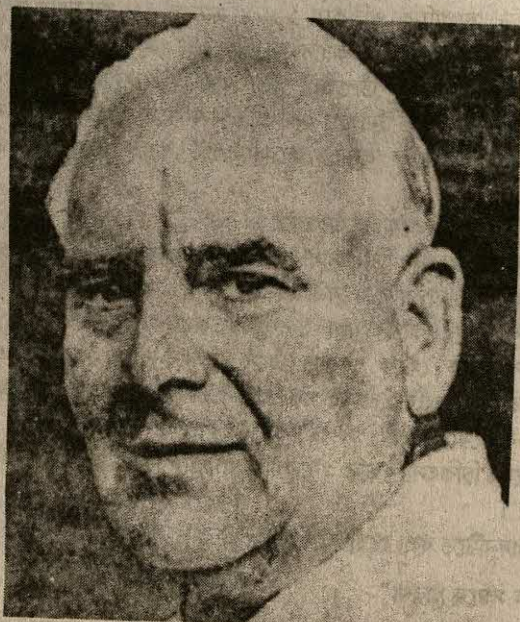
হ্যারি এডওয়ার্ড

তিনি ক্ষয় রোগাক্রান্ত ছিলেন। হৃদপিণ্ডের স্ফীতি হওয়াতে ভেতরের নাড়ি ফেটে রক্তস্রাব হচ্ছিল। সেখানেই হ্যারি এডওয়ার্ড তাঁর সম্পূর্ণ নীরোগ হওয়ার কামনা করে মন একাগ্র করলেন। এক সপ্তাহ পর যখন তিনি তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি বললেন, তাঁর বন্ধুর হৃদপিণ্ডের স্ফীতি এখন আর নেই। রক্তস্রাবও বন্ধ হয়ে গেছে। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন এবং সেইভাবেই রোগীর রোগ উপশম করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিছুদিন পর সেই রোগী সুস্থ হয়ে পুনরায় নিজের কাজে যোগ দেন।

একদিন হ্যারি এডওয়ার্ড নিজের ছাপাই ও স্টেশনারি দোকানে অন্যান্য দিনের মত কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা দোকানের ভেতরে এসে বললেন, কে যেন তাকে এই দোকানে ঢোকার জন্য প্রেরণা দিচ্ছে। তাই তিনি এসেছেন। তিনি বললেন, তাঁর স্বামী লন্ডনে একটি হাসপাতালে বক্ষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাঁর নীরোগ হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যেকটা দিন তিনি বেঁচে আছেন, সে কটা দিন তিনি বাড়িতে ফিরে গিয়ে যেন হাসিখুশিতে বাকী জীবনটা কাটান—এ উপদেশ দিয়েছেন।

বিদেহী আত্মার দ্বারা প্রতিকার

সেই মহিলার মনোকষ্টে হ্যারি এডওয়ার্ড অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর স্বামীর চিকিৎসা তিনি বিদেহী ডাক্তারের মাধ্যমে করবেন। কিন্তু এ কথা বলা যত সহজ ছিল, বক্ষ ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর রোগ উপশম করা ততই সন্দেহজনক মনে হতে লাগল। রাতে তিনি মন একাগ্র করে সেই বিদেহী আত্মার কাছে তাঁর নীরোগ হওয়ার প্রার্থনা করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ করে কাজে মনোনিবেশ করলেন। কিছুদিন পর মহিলাটি তাঁর স্বামীকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে পরীক্ষা করাবার জন্য এবং তিনি ডাক্তারদের জানালেন, যে দিন থেকে তিনি হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি ফিরেছেন সেদিন থেকেই কোন প্রকার পথ্য গ্রহণ করেননি। ডাক্তাররা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, তাঁদের নির্ধারিত ওষুধের গুণেই তিনি সুস্থতা লাভ করেছেন।

এইভাবে হ্যারি এডওয়ার্ড তাঁর জীবনের প্রথম দুটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত অচিন্ত্যনীয় ভাবে সফলতা পেয়ে গেলেন তাঁর স্পিরিচুয়াল হিলিং-এর মাধ্যমে। একে অ্যাবসেন্ট হিলিং বলা হয়। অতঃপর তিনি নিজের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন যে তাঁর ভেতর রোগ উপশম করার ক্ষমতা রয়েছে। একদিন একটি মেয়ে মধ্যরাত্রে তাঁর ঘরে এসে জানালেন যে তার বোন জ্বরাক্রান্ত হয়ে বেঘোরে পড়ে আছে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য কিছু উপসর্গও দেখা দিয়েছে। ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছেন। তিনি এক পরাশক্তি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধ ব্যক্তির আদেশে হ্যারি এডওয়ার্ডের কাছে এসেছেন। সে রাত্রেই তাকে অ্যাবসেন্ট হিলিং দেওয়া হল। দ্বিতীয় দিন সকালে হ্যারি এডওয়ার্ড তাদের বাড়িতে গিয়ে বোনটির মাথায় হাত রেখে মঙ্গল কামনা করলেন। সে দিনটা বৃহস্পতিবার ছিল।

হ্যারি এডওয়ার্ড জানালেন যে মেয়েটি সপ্তাহখানেক পরেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। পরিবার পরিজনেরা তার দিকে অবিশ্বাস্যভরে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু দেখা গেল রবিবার সকালে সে মেয়েটি বিছানায় বসে চা পান করছে এবং তার জ্বরও একদম ছেড়ে গেছে। অতঃপর দেখা গেল যে, সে মেয়েটি ক্ষয় রোগাক্রান্ত এবং পনের দিন অন্তর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান হত এবং বায়ু সেবন করা হত। হ্যারি তাঁর এই নবার্জিত প্রয়াসকে অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করে চললেন। ক্ষয় রোগ থেকে মুক্তি পেল মেয়েটি। হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করলেন। পরবর্তীকালে মেয়েটি সেই হাসপাতালে নার্সের কাজ পেয়েছে এবং এখন সেই কাজেই আছে। এভাবে শরীর স্পর্শ করে চিকিৎসার পদ্ধতিটিতে এই প্রথমবার তিনি সফলতা লাভ করলেন। এটি কনটাক্ট হিলিং-এর দৃষ্টান্ত।

অতঃপর হ্যারি এডওয়ার্ডের বাড়িতে রোগীরা ভিড় করে আসতে লাগলেন। স্পিরিচুয়াল হিলিং-এর মাধ্যমে তারা নিরাময় লাভ করে রীতিমত উপকৃত হলেন। এখানে এই মহান মানুষ ও অপার্থিব চিকিৎসাটি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

২৯ মে, ১৮৯৩ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি বিদেহী আত্মার মাধ্যমে রোগ উপশম চর্চা শুরু করেন। এবং ১৯৭৬-এর ৯ ডিসেম্বর ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁর পার্থিব দেহ পরলোকে লীন হয়। মরদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মলোকে গমন করেন তিনি, সেখানে বিদেহী ডাক্তারদের মধ্যে স্থিত হন অতঃপর। ৪১ বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক অসাধ্য রোগীর রোগ উপশম করে তাদের রোগ মুক্ত করেছেন এই প্রয়াত মানুষটি। তাঁর বিদেহী আত্মার আরোগ্য-মন্দিরে প্রত্যেক সপ্তাহে কয়েক হাজার চিঠি আসত এবং প্রত্যেকটি চিঠির তিনি উত্তর দিতেন। ১৯৫৫ সন পর্যন্ত তিনি দশ লক্ষ চিঠির জবাব দেন। তাঁর স্বর্গ প্রাপ্তির পর আজও হ্যারি এডওয়ার্ড সেনচুরির কাজকর্ম সে প্রকারই করা হয়।

অসাধ্য রোগের চিকিৎসা

ভারতবর্ষে এখনও অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা হ্যারি এডওয়ার্ডের অ্যাবসেনট হিলিং-এর মাধ্যমে রোগ উপশম করে আরোগ্যলাভ করেছেন। ১৯৭০-এর আগস্ট মাসে ২৭ বৎসর বয়স্কা কুমারী ছায়ার পায়ে স্ফোটক হয়। কয়েক বৎসর বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করান হয় কিন্তু কিছুতেই তাকে সারান যাচ্ছিল না। অতঃপর সে হ্যারি এডওয়ার্ডের কাছে তিন মাস ধরে চিঠিপত্র লেখালেখি করতে লাগল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার সব কটি চিঠির উত্তরও পেল। একদিন সকালে সে উঠে দেখে কোন দৈববলে যেন তার স্ফোটক একেবারে উধাও হয়ে গেছে।

হ্যারি এডওয়ার্ড ইংলন্ডের একটি জাঁকজমকপূর্ণ আলো ঝলমলে বিশাল সভাকক্ষে হাজার হাজার দর্শকের সামনে বিদেহীরূপে এসে তাঁর অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে আরোগ্যলাভ হওয়ার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতেন। রয়েল অ্যালবার্ট হলে একবার তাঁর এরকম একটি ঘটনার সময় দিল্লির স্পিরিচুয়ার হিলার শ্রীমতী স্বর্ণনারঙ্গ উপস্থিত

ছিলেন। এই প্রদর্শন কক্ষে জনৈক জটিল রোগাক্রান্ত রোগীকে একটি মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়াতে বলা হল। এক যুবক তার অতি বৃদ্ধা মাকে কোলে করে নিয়ে এসে সেই মঞ্চের ওপর দাঁড় করাল কোনক্রমে। সেই বৃদ্ধার সম্পূর্ণ শরীর বাতে আক্রান্ত ছিল। মাইকে এসে তিনি অস্ফুট শব্দে বললেন, 'বাছা তুই আমার শরীরের আর কী ভালো করবি ! কিন্তু এতটুকু উপকার কর যাতে আমার আঙুলগুলো অন্তত সোজা হয়ে যায়, আমি যেন নিজের হাত দিয়ে নিজের খাবারটুকু খেতে পারি। আমার ছেলে, নাতির হাত দিয়ে তুলে দেওয়া খাবার মুখে নিতে বড় লজ্জা করে।' দর্শকরা হেসে উঠলেন হো হো করে। এর কিছুক্ষণ পরেই সেই বৃদ্ধা নিজের চেষ্টায় আস্তে আস্তে মঞ্চের উপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। খুব খানিকটা হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করতে শুরু করলেন, আবার একটু দৌড়েও নিলেন আনন্দে। এভাবে হ্যারি এডওয়ার্ড তাঁর রোগ নিরাময় ক্ষমতা দেখিয়ে দিলেন পৃথিবীর মানুষের চোখের সামনে।

বিদেশী ডাক্তার দ্বারা আরোগ্যলাভ

বোম্বের হাসপাতালে বহু বিদেশি ডিগরিধারী এক প্রতিভাবান ডাক্তার রয়েছেন, রমাকান্ত কোনি। তিনি বৃদ্ধ-অবস্থার যে কোন ধরনের রোগ নিবারণে বিশেষজ্ঞ। প্রথম জীবনে অ্যালোপ্যাথি পদ্ধতিতেই চিকিৎসা শুরু করেছেন। ডাঃ রমাকান্ত কোনি সারস্বত ব্রাহ্মণ হলেও বিবাহ করেছেন অন্ধ্রের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী রম্ভাকে, যিনি ছিলেন গৌড়-ব্রাহ্মণ।

১৯৭২ সনে ডাঃ কোনি কোমরের স্পনডিলোসিস-এ আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। মেরুদণ্ডের অসহ্য ব্যথার দরুন তিনি শয্যাগত হন। ভাবলেন, বাকি জীবনটা বোধহয় বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে। সে সময় তাঁর জনৈক বয়স্ক বন্ধু তাঁকে হ্যারি এডওয়ার্ডের কাছে আরোগ্য কামনা করে চিঠি লেখার জন্য উৎসাহিত করলেন। আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং সুশিক্ষিত হওয়ার দরুন তিনি এ বিষয়টি প্রথমে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে করতে পারেন নি। কিন্তু বন্ধুর কথা রাখবার জন্য তিনি তাঁকে চিঠি লিখলেন। নিজের এবং অন্যান্য ডাক্তারদের এ বিষয় আশ্চর্য ভাবান্তর দেখা দিল এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বিচিত্র ঘটনা

১৯৭২ সনে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এতে ডাক্তার রমাকান্ত কোনির জীবনে নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়। এ অবস্থায় তাঁর একটি 'সিয়ানস' দেখার সুযোগ হল। ঘর অল্প অন্ধকার ছিল। লোকেরা চেয়ারে গোল হয়ে বসে ছিলেন। মধ্যস্থলে যে মিডিয়াম,
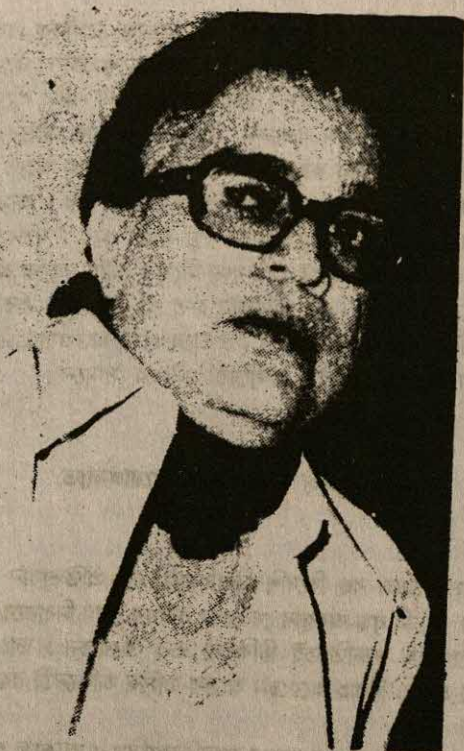
ডাঃ রমাকান্ত কোনি

সে ঘুরে ঘুরে এক একটি লোকের কাছে এসে তাঁদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের সম্বন্ধে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময় ঘুরে এসে ডাঃ কোনির সামনে দাঁড়ালেন। এবং বললেন 'আমার বিদেহী মার্গদর্শক জানাচ্ছেন যে আপনাকে রোগ উপশম করার প্রতিনিধি (যন্ত্র) সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে আপনার মাধ্যমে বিদেহী ডাক্তার দ্বারা রোগীর রোগ উপশম করা যায়।' বারবার তাঁকে এ কথা বলা হল। তিনি বললেন 'আপনি নিজের মন হতে সমস্ত সন্দেহ, শঙ্কা ও দ্বন্দ্ব দূর করে ফেলুন।'

এই বৈঠকের পর আমার মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। মনে হল কেউ যেন আমার অন্তরে অফুরন্ত শক্তি জুগিয়ে দিয়েছে। আমি যেন মাইলের পর মাইল দৌড়ে চলে যেতে পারি। আমার পিঠে যেন দুটো ডানা লাগান হয়েছে। আমার মনের এই বিচিত্র আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ উপলব্ধি করে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলাম। আমার হাতের ছোঁয়া মাত্র রোগী নীরোগ হয়ে উঠবে বলে মনে হতে লাগল। করতল উষ্ণ হয়ে উঠল। আঙুলের প্রান্তগুলোতে যেন তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগল। চোখ বুজতেই জ্যোতির্ময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডতে স্ফুলিঙ্গের ছটা দেখা দিতে লাগল। এই বিচিত্র অনুভূতির কথা তিনি তাঁর নিজের লেখা বই 'সাইকো হিলিং'-এ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি

বোম্বের একজন সুবিখ্যাত মিডিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর সহযোগিতায় নিজের বিদেহী মার্গদর্শক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন। সূক্ষ্মলোক নিবাসী তিনি দুশো বৎসর আগে এ লোকে থাকাকালীন অবস্থায় সার্জারি ও ডাক্তারি করে গেছেন এবং এখনও তিনি পরলোকে অবস্থান করে নানা প্রকার অনুসন্ধান করে চলেছেন। তিনি এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন যশস্বী ডাক্তার ছিলেন যে জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা মাত্র বুঝতে পারতেন রোগী কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তার কোনিকে মাধ্যমে হিসেবে উপযোগী করে তাঁর ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে তিনি রোগ উপশম করেন। ডাঃ কোনি যখন রোগীর শরীর স্পর্শ করেন তাঁর আঙুলগুলো রোগীর রোগাক্রান্ত স্থানটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় করে ফেলেন। ওষুধ লেখবার সময়ও তিনি অনুভব করেন যেন কেউ তাঁর হাত ধরে ওষুধগুলোর নাম লিখিয়ে নিচ্ছেন যেমন 'অটোমেটিক রাইটিং'-এ লেখা হয়। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রি বিভূষিত এই আধুনিক ডাক্তার ভদ্রলোক না জানি কত দুরূহ রোগীর রোগ নিরাময় করে তাদের সুস্থ সবল করেছেন। অনেক কঠিন রোগ নিরাময় করার সম্বন্ধে বর্ণনা তাঁর ফাইলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মাত্র অ্যাবসেন্ট হিলিং দ্বারাই তিনি ১৯৮১ সন পর্যন্ত ২৭০০ রোগীর রোগ উপশম করেছেন। ভারতে শুধু বোম্বের হাসপাতালেই এই স্পিরিচুয়াল হিলিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

কনট্যাক্ট হিলিং

যে সব রোগী নানা পদ্ধতিতে নিজেদের চিকিৎসা করিয়ে শ্রান্ত ও নিরাশ হয়ে পড়েন তাঁরাই অবশেষে ডাঃ কোনির কাছে আসেন বিদেহী চিকিৎসার জন্য। বিশ্বাসের অভাব তো রয়েছেই তাদের মনে, তবু তাঁরা শঙ্কিত হৃদয়ে এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিকেও যাচাই করে নিতে চান। অন্যান্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁরা ধৈর্য সহকারে সুস্থ হওয়ার আশা রাখেন। তবে বিদেহী আত্মার দ্বারা চিকিৎসা করাতে এসে মনে করেন যেন তাঁদের অসুস্থতা জাদুমন্ত্রে উড়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতাল হতে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যে কোন রোগ যতদিনকারই হোক সারার কথা, তাতে ধৈর্য হারালে চলে না।

প্রতিবেদন প্রসঙ্গে কিছু কথা

প্রতিবেদনটির শুরুতে প্রতিবেদক মৃত্যুর পর আত্মা বাস্তবিকই কী করে—বলতে গিয়ে যা বলেছেন তা একান্তভাবেই প্রতিবেদকের নিজস্ব বিশ্বাসের কথা। তাঁর এই বিশ্বাসের পিছনে কোনও পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ কাজ করেনি। যুক্তি বা বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে

পৌঁছায় পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পথ ধরে। বিশ্বাস চলে আপন খেয়াল-খুশিতে। কখনও বহু লোকে বিশ্বাস করে, বিখ্যাত ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন, এই কু-যুক্তিতে মানুষ অন্ধভাবে কোনও কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। কখনও শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ইত্যাদিকে অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া থেকে সৃষ্টি হয় অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির লড়াই জন্মলগ্ন থেকেই। কারও একান্ত ব্যক্তি বিশ্বাস কখনই বিজ্ঞানের সত্য হয়ে উঠতে পারে না, তা সেই বিশ্বাস আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ রায় যাঁরই হোক না কেন। যুক্তির সত্য, বিজ্ঞানের সত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই আসবে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলিকাতা পুস্তকমেলা '৯০-এ আমাদের সমিতিও আসর জাঁকিয়ে বসেছিল এক রঙিন ছাতার তলায়। প্রতিদিনই আমরা নানা অনুষ্ঠান ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছিলাম।। এক সন্ধ্যায় এক বিশপ আমাদের সামনে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই ধরনের প্রশ্ন আরও বহু ভাববাদীদের কাছ থেকে আসার সম্ভাবনা আছে বলেই প্রসঙ্গটির অবতারণা করছি।

বিশপ আমাকে বলেছিলেন, "কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাস রাখতেই হয়, এমনই একটি ক্ষেত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরকে বিশ্বাসেই পাওয়া যায় যুক্তিতে নয়। যুক্তিতে সব কিছু প্রমাণ করা যায় না। আপনার বাবারই যে আপনি ছেলে তা কি আপনি প্রমাণ করতে পারেন? পারেন না। এখানে আপনাকে বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করতে হয়।"

বলেছিলাম, গর্ভধারণ যিনি করেছেন তিনিই আমার মা। এবং তাঁর স্বামীকেই আইনত আমি ও সমাজ বাবা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। নিশ্চয়ই যুক্তির দিক থেকে যে কোনও সন্তানেরই জন্ম হতে পারে সাধারণভাবে সক্ষম নারী-পুরুষের মিলনে। সেই মিলন বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে না হতেও পারে। এই সম্ভাবনা আপনার আমার সবার ক্ষেত্রেই থাকতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের জন্মদাতা নন, আমাদের পিতাকেই নির্দেশ করি পরিচয়দানের ক্ষেত্রে। আর পিতা সব সময় মায়ের বিবাহিত স্বামী। আমার জন্মদাতা আমারই পিতা কি না, এই ধরনের চিন্তার দ্বারা বা অনুসন্ধানে নেমে সত্যকে আবিষ্কার করতে পারা বা না পারার মধ্যে কী আসে যায়?

ডাঃ রমাকান্ত কোনি প্রসঙ্গে বরং এবার আসা যাক। ডাঃ কোনির দাবির সমর্থনে প্রমাণ চেয়ে '৮৪-র ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২৮ মার্চ দুটি চিঠি দিই। প্রথম চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

ডাঃ রমাকান্ত কোনি
বোম্বে হাসপাতাল
মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার
৩য় তল, বোম্বে-৪০০ ০২০

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮, দেবীনিবাস রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

প্রিয় ডাঃ কোনি,

সম্প্রতি আপনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচুর প্রচার পাওয়া এক 'ফেইথ হিলার'। আপনিও ফিলিপিনো ফেইথ হিলারদের মতই দাবি করেন অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা বিদেহী ডাক্তারদের সাহায্যে রোগীদের রোগমুক্ত করেন।

আমার ধারণা, যে সব রোগীদের Placebo চিকিৎসার দ্বারা অর্থাৎ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে রোগমুক্ত করা সম্ভব আপনি কেবলমাত্র তাঁদেরই বিনা ওষুধে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং হবেন। অথবা 'বিদেহী ডাক্তার রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধের নাম লিখেছে', দাবি করলেও বাস্তবে চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই আপনি ব্যবস্থাপত্র লিখছেন। যে ব্যবস্থাপত্র অনুসারে চিকিৎসা করিয়ে রোগীরা রোগমুক্ত হচ্ছেন।

আপনি কি বাস্তবিকই দাবি করেন—বিদেহী ডাক্তারের আত্মাকে কাজে লাগিয়ে যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করতে আপনি সক্ষম ?

আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে জানতে আগ্রহী সত্যানুসন্ধানী। তথাকথিত অলৌকিকতার পিছনে লৌকিক রহস্য কী, এই বিষয়ে কিছু পত্র-পত্রিকায় লিখেও থাকি। দীর্ঘদিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একজন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীর সন্ধান পাইনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি ওইসব তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রত্যেকেরই ক্ষমতার পিছনে কোনও অলৌকিকত্ব ছিল না, ছিল লৌকিক কৌশল।

আমার এই ধরনের সত্যকে জানার সদিচ্ছা ও শ্রমকে নিশ্চয়ই আপনি একজন সৎ মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বাগত জানাবেন। আপনার অলৌকিক চিকিৎসা ক্ষমতার বিষয়ে আমি একটি অনুসন্ধান চালাতে চাই। আশা রাখি সত্য প্রকাশের স্বার্থে আপনি আমার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

আমি আপনার কাছে তিনজন রোগীকে হাজির করতে চাই। আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় ওই তিনজনকে ছয় মাসের মধ্যে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়ে আপনাকে দেব দশ হাজার টাকা।

আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করলে বা চিঠি পাঠাবার এক মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ না করলে অবশ্যই ধরে নেব, আপনার দাবি একান্তই মিথ্যা। আপনি লৌকিক উপায়েই কিছু কিছু রোগীর রোগমুক্তি ঘটিয়ে থাকেন মাত্র।

শুভেচ্ছাসহ
প্রবীর ঘোষ

কোনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেননি। কারণ এগিয়ে এসে পরাজিত হওয়ার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন, যেমন আরও অনেক 'ক্ষমতাধরেরাই' করেন।

ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতার ভুতুড়ে চিকিৎসা

১৯৮৮ সালটা যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণীকে নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রিকাগুলো হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল তাঁর নাম ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তী, ডাইনি সম্রাজ্ঞী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় রঙিন ও সাদা-কালো ছবির সঙ্গে যে সব

প্রচ্ছদ কাহিনী ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সে সব পড়ে পাঠক-পাঠিকারা শিহরিত হলেন। শিহরিত হলাম আমিও। জানলাম, রহস্যবিদ্যা ঈপ্সিতার মুঠো-বন্দী। থট্ রিডিং বা মানুষের মন বোঝার ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিকদের। নিখুঁৎ ভবিষ্যৎবাণী করতে সক্ষম। মারণ-উচাটন, তুকতাক সবই আয়ত্তে। ডাকিনী বিদ্যার সাহায্যে যে কোনও রোগীকে ইচ্ছে করলেই সুস্থ করে তুলতে পারেন, যে কোনও সুস্থ মানুষকে পারেন মারতে। ঈপ্সিতার দাবি, ডাইনীর এইসব অলৌকিক ক্ষমতা বিজ্ঞানসম্মত সাধনার ফল। অলৌকিক ঘটনার প্রতি চিরকালই আমার আকর্ষণটা বড় বেশি। এই ধরনের কোনও ঘটনা শুনলে সত্যানুসন্ধানে নেমে পড়ার ইচ্ছেটা প্রবলতর হয়ে ওঠে। তার মধ্যে আবার, অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার যদি 'বিজ্ঞানসাধনার ফল' হয় তবে তো কথাই নেই। ঈপ্সিতার ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিককে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে ঈপ্সিতার পরিচয় করিয়ে দিতে। কয়েক দিনের মধ্যে খবর পেলাম, ঈপ্সিতা আমার মুখোমুখি হতে অনিচ্ছুক।

৮৮-র জুনের শেষ সপ্তাহে পড়ন্ত বিকেলে ঈপ্সিতার দক্ষিণ কলকাতার লেক রোডের ছবির মত সাজান ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে সাক্ষাৎকার নিতে। ঘরের দু'পাশে দুই বেড-ল্যাম্প সৃষ্ট আলো-আঁধারের মাঝে এক সময় ঈপ্সিতার আবির্ভাব ঘটলো। যথেষ্ট সময় ও যত্ন নিয়ে নিজেকে সাজিয়েছিলেন। আমি ও আমার সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক তাপস দেব পরিচয় দিলাম। ঈপ্সিতা বসলেন। আমার মিথ্যে পরিচয়কেই সত্যি বলে ধরে নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। সত্যানুসন্ধানে এসে প্রথম সত্যটি আমার সামনে প্রকাশিত হল, ঈপ্সিতার থট্ রিডিং ক্ষমতার দাবি নেহাতেই বাত্‌কে-বাত্।

মন্ট্রিয়লে শিক্ষা ও ডাইনি দীক্ষা পাওয়া ঈপ্সিতা ইংরেজির সঙ্গে কিছু কিছু বাংলা মিশেল দিয়ে জানালেন, তাঁদের সংস্থার নাম "ওয়ার্ল্ড উইচ ফেডারেশন"। কেন্দ্রীয় কার্যালয় মন্ট্রিয়লে। সংস্থার তরফ থেকে পৃথিবীকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিন প্রধানকে। এঁরাই সংস্থার সর্বোচ্য পদাধিকারী। পূর্বাঞ্চলের কার্যালয় নিউ দিল্লি, প্রধানা স্বয়ং ঈপ্সিতা। তবে ঈপ্সিতা যখন তাঁর কলকাতার ফ্ল্যাটে থাকেন তখন সেটাই হয়ে ওঠে অস্থায়ী কার্যালয়। ডাইনিপীঠের কেন্দ্রীয় সদস্য সংখ্যা মাত্র ৭৫ এবং সকলেই মহিলা। অনেক পুরুষই সদস্য হওয়ার ব্যর্থ আবেদন রেখেছিলেন।

আলোচনার মাঝে চা ও বিস্কুট এল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, "কৈশোর থেকেই ওকাল্ট বা রহস্যবিদ্যার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছি। এ-জন্য ডাইনি, ডাইন, ওঝা, গুনিন, জানগুরু, তান্ত্রিক, ভৈরবী, অবতারদের পিছনে কম ঘুরিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গাদা সময় আর গুচ্ছের অর্থনাশই সার হয়েছে। যখন বাস্তবিকই সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম, এ জীবনে আর বোধহয় রহস্যবিদ্যার হদিশ দেওয়ার মত কারও দেখা পেলাম না, এমনি সময় আপনার খোঁজ পেলাম। আপনাকে নিয়ে অন্তত গোটা আটেক লেখা আমার চোখে পড়েছে। সবই গোগ্রাসে গিলেছি। সব পড়ে সব জেনেও কেমন যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছে না, তাই আমি নিজে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলোতে আপনার সম্বন্ধে যে সব আপাত

অদ্ভুত খবর ছাপা হয়েছে তা সবই কি সত্যি ?"

ঈপ্সিতা পরম অবহেলায় আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো অবজ্ঞার হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "বাস্তবিকই প্রতিটি প্রকাশিত ঘটনাই সত্যি। এই তো গত ৬ জুন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এসেছিলেন। নাম তারাকুমার মল্লিক। থাকেন এই কলকাতারই ৪৪ বি, রাণী হর্ষমুখী রোডে। সমস্যাটি তারাকুমারবাবুর ভাগ্নী মঞ্জু চ্যাটার্জিকে নিয়ে। মঞ্জু বাতে এবং শয্যাক্ষতে শয্যাশায়ী। ডাক্তার ও হাসপাতাল ঘুরে এখন বাড়িতেই আছেন। এঁরা প্রত্যেকেই জবাব দিয়েছেন। শয্যাক্ষতের তীব্র

ঈপ্সিতা ও কন্যা দীপ্তা

যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতাও হারাতে বসেছেন মঞ্জু। সঙ্গে উপসর্গ অনিদ্রা। কসমিক-রে চার্জ করা জলে ডাইনি শক্তি মিশিয়ে এক শিশি তারাকুমারকে দিয়ে মঞ্জুর শরীরে লাগতে বলেছিলাম। এক সপ্তাহেই দারুণ ফল পাওয়া গেল। ১৩ তারিখ তারাকুমার জানালেন মঞ্জুর শরীরের শয্যাক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রণা অনেক কম।"

না বুঝেও 'বুঝেছি' ভান করা আমার ধাতে সয় না। তাই অকপটে ঈপ্সিতাকে জানালাম, কসমিক-রে চার্জের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি।

ঈপ্সিতার যথেষ্ট যত্ন-সহকারে বিষয়টা বোঝালেন। জানালেন, তাঁদের সংস্থার তিন প্রধানের কাছে তিনটি ক্রিস্টাল-বাটি আছে। ক্রিস্টালের বাটিতে জল, লাল গোলাপের পাপড়ি, কিছু বিভিন্ন ধরনের বিশেষ রত্ন পাথর, রুপোর টুকরো এবং সেন্ট ঢেলে বাটিটি রোদে রাখেন। বাটির এমনই গুণ, সেটা সূর্য রশ্মি থেকে কসমিক-রে শোষণ করে জলে জমা করে। ঈপ্সিতার কথায়, এটা ম্যাগনেটাইজড্ জল। এই ম্যাগনেটাইজড্ জলে হাত ডুবিয়ে ঈপ্সিতা তাঁর মানসিক শক্তি জলে মিশিয়ে দেন।

আবার ধাক্কা খেলাম, ঈপ্সিতার বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানটুকুরও অভাব দেখে। কসমিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মি শক্তিশালী তড়িৎকণার বিকিরণ। এই অদৃশ্য তড়িৎকণার বিকিরণ সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত। সেই সন্ধ্যায় ঈপ্সিতা আমার হাতে যে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়েছিলেন, তাতেও ছিল কসমিক-রে। আসলে অজ্ঞানতার দরুন ঈপ্সিতা সূর্য-রশ্মি ও মহাজাগতিক-রশ্মিকে গুলিয়ে ফেলে নিজের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এক অদ্ভুত তথ্য তৈরি করেছিলেন। ঈপ্সিতার দৌড় আরও যতটুকু সম্ভব বোঝার তাগিদে কসমিক-রে নিয়ে তাঁর ভ্রান্ত ধারণার প্রসঙ্গ না তুলে ঈপ্সিতাকে বক্‌বক্ করে যাওয়ার সুযোগ দিলাম।

ঈপ্সিতা বলে চললেন, ডাইনি বিদ্যাকে বলা হয় রহস্যবিদ্যা বা অপরসায়ন। মজা হল, আমাদের এই অলৌকিক রহস্যবিদ্যা বা অপরসায়নের তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক কাণ্ড-কারখানাগুলো আমরা ঘটিয়ে চলেছি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই। এই যে ৪৯-টি মহাজাগতিক রশ্মি সূর্যের আলো থেকে আমরা গ্রহণ করছি, এই ৪৯-টি মহাজাগতিক রশ্মির কথা তথাকথিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনেক অনেক আগে ঋকবেদেই লেখা রয়েছে। এমনিভাবেই আমরা অপরসায়নের জ্ঞান অর্জন করেছি ইহুদিদের কোবলা, মিশরীয়দের অপদেবী আইসিসের আরাধনা সংক্রান্ত বই, 'দ্য কিং অফ্ সলোমন', তিব্বতের তন্ত্র ইত্যাদি পড়ে।

পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে পাঁচটি মৌল শক্তি—মাটি, জল, আগুন, হাওয়া ও আকাশ বা মহাশূন্য। এই মৌল শক্তিগুলো থেকেই আমরা বিশেষ ডাইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করি। তারপর তার সঙ্গে যখন আমাদের মানসিক শক্তিকে মিলিয়ে দিই, তখন যে ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আসে, সেটাকেই সাধারণ মানুষে বলেন অলৌকিক ক্ষমতা।

অজ্ঞানের কাছে বিজ্ঞানের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত লাগছিল। বললাম, "আপনাদের ডাইনিবিদ্যা কেমনভাবে শেখান হয় এই প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য বলে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, শিক্ষাক্রমের প্রথম চার বছর বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিপত্র পড়ে অপরসায়ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। পরবর্তী দু'বছর আপনারা

শেখেন মনকে শক্ত করে তৈরি করতে। এই সময় আপনারা বহু পুরুষকে ভালোবাসেন, কিন্তু হৃদয় অর্পণ করেন না, বহু পুরুষদের সঙ্গ দেন আবার যখন ইচ্ছে তাঁদের ছেঁড়া কাগজের মতই ছুঁড়ে ফেলে দেন। এসব কি বাস্তবিকই আপনাদের ডাইনি হওয়ার শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ, না কি এই ধরনের নীতিহীন, মূল্যবোধহীন, অফ্ বিট্ কিছু বলে প্রচারের মধ্যে আসতে চেয়েছিলেন ?"

ঈপ্সিতার চোখ সরু হল, সম্ভবত ঘাড়টা শক্ত হল। "যা সত্য, সেটুকুই বলেছি। কার কাছে আমার বক্তব্য অফ্ বিট্ মনে হবে, কার কাছে হবে না, সেটা আমার বিবেচ্য নয়।"

"আপনার মেয়ে দীপ্তার বয়স এখন বছর দশেক। তাকে আপনি না কি ডাইনি করে তুলছেন। আপনার কিশোরী কন্যা যখন আপনারই চোখের সামনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে তখন কি তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবেন ?"

"না পারার কী আছে ? ওটা তো মনকে শক্ত করে তৈরি করার একটা পরীক্ষা মাত্র," বললেন ঈপ্সিতা।

ঈপ্সিতার মানসিক স্বাভাবিকত্ব নিয়ে একটা সন্দেহ তীব্র হল।

বললাম, "'সানন্দা'র শংকরলাল ভট্টাচার্যকে আপনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছিলেন বলে পড়েছি। আপনার অলৌকিক ক্ষমতা নিজের চোখে দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছে নিয়ে এসেছি। একান্ত অনুরোধ, বিফল করবেন না।"

ঈপ্সিতা আমার অনুরোধে আফ্রিকার ভুডু মন্ত্রের সাহায্যে একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে রাজি হলেন। জানালেন, এই ধরনের অনুরোধ রেখেছিলেন টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়ার শিখা বসু। তাঁকে ভুডু মন্ত্রে যা ঘটিয়ে দেখিয়েছিলেন তাই দেখে শিখা ও তাঁর চিত্রসাংবাদিক সঙ্গী মোনা চৌধুরী প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ঈপ্সিতা আরও বললেন, "দেখি আপনার এবং আপনার সঙ্গীর নার্ভ কত শক্ত!"

ঈপ্সিতা উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। এলেন একটি পুতুল নিয়ে। পুতুলের উচ্চতা দেড় ফুটের মত। পরনে প্যান্ট, শার্ট, টাই, কোট, হ্যাট। মুখটা কাঠের, কালো রঙের পালিশ করা। ঈপ্সিতার সঙ্গী এবার মেয়ে দীপ্তা। ওর হাতে একটা ট্রে। তাতে তিনটি বেগুন। আমার সঙ্গী তাপস ছবি তোলা শুরু করল। ঈপ্সিতা তাঁর হাতের পুতুলটা তুলে ধরে বললেন "এটাই ভুডু। জীবন্ত প্রেতাত্মা।"

ঘরের লাগোয়া ঘেরা বারান্দায় একটা টেবিল। দু'পাশে দুটো চেয়ার। টেবিলের পাশেই একটা দামী টুল। তার উপর ভুডু মূর্তিটিকে নামিয়ে রাখলেন ঈপ্সিতা। দীপ্তা তার হাতের ট্রেটা নামাল টেবিলে। ঈপ্সিতা তাঁর দু'হাতের দশ আঙুলকে কাজে লাগিয়ে চুলগুলোকে এলো করে ছড়িয়ে দিলেন। দু'হাতের তালুতে গোলা সিঁদুর ঘসলেন। কপালেও লাগালেন গোলা সিঁদুরের টিপ। দীপ্তা ঘরের ভিতরে গিয়ে নিয়ে এলো দুটো মাটির ভাঁড়।

ঈপ্সিতা ভুডু মূর্তিটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিড়-বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। এক সময় আমাকে অনুরোধ করলেন ট্রে থেকে একটা বেগুন তুলে ওঁর হাতে দিতে। দিলাম। ঈপ্সিতা একটা চেয়ারে বসলেন। ঈপ্সিতার কথা মত মুখোমুখি চেয়ারটায় বসলাম আমি। টেবিলের উপর একটা মাটির

ভাঁড় বসিয়ে তার উপর বেগুনটাকে বসালেন। আর একটা মাটির ভাঁড় উপুড় করলেন বেগুনটার মাথায়। এ-বার ঈপ্সিতা আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, "আপনার কোনও শত্রু আছে?"

বললাম, "থাকতে পারেন, আবার নাও থাকতে পারেন।"

ঈপ্সিতা বললেন, "এখন আমরা ভুডু মন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়েছি। আপনার কোনও শত্রু থাকলে তার নাম বলুন। জীবন্ত প্রেতাত্মাকে স্মরণ করে বেলুনটা কেটে ফেলবো, অমনি দেখতে পাবেন বেগুনের কাটা অংশে রক্তের দাগ। রক্তের দাগ যত তীব্র হবে, শত্রুর শারীরিক ক্ষতিও ততই তীব্র হবে। ভুডু মন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেগুনের পরিবর্তে চিচিঙা বা পাতিলেবুও ব্যবহৃত হয়।"

বললাম, "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আমার কোনও শত্রু নেই। আমি নির্বিরোধী ছাপোশা কলমচী মাত্র।"

"বেশ তো আমরা বরং একটা মানসিক শক্তির পরীক্ষা করে দেখি। আপনি আপনার সমস্ত মানসিক শক্তি দিয়ে ভাবতে থাকুন বেগুনটার ভেতর যেন সাদাই থাকে। আমি আমার মানসিক শক্তিকে অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বেগুনটার ভেতর মানুষের রক্ত নিয়ে আসতে চেষ্টা করব।" বললেন ঈপ্সিতা।

দু'জনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে বেগুনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক সময়

ডাইনী সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা ও লেখক 'মন্ত্র-শক্তি' পরীক্ষায় মুখোমুখি

ঈপ্সিতা বললেন, "দেখি আপনার নাড়ির গতি।"

আমার নাড়ির গতি পরীক্ষা করে বললেন, "স্বাভাবিকই আছে দেখছি। আপনার নার্ভের তারিফ করতেই হবে। আপনি এক মনে ভাবতে থাকুন বেগুনের ভেতরটা সাদাই আছে। যখন আপনার মনে হবে বাস্তবিকই বেগুনটা সাদাই আছে, তখন আমাকে বলবেন। বেগুনটা কাটবো।"

আমি প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই বললাম, "এবার কাটুন।"

ঈপ্সিতা তাঁর ডাইনি ছুরি 'ড্যাগার অফ জাস্টিস' তুলে বেগুনটা কেটে ফেললেন। বেগুনের ভিতরের সাদা অংশের খানিকটা জায়গা টক্‌টকে লাল রক্তে ভেজা।

ঈপ্সিতা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "দেখছেন রক্ত। এটা আপনার অজ্ঞাত শত্রুর রক্ত।"

বেগুনের টুকরো দুটো হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত পরীক্ষা করে বিনীতভাবে জানতে চাইলাম, "আপনি কী ভাবে ঘটালেন?"

"ভুডু মন্ত্রে। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের শত্রুকেই বধ করতে পারি আমরা।"

বললাম, "ঈপ্সিতা, ট্রে থেকে যে কোনও একটা বেগুন আমার হাতে তুলে দিন। তারপর আপনি আপনার সমস্ত ইচ্ছে শক্তি দিয়ে চেষ্টা করুন বেগুনটার ভেতরটা সাদা রাখতে। আমি কোনও মন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই বেগুনটা কেটে রক্ত বের করে দেবো, যেমনটি আপনি করলেন।"

আমার কথা শুনে ঈপ্সিতার মুখের চেহারা গেল পাল্টে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে শক্ত মাটিতে শেষ বারের মত দাঁড় করাতে চাইলেন। বললেন, "ওইসব ছেলে-মানুষী চিন্তা মাথায় রাখবেন না। ভুডু মন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাবার ফল প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভয়াবহ।"

বললাম, "কোনও ভয় নেই আপনার। আমার কোনও ক্ষতির জন্য আপনাকে সামান্যতম দোষারোপ করব না। আপনি আমার হাতে একটা বেগুন তুলে দিন।"

উত্তেজিত, শঙ্কিত ঈপ্সিতা দীপ্তার হাতে ট্রেটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা ভেতরে নিয়ে যাও।"

দীপ্তাকেও যথেষ্ট নার্ভাস মনে হচ্ছিল। ও দ্রুত আদেশ পালন করলো। আমি নিশ্চিত ছিলাম, প্রতিটি বেগুনেই লাল তরল ঢোকানো আছে। অথবা ছুরিতে মাখানো আছে রসায়ন। ঈপ্সিতাকে আরও একটা চমক দিতে বললাম, "আমারও কিছু ক্ষমতা আছে।"

ঈপ্সিতা সন্দেহজনক চোখে তাকালেন। লৌকিক কৌশলে তথাকথিত কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখানোতে ঈপ্সিতা ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন, উচ্ছ্বসিত হলেন। বললেন, "আপনি জানেন না, ঠিক বুঝতে পারছেন না, আপনার কী প্রচণ্ড রকম অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতাকে ঠিক মত ব্যবহার করতে পারলে দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড উইচ একজিকিউটিভ কমিটির সভ্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনিই হলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি এই আমন্ত্রণ পেলেন। আপনাকে এই দুর্লভ সম্মান জানাবার কারণ, আপনার কাছ থেকে আমাদেরও অনেক কিছু শেখার আছে।"

ঈপ্সিতার উচ্ছ্বাস আমার মধ্যে সংক্রামিত না হওয়ায়, তাঁর মত রমণীয় রমণীর আমন্ত্রণ গ্রহণ না করায় তিনি যেমন অবাক হয়েছিলেন তেমনই নিরাশ। শেষ চেষ্টা হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেন শনিবার দুপুরের আগে আসার। আরও কিছু না কি বলার আছে। শনিবার গিয়েছিলাম তাপসকে নিয়েই। নিষ্ফল কিছু কথাবার্তার মধ্যে আমার সফলতা ছিল একটিই। ঈপ্সিতা পরম ভালোবেসে একটি সুন্দর আধারে দিলেন ম্যাগনেটাইজড জল।

৮ জুলাই বিকেলে গিয়েছিলাম মঞ্জু চ্যাটার্জির বাড়িতে। মধ্য-বয়সী মঞ্জুকে দেখলাম শয্যাক্ষতে শয্যাশায়ী। শয্যাক্ষত্রের তীব্র গন্ধে বাতাস ভারি। কথা বললাম মঞ্জুর মা শান্তি সেন এবং সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত মীরা দাসের সঙ্গে। তিনজনই জানালেন, বাস্তবিকই দীর্ঘ চিকিৎসার পর ঈপ্সিতার কসমিক-রে চার্জ করা অলৌকিক জল প্রতিদিন শরীরে বুলিয়ে ভালই ফল পাচ্ছিলেন। শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুটা কম ছিল। শেষ শনিবার মন্ত্রপূতঃ জল না নিয়েই ফিরেছিলেন। তারপর থেকে যন্ত্রণাটা আবার তীব্র আকার ধারণ করেছে। ঘুম আসছে না। মঞ্জু কথা বলতে বলতে কাঁদছিলেন। আমি ঈপ্সিতার কাছ থেকে আসছি শুনে মঞ্জু অনুরোধ করলেন, "আপনি একটা কিছু করুন। এই যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

মঞ্জুর উপর একটা পরীক্ষা চালাতে চাইলাম। মঞ্জুকে বললাম, "আমি কিছু কথা বলবো, কথাগুলো আপনি চোখ বুজে মন দিয়ে শুনুন। আপনার যন্ত্রণা কমে যাবে, ভালো লাগবে, ঘুম হবে।" শান্তি দেবী ও মীরার উপস্থিতিতেই 'হিপনটিক সাজেশন' দিলাম। মিনিট দশ-পনেরো সাজেশন দেওয়ার পর মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন লাগছে ?"

মঞ্জু বললেন, "ভাল লাগছে। ব্যথা-যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। আমার ঘুম পাচ্ছে।"

বললাম, "ঘুমোন। আমি আবার পরশু সকালে এগারোটা নাগাদ এসে খবর নেব, কেমন ছিলেন।"

রবিবার সাড়ে বারোটা নাগাদ গিয়েছিলাম। গিয়েই একটা আশ্চর্য খবর শুনলাম। ঈপ্সিতা এসেছিলেন। সাড়ে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত মঞ্জুর ঘরে ছিলেন।

ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা হঠাৎ প্রথা ভেঙে বৈভব ছেড়ে গরীবের ভাঙা ঘরে এসেছিলেন কি শুধুই আর্তের সেবায় ? তারাকুমারের কথাতেই আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। শনিবার তারাকুমারের কাছে আমার আগমন বার্তা ও মঞ্জুর অবস্থার পরিবর্তনের কথা ঈপ্সিতা শুনেছেন। আরও জেনেছিলেন আমি রবিবার এগারোটা নাগাদ আবার আসবো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

মঞ্জু, শান্তি দেবী, মীরা এবং তারাকুমারবাবুর সঙ্গে মঞ্জুর বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা হল। চারজনই জানালেন আমার কথাগুলো শোনার পর মঞ্জু দেবীর যন্ত্রণা অনেক কম অনুভূত হচ্ছে। ঘুমও ভালো হচ্ছে। এ-বাড়ির প্রত্যেকের কথাগুলো ধরে রাখলাম টেপ রেকর্ডারে। বিদায় নেওয়ার সময় ওঁরা আবার আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

মঞ্জুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, তা জানতে পেরে খুশি হলাম। ঈপ্সিতা মঞ্জুর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়েই মঞ্জুর যন্ত্রণা সাময়িকভাবে কিছুটা

ঈপ্সিতা, দীপ্তা ও লেখক

কমাতে পারেন। এই ধরনের যন্ত্রণা কমার কারণ কখনই ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতা নয়, এর কারণ রয়ে গেছে লৌকিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে। বিশ্বাস-নির্ভর এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। এ বিষয়ে আগে বিস্তৃতই আলোচনা করেছি। যাঁরা এইসব অলৌকিক উপায়ে রোগমুক্ত হয়েছেন খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন তাঁরা প্রত্যেকেই সেইসব অসুখেই ভুগছিলেন, যেসব অসুখ বিশ্বাসে সারে। ঈপ্সিতা কাদের রোগমুক্ত করবেন তা ছিল সম্পূর্ণই ঈপ্সিতার ইচ্ছাধীন। নিজের ইচ্ছেমত রোগী নির্বাচনের দায়িত্ব রাখার কারণ তিনি সেইসব রোগীদেরই বাছতেন যাদের প্ল্যাসিবো চিকিৎসায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঈপ্সিতার কাছ থেকে আমি যে অলৌকিক জল সংগ্রহ করেছিলাম, তা পরীক্ষার জন্য তুলে দিয়েছিলাম রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরীর হাতে। ডঃ রায়চৌধুরী কিন্তু ওই অপার্থিব জলে পার্থিব স্টেরয়েড-এর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। এরপর এই সত্যটুকু আবিষ্কার করে আরও এক দফা বিস্মিত হলাম। ঈপ্সিতার নিজের ওপরই

নিজের ভরসা নেই, তাই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে স্টেরয়েডের উপর।

১২ আগস্ট 'আজকাল' পত্রিকায় ঈপ্সিতাকে নিয়ে আমার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এই ঘটনারই সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছিলাম, "ঈপ্সিতা কি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখতে আমার হাজির করা পাঁচজন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে রাজি আছেন? তিনি জিতলে আমি দেব পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রণামী, সেই সঙ্গে থাকব চিরকাল তাঁর গোলাম হয়ে।"

১৩ আগস্টের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সে-রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বহরমপুর যেতে হয়েছিল পুলিশ দেহরক্ষী নিয়ে। কারণ—'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অলোক দাশগুপ্তের কাছে একটি খবর এসেছিল—সে রাতে আমার কম্পার্টমেন্টে ডাকাত পড়বে। ডাকাতির আসল উদ্দেশ্য আমাকে হত্যা করা। অর্থাৎ, হত্যার উদ্দেশ্য গোপন রাখতে ডাকাতির অভিনয় হবে। খবর ছিল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ মিস্টার সুফির কাছেও। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেহরক্ষীর ব্যবস্থা।

১১ ডিসেম্বর ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতাকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে। ঈপ্সিতা চিঠিটা স্বয়ং গ্রহণ করলেও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মত সততা, সাহসিকতা বা ধৃষ্টতা দেখাননি। যদি দেখাতেন তবে অবশ্যই তাঁর মাথা যুক্তিবাদী আন্দোলনের কাছে, বিজ্ঞানের কাছে নতজানু হতই। তিনি অবশ্যই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়ে উপস্থিত না হওয়াকেই শ্রেয় ও কম-অপমানজনক মনে করেছিলেন।

ডাইনি সম্রাজ্ঞীর কাছে সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির প্যাডে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম আপনাদের কৌতূহল মেটাতে তা এখানে তুলে দিলাম :

ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তী
৬৪, লেক রোড,
ফ্ল্যাট ২ এম, ডব্লিউ, 'বলাকা বিল্ডিং', ৫·১২·৮৮
কলকাতা-৭০০ ০২৯

মহাশয়া,

সাম্প্রতিককালে আপনিই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে প্রচার পাওয়া মানুষ। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী পত্র-পত্রিকায় আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে পড়েছি। কয়েক মাস আগের এক সন্ধ্যায় আপনারই ফ্ল্যাটে বসে আপনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনেক কিছুই আমাকে বলেছিলেন। পড়েছি এবং শুনেছি, আপনি যে কোনও রোগীকে আপনার অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার দ্বারা রোগ মুক্ত করতে পারেন। যে কোনও অপরিচিত মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন।

আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে জানতে আগ্রহী এক সত্যানুসন্ধানী। দীর্ঘ দিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একজনও অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা একটিও

অলৌকিক ঘটনার সন্ধান পাইনি। আমার এই ধরনের সত্যানুসন্ধানের প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতই আপনিও স্বাগত জানাবেন আশা রাখি। সেই সঙ্গে এও আশা রাখি, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনুসন্ধানে আপনি আমার সঙ্গে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবেন।

আগামী এক মাসের মধ্যে আপনার সঙ্গে ঠিক করে নেওয়া কোনও একটি দিনে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে আপনার সামনে হাজির করব পাঁচজন মানুষ ও পাঁচজন রোগীকে। পাঁচজন মানুষের অতীত সম্পর্কে সে-দিনই আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পাঁচজন রোগীকে আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় রোগ মুক্ত করার জন্য দেব ছয়মাস সময়। পরীক্ষা দুটিতে আপনি কৃতকার্য হলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকর করে নেব আমি এবং 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রইলাম, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ পেলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা।

আমার সঙ্গে এই অনুসন্ধান বিষয়ে সহযোগিতা না করলে অবশ্যই ধরে নেব, আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনীই মিথ্যা।

আগামী ১১ ডিসেম্বর '৮৮ রবিবার বিকেল চারটের সময় আমাদের ময়দান তাঁবুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান করেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সে-দিন আপনাকে ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ—
প্রবীর ঘোষ।

ঈপ্সিতার এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে পরাজয়েরই নামান্তর ধরে নিয়ে শহর কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রতিটি নামী-দামী, বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে বিশাল আকারে খবরটি পরিবেশন করেন। একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত হয় দীর্ঘ সম্পাদকীয়। বহু পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির দামাল ছেলেদের ঘটানো অনেক অলৌকিক ঘটনার ছবি।

১১ ডিসেম্বর '৮৮-র ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইনী সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা ছাড়াও আহ্বান জানান হয়েছিল আরো দু'জনকে। তাঁরা হলেন, 'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল'-এর সাঁই শিষ্য উপাচার্য ও হস্তরেখাবিদ নরেন্দ্রনাথ মাহাতোকে।

উপাচার্য ও শ্রীমাহাতো সরাসরি আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে সেই চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করে চিঠি দিই ও তাঁদের ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানাই।

উপাচার্যের চ্যালেঞ্জটি ছিল খুবই কৌতূহল জাগানো। তিনি জানিয়েছিলেন, স্রেফ সাঁইবাবার বিভূতি খাইয়ে সাঁইবাবার অপার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দেবেন। বিভূতি খাওয়ার তিন দিনের মধ্যে আমার পেটে তৈরি হবে ছয় থেকে এগারোটি স্বর্ণমুদ্রা। চতুর্থ দিন অপারেশন করলেই ওগুলো পেট থেকে হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

তারপর যা যা ঘটেছিল, সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। কিন্তু সে কাহিনী এখানে আনলে 'ধান ভানতে শিবের গান' গাওয়া হয়ে যাবে। এমনি আরো অনেক

চ্যালেঞ্জারদের চ্যালেঞ্জে বহু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, হয়েই চলেছি। কিন্তু সে-সব অভিজ্ঞতার কাহিনী 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইতে আনা প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি। যে-গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথম খণ্ডে হয়তো আসতে পারত, সে সব চ্যালেঞ্জারদের অনেকেরই মুখোমুখি হয়েছি প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পর। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের পিপাসা মেটাতে তাঁদেরই জন্য 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' শিরোনামে একটা বই লেখায় মন দিয়েছি।

পাঁচ

ভূতুড়ে তান্ত্রিক

গৌতম ভারতী ও তাঁর ভূতুড়ে ফটোসম্মোহন

'৮৭-র ১ আগস্ট-এর সন্ধ্যা। 'আলোকপাত' পত্রিকার প্রতিনিধি অমিতবিক্রম রাণা এলেন। উদ্দেশ্য আমার একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া। বিষয়—সম্মোহন। কথা প্রসঙ্গে অমিত জানালেন, কয়েকজন মনোরোগ চিকিৎসকদেরও সাক্ষাৎকার নেবেন, যাঁরা রোগীদের রোগমুক্ত করার ক্ষেত্রে সম্মোহনের সাহায্য নেন। এবং তাঁদের কাছে এও জানতে চাইবেন, কোন্ কোন্ রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে সম্মোহন কার্যকর ভূমিকা নেয়। এরই পাশাপশি কয়েকজন তান্ত্রিকের সাক্ষাৎকার নেবেন, যাঁরা দাবি করেন—তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে ভৌতিক উপায়ে শুধুমাত্র একটি ফটোগ্রাফ পেলেই সেই ফটোর মালিককে সম্মোহন করতে সক্ষম। এই ধরনের ফটো-সম্মোহনের সাহায্যে তাঁরা নাকি বিরহী প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন ও বিবাহ ঘটিয়ে দিয়ে থাকেন, শত্রুকে পায়ের সুকতলা বানিয়ে থাকেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমিত জানালেন কয়েকজন মনোরোগ চিকিৎসক ও তান্ত্রিকদের নাম, যাঁদের সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছে আছে। এরই ভিতর একটি নাম গৌতম ভারতী। উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে লেকটাউন শিবকালী মন্দিরের গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতী বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে খ্যাত। অনেক দিনের ইচ্ছে, গৌতম ভারতীকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখার। অমিতকে জানালাম, "গৌতম ভারতীর মুখোমুখি হওয়ার একটা আন্তরিক ইচ্ছে আমার আছে। কিন্তু সময়াভাবে ইচ্ছেটা বাস্তব রূপ নিতে পারেনি।"

আমার কথায় অমিত প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, "আপনি যদি আমার সাক্ষাৎকার নেবার সময় আমার সঙ্গী হন তো দারুণ হয়। ব্যাপারটা তাহলে দারুণ জমবে।"

বললাম, "আমার পরিচয় পেলে ব্যাপারটা আদৌ জমবে বলে মনে হয় না। বরং গৌতম ভারতী হয়তো মুখই খুলতে চাইবেন না। আমার একটা পরিকল্পনা আছে। আমি যদি পরিচয় গোপন করে 'আলোকপাত'-এর প্রতিনিধি হিসেবে আপনার সঙ্গী হই, আপত্তি আছে?"

আমার যুক্তি অমিতেরও মনে ধরলো। বললেন, "না না, কোনও আপত্তি নেই।

আপনি তো আমাদের পত্রিকাতেও লিখেছেন এবং আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে আপনি থাকলে আমি এবং আমাদের পত্রিকা আন্তরিকভাবেই খুশি হবো।"

আমি প্রস্তাব দিলাম, "আজ তাহলে আমার সাক্ষাৎকার নেওয়াটা মুলতুবি থাক। আমরা বরং আজ গৌতম ভারতীর আশ্রম থেকে ঘুরে আসি। আমার সাক্ষাৎকারটা আর এক দিন হবে।"

অমিত রাজি হয়ে গেলেন। অতএব দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম অ্যাডভেঞ্চারে, অবতার শিকারে।

যশোর রোড লেকটাউনের মুখে একটি বহুতল বাড়িতে গৌতম ভারতীর শিবকালী আশ্রম। ঢোকার মুখে এক মহিলা রিসেপশনিস্ট। তাঁকে জানালাম—'আলোকপাত' পত্রিকা থেকে আসছি। গৌতম ভারতীর একটি সাক্ষাৎকার পত্রিকায় প্রকাশ করতে আগ্রহী।

মহিলাটি এক কর্মচারীকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন ম্যানেজারবাবুকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। অপেক্ষারত মানুষের সংখ্যা তখনও অন্তত জনা আটেক। ইতিমধ্যে গৌতম ভারতীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সাক্ষাতের একটা ছাপান নিয়মাবলীও সংগ্রহ করলাম। তাতে লেখা গৌতম ভারতীর সাক্ষাৎপ্রার্থীকে অবশ্যই আশ্রমের সদস্য হতে হবে। সদস্য পদ তিন রকমের : (১) ছয় মাসের জন্য ২১১ টাকা। (২) এক বছরের জন্য ৩১১ টাকা (৩) আজীবন ৫৭৫ টাকা। রিসেপনিস্ট নিরুপমা সাউ জানালেন, প্রতিদিন গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন সাক্ষাৎপ্রার্থীকে আচার্য গৌতম ভারতী দর্শন দেন, প্রতিকারের ব্যবস্থা করে দেন। একবার দর্শন করতে গেলেও দর্শনার্থীকে ২১১ টাকা জমা দিতে হবে। প্রতিকার ব্যবস্থার খরচ আলাদা।

ম্যানেজারবাবু এলেন। প্রবীণ, পাকানো চেহারা। সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের দু'জনকে কিছুক্ষণ জরিপ করলেন। আমাদের নাম, আসার উদ্দেশ্য শুনে কিছুক্ষণ কোনও উত্তর না দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর এক সময় সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি বলুন তো ?"

বললাম, "তা তো ঠিক বলতে পারব না। তবে আপনাকে এই প্রথম দেখছি বলে মনে হচ্ছে।"

"আপনি দমদমে থাকেন ?" জিজ্ঞেস করলেন ম্যানেজারবাবু।

"না। থাকি কলেজ স্ট্রিটের মেসে। তবে কাজের সূত্রে অনেক জায়গাতেই ঘুরতে হয়। দমদমেও বহুবার এসেছি।"

আমাকে ও অমিতকে বাড়ির ঠিকানা বলতে বললেন। দু'জনেই বললাম। ম্যানেজারবাবু নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে নিয়ে 'আলোকপাত' পত্রিকার ঠিকানা, ফোন নম্বর, সম্পাদকের নাম ইত্যাদি নিয়েই অনেক প্রশ্ন করলেন এবং কাগজটায় প্রয়োজনীয় উত্তরগুলো লিখে নিলেন। কাগজটা বুক-পকেটে রেখে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রবীর ঘোষকে চেনেন ?" বললাম, "রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুরে কাজ করেন তো ? স্বাস্থ্য ভাল, টাক আছে ?"

"না, না, সে নয়, পত্র-পত্রিকায় ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে লেখে ?" আমার দু-চোখে দৃষ্টি মেলে রেখেই কথাগুলো বললেন ম্যানেজারবাবু।

বললাম, "না, এমন কাউকে চিনি না।"

"আপনার নামটা যেন কী বললেন ?" ম্যানেজারবাবু জানতে চাইলেন।

বললাম, "কুমার রায়।"

"আপনাদের কাছে 'প্রেস কার্ড' আছে ?"

এবার অমিতই উত্তর দিলেন, "আমাদের কোনও সরকারী প্রেস কার্ড ইস্যু করা হয় না।"

"পত্রিকার তরফ থেকেও কোন্ পরিচয়পত্র এনেছেন ?"

অমিত জানালেন, "এখন সঙ্গে নেই। তবে আপনি যদি চান, নিশ্চয়ই পরিচয়পত্র পরশুই দেখিয়ে যাব। কারণ কাল তো রবিবার, অফিস বন্ধ।"

ম্যানেজারবাবু বললেন, "ঠিক আছে, পরশুই পরিচয়পত্র নিয়ে আসুন, সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেব। সাক্ষাৎকারে কী কী বিষয় জানতে চান, সেগুলো একটু বলুন।"

আমিই মুখ খুললাম, জানালাম, "আমাদের লেখার বিষয় সম্মোহন। এই বিষয়ে মনোরোগ চিকিৎসক ও কয়েকজন তান্ত্রিকের সাক্ষাৎকার নিতে আগ্রহী। মনোরোগ চিকিৎসকরা যেমন বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সম্মোহন করেন, তেমনি তন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু তান্ত্রিকরাও তো ছবির সাহায্যেই ফটো সম্মোহন করে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দিচ্ছেন। আমরা শুনেছি আচার্য গৌতম ভারতী ফটোসম্মোহনের সাহায্যে অনেক অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটিয়ে দেন। ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন ঘটিয়ে দেন, শত্রুকে বশ করেন। এই বিষয়েই তাঁর কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।"

৩ আগস্ট সন্ধ্যায় আবার হাজির হলাম শিবকালী আশ্রমে। এ-দিন আমাদের সঙ্গী আরও একজন ; সত্যিকার কুমার রায়—পেশায় চিত্র সাংবাদিক। তখনও জনাদশেক দর্শনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আজও রিসেপশনিস্ট নিরুপমার কাছে হাজির হলাম। আমাদের আসার খবর পাঠালেন ভিতরে। এলেন ম্যানেজারবাবু। ম্যানেজারের হাতে অমিত আমাদের দু'জনের পরিচয়-পত্র তুলে দিলেন, সেই সঙ্গে কুমারের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, "প্রদীপ দাস, আমাদের পত্রিকার চিত্র-সাংবাদিক।" কুমারের কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ দেখে, ওর প্রতি আর সন্দেহ প্রকাশ করলেন না। দেখতে চাইলেন না ওঁর পরিচয়পত্র। আমার প্রতি যে সন্দেহ ছিল সেটা পরিচয়পত্রের কল্যাণে দূর হয়ে যাওয়ায় কুমারকেও প্রদীপ বলে ধরে নিয়েছিলেন।

ভিতরে আচার্যের কাছে আমাদের আগমনের খবর গেল। একটু পরে আহ্বান এলো। দামী কার্পেটে মোড়া মেঝে। মেঝের এক প্রান্তে দেওয়াল ঘেঁষে উঁচু গদী। গদীতে হরিণের ছাল বিছোন। আশে-পাশে কয়েকটা পুরু তাকিয়া। হরিণের ছালে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়স তিরিশের কাছাকাছি বলেই মনে হলো। স্বাস্থ্য ভালো। উচ্চতা কিছুটা কম। গলায় একাধিক সোনার হার শোভা পাচ্ছে। বাহুতে দস্তুরমতো পুরু সোনার পাতে বন্দী রয়েছে ৯টি গ্রহরত্ন। গৌতম ভারতী সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। গৌতমের মুখোমুখি আমি ও অমিত বসলাম। 'প্রদীপ' ছদ্মপরিচয়ের আড়ালে কুমার তাঁর ক্যামেরা নিয়ে তৎপর হলেন শাটার টেপার সময়ের

সন্ধানে।

গৌতম ভারতী একজনকে ডেকে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, "কী খাবেন বলুন ?"

অমিতই বললেন, "মিষ্টি খেতে পারি।"

তিনজনের জন্য মিষ্টি আর ঠাণ্ডা পানীয় আনার নির্দেশ দিয়ে গৌতম আমাদের দিকে নজর দিলেন। বরং সত্যি বলতে কি, আমার দিকেই নজর দিলেন। একটানা মিনিট দশেক পুলিশী জেরার প্রতিটি হার্ডল পার হতে হলো। গৌতম নিশ্চিন্ত হলেন, আমি প্রবীর ঘোষ নই। ইতিমধ্যে তিনটি রেকাবি বোঝাই মিষ্টি এলো, এলো ঠাণ্ডা পানীয়। খেতে খেতে শুনছিলাম গৌতমের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ও অলৌকিক-ক্ষমতার অনেক অনেক কাহিনী। জানালেন, যে কোনও মানুষকে দেখলেই গৌতম তাঁর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পান। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির কাছে মানুষের গোপনীয় কিছুই থাকতে পারে না।

আমি প্রবীর ঘোষ নই, এই বিষয়ে গৌতমের নিশ্চিন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিশ্চিন্ত হলাম, গৌতমের পুঁজি কতখানি জেনে।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে দিয়েও কথা বলাচ্ছিলেন। আবেগতাড়িত মানুষের মত আমিও কথা বলে যাচ্ছিলাম। বলছিলাম আমার অনেক দুঃখের কথা। সাংবাদিকতার লাইনে দীর্ঘবছর থেকেও প্রতিষ্ঠার মুখ দেখতে না পাওয়ার দুঃখের কথা।

গৌতম ভরসা দিলেন। বললেন, "আপনার ভক্তি আছে, অনেক গুণ আছে। জীবনে সফলতা পেতে প্রয়োজন সেইসব লুকোন গুণগুলোকে বের করে নিয়ে এসে ঠিক মত কাজে লাগান। একজন অভিনেতার সমস্ত প্রতিভাকে দর্শকদের সামনে সফলভাবে হাজির করতে পারেন শুধুমাত্র একজন সফল ডাইরেক্টর। মায়ের ইচ্ছেয় আপনি যখন আমার কাছে এসেই পড়েছেন, তখন আর চিন্তা কী ? ডিরেক্টরের ভূমিকা না হয় আমিই নেব। ধরুন...ধরুন...ধরুন..."

গৌতম হঠাৎ তাঁর ডান হাতটা শূন্যে তুলে কাঁপতে কাঁপতে নামিয়ে আনলেন। আমার কপালে তাঁর কাঁপা কাঁপা হাতটা ঠেকিয়ে আমার ডান হাতে দিলেন একটি শিকড়। অমিতের হাতেও দিলেন একটি শিকড়। বললেন, "এই শিকড়টা সব সময় সঙ্গে রেখে দেবেন। মঙ্গল হবে। মানসিক শক্তি বাড়বে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "শিকড় দুটো কি আপনার হাতেই ছিল ? নাকি ও-দুটো সৃষ্টি করলেন ?" আমার স্বরে স্পষ্ট বিহ্বলতা।

গৌতম হাসলেন। বললেন, "ওগুলো শূন্য থেকেই সৃষ্টি করেছি। এই তো কয়েকদিন আগে আপনাদের বিখ্যাত গায়ক অমৃক সিং অরোরাকে ঠিক এমনিভাবেই এনে দিয়েছিলাম একটা বড়সড় রঙিন পাথর।"

বিস্মিত আমি বললাম, "এতদিন জানতাম নেই থেকে আছে হয় না। আজ নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম। আসলে তবুও ধন্দ থেকেই যায় ; যা দেখেছি সেটা ম্যাজিক নয় তো ? অথবা, সম্মোহনের ফল ? এতদিনের বিজ্ঞান পড়ার সংস্কার থেকে চট্ করে বেড়িয়ে আসাও তো সহজ কথা নয়। ভরসা দিলে একটা অনুরোধ করি।"

"বলুন বলুন !" আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গৌতম আমার দিকে তাকালেন—যে চোখে শিকারী শিকারকে খেলিয়ে তোলার মুহূর্তে তাকিয়ে থাকে।

শিশুর সরলতা নিয়েই আবদার করলাম, "আমি শিকড়টা মুঠো বন্দী করছি। আপনি এটাকে একবারের জন্য অদৃশ্য করে দিয়ে দেখান, আছে থেকে আবার নেই-তেও কোনও কিছুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।"

আমার কথায় গৌতম মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে পড়লেন। তারপরই বহু বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানসেবী রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিতসমাজের প্রণম্য গৌতম প্রণাম পাওয়ার যোগ্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে গর্জন করে উঠলেন,"আমি শুধু ঈশ্বরের দাস, আর কারও দাস নই। আপনার কথা শুনব কেন মশাই ?"

বুঝলাম, ডোজটা একটু কড়া দিয়ে ফেলেছি। কাঁচুমাচু হয়ে বোকা-বোকা চোখে এমন করে গৌতমের দিকে তাকালাম, যেন অজ্ঞতার দরুন অন্যায় কিছু করে ফেলে বড় বেশি কুণ্ঠিত।

অবস্থা সামাল দিতে অমিত প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। জানতে চাইলেন, "আপনার দৃষ্টিতে অর্থাৎ একজন সিদ্ধ তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে সম্মোহন কী ?"

উত্তরে গৌতম শুরু করলেন, "সম্মোহনের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'হিপ্‌নোটিজম্'। 'হিপ্‌নোটিজম্' কথাটি আবার এসেছে 'হিপ্‌নোসিস্' কথা থেকে। 'হিপনোস্' কথার অর্থ ঘুম। স্বাভাবিক ঘুমের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও সম্মোহন-ঘুম আর স্বাভাবিক-ঘুম এক নয়, কারণ দু'য়ের মধ্যে অ-সাদৃশ্যও কম নয়। তবে এটা বলা যায়, সম্মোহন ঘুমেরই রকমফের, এবং জেগে থাকা ও ঘুমের একটা অন্তবর্তী অবস্থা।...

...কোলের ছোট্ট বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর কৌশল ও সম্মোহন-ঘুম পাড়ানোর কৌশল অনেকটা একই ধরনের। শিশুদের ঘুম পাড়ানো হয় একটানা একঘেয়ে সুরে গান গেয়ে। সম্মোহনের জন্যেও সম্মোহনকারী প্রায় একই ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। সম্মোহনকারী যাকে সম্মোহন করতে চায়... ।"

গৌতমের মুখ নিঃসৃত বাণী শুনে বুঝলাম, গত দু'দিনে তিনি "অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির প্রথম খণ্ডের 'সম্মোহন' অধ্যায়টা ভালমতই মুখস্ত করে ফেলেছেন। অমিত একটা স্লিপ লিখে আমার হাতে এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা—"ও যে আপনারই বই থেকে মুখস্ত বলে যাচ্ছে।"

গৌতম তাঁর সম্মোহন শক্তির যে দুটি উদাহরণ আমাদের সামনে উত্থাপন করলেন, সে দু'টিরই উল্লেখও 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইতেই আছে। আমাদের মনোযোগিতায় গৌতম আরও উৎসাহিত হলেন। বললেন, কারোকে চোখ বন্ধ করতে বলে তার শরীরে প্রচণ্ড গরম কিছু ঠেকান হচ্ছে, এমন ধারণা সঞ্চার করে স্রেফ একটা আঙুল ছুঁইয়ে সম্মোহিত মানুষটির শরীরে ফোস্কা ফেলে দিতে পারেন। পারেন সম্মোহনের সাহায্যে বহু রোগীকে রোগ মুক্ত করতে।

বললাম, "সত্যি বলতে কি, আপনার মুখ থেকে শোনা সত্ত্বেও কথাগুলো বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। আপনি যদি আমার হাতে একটু ফোসকা ফেলে দেখান... ।"

গৌতম চতুর মানুষ। যা পারেন না, তা গল্পেই সীমাবদ্ধ রাখেন, ঘটাবার চেষ্টা করেন না। এ-ক্ষেত্রেও তার অন্যথা করলেন না। বললেন, "মাঝে মাঝে আসুন।

সময়ে অনেক কিছুই দেখতে পাবেন।"

অমিত ফটো সম্মোহনের বিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। গৌতম জানালেন, "তন্ত্র হল বিজ্ঞান। তথাকথিত সাধারণ বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, তন্ত্রের সেখানে শুরু। এতক্ষণ আপনাদের যে-সব সম্মোহনের কথা বলছিলাম, সেগুলো ঘটাতে তন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, সামান্য চেষ্টাতেই যে কোনও মনোবিজ্ঞানীই ওইসব ঘটনা ঘটাতে পারেন। কিন্তু ফটো সম্মোহন—সেটা হল তন্ত্রের এক বিশেষ জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার কোনও একজনের ছবি পেলে সেই ছবির সাহায্যেই ছবির মালিককে সম্মোহিত করা যায়। অনেক ব্যর্থ প্রেমিক বা প্রেমিকা তাঁদের ব্যর্থ-প্রেমকে সফল করে তুলতে আমার কাছে আসে। তাদের কষ্ট দেখে ফেরাতে পারি না। ফটো সম্মোহন করে মিলন ঘটিয়ে দিয়ে ব্যর্থ জীবনে বাঁচার আনন্দ এনে দিই। আর এতেই আমার আনন্দ।"

"ব্যাপারটা কেমন ভাবে ঘটান ?" সত্যিকারের কুমার রায়ই এবার প্রশ্ন করলেন।

"ধরুন একটি ছেলে এলো। একটি মেয়ের সঙ্গে গভীর প্রেম ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাড়ির চাপে বা অন্য কোনও কারণে মেয়েটি ছেলেটিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলছে। বা বলা যায় ছেলেটিকে নিজের জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চাইছে। ছেলেটিকে বললাম তার প্রেমিকার একটি ছবি এনে দিতে। ছেলেটি একটি ছবি এনে দিল। এ-বার শুরু হল যাগযজ্ঞের সাহায্যে তন্ত্রমতে মেয়েটিকে সম্মোহন করা। মেয়েটি যত দূরেই থাক, তন্ত্রের এই সম্মোহন শক্তিকে কিছুতেই সে এড়াতে পারবে না। তার মস্তিষ্ক কোষে ধারণা সঞ্চার করে দিই—সে ছেলেটিকে ভালবাসে। ছেলেটিকে ভালবাসার মধ্যেই সে খুঁজে পাবে জীবনের সার্থকতা। এমনি তিনটে সিটিং—এরপর দেখা যাবে, মেয়েটি ছেলেটির বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছে না। ছেলেটির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুল হয়ে রয়েছে। ফলে দু'জনের মিলন ঘটতেও দেরি হয় না।"

আমি প্রশ্ন তুললাম, "প্রতিটি ক্ষেত্রেই কি ফটো সম্মোহনে সফলতা পাওয়া সম্ভব ?"

গৌতমও পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কেন সম্ভব নয় ? তন্ত্র যদি বিজ্ঞানই হয় তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা আসতে বাধ্য। যেমন একের সঙ্গে এক যোগ করলে সব সময়ই দুই হতে বাধ্য। যাদের দায়িত্ব নিয়েছি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছি।"

গৌতম ভারতীর আদেশে ম্যানেজারবাবু কিছু খাতাপত্তর বের করে দিলেন। গৌতম সে সব ঘেঁটে চারটি নাম বের করে দিলেন, মালা বসাক, সৌমিত্র সেন এবং স্মৃতিরেখা চ্যাটার্জি, আলোক ব্যানার্জি। বললেন, "এদের মিলন ঘটিয়েছি ফটোসম্মোহন করে।"

বললাম, "সব কিছু জানা-বোঝার পরও সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে। আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, তার ভালবাসা চাই, মেয়েটির ছবি আপনাকে হাজির করতেই আপনি তাকে আমার করে দিলেন—ভাবতে পারা যাচ্ছে না।"

"ভাবতে না পারার মত অনেক কিছুই এই পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। এই যে আমি 'মোহিনী ঔষধি' দিয়ে থাকি, এর এমনই বশীকরণ শক্তি যার প্রভাবে যে কোন শত্রুকে,

যে কোন স্ত্রী বা পুরুষকে বশে আনা সম্ভব।" জানালেন গৌতম।

বললাম, "তাহলে ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকাদের 'মোহিনী ঔষধি' না দিয়ে এত যাগযজ্ঞ করে ফটোসম্মোহন করার দরকার কী ?"

গৌতম জানালেন, "মোহিনী ঔষধি'-তে বশ করা আর প্রেম পাওয়া কি এক ব্যাপার ? ফটোসম্মোহনে সম্মোহিত করে একজনের মনে আর একজনের প্রতি প্রেম জাগিয়ে তুলি।"

অমিত জিজ্ঞেস করলেন, "ফটো সম্মাহনের জন্য কত নেন ?"

গৌতম জানালেন, "কোনও টাকা-পয়সাই নিই না। যজ্ঞের খরচটুকুই শুধু নিই।"

"সেটা কত ?" অমিতই জিজ্ঞেস করলেন।

"তিন হাজার এক টাকা।"

"আমি বললাম, "আপনার সমস্ত কথা শোনার পর কয়েকটা বিষয় আমার মাথায় জট পাকিয়ে গেছে। আপনি ফটো সম্মোহনের বিষয়ে বলার আগে সম্মোহন প্রসঙ্গে যে-সব কথা বললেন, এমনকি আপনি সম্মোহন করে দু-জনের ক্ষেত্রে যে দুটো ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে জানালেন সে সবই আমি সম্প্রতি পড়েছি। অমিতই মাস-খানেক আগে আমাকে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইয়ের অংশ-বিশেষের ফটো কপি পড়তে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গ ছিল সম্মোহন। তাতে এ-সবেরই উল্লেখ ছিল। সম্মোহনের সাহায্যে অনেক রোগীকে আরোগ্য করা যায় বলে আপনি যে সব কথা বললেন, সে-সব কথার সঙ্গে সম্প্রতি আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার হুবহু মিল লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল, 'সম্মোহন ও রোগমুক্তি'। সম্মোহন প্রসঙ্গে পড়ে যতটুকু জেনেছি, তাতে সম্মোহন হলো মস্তিষ্কস্নায়ু কোষে ধারণা সঞ্চারের ব্যাপার। অর্থাৎ, সম্মোহন করার প্রাথমিক শর্ত, আপনি যার মধ্যে কোনও ধারণা সঞ্চার করতে চাইবেন তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ অবশ্যই থাকতে হবে। আপনি ফটোর মধ্যে ধারণা সঞ্চারিত করবেন কী করে ? ফটো তো জড় বস্তু। ফটোর মস্তিষ্ক, স্নায়ু বা মন আছে, এ ধরনের কল্পনা তো স্রেফ পাগলামি বা চূড়ান্ত অজ্ঞতা। আপনাকে যদি চ্যালেঞ্জ জানাই, ফটো সম্মোহনের বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারবেন ?"

মহা অলৌকিক শক্তিধর, অবতার গৌতম ভারতী আমার কথায় ফ্যাকাশে মেরে গেলেন। তাঁর বড় বড় চোখ দুটো সরু সরু হয়ে গেল। ফোলান বুক থেকে হাওয়া বেরিয়ে গেল। সামনের দিকে ঝুঁকে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। নিজের অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিলেন। অনুরোধ করলেন তাঁর বিষয়ে বিরূপ কিছু না লিখতে।

'৮৭-র নভেম্বর সংখ্যা আলোকপাতে 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয় ?' শিরোনামে লেখাটি প্রকাশিত হলো। সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখাটির লেখক তাপস মহাপাত্র ও অমিতবিক্রম রাণা। প্রতিবেদনটিতে লেখক জানালেন, "ছদ্মবেশে যাওয়া সুদক্ষ সম্মোহনবিদ প্রবীর ঘোষকে তিনি (গৌতম ভারতী) চিনতে পারলেন না কিছুতেই। শুধু তাই নয় প্রবীরবাবুর লেখা, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বই-এর হুবহু উদাহরণ দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি বলে বাহবা চাইতেও ছাড়েননি।... প্রবীরবাবুর একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তরে শেষ পর্যন্ত হার মানলেন শ্রীযুক্ত ভারতী। কিন্তু তাঁর এইসব তন্ত্রমন্ত্রের বুজরুকি কথাবার্তা প্রকাশ না করার জন্য অনুরাধও করলেন। কেননা এতে তাঁর

ব্যবসার ক্ষতি হবে।" এই প্রবন্ধে প্রতিবেদক আরও জানান, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ ফটো-সম্মোহন ক্ষমতার দাবিদারদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন কেউ তাঁদের দাবির যথার্থতা প্রমাণ করতে পারলে তিনি দেবেন ৫০,০০০ টাকা। "আসলে পুরো ব্যাপারটাই ফাঁকি। মানসিক ভারসাম্যহীন বিরহী প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক ঘৃণ্য উপায়ে ঠকান।"

লেখাটির সঙ্গে গৌতম ভারতীর ভণ্ডামীর চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে ছদ্মপরিচয়ে চিনতে না পারা আমাকে আশীর্বাদরত গৌতম ভারতীর একটি ছবি প্রকাশিত হয়।

'আলোকপাত' জানুয়ারী '৮৮ সংখ্যায় 'পাঠকের অধিকার' বিভাগে একটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক অমৃক সিং অরোরা এবং গৌতম ভারতীর অন্যান্য ভক্তবৃন্দ জানান,

'নভেম্বর '৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয়?' লেখাটিতে লেকটাউন শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রম এবং আচার্য শ্রীগৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতী সম্পর্কে প্রবীর ঘোষের মিথ্যা ভাষণের প্রতিবাদ জানাই। গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতীর সঙ্গে অনেক মহাপুরুষকে এভাবে প্রবঞ্চক হিসেবে তুলে ধরার জন্য আমরা ব্যথিত। নিজস্ব মতামত দিয়ে কাউকে এভাবে নস্যাৎ করার এবং হীন বলে প্রচার করার ক্ষুদ্র মানসিকতার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

উত্তরে আমি যে চিঠি দিই, তা 'আলোকপাত' মার্চ ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জানাই,

"জানুয়ারি '৮৮ সংখ্যা আলোকপাতের পাঠকের অধিকার-এ প্রকাশিত আচার্য শ্রীগৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতীর ভক্তবৃন্দের প্রতিবাদপত্রের উত্তরে জানাই উক্ত প্রবন্ধটির লেখক আমি নই, লেখক হলেন—তাপস মহাপাত্র ও অমিতবিক্রম রাণা। শ্রীরাণা আমার একটি সাক্ষাৎকার নেন। তাঁর কাছেই শুনতে পাই তিনি আপনাদের গুরুদেবের একটি সাক্ষাৎকার নেবেন। আমি একজন অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে সত্যানুসন্ধানী মানুষ হিসেবে শ্রীরাণার সঙ্গী হতে চাইলে তিনি সানন্দে রাজি হন। তারপর যা ঘটেছে, যা দেখেছেন, তাই শ্রীরাণা লিখেছেন একজন সৎ সাংবাদিক হিসেবেই। অতএব এই লেখার মধ্যে আমার ভাষণ আসছে কোথা থেকে? মিথ্যেই বা আসছে কোথা থেকে?

যাই হোক এ-বিষয়ে চিঠির কূট-কচালির কোন প্রয়োজন আছে কী? বরং আপনাদের গুরুদেবকে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে (নিয়মমত ৫,০০০ টাকা জমা রেখে ৫০,০০০ টাকার চ্যালেঞ্জ) আমার বিরুদ্ধে সমুচিত জবাব দিতে বলুন।"

'৮৭ শেষ হলো, '৮৮ শেষ হলো। গৌতম ভারতী জবাব দিতে হাজির হলেন না। বিপুলভাবে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়ে হাজির হলেন '৮৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। ১৯ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় ও ২১ ফেব্রুয়ারি আজকাল পত্রিকায় আলোকপাতের সেই ছবিটি সহ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো।

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

ঐশী শক্তির জয়

যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ পৃথিবীর সমস্ত সন্ত-মহাপুরুষদের ধোঁকা-বাজ বলে তাঁদের কুৎসা প্রচারে পঞ্চমুখ। কিন্তু পরিণামে সত্যের জয় নিশ্চিত। এহেন প্রবীরবাবু—৯৯ডি/১ লেকটাউন (লেকটাউন ও যশোর রোডের সংযোগ স্থল) শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমে আচার্য শ্রীমদ গৌতম ভক্ত সিদ্ধান্ত ভারতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমদ ভারতীর কাছে সকল প্রশ্নের সুসমাধান পেয়ে প্রবীরবাবু মাথা নত করে ভারতীজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীগৌতম ভারতীর নিকট আশীর্বাদ গ্রহণরত প্রবীর ঘোষ।
বিজয় দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারী,দমদম পৌর প্রতিষ্ঠান
৭/২ যশোর রোড, কলিকাতা-২৮

আজকাল ২১ ফেব্রুয়ারি '৮৯ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

পরাজিত প্রবীর ঘোষ

এক শোচনীয় ও মর্মান্তিক পরাজয়। যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ লেকটাউনস্থিত শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রম—৯৯ডি/১ লেকটাউন, কলিকাতা-৮৯-এর

অধ্যক্ষ মাতৃসাধক আচার্য্য শ্রীমদ্ গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতী ঠাকুরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণে মাথা নত করতে ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে বাধ্য হন। ইতি—

শ্যামাপদ ঘোষ

এরও একটা পশ্চাৎপট রয়েছে। সেই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১২ ফেব্রুয়ারী আজকাল পত্রিকার 'রবিবাসর'-এ আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম—'আমার চ্যালেঞ্জাররা'। লেখাটিতে গৌতমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলাম। সেই সঙ্গে জানিয়েছিলাম—পত্রিকাটিতে (আলোকপাত) প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ জানিয়েছেন গৌতম ভারতী তাঁর ফটো সম্মোহনের যথার্থতা প্রমাণ করতে পারলে শ্রীঘোষ দেবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। সে নিয়েও কম জল ঘোলা হয়নি, চিঠি-চাপাটির অনেক চাপান-উতোর চলেছিল। আমি একটি চিঠিতে লিখেছিলুম, গৌতম ভারতী তাঁর দাবির সমর্থনে প্রমাণ দিলেই যেখানে ল্যাঠা চুকে যায়, সেখানে এত চিঠির কূট-কচ্‌কচানির কী আছে?"

আজকাল-এর লেখাটির সঙ্গে একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। ছবিটি ছিল শ্রীশ্রীসদানন্দ দেবঠাকুর ও আমার। কিন্তু ভুলে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে ছবির তলায় ছাপা হয়েছিল—গৌতম ভারতীর সঙ্গে লেখক।

আমি যে লেখাটি আজকাল পত্রিকার 'রবিবাসর' বিভাগে দিয়েছিলাম, তাতে সদানন্দ দেবঠাকুর বিষয়েও কিছু লিখেছিলাম। সম্ভবত স্থানাভাবে অংশটিকে বাদ দিতে হয়। ফলে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ার বা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা ছিল।

এই বিজ্ঞাপন দুটি বিশাল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। অলৌকিকতার ব্যবসায়ী ও জ্যোতিষ ব্যবসায়ীরা এবং তাদের অন্ধ ভক্ত ও উচ্ছিষ্টভোগীরা এবং অলৌকিকতায় বিশ্বাসী সাধারণ মানুষেরা যুক্তিবাদের এই পরাজয়ের খবরে প্রচণ্ডভাবে উল্লসিত হয়েছে। প্রতিটি যুক্তিবাদী আন্দোলনে ব্রতী স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানকে অপ্রিয় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অপমানিত হতে হয়েছে, ধিকৃত হতে হয়েছে। কয়েকটা দিনের জন্য বহু ক্ষেত্রেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন। ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় শত শত সংগঠনের চিঠির পাশাপাশি বহু মানুষের উৎকণ্ঠাভরা বাস্তব সত্যকে জানতে চাওয়া চিঠির পাহাড় জমেছিল। ভোর থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত বাড়িতে এসেছেন দূরের-কাছের বহু গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তাঁরা অনেকেই অভিযোগ করছেন, অলৌকিক বিরোধী অনুষ্ঠানের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, দেওয়াল লিখনে লেপে দেওয়া হচ্ছে আলকাতরা, হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে প্রচার-পত্র ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। অলৌকিক বিরোধী অনুষ্ঠানের ওপর হামলা চালান হচ্ছে।

আমাদের সংগ্রামী সাথী যাঁরাই এসেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই বক্তব্য ছিল—একটা কিছু করতে হবে। কোণঠাসা অবতাররা আজ যে আক্রমণ চালিয়েছে, তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে না দিলে আমাদের আন্দোলনের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমরা সঠিক আঘাত হানতে পারছি বলেই অবতাররা আজ আমাদের প্রত্যাঘাত

করেছে।

কী করবো আমরা ? কুসংস্কার মুক্তির এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন যখন সঙ্কটের আবর্তে পাক খাচ্ছে তখন আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল—বিজ্ঞাপনের জবাবে পাল্টা বিজ্ঞাপন দেওয়া। কারণ, আমাদের যতদূর জানা আছে, ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ পাঠান কোনও চিঠি প্রথম শ্রেণীর কোনও ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। আবার ধনকুবের অবতারদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনের লড়াইয়ে নামলে তা হয়ে দাঁড়াবে অসম লড়াই। আমরা খবর পাচ্ছিলাম কিছু অবতার ও জ্যোতিষীরা এই লড়াইকে তাঁদের বাঁচার শেষ লড়াই হিসেবে ধরে নিয়ে একত্রিত ও সংগঠিত হয়েছেন। এক অবতারের টাকার জোরের সঙ্গে টক্কর দিতেই যখন আমরা অপারগ, তখন বহুর বিরুদ্ধে লড়ব কেমন করে ? আমরা যখনই একটা কাগজে ছোট্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে বাস্তব সত্যকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরবো, তখন বিরোধী শিবির দশটা কাগজে দশটা ঢাউস বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

ইতিমধ্যে 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'। আমরা বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ও অগ্রণী বিজ্ঞান সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে অলোচনায় বসলাম আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে। সমস্ত রকমের সক্রিয় সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা। ওই উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যেই কয়েকজন অভিযোগ তুললেন, একটি স্ব-বিজ্ঞাপিত যুক্তিবাদী সমাজ সচেতন মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকার কিছু কাছের মানুষ ইতিমধ্যে প্রচারে নেমে পড়েছে—প্রবীর ঘোষ ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পরাজয় মেনে নিয়েছে। আমাদের দেশে ঈর্ষাকাতর মানুষের কোনও দিনই অভাব ছিল না। কিন্তু এমন অভাবনীয় বিপদের দিনে কেউ সহযোগিতার পরিবর্তে মিথ্যে কুৎসা রটিয়ে আখের গুছোতে চাইবে এটা বিজ্ঞান আন্দোলনের পক্ষে যেমনই দুঃখজনক, তেমনই ঘৃণ্য চক্রান্ত। অবশ্য এই ধরনের যুক্তি-বিরোধী, মিথ্যাচারিতা ও ঈর্ষাপরায়ণতার বহু দৃষ্টান্ত এর আগেও ওই পত্রিকাটি স্থাপন করেছে। আরো একবার ওদের আসল রূপটা আমাদের দেখাল।

আমরা সাধারণ মানুষের কাছে সত্যকে তুলে ধরার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকার 'সম্পাদক সমীর্পেষু' বিভাগের সম্পাদক ধীরেন দেবনাথের হাতে প্রতিবাদপত্র তুলে দিলে তিনি জানালেন, মিথ্যে বিজ্ঞাপনের দরুন কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের প্রতি তাঁর সমস্ত রকম সহানুভূতি থাকলেও, আমাদের চিঠি ছাপতে তিনি অপারগ। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অভীক সরকার ও আজকাল পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তকে আমাদের সমস্যার কথা জানিয়ে কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের স্বার্থে সত্যকে তুলে ধরার অনুরোধ রেখেছিলাম। দুজনেই সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন।

২২ ফেব্রুয়ারি আজকাল পত্রিকায় 'প্রিয় সম্পাদক' বিভাগে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে আমার লেখা চিঠিটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে প্রকাশিত হয় আরও তিনটি চিঠি—

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

বুজরুকরা মিথ্যা বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিচ্ছেন

যুক্তিবাদীদের সঙ্গে লড়াই-এ না পেরে বুজরুকরা এখন মিথ্যা বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিচ্ছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আজকালের প্রবীর ঘোষ ও ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বিরুদ্ধে শ্যামাপদ ঘোষ যে সচিত্র বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন তা নির্জলা মিথ্যা। তথ্য ও সত্যের মারাত্মক বিকৃতি ঘটিয়েছেন তিনি। বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয়েছে লেকটাউন শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমদ গৌতম সিদ্ধান্ত ভারতীর কাছে পরাজিত হয়ে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছেন। বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ছবিটি '৮৭ সালের নভেম্বরে 'আলোকপাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তলায় ক্যাপসন ছিল 'এই গৌতম সিদ্ধান্ত ভারতীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন প্রবীর ঘোষ।' বিজ্ঞাপনে ক্যাপসনটিকে সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া হয়েছে। ছবির সঙ্গে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকেই পরিষ্কার যে গৌতম ভারতীর অলৌকিক ক্ষমতা কিছুই নেই। আলোকপাতে প্রকাশিত ঐ লেখাটির শিরোনাম ছিল 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয় কি?' লেখক ছিলেন তাপস মহাপাত্র ও অমিত বিক্রম রাণা। ছবিটি তুলেছিলেন কুমার রায়। প্রতিবেদনে লেখকদ্বয় জানিয়েছিলেন 'ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক পৌঁছুনোমাত্র আশ্রমাধ্যক্ষ (অর্থাৎ গৌতম ভারতী) হঠাৎই ম্যাজিকের মত খালি হাতটি এগিয়ে দিয়ে হাতের মুঠো থেকে বের করলেন নাম-না-জানা শিকড়। এ দিব্যদৃষ্টি। সম্মোহনে ত্রিকাল দর্শনও করতে পারে। এসব তাঁর দাবি। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশে যাওয়া সুদক্ষ সম্মোহনবিদ্ প্রবীর ঘোষকে তিনি চিনতে পারলেন না কিছুতেই'...'প্রবীরবাবুর একটার পর একটা প্রশ্নে হার মানলেন শ্রীযুক্ত ভারতী। কিন্তু তাঁর এইসব তন্ত্রমন্ত্রের বুজরুকি কথাবার্তা প্রকাশ না করার জন্যও অনুরোধ করলেন। কেন না এতে তাঁর ব্যবসার ক্ষতি হবে। এই লেখা থেকে পরিষ্কার হার আমার হয়নি। হেরেছেন তিনিই। ছবিটিরও একটা নেপথ্য কাহিনী আছে। গৌতম ভারতীর কাছে আমি গিয়েছিলাম আত্মপরিচয় গোপন করে। সাধারণ ভক্ত সেজে। নাম দিয়েছিলাম কুমার রায়। কিন্তু সবজান্তা এই গুরুদেব আমার আসল পরিচয় জানতে পারেননি। আর পাঁচটা ভক্তকে যেমন আশীর্বাদ করেন তেমনভাবেই আশীর্বাদ করেছিলেন আমাকে। আমি নিশ্চিত আমার পরিচয় জানার পর তিনি আমাকে আশ্রমে ঢুকতেই দিতেন না। আমার পক্ষেও সম্ভব হত না তাঁর বুজরুকি ধরা। আমাকে চিনতে না পেরে আশীর্বাদরত গৌতম ভারতীর এই ছবিটিই 'আলোকপাতে' ছাপা হয়েছিল। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর আবার আসরে নেমেছেন গৌতম ভারতীর 'ভক্তরা'। কিছুদিন আগে 'আজকাল' পত্রিকায় রবিবাসরে 'আমার চ্যালেঞ্জাররা' শীর্ষক লেখাটিতে গৌতম

ভারতীর বুজরুকির মুখোশ আর একপ্রস্থ খুলে দেবার পরই আমার বিরুদ্ধে এই বিজ্ঞাপন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতা শ্যামাপদ ঘোষ সহ প্রতিটি বুজরুক এবং তাঁদের ধারকবাহকদের উদ্দেশ্যে জানাই টাকার জোরে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের দেশে গড়ে ওঠা কুসংস্কার বিরোধী গণ আন্দোলন বন্ধ করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। আপনাদের বিজ্ঞাপন প্রমাণ করে আপনারা ভীত, সন্ত্রস্ত। তাই মিথ্যাচারিতাকে আশ্রয় করে গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে আঘাত করতে চাইছেন। আমি আবার চ্যালেঞ্জ করছি আপনাদের গুরুদেবকে বলুন, সবসর্মক্ষে তাঁর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রমাণ করতে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ধৃষ্টতা যদি আপনার গুরুদেবটি দেখান তাহলে তাঁর মাথা যুক্তিবাদী মানুষের পায়ে তথা আন্দোলনের কাছে নত হতে বাধ্য হবে।'

প্রবীর ঘোষ, সম্পাদক, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

কেন এই লেখা ?

আমরা ক্ষুব্ধ

(১)

জনৈক প্রবীর ঘোষের 'আমার চ্যালেঞ্জাররা' শীর্ষক লেখা পড়লাম। ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবাসরে। এ ধরনের একজন আনাড়ির লেখা আজকালের মত প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে দেখে আমরা বিস্মিত। প্রবীর ঘোষ বহু মহাপুরুষের নামে বহু বাজে উক্তি করেছেন। এর মধ্যে লেক টাউনের শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমের অধ্যক্ষ গৌতম ভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতীকে নিয়ে একটি ভুল ছবিও প্রকাশ করেছেন্। এতেই প্রমাণিত হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা ও আচার্যদেবকে হেয় করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আমরা তাঁর এই হীন মনোভাবে ক্ষুব্ধ। আমরাও প্রবীর ঘোষকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, গৌতম ভারতী ঠাকুর সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তার সত্যতা তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে পারলে আমরা তাঁকে ভারতীয় মুদ্রায় ৫০ হাজার টাকা দেব। প্রবীরবাবু নিচের ঠিকানায় কবে আসতে পারবেন জানলে খুশি হব। আমরা তাঁর জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।

বিজয় দাশগুপ্ত, ৭/২, যশোর রোড, কলি-২৮।
অসীম কুমার মিত্র, কলি-৯১।
কাজল কুমার পোদ্দার, কলি-৯
রজত পাল, কলি-৫০ এবং আরও অনেকে।

(২)

গত ১২ ফেব্রুয়ারি প্রবীর ঘোষের লেখা 'আমার চ্যালেঞ্জাররা' লেখাটি পড়ে আমি মর্মাহত। কারণ লেখাটির বিষয়বস্তু ছিল কতিপয় অলৌকিক ম্যাজিক প্রদর্শনকারী জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে। এবং আমার সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ ছিল না। অহেতুক আমার ছবিটি এই বিতর্কিত লেখাটির মধ্যে ছাপা হয়েছে। ছবিটি গৌতম ভারতীর নয়, আমার। এতে আমার হাজার হাজার ভক্ত নরনারীদের সঙ্গে আমিও

অস্বস্তি বোধ করছি। কারণ এই ধরনের অলৌকিক ম্যাজিকে আমি আদৌ বিশ্বাসী নই। আমি একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী ধর্মগুরু। যারা আমার কাছে আসে এবং শান্তি চায় তাদের দিই শান্তিময় দিব্যজীবনের পথের সন্ধান।

শ্রীশ্রীসদানন্দ দেব ঠাকুর
আনন্দধাম। কলকাতা-২৮

(৩)

১২।২।৮৯ তারিখের আজকাল পত্রিকায় শ্রী প্রবীর ঘোষের লেখা 'আমার চ্যালেঞ্জাররা' লেখাটি পড়ে আমরা বিস্ময়ে হতবাক। কারণ শ্রীঘোষ লেখাটিতে কতিপয় জ্যোতিষী তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে গৌতম ভারতী নামে আমাদের পরামারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রী সদানন্দ দেব ঠাকুরের ছবি ব্যবহার করেছেন। এতে তাঁর শিষ্যভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তিনি এ ধরনের অলৌকিক ম্যাজিকের পক্ষপাতী নন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ধর্মীয় ব্যাখ্যায় আমরা আকৃষ্ট। তাঁর উপদেশে আমরা পাই সুস্থ শান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবনের আলোর সন্ধান। কাজেই এ ধরনের বিতর্কিত লেখার মধ্যে তাঁর ছবি একেবারেই শোভা পায় না।

চিরঞ্জীব ব্রহ্মচারী
কলকাতা-৪৯।

ইতিমধ্যে সুসংগঠিতভাবে আমাদের উপর আক্রমণ ও ভীতিপ্রদর্শন চলতেই থাকে। গৌতমের ভক্ত নামধারীরা 'আজকাল' পত্রিকা অফিসেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

আমাদের সমিতি ও আমাদের সহযোগী বহু সংস্থা গৌতমের মিথ্যাচারিতার জবাব দিতে সভা, পথসভা, পোস্টার, লিফলেট নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির হতে থাকেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন সাধারণ মানুষের এক বিশাল অংশ। যুক্তিবাদী আন্দোলনের জনপ্রিয়তায় বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ। এতে বিপদ অনেক। যুক্তিবাদী চেতনার উন্মেষে বিপদ অনেকেরই—তারা তো সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেবেই।

এতো আমাদের অজানা ছিল না। এই আন্দোলন যে শ্রেণীস্বার্থকে আঘাত হানবে সেই শ্রেণী তাদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, তীব্র প্রত্যাঘাত হানবে। এই প্রত্যাঘাতের মুখে কেউ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ পিছু হটবে। আমাদের এই সংগ্রামেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানুষও যেমন পেয়েছি, তেমনি পিছু হটে যাওয়া বাক্য-সর্বস্য মানুষও দেখেছি।

আমাদের দেশের বহু সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে দাবি জানিয়েছিলেন, পুলিশ ও প্রশাসন যেন আক্রান্ত যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সভা-সমিতির মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার

মুখ্যমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গৌতম ভারতীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার ও আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি উঠছিল। আনন্দবাজারের প্রতিনিধি দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী এই সময় আমার একটি সাক্ষাৎকার নেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "পুলিশ বা প্রশাসন সাহায্য না করলে আপনারা কি যুক্তিবাদী আন্দোলন বন্ধ রাখবেন ?"

বলেছিলাম, "একজন নাগরিক হিসেবে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে নিশ্চয়ই আমার ও আমাদের সমিতির ঘনিষ্ঠদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি করতেই পারি এবং করছিও। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও ঠিক, আমরা পুলিশ ও প্রশাসনের উপর নির্ভর করে আন্দোলন করতে নামিনি। প্রত্যাশাও করি না পুলিশ ও প্রশাসন আমাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা নির্ভর করি দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষের উপর। তাঁরাই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁরাই তো আমাদের আন্দোলনের শক্তি।

২৫ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতে চার কলম জুড়ে প্রকাশিত হলো—

'অলৌকিক শক্তিধরদের' চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী

যুক্তির পথ কখনওই সুগম নয়। সংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস যেখানে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখে, সেখানে স্বেচ্ছায় যাঁরা যুক্তিবাদের পথ বেছে নেন, তাঁদের কঠিন পরীক্ষা দিতেই হয়। যেমন এই মুহূর্তে দিতে হচ্ছে প্রবীর ঘোষকে। প্রবীরবাবু ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক। অসংখ্য অবতার, মহাপুরুষ, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা, জ্ঞানগুরু আর 'অলৌকিক শক্তিমান'দের বিরুদ্ধে সারা দেশে এই মুহূর্তে প্রচার চালাচ্ছেন বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিনিষ্ঠ বেশ কিছু মানুষ ও সংগঠন। প্রবীর ঘোষ ও তাঁর সমিতি এঁদেরই অন্যতম। বার বার 'হোলি ম্যাজিশিয়ান'দের চ্যালেঞ্জ জানাতে জানাতে প্রবীরবাবু এখন জড়িয়ে পড়েছেন এক সঙ্কটের ঘূর্ণিতে। প্রথম একটি বিজ্ঞাপন যাতে দাবি করা হয় তিনিও এক 'গুরুর' কাছে মাথা নত করেছেন। এবং প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ করতেই শারীরিক আক্রমণের হুমকির মুখে পড়েন। প্রবীরবাবুর মনে হয়, "ওরা ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে না। ওদের টাকা আছে, তার জোরে ওরা অনেক কিছুই করতে পারে।" তাঁর অভিযোগ, দমদম লেকটাউন অঞ্চলে তাঁদের সমিতির কর্মীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে—যুক্তিবাদী বইয়ের কাউন্টারে এসে বলা হচ্ছে, "প্রবীর ঘোষকে কেউ বাঁচাতে পারবে না ; এসব করলে তোমরাও মরবে।" প্রবীরবাবু ইতিমধ্যেই দমদম থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ এখনও অবধি সক্রিয়তার পরিচয় বিশেষ দেয়নি।

'অলৌকিক শক্তিধর' গৌতম ভারতীকে প্রবীর ঘোষ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছেন অনেক দিন থেকেই। কিন্তু 'অলৌকিক শক্তিধর' বলে কথিত গৌতম ভারতীর সঙ্গে তাঁর নতুন করে বিরোধের কারণ একটি বিজ্ঞাপন—যাতে বলা হয়েছে ভারতীর কাছে

হার মেনে প্রবীরবাবু তাঁর সামনে মাথা নত করেছেন। বক্তব্যের সমর্থনে একটি ছবিও বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ছবি ও কথায় ছিল "পৃথিবীর সমস্ত সন্ত-মহাপুরুষদের ধোঁকাবাজ বলে তাঁদের কুৎসা প্রচারে পঞ্চমুখ" প্রবীরবাবু "শ্রীমদ ভারতীর কাছে সকল প্রশ্নের সুসমাধান পেয়ে মাথা নত করে ভারতীজির আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন।" প্রবীরবাবুর মতে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কতখানি মিথ্যা প্রচার করা যায়— এ তারই নিদর্শন। ছবিটি অবশ্য সাজানো নয়—এক আলোকচিত্রীরই তোলা। সেই ঘটনাও ঘটেছিল সাংবাদিকদের সামনেই, ১৯৮৭ সালে—তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। পরিচয় গোপন করে প্রবীরবাবু উপস্থিত হয়েছিলেন গৌতম ভারতীর সামনে। দিব্যদৃষ্টির অধিকারী বলে প্রচারিত তান্ত্রিক আদৌ বুঝতে পারেননি প্রবীরবাবুর উদ্দেশ্য। বরং দর্শনার্থীদেরই একজন মনে করে ভারতী তাঁকে আশীর্বাদ করেন। সেই ছবিটি তখনই তোলা। একটি পত্রিকায় তা ছাপাও হয়। হুবহু এই ছবিটিই বিজ্ঞাপনেও রয়েছে। সেই পত্রিকার প্রতিবেদনে স্পষ্টই জানানো হয়েছিল, প্রবীরবাবুর বিভিন্ন প্রশ্নে পরাজিত গৌতম ভারতী প্রবীরবাবুকেই অনুরোধ করেছিলেন 'তন্ত্রমন্ত্রের বুজরুকি/কথাবার্তা প্রকাশ না করতে।' এখন প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কিন্তু এর উল্টো কথাই বলা হয়েছে।

যাঁদের নামে এই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে তাঁদের একজন দমদম পৌর প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারি বিজয় দাশগুপ্ত। ' ঐশী শক্তির জয়' শিরোনামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ছবি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, ছবি তোলার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুরীতে। ঘটনাটি লেকটাউনের। তা সত্ত্বেও তিনি জানালেন, বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব তাঁরই। একই মর্মে 'প্রবীর ঘোষ পরাজিত' শিরোনামে আর একটি বিজ্ঞাপনও মুদ্রিত হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপক শ্যামাপদ ঘোষ বললেন, প্রবীরবাবু তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছিলেন। "কিন্তু আশীর্বাদ তো তিনি নিয়েছেন ; আমরা সেটাকেই ঘুরিয়ে প্রচার করছি।"

গেলাম গৌতম ভারতীর কাছেই। বাঘছালের আসনে বসে থাকা এক দোহারা যুবক। জানতে চাইলাম। আপনি কি অলৌকিক-শক্তিমান ?—"আমি ? আমি কিছুই না। সবই মা। আমি কী তা কে বলবে। তোমরা বল।" লক্ষ্য ভক্তরা। তাঁরা গুরুর আশ্চর্য সব ক্ষমতার কথা বললেন। গুরু জানিয়ে দিলেন ক্ষমতা তাঁর নয়, 'ক্ষমতা মায়ের'। তা সত্ত্বেও তিনি পার্থিব সম্পদ কিন্তু পান ভক্তদের কাছ থেকেই। যদিও তাঁর নিজের কথায় "আমি কিচ্ছু নিই না। ওরা দেয়। জোর করে দেয়। না নিলে তো ওদের অপমান করা হয়, তা-ই নিই। এই যে রুপোর গ্লাস, ওই যে ওটা (এয়ারকুলার), সব জোর করে ব্যবহার করায় আমাকে দিয়ে।"

এক ভক্ত জানালেন, গুরুর কোনও দাবি নেই। কেউ দু'হাজার টাকা দিলে তা-ই নেন ; কেউ পঁচিশ হাজার দিলে তা-ও নেন।

আপনি কীভাবে রোগ সারান ?

—আমি না, আমি না—মা সারান। আমি হাত মুঠো করি। মা সন্দেশ দিলে আমি সন্দেশ দিই, মা রসগোল্লা দিলে আমিও রসগোল্লা দিই। বারবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও কিন্তু বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনায় গেলেন না তিনি। শুধু বললেন, "ও সব ভক্তদের কাজ।"

তারপরেই সারাক্ষণ করজোড়ে বসে থাকা গৌতম ভারতী সুর পাল্টে বললেন, "তবে উনি (প্রবীর ঘোষ) বড় বাড়াবাড়ি করছেন, ওর ব্যবস্থা ভক্তরাই করবে।" সেই সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন, কাগজগুলোও যদি বাড়াবাড়ি করে, ভক্তরাই ব্যবস্থা নেবে। "আমি ওদের বারণ করি, ওরা আমার কথা শোনে না।"

চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি ; যা জানা যাচ্ছে তা থেকে মনে হচ্ছে প্রবীরবাবুর বিরুদ্ধে ভক্তরা 'ব্যবস্থা নিতে' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদিও গৌতম ভারতী এও বলেছিলেন, "কে এই প্রবীর ঘোষ ? সে বিখ্যাত লোকের গায়ে কাদা ছুঁড়ে বিখ্যাত হতে চাইছে।" মজার কথা, গৌতম ভারতীর শিষ্যরাই কিন্তু এই বিজ্ঞাপন ছেপে প্রবীরবাবুকে আরও বিখ্যাত হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। বার বার প্রশ্ন করে জেনেছি গৌতম ভারতী প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগ্রহী নন। প্রবীরবাবু কিন্তু স্পষ্টই বলেছেন, "মিথ্যাচারিতাকে আশ্রয় করে টাকা-পয়সার জোরে ওরা বিজ্ঞান-আন্দোলনকে আঘাত করতে চাইছে।" ভক্তদের কাছে প্রবীরবাবু তাঁদের গুরুদেবের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রকাশ্যে প্রমাণের চ্যালেঞ্জও জানিয়েছেন।..........(একটি সূত্রের খবরে প্রকাশ ইতিমধ্যেই লেকটাউনের শিবকালী আশ্রমের গৌতম ভারতী ও তার দাদা দমদম শিবকালী আশ্রমের গৌতম ভারতীর সঙ্গে আরও দু-একজন তান্ত্রিক ও জ্যোতিষী যুক্ত হয়েছে)।..........

২ মার্চ 'আজকাল' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলো আর একটি ছবি সহ খবর—

আত্মহত্যার চেষ্টায় 'অলৌকিক শক্তিধর' গৌতম ভারতী হাসপাতালে : ভাঙচুর, পুলিস

দেবাশিস ভট্টাচার্য : 'আত্মহত্যার' চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে 'অলৌকিক শক্তিধর' গৌতম ভারতী এখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সির তিনতলার বেডে চিকিৎসাধীন। দমদম লেকটাউনের শ্রীশ্রী শিবকালী আশ্রমের 'অলৌকিক শক্তিধর' এই আচার্য বুধবার ভোররাতে নিজের তলপেটে ভাঙা কাচের বোতল ঢুকিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধান। হঠাৎ-ই অ্যাপেন্ডিসাইটিসের প্রচণ্ড ব্যথা ওঠায় 'অলৌকিক শক্তিধর' গৌতম ভারতী যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একটি বোতল ভেঙে নিজের তলপেটের ডানদিকে ঢুকিয়ে দেন। তারপর যন্ত্রণা-কাতর গৌতম ভারতীর চিৎকারে আশ্রমের ভক্ত-শিষ্যরা ছুটে এসে দেখেন চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওই অবস্থায় তাঁর ভক্ত-শিষ্যরা গৌতম ভারতীকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এমার্জেন্সির তিনতলায় সি বি টপ ১৩৬ নম্বর বেডে তাঁকে ভর্তি করা হয়। ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করেন। বুধবার সকালেই তাঁর অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করা হয়। অপারেশনের পর প্রায় সারাদিনই তিনি ছিলেন অচৈতন্য। সন্ধ্যে নাগাদ ধীরে ধীরে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। সারাদিনই তাঁর স্যালাইন চলে। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ এক সিস্টার তাঁকে ইঞ্জেকশন দিতে এলে গৌতম ভারতী আবার রুদ্রমূর্তি ধরেন। হঠাৎই উন্মত্তের মত আচরণ

করতে থাকেন তিনি। চিৎকার করতে করতে তিনি বেড থেকে লাফ দেন। তাঁর নিজের স্যালাইনের বোতল ছিটকে পড়ে। এরপর তিনি তাঁর চারদিকের রোগীদের দিকে তেড়ে যান। তাঁদের স্যালাইনের বোতল ছিড়ে নিয়ে তিনি চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি ছুঁড়তে থাকেন।

গৌতম ভারতীর উন্মত্ত আচরণে অসুস্থ অবস্থাতেও অন্যান্য রোগীরা দৌড়দৌড়ি শুরু করে দেন। ইঞ্জেকশন দিতে আসা সিস্টার ভয়ে দৌড়ে চলে যান। ডাক্তাররাও ভয় পেয়ে যান। ডাক্তার এবং সিস্টারদের অনুরোধ সত্ত্বেও গৌতম ভারতীর উন্মত্ততা বন্ধ হয়নি। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন পুলিসকে খবর দিতে। তাঁরা লালবাজার এবং বৌবাজার থানায় ফোন করেন। দু ঘণ্টা পরে প্রায় রাত নটা নাগাদ পুলিস আসে হাসপাতালে। ডাক্তারদের উপরোধ অনুরোধে যে কাজ হয়নি, পুলিশ আসামাত্রই সে কাজ সমাধা হয়। পুলিশ দেখেই গৌতম ভারতী চুপচাপ তাঁর বেডে শুয়ে পড়েন। এই প্রতিবেদক রাত দশটা নাগাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিনতলার ওই ওয়ার্ডে গিয়ে দেখেন চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে স্যালাইনের বোতল ভাঙা কাচের টুকরো। চিকিৎসারত ডাক্তাররা জানান, সম্প্রতি যুক্তিবাদীরা "অলৌকিক শক্তিধর' গৌতম ভারতীর 'শক্তি'কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। সম্ভবত, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে না পারার আশঙ্কায়, গৌতম ভারতীর মধ্যে 'মস্তিষ্ক বিকৃতি'র লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অ্যাপেন্ডিসাইটিসের যন্ত্রণা তাঁকে ইন্ধন যুগিয়েছে। ফলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি সম্ভবত আত্মহত্যায় প্ররোচিত হন। ডাক্তাররা জানান, গৌতম ভারতীর শারীরিক অবস্থা এখন আর সঙ্কটজনক নয়। বুধবার রাত সোয়া নটা নাগাদ গৌতম ভারতীকে দেখতে আসেন একজন মনস্তত্ত্ববিদ। চিকিৎসারত ডাক্তাররাই তাঁকে ডেকে আনেন। এদিন সন্ধ্যায় গৌতম ভারতীর উন্মত্ত আচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মনস্তত্ত্ববিদ বলেছেন, রোগীর (গৌতম ভারতী) সম্ভবত রোজ সন্ধ্যায় মদ, গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস আছে। এদিন (বুধবার) সন্ধ্যায় তা না পাওয়ায় তিনি হিংসাত্মক হয়ে উঠে ভাঙচুর করেন। তবে, আরও পর্যবেক্ষণ না করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না বলে মনস্তত্ত্ববিদ মন্তব্য করেছেন।

২ মার্চ আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা হলো। আমাকে তুলতে কোনও অবতারের 'মা' আসেননি। যদিও অবতারদের কথা মত সবই মা'য়ের ইচ্ছে। তবু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, অবতার নিজেই কিন্তু মায়ের শক্তির উপর সামান্যতম ভরসা করেন না। ভরসা করেছিলেন পেশীশক্তি সম্পন্ন অ-মানুষের ওপর। হায়!যাঁরা, শত্রুকে স্ব-বশে আনতে অপরকে মোহিনী ঔষধি দেন, তাঁরাই আবার শত্রুকে বশ করতে মোহিনী ঔষধির উপর ভরসা রাখতে পারেন না ? বশীকরণ, ফটোসম্মোহনের দাবিদাররাও নিজের বিপদকালে অসার দাবির কথা ভুলে বাহুবলের ওপর অধিক ভরসা রাখেন !

৩ মার্চ বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হল। এখানে 'আজকাল'-এ প্রকাশিত খবরটি তুলে দিলাম—

প্রবীর ঘোষকে কিডন্যাপের চেষ্টা
অপ্রকৃতিস্থ নন গৌতম ভারতী : বিশেষজ্ঞ

আজকালের প্রতিবেদন : বুধবার রাতে মেডিক্যাল কলেজের সি বি টপ ওয়ার্ডে তাণ্ডবের নায়ক 'অলৌকিক শক্তিধর' গৌতম ভারতী মোটেই অপ্রকৃতিস্থ (অ্যাবনর্ম্যাল) নন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের এই অভিমত। বৃহস্পতিবার মেডিকেল কলেজের সাইক্রিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ হরি গাঙ্গুলি গৌতম ভারতীকে দেখেন। চিকিৎসক ডাঃ মৃগাঙ্কমোহন দাসের কাছে লেখা নোটে তিনি জানিয়েছেন 'নো অ্যাবনর্ম্যালিটি হ্যাজ বিন ফাউন্ড ইন হিজ স্পিচ ওরিয়েন্টেশান অ্যান্ড পারসেপশান।' ঐ নোটেই তিনি জানিয়েছেন বুধবার রাতে ওঁর আচরণ এক ধরনের হিস্টিরিয়া অথবা ভানও হতে পারে। রোগী অবসাদগ্রস্ত ও অপরাধবোধে আক্রান্ত। মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে। যাতে পান না করতে পারে সে ব্যাপারে নজর রাখা উচিত। এদিকে 'ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন' লেকটাউনের শিবকালী আশ্রমের এই আচার্যের ক্ষমতার প্রথম চ্যালেঞ্জার প্রবীর ঘোষকে এদিন সকালে দুই দুর্বৃত্ত তাঁর বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ তাঁকে বাড়ির সামনেই পাকড়াও করে দুর্বৃত্তরা। বলে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখনই তাঁকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে। প্রবীর রুখে দাঁড়ানোয় তারা অবশ্য পিছু হটে। পরে প্রবীর সুভাষবাবুর ঘনিষ্ঠ মহলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন এদিন সকালেই তিনি দীঘা চলে গেছেন। এই ঘটনার ব্যাপারে দমদম থানায় প্রবীর একটি ডায়েরীও করেছেন। বুধবার রাতের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন এবং স্পেশাল অ্যাটেনডেন্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সুপারের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ চলে সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। অ্যাটেনডেন্টদের অবশ্য অন্যান্য দাবিদাওয়াও ছিল। দুটি সংগঠনই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন। এ বি জে ডি এফ-এর পক্ষ থেকে ডাঃ গিরিশ বেরা ও সুবীর ব্যানার্জি জানান বার বার জানানো সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনার ২ ঘণ্টা পরে এসেছে। অবস্থা সামাল দেওয়ার বদলে পুলিশ ডাক্তারদের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করেছে। চিকিৎসক ডাক্তার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছেন রোগীকে আলাদাভাবে রাখা হোক। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা অবধি গৌতম ভারতীকে অন্য বেডে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এদিন ঐ ওয়ার্ডেরই বেশ কিছু রোগী অভিযোগ করেন এমন একজন পেশেন্টের সঙ্গে তাঁদের থাকতে ভয় লাগছে। বুধবার রাতে তাণ্ডবের সময় ডাক্তার, নার্স, কর্মী ও রোগীদের সবাই পালিয়ে গেলেও নিরুপায় কয়েকজন রোগী বিছানাতেই ছিলেন। এঁদের অন্যত্র যাওয়ার ক্ষমতাও ছিল না। এই ঘটনা আবার ঘটুক তা তাঁরা চান না। রোগীদের অনেকেরই জিজ্ঞাসা শুনেছি উনি বিরাট সাধুবাবা। তা হলে নিজের অ্যাপেন্ডিক্সটা অলৌকিক ক্ষমতাবলে উনি সারিয়ে তুলছেন না কেন?

এসব সত্ত্বেও ভক্তরা এদিন ভিজিটিং আওয়ারে ভিড় জমিয়েছেন তাঁর শয্যায় সামনে। হাত পা বাঁধা ভারতী অবশ্য তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। তাঁর স্যালাইন চলছিল। এদিকে অলৌকিক শক্তিধরের ক্ষমতার প্রথম চ্যালেঞ্জার ভারতীয়

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ এদিন এ প্রসঙ্গে জানান যুক্তিবাদীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে ও এখন এইসব অভিনয় শুরু করেছে। ও একজন বড় অভিনেতা। এই ঘটনাই প্রমাণ করেছে ও ধাপ্পাবাজ। যিনি অপরের রোগ নিরাময় করতে পারেন বলে বিজ্ঞাপন দেন তিনি নিজের রোগ নিরাময় করতে পারলেন না কেন ? এমনও হতে পারে, এইসব অভিনয় করে উনি ওঁর শিষ্যদের আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। আমাদের সমিতি সহ বিভিন্ন বিজ্ঞানকর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে গণ বিজ্ঞান আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সন্ত্রাস রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যুক্তিবাদী আন্দোলনের সমর্থনে গৌতমকে ধিক্কার জানিয়ে বহু চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, যা আমাকে এবং আমাদের যুক্তিবাদী আন্দোলনকে শক্তি যুগিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে।

১৪ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠাটি খুলেই নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। মানুষ আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে আছেন ! নিশ্চিত হলাম, এত মানুষের ভালবাসায় জয় ছাড়া আর কিছুই আসতে পারে না। 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে 'অলৌকিক শক্তিধরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ, বিপন্ন যুক্তিবাদী এবং প্রশাসন' শিরোনামে প্রায় পৃষ্ঠা জুড়ে বহু পাঠকের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এরই মধ্য থেকে কিছু চিঠি আপনাদের আগ্রহ নিবারণের জন্য তুলে দিচ্ছি।

অলৌকিক শক্তিধরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ, বিপন্ন যুক্তিবাদী এবং প্রশাসন

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজারে গৌতম ভারতীর আশীর্বাদ গ্রহণরত প্রবীর ঘোষের ছবি দেখেছিলাম। ছবিটি দেখেই বুঝেছিলাম এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাই অপেক্ষায় ছিলাম আপনাদের কাগজ মারফত প্রবীর ঘোষের প্রতিবাদের।

২৫ ফেব্রুয়ারি অপেক্ষার অবসান হয়। দেখলাম প্রবীর ঘোষের প্রতিবাদের উত্তরে অলৌকিক শক্তিধর গুরুর হুমকির সংবাদ। বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা যখন যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত করার চেষ্টায় রত, তখন মুষ্টিমেয় ক্ষমতালিপ্সু অলৌকিক (!) শক্তিধরদের প্রশ্রয় দিয়ে যান মানুষকে ভুল বোঝাবার জন্য।

কোনও অলৌকিক (!) কারণে হয়তো প্রবীর ঘোষ অদৃশ্য হতে পারে। কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী মননের শিকড় যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে তা এই উত্তরবঙ্গের গ্রামে বসেও অনুভব করছি। এক প্রবীর ঘোষ ইতিমধ্যেই বহু প্রবীর ঘোষের জন্ম দিয়েছে। গৌতম ভারতীর দল কি তাঁদের স্তব্ধ করতে পারবে ?

সাধিকা দাস। মথুরাপুর, মালদহ

॥ ২ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য হিসাবে সত্যিই খুব বিপন্ন বোধ করছিলাম। কলকাতা থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে আমার নিজের গ্রাম এবং সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চলের কয়েকজন জ্যোতিষী এবং গুরুজির তন্ত্রমন্ত্রের বুজরুকি ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে আমরা কয়েকজন যুবক-যুবতী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার চালাচ্ছি। খুব একটা সাড়া যে পাচ্ছিলাম তা নয়। তবে চেতনা বাড়ছে। গ্রামে লড়াইটা একেবারেই অসম। ওঝা, জ্যোতিষী, গুরুজিদের এখানে বড় সুবিধা। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীন। তাছাড়া, যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের মধ্যেও অনেকে (এঁদের দলে শিক্ষকমশাইরাও আছেন) জ্যোতিষীদের মুখনিঃসৃত বাণীকে অভ্রান্ত মনে করেন।

এ অবস্থায় কাগজে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষের ছবি সহ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের কাটিং নিয়ে স্থানীয় গুরুজিরা প্রচারে নামেন। তাঁদের চেলারাও যত্রতত্র আমাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেন। আনন্দবাজারে অলৌকিক শক্তিধরদের মুখোশ খুলে দিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে সেটা দেখেই আট কপি আনন্দবাজার কিনে কয়েকটি গ্রামে ঘুরলাম। পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের এটা একটা উপযুক্ত জবাব।

মধুসূদন সরকার। গাংনাপুর, নদীয়া

॥ ৩ ॥

২৫ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজারে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষের বিপদের কথা পড়লাম। ওঁর অপরাধ, তিনি তথাকথিত গুরু/বাবাদের মুখোশ খুলে দিতে চান। ধোঁকাবাজ মহাপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয় না। যুক্তিবাদী আন্দোলনকে বানচাল করতে তাঁরা যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন সেটাই স্বাভাবিক।

বামফ্রন্ট সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ ; অবিলম্বে প্রবীরবাবুর যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে দিন।

আশিস রায়চৌধুরী। জলপাইগুড়ি

॥ ৪ ॥

অলৌকিক শক্তিধরেরা কবরের ভেতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকে, আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে, কিংবা নাড়িবন্ধন করে সমাধিস্থ হওয়ার বিভিন্ন প্রকার 'অলৌকিক কাণ্ড' দেখায়। চ্যালেঞ্জ জানালাম—আমিও তাদের সামনে ওইসব খেলা দেখাব এবং তার বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি দেখাব।

সুশান্ত দে। দিঘড়া, উঃ ২৪ পঃ

॥ ৫ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' প্রতিবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুন্নত দেশগুলিতে যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী শিক্ষার অভাব সেখানে একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং এদের ঘিরে গড়ে ওঠা কিছু স্বার্থান্বেষী এবং কিছু অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমর্থকদের দল বহু লোকের কষ্টার্জিত সম্পদ কৌশলে হস্তান্তর করেন কেবল মাত্র অলৌকিক আশীর্বাদ, আশ্বাস, মাদুলি, কবচ, পাথর প্রভৃতি বুজরুকির দ্বারা। হতাশাগ্রস্ত মানুষেরা অলৌকিকত্বের ফাঁদে পড়ে মিথ্যা আশ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এমনকি মিথ্যা আশ্বাসে অচিকিৎসায় বা বিনা চিকিৎসায় প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হয়। মাঝে মাঝে তথাকথিত গুরুদের প্রতারণার খবর আদালত পর্যন্তও গড়ায়। উন্নত দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদ কোনও অলৌকিক শক্তির দ্বারা অর্জিত হয়নি। সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন। কোনও স্বর্গীয় মা বা বাবা তাঁদের কিছু পাইয়ে দেয় না।

আমাদের দেশে যেখানে চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, ক্রীড়াবিদ্, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পর্যন্ত আংটি বা মাদুলি ধারণ করে ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করেন সেখানে যুক্তিবাদীদের আরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রচারে নামতে হবে। যুব সমাজকে চিন্তা করতে হবে ড্রাগ অ্যাডিক্‌শনের মতো অলৌকিকত্বের আসক্তিও একটা সামাজিক সমস্যা। যুক্তিবাদী প্রবীরবাবু একা নন, তাঁকে সমর্থন করতে অগণিত প্রগতিশীল নরনারী এগিয়ে আসবেন।

ডাঃ শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈহাটি

॥ ৬ ॥

প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ যে গুরুদেবকে বেশ বিপাকে ফেলেছে তা প্রমাণিত হল গৌতম ভারতীর হাস্যকর হুমকি ও অসংলগ্ন বক্তব্যে। তিনি ভক্তদের দেওয়া পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করেন, কেননা না নিলে 'ওদের অপমান করা হয়'। আবার প্রবীর ঘোষ এবং 'কাগজগুলোও যদি বাড়াবাড়ি করে, ভক্তরাই ব্যবস্থা নেবে।'

এইভাবে সরাসরি ভক্তদের প্ররোচিত না করে তিনি নিজের 'অলৌকিক ক্ষমতা' এক্ষেত্রে প্রদর্শন করতে অথবা ভক্তদের সঠিক পথে পরিচালিত করে প্রকৃত গুরু হতে পারতেন। "আমি ওদের বারণ করি, ওরা আমার কথা শোনে না।" তিনি কেমন গুরু যে ভক্তরা তাঁকে মান্য না করে উন্মার্গগামী হয়?

তপনকুমার দাস। রানাঘাট, নদীয়া

॥ ৭ ॥

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরীর 'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' লেখাটি (২৫-২) পড়লাম। যাঁরা প্রবীরবাবুর জীবননাশের হুমকি দিচ্ছেন তাঁদের ধিক্কার জানাই। প্রকৃত ধর্ম বুজরুকির ধার ধারে না। মহাভারত বলছে:

"যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনাঞ্চাপি ধিয়তে স ধর্মঃ"—অর্থাৎ যার দ্বারা নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম। মনুর মতে—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় (অচৌর্য), শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ। হারীতের মতে, 'যাতে উন্নতি হয়, তাই শ্রেয়, তাই ধর্ম।' যাজ্ঞবল্কের মতে, 'যা কু-কার্য ও কলুষ থেকে সকলকে নিবৃত্ত করে' সৃষ্টিকে রক্ষা করছে, তাই ধর্ম। বিবেকানন্দের মত সৎকর্মই ধর্ম এবং যা নিজের কল্যাণ করে ও জগতের হিতসাধন করে তাই ধর্ম।'

প্রকৃত গুরু যাঁরা তাঁরা কোনও দিন ধান্দায় ছোটেন না।

রাধাকৃষ্ণ প্রধান। ডায়মণ্ডহারবার

॥ ৮ ॥

আমরা দুর্গাপুরে যুক্তিবাদী সংগঠন করেছি যার নাম 'লৌকিক'। 'লৌকিকের' পক্ষ থেকে গৌতম ভারতী ও তাঁর অন্ধ বিশ্বাসধারী শিষ্যদের এইটুকুই জানিয়ে রাখছি যে, প্রবীর ঘোষ ও তাঁর বিজ্ঞান সংগঠন কর্মীদের মৃত্যুর হুমকি দেওয়ার আগে একটু চিন্তা করে নেবেন।

উৎপলকুমার দে। দুর্গাপুর-১০

॥ ৯ ॥

মিথ্যাচার তথা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমেই কুরু-পঞ্চালে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাবা-প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। পঞ্চালের আর্য জন-সমিতির তৎকালীন সেনাপতি 'বধ্রশ্ব' কয়েকটি যুদ্ধ জয় করে সমগ্র আর্যসমাজের সম্মান লাভ করে। এই সুযোগে আত্মসুখ ও অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগের লোভে 'বধ্রশ্ব' জন-সমিতির ক্ষমতা খর্ব করে রাজা প্রথার প্রবর্তন ঘটায় আর বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্রের পূর্বপুরুষকে উৎকোচ দিয়ে তাদের 'বাবা-পদে' বসায়। পরিবর্তে এই বাবারা প্রচার করেছিল—ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ, বিশ্বদেব এবং অন্যান্য দেবতারা রাজাকে পাঠিয়েছেন পৃথিবীর প্রজাকে শাসন করবার জন্য। অতএব সাধারণ মানুষ যেন রাজার হুকুম মেনে চলে আর যথাবিহিত সম্মান করে। এর সবটাই ছিল বেইমানী। 'বাবাদের' মিথ্যাচারের ফলে পঞ্চালের আর্য-সমাজের গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল। পরবর্তীকালে বধ্রশ্য-পৌত্র দিবোদাসের রাজত্বে 'বিশ্বামিত্র বাবাগিরি করে জনগণকে প্রতারিত করেছিল। আজ গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজত্বে ভারতীরা শূন্য থেকে মায়ের দেওয়া সন্দেশ এনে খাওয়াচ্ছে আর বিজ্ঞান কর্মীদের (এঁরাও পারেন শূন্য থেকে রসগোল্লা, সন্দেশ আনতে) মেরে ফেলবার হুমকি দিচ্ছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ঘৃণ্য রাজনীতির আবর্তে সরাসরি অন্যায়ের বিরোধিতা করতে গিয়ে কে কতটা প্রশাসনিক সাহায্য পাবেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জনপ্রতিনিধি বা আমলারা যেখানে বাবাদের দ্বারস্থ হন সেক্ষেত্রে সাহায্য পাবার আশা দুরাশা মাত্র।

অভিজিৎ বোস। রহড়া, উঃ ২৪ পঃ

॥ ১০ ॥

গৌতম ভারতী জানিয়েছেন, তিনি আসলে কিছুই করেন না। মা (?)-ই সব করে থাকেন। তা হলে প্রবীরবাবুকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি কেন 'ভক্তদের' সাহায্য নিচ্ছেন? এখানে কি তাঁর 'মা' ব্যর্থ? তাঁর ভক্তরা কাগজগুলোকেও দেখে নেবে—এমন হুঙ্কারও তিনি ছেড়েছেন। তাঁর এই হুঙ্কারের কারণ কী? তিনি কি অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছেন?

চিত্তরঞ্জন পাল। হাওড়া-৩

॥ ১১ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শীর্ষক খবরটি (২৫-২) পড়ে বুঝলাম: সক্রেটিসের হাতে বিষ তুলে দেওয়ার যুগ থেকে অনেকটা এগিয়ে আসার অহঙ্কারটা আমাদের মিথ্যে। অলৌকিক শক্তিধরদের বুজরুকির ভিত হল মানুষের প্রশ্নহীন অন্ধ বিশ্বাস। সেই ভিতে নাড়া পড়লে মিথ্যার মিনারটি মিলিয়ে যাবার আশঙ্কায় বিপন্ন বোধ করে তাঁরা তো ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় নেবেনই। কারণ ধোঁকাবাজিই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন।

জ্যোতিরুণা মুখোপাধ্যায়। খড়্গপুর

॥ ১২ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' প্রতিবেদনটি পড়লাম।

প্রবীর ঘোষ গত এক দশকের চেনা নাম। তথাকথিত 'সর্বজ্ঞ' 'অমুক বাবা' 'তমুক ব্রহ্মচারীদে'র যে কোন অলৌকিক ক্ষমতাই নেই যৌক্তিক পদ্ধতিতে তিনি সে কথা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাঁর বিজ্ঞানমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য কোথায় তাঁকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করব তা নয়, তিনি আজ বিপন্ন হতে বসেছেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে পুলিশও ইতিকর্তব্য পালনে বিমুখ।

তিমিরবরণ চঁদ। গুসকরা, বর্ধমান

॥ ১৩ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' (২৫-২) প্রতিবেদন পড়ে অবাক হলাম ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে কি বাক-স্বাধীনতা লোপ পাচ্ছে?

মনোজ ভোজ। কলকাতা-৬

॥ ১৪ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শীর্ষক সংবাদে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হলাম। দেশের দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ হল এই সব 'গুরুবাবা'। বর্তমানে মানুষের ভাবনা অনেক উন্নত হয়েছে, যুক্তি ছাড়া কোনও কিছুকে কেউ মেনে নিতে পারছে না। তাই 'মায়ের সুপুত্তুর'রা মায়ের নামে ভয় দেখিয়ে বা জোর করে সাধারণ মানুষকে তাদের চেলা বানাতে চাইছে।

পার্থসারথি বিশ্বাস। হেতিয়া, বাঁকুড়া

॥ ১৫ ॥

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রতিবেদন 'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' (২৫-২) এবং 'ঐশী শক্তির জয়' বিজ্ঞাপন (১৯-২) প্রকাশের জন্য যুগপৎ অভিনন্দন ও ধিক্কার। কিছু অসাধু লোক ধর্মের দোহাই দিয়ে লোক ঠকাচ্ছে। প্রবীরবাবু তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এতেই তাদের গাত্রদাহ, শিরঃপীড়া। ওরা খুনের হুমকি দেয়। যুগে যুগে এটাই হয়ে আসছে।

সঞ্জীবকুমার রায়। মঙ্গলবাড়ি, মালদহ

॥ ১৬ ॥

২৫-২-৮৯ তারিখের আনন্দবাজার থেকে জানলাম, অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ বিপন্ন। খুবই স্বাভাবিক—কারণ, প্রবীরবাবু চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে 'অলৌকিক শক্তিধরদের' মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে তাঁদের ভণ্ডামি জনসমক্ষে ফাঁস করে ফেলছেন যে! আসলে অল্প আয়াসে প্রচুর অর্থ রোজগারের লোকঠকানি ব্যবসায় ভাটা পড়ে যাবার আশঙ্কায় বুদ্ধিমান জোচ্চোরের দল নিজেরাই বিপন্ন হয়ে প্রবীর ঘোষের প্রাণনাশের এমন আদিম বর্বরোচিত হুমকি দিচ্ছে।

যে সব 'ভক্ত' মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে, তারা যে স্রেফ বুজরুকদের দালাল সেটা সাধারণ লোকেও বোঝে। দালালরা হাতসাফাই-এর কায়দা-জানা এক একজন লোককে করায়ত্ত করে অবতার ছাপ দিয়ে দেয়। আর এইভাবেই হাজার হাজার কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসহায় বোকা লোককে ঠকিয়ে আদায় করা লাখ লাখ টাকার দান-প্রণামী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

অশোক প্রামাণিক। বীরভূম

॥ ১৭ ॥

তথাকথিত অলৌকিক শক্তিধরদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ও বুজরুকদের দ্বারা তাঁর প্রাণনাশের হুমকির সংবাদ আপনাদের কাগজে মুদ্রিত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

আশিসকুমার নন্দী। ত্রিবেণী

॥ ১৮ ॥

'ঐশী শক্তির জয়' বিজ্ঞাপনটি যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল, 'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শীর্ষক রিপোর্টে সেই বিভ্রান্তির অবসান ঘটেছে। ইচ্ছাকৃত প্রতিবন্ধকতার বা হুমকির দ্বারা কখনও প্রকৃত সত্যের গতিরোধ করা যায়নি, যাবেও না। 'অলৌকিক শক্তিধর' বুজরুকের দল সাবধান।

স্বস্তিক সেনগুপ্ত। স্কটিশ চার্চ কলেজ

॥ ১৯ ॥

ধর্মগুরুরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে-যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের প্রাণদণ্ডের হুমকি দিতে শুরু করেছেন। আগেও বিজ্ঞানীকে মরতে হয়েছে কিছু ধর্মগুরুর নির্দেশে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁড়িয়েও ধর্মগুরুদের হিংসামূলক কাজকর্মে উসকানিতে কিছু মানুষকে উৎসাহিত হতে দেখে অবাক লাগে।

মলয়কুমার দাস। কেশিয়াড়ি, মেদিনীপুর

॥ ২০ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' খবরটি পড়ে স্তম্ভিত হচ্ছি। প্রবীর ঘোষকে যাঁরা হত্যার হুমকি দেখাচ্ছেন তাঁদের জানা উচিত একজন প্রবীর ঘোষের মুখ বন্ধ করা যায় হয়তো, কিন্তু সত্যের মুখ বন্ধ করা যায় না।

আশিসকুমার চক্রবর্তী। জগদীশপুর, হাওড়া

॥ ২১ ॥

আনন্দবাজারের খবর (২৫-২-৮৯) থেকে জানলাম : যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ তথাকথিত বাবাদের বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর উপর নাকি দৈহিক আক্রমণও হতে পারে। এটা প্রমাণ করে যে, যাঁরা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করেন, তাঁরা ভয় পেয়েছেন। এবং এইখানেই প্রবীরবাবুর সাফল্য।

অমল রায়চৌধুরী। চন্দননগর।

ভূতুড়ে সম্মোহনে মনের মত বিয়ে : কাজী সিদ্দিকীর চ্যালেঞ্জ

'আলোকপাত' জানুয়ারি ১৯৮৮ সংখ্যায় পাঠকদের অধিকার বিভাগে "দোষ ধর্মের নয়, ব্যক্তির" শিরোনামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটি লিখেছিলেন চুরুলিয়া, বর্ধমান থেকে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী। চিঠিটা খুবই কৌতূহল জাগানোর মত এবং

তারই সঙ্গে যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে একটি জোরালো চ্যালেঞ্জ। চিঠিটি এখানে তুলে দিলাম।

আলোকপাত নভেম্বর '৮৭ সংখ্যায় 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয়?' পড়লাম। প্রবীর ঘোষ মহাশয়ের চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই, বিজ্ঞান বিশ্ব সৃষ্টি করেনি এবং নিয়ন্ত্রকও নয়।
মূলত ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন প্রভেদ নেই। সূক্ষ্মতাত্ত্বিক ব্যাপার হেতু সাধারণ বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা মেলে না। এই তত্ত্বকে প্রখ্যাত সুফী সাধক জোলনুন থেসরী তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

১) ঈশ্বরের একত্ব তত্ত্ব, এই জ্ঞান সাধারণ বিশ্বাসীদিগের।
২) প্রামাণিক ও যৌক্তিক তত্ত্ব, এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের।
৩) একত্রে গুণ-রাশির তত্ত্ব, এই জ্ঞান ঈশ্বর প্রেমিক ঋষিদিগের।

এই সূত্রানুসারে প্রবীরবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। এখানে ধর্মের ভড়ং করে কেউ যদি প্রতারণা করে তাহলে তা ধর্মের দোষ নয়—দোষ ব্যক্তির। এই জাতীয় প্রতারণা ধরে বিজ্ঞানের মহিমা গাথায় ধর্মকে অস্বীকার করা অহংকারের প্রকাশ মাত্র—এটা অযৌক্তিক ও অসমীচীন। এই অহংকারের বশবর্তী হয়ে তিনি বিরাট অংকের চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন। ফটো সম্মোহন বা তান্ত্রিক মতে এ জাতীয় কোন প্রক্রিয়ার ফল হয় কি না জানি না। তবে এমন কিছু প্রক্রিয়া আছে যা আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ বা নারীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমাবেগ বা বিতৃষ্ণা এনে মিলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে দিতে বা বিচ্ছিন্ন করতে পারে। অবশ্যই কোনরূপ প্রচলিত সম্মোহন নয় এটা—সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রক্রিয়া।

প্রবীরবাবুর যদি তাঁর পরিচিত কোন নারীকে প্রকৃতই জীবন সঙ্গিনী করার ইচ্ছে থাকে তাহলে কোন ছবি-টবি নয় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রকৃত তথ্য দিলেই হবে। তথ্যগুলো অবশ্যই অপার্থিব নয়।

যদিও তিনি ফটো-সম্মোহন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন তবুও তিনি আগ্রহী হলে তাঁর এ প্রক্রিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি।

প্রকাশ থাকে যে তাঁর ঘোষিত অর্থের আমার কোন প্রয়োজন নেই। মিলনের সূত্রপাত ঘটলে তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর ঘোষিত অর্থ কোন নির্মীয়মাণ মুসলিম ছাত্রীআবাসে বা কোন অরফ্যানেজে নিজ পছন্দ মত দান করে দেবেন।

কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী'র চিঠিটি আমার নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে ৭ জানুয়ারি একটি উত্তরও পাঠিয়ে দিই 'আলোকপাত' পত্রিকার দপ্তরে। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

আলোকপাত জানুয়ারি '৮৮ সংখ্যায় 'পাঠকদের অধিকার' বিভাগে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী'র একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিটিতে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় তিনি আমার মনের মত নারীকে আমার জীবন সঙ্গিনী করে দিতে পারেন। কাজী জানতে চেয়েছেন আমি তাঁর চ্যালেঞ্জ

গ্রহণে আগ্রহী কি না ? চিঠিতে এক জায়গায় লিখেছেন অহংকারের বশবর্তী হয়ে আমি চ্যালেঞ্জ করে বসেছি।

উত্তরে বিনীতভাবে জানাই—এই চ্যালেঞ্জ কোনও অহংকার নয়, এই 'চ্যালেঞ্জ' যুক্তিবাদী আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়াতেই এই 'চ্যালেঞ্জ'। অবতার, জ্যোতিষী, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার ও তাঁদে উচ্ছিষ্টভোগী এবং অন্ধভক্তদের কাছে অথবা কিছু ঈর্ষাকাতরদের কাছে 'চ্যালেঞ্জ' 'অশোভন' 'অহংকার' ইত্যাদি মনে হতেই পারে, কারণ 'চ্যালেঞ্জ' বাস্তব সত্যকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু 'চ্যালেঞ্জ' বিষয়ে জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, সত্য প্রকাশিত হয়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন ? অলৌকিকতার বিরুদ্ধে এই চ্যালেঞ্জ যুক্তিবাদী আন্দোলনের, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের অতি শক্তিশালী হাতিয়ার।

আমি বিবাহিত। তাই আমার মনের মত নারীকে জীবনসঙ্গিনী করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার এক তরুণ চিকিৎসক বন্ধু অনিরুদ্ধ কর অবিবাহিত। কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী যদি অনিরুদ্ধের পছন্দমত এবং আমার নির্দেশ মত মেয়েটিকে অনিরুদ্ধর জীবনসঙ্গিনী করে দিতে পারেন তবে অনিরুদ্ধের বিয়ের সাত দিনের মধ্যেই কাজী সাহেবের ইচ্ছে মত প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা, এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করে নেব—পৃথিবীতে অলৌকিক ঘটনার অস্তিত্ব আছে।

কাজী সাহেবের কথা মত মেয়েটির 'কয়েকটি প্রকৃত তথ্য' অবশ্যই দেব, উপরন্তু দেব মেয়েটির একটি ছবি।

কাজী সাহেব যদি বাস্তবিকই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ইচ্ছুক হন, তবে মেয়েটির তথ্য ও ছবি কাজী সাহেবের হাতে তুলে দেওয়ার পর দেব ৬ মাস সময়, এই সময়ের মধ্যে অনিরুদ্ধের পছন্দমত মেয়েটির সঙ্গে তিনি বিয়ে ঘটিয়ে দিতে পারলে আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব। নতুবা ধরে নেব কাজীসাহেব পরাজিত।

প্রবীর ঘোষ

আমার চিঠিটা আজ পর্যন্ত 'আলোকপাত'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। কাজী সাহেবের চ্যালেঞ্জ যে অনেককেই নাড়া দিয়েছিল তারই প্রমাণ পাই যখন দেখি '৮৮ ফেব্রুয়ারি 'পরিবর্তন'-পত্রিকা আমার একটি সাক্ষাৎকার নিতে এসে কাজী সাহেবের প্রসঙ্গটি তোলেন। ৩০ মার্চ '৮৮ সংখ্যার 'পরিবর্তন'-এ দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে কাজী সাহেবের প্রসঙ্গটুকু শুধু তুলে দিচ্ছি।

"পরিবর্তন : 'আলোকপাত' জানুয়ারি '৮৮ সংখ্যায় বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ার জনৈক কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় আপনার মনের মতো নারীকে আপনার জীবন সঙ্গিনী করতে পারেন। পরবর্তী দুটো সংখ্যা 'আলোকপাত'-এ এমন কোনও খবর চোখে পড়লো না যাতে লেখা আছে আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। আপনি কি তবে পিছু হটেছেন ধরে নেব ?

শ্রীঘোষ : ৭ জানুয়ারি একটি চিঠি দিয়ে 'আলোকপাত' সম্পাদককে জানাই, 'আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।' এইটুকু বলতে পারি চিঠিটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। চিঠির প্রতিলিপিটি আপনি দেখতে পারেন।"

এখনও কাজী সাহেবের জন্য চ্যালেঞ্জ খোলাই রইলো, তবে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সময়ের মধ্যে যদি ডাঃ অনিরুদ্ধ কর বিয়ে করে ফেলেন তবে আমার অন্য কোনও অবিবাহিত বন্ধুর পছন্দ মত মেয়েকে বন্ধুটির জীবন সঙ্গিনী করতে হবে।

অনিরুদ্ধ আমাকে এই প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মেয়েটিকে পছন্দ করার পর কাজী সাহেব যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করে আক্ষরিক অর্থে তাঁর হাতে-পায়ে ধরে আমার সঙ্গে বিয়ে ঘটিয়ে দেয় ?"

আমি বলেছিলাম, "আপনার শ্রীদেবী, রেখা, অথবা তার চেয়েও কোনও দুর্লভ মেয়েকে বিয়ে করতে কোনও আপত্তি নেই তো।" দুর্লভ মেয়েদের যে সব নাম বলেছিলাম, তাতে অনিরুদ্ধ প্রাণ খুলে হো-হো, করে হেসে বলেছিলেন, "কাজী সাহেব আপনার চিন্তার হদিশ পেলে চ্যালেঞ্জ জানাবার দুঃসাহস দেখাতেন না।"

ভূতের দুধ খাওয়া

মেদিনীপুর জেলার 'গোলগ্রাম গ্রামোন্নয়ন সংস্থা'র আমন্ত্রণে আমাদের সমিতির সদস্যরা ও আমাদের সহযোগী ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার সভ্যরা '৮৮-র ১১ ফেব্রুয়ারি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান করতে যান।

গ্রামোন্নয়ন সংস্থার তরফ থেকে গুণধর মুর্মু অনুষ্ঠানের মাস দুয়েক আগে যখন প্রথম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তখনই তাঁর কাছ থেকে জেনেছিলাম, ডেবরা ও গোলগ্রাম অঞ্চলের ওঝা, গুণিন, জানগুরু সখারা কী কী তথাকথিত অপ্রাকৃতিক ক্ষমতা দেখিয়ে স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করেছেন। উদ্দেশ্য, সেই সব অপ্রাকৃতিক ক্ষমতার পরিচয়ই আমাদের সমিতির সভ্যরা অনুষ্ঠানে দেবেন এবং তারপর প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতার লৌকিক কৌশলগুলো দর্শকদের বুঝিয়ে দেবেন। এর ফলে স্বভাবতই ওঝা, গুণিন, জানগুরু, সখাদের লোকঠকানো ব্যবসা বন্ধ হবে। ইতিপূর্বে আমরা এই ভাবে কাজ করে যথেষ্ট সফলতা পেয়েছি।

আমাদের ছেলেরা ওখানে গিয়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের সাড়া জাগিয়েই অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই সঙ্গে সভায় এই ঘোষণাও করেন—আপনারা যদি কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা চান, আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন অথবা গোলগ্রাম গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাদের জানতে চাওয়া অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা করে দেব।

ওই সভাতেই গ্রামোন্নয়ন সংস্থারই এক কর্মকর্তা গুণিন এন কে মান্নার কথা জানান। মান্না ওই অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি সাধারণ মানুষদের সামনে বহুবার প্রমাণ করেছেন ভূত আছে। ভূত নিয়ে এসে প্রমাণ করেছেন ভূতের অস্তিত্ব। কেমনভাবে ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন ? একটা কাচের গ্লাসে তাড়ি রাখা হয়। তাড়ির গ্লাসে-র

উপর তিনি একটি মড়ার মাথা বসিয়ে দেন। নানা ধরনের মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে নরমুণ্ডকে জাগ্রত করেন। নরমুণ্ড তখন চোঁ-চোঁ করে গ্লাসের তাড়ি পান করতে থাকে। শ্রীমান্না ভক্তদের নানা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন, নানা সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলে দেন। এই সবই তিনি করেন ভূতের পরামর্শমত। বাংলা চলচ্চিত্রের অতি জনপ্রিয় এক নায়কও নাকি মাঝে মধ্যে শ্রীমান্নার কাছে আসেন।

আমাদের ছেলেরা সেখানেই এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। জানিয়েছিলেন, এই বিষয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোলগ্রামের মানুষদের কাছে ব্যাখ্যা হাজির করবেন।

সমিতির সভ্যরা ফিরে এসে শ্রীমান্নার বিষয়টি আমাকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের ছবি এঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, স্রেফ লৌকিক কৌশলেই বাস্তবিকই এই ধরনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব।

২১ ফেব্রুয়ারি দমদম কিশোর ভারতী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিনিধি ও অঞ্চলের বিজ্ঞানকর্মীদের নিয়ে সারাদিনব্যাপী এক কুসংস্কার বিরোধী শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করি। সেখানে শ্রীমান্নার ভূতে তাড়ি খাওয়ার প্রসঙ্গটি আলোচনা করি। হাজির করি একটি দুধ ভর্তি গ্লাস, অর্থাৎ তাড়ির অভাবে দুধ। একটি মড়ার খুলি গ্লাসের উপর চাপিয়ে বিড়-বিড় করতেই দর্শকরা অবাক হয়ে দেখলেন গ্লাস থেকে কোন অলৌকিক ক্ষমতায় দুধ দ্রুত কমে যাচ্ছে। দর্শকদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে ব্যাখ্যা হাজির করতেই বিস্ফারিত চোখে নেমে এলো আনন্দের জোয়ার।

কৌশল মড়ার খুলিতে ছিল না। কৌশল ছিল না দুধে বা শ্রীমান্নার তাড়িতে। কৌশল যা ছিল, সবই ছিল গ্লাসে। দুটি ভিন্ন মাপের স্বচ্ছ প্লাস্টিক গ্লাস জুড়ে তৈরি করা হয়েছিল গ্লাসটি। একটি গ্লাস যত বড় আর একটি গ্লাস তার চেয়ে সামান্য ছোট। দেখতে হবে ছোট গ্লাসটা যেন বড় গ্লাসটার মধ্যে ঢুকে যায়। ছোট গ্লাসের তলায় একটা ছোট্ট ফুটো করা রয়েছে। বড় গ্লাসের উপরে কানা ঘেসে ওই ধরনেরই আর একটা ফুটো রয়েছে। দুটো গ্লাসের কানা এমনভাবে জুড়ে দেওয়া যাতে সামান্যতম বাতাস ওই কানার কোনও অংশ দিয়ে ঢুকতে না পারে। ছবিতে গ্লাস দুটো এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।
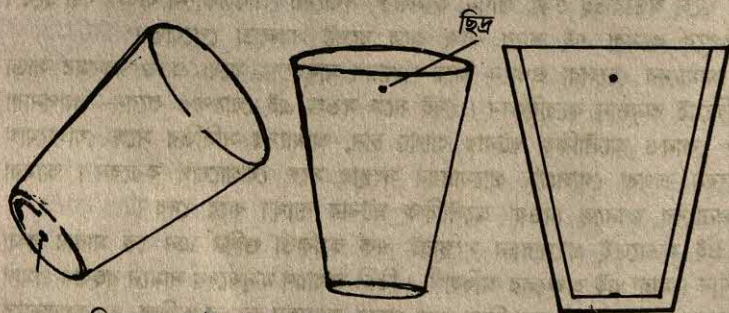
ভিতরের ছোট গ্লাস বাইরের বড় গ্লাস

এবার গ্লাসের ভিতর দুধ ঢাললে ছোট গ্লাসের ফুটো দিয়ে দুধ দু-গ্লাসের ফাঁকে এসেও জমা হয়। বড় গ্লাসের কানায় যে ফুটো আছে সেটা সেলোটেপ দিয়ে বন্ধ করে দিই। এবার গ্লাসটা উপুড় করে দিলে ছোট গ্লাসের দুধ যায় পড়ে। দু'গ্লাসের মাঝে ঢুকে থাকা দুধ থেকেই যায়। নরমুণ্ডটা গ্লাসে বসিয়ে মন্তর পড়ার সময় সেলোটেপটা খুলে নিতেই বাইরের বাতাস বড় গ্লাসের ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়তে চাপ দিতে থাকে। বাইরের বাতাসের চাপে ছোট গ্লাসের ফুটো দিয়ে দুধ বেরিয়ে এসে ছোট গ্লাসের তলায় জমতে থাকে এবং দু'গ্লাসের ফাঁকে আটকে থাকা দুধ দ্রুত কমতে থাকে। এক সময় ছোট গ্লাস ও দু'গ্লাসের ফাঁকের দুধ একই সমতলে এসে হাজির হয়। দর্শকরা দেখতে পান, বিশ্বাস করেন নরমুণ্ডই দুধ খেল, পড়ে রইল সামান্য তলানি।

পরবর্তীকালে গোলগ্রামের "অলৌকিক নয়, লৌকিক" অনুষ্ঠানে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'-র সভ্যরাই ভূতের তাড়ি খাওয়ার রহস্য উন্মোচন করেন স্থানীয় মানুষদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে।

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত বহু সংস্থাই "অলৌকিক নয়, লৌকিক" শিরোনামের অনুষ্ঠানে এই ঘটনাটি ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন।

'জাগ্রত' নরমুণ্ড সিগারেট টানল তারাপীঠের মহাতান্ত্রিক নির্মলানন্দের নির্দেশে

১৬ জানুয়ারি '৯০ আজকাল পত্রিকায় চোখ বোলাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। তিন কলম জুড়ে ছবি সহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি নিঃসন্দেহে অলৌকিক বিশ্বাসীদের ও অলৌকিক ব্যবসাদারদের নব বলে বলীয়ান করবে, কিছু দোদুল্যমান মানুষকে অলৌকিকতায় বিশ্বাসীদের শিবিরে টেনে নিয়ে যাবে, কিছু যুক্তিবাদীদেরও অস্বস্তি ঘটাবে, বিভ্রান্ত করবে।

প্রতিবেদনটি এই রকম :

'জাগ্রত' নরমুণ্ড সিগারেট টানল

আজকালের প্রতিবেদন : গা ছমছমে তারাপীঠ শ্মশানেই শুটিং হচ্ছে 'তান্ত্রিক' ছবির। এই ছবিতে অভিনয় করছেন তারাপীঠের মহাতান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ স্বয়ং। দ্বারকা নদীর ধারে তারাপীঠ শ্মশানের ওপরেই নির্মলানন্দ তীর্থনাথের ছোট আশ্রমটাই লোকেশনে। আশ্রম না বলে একটা ছোটখাটো খুঁড়েঘরই বলা উচিত। যার মধ্যে বসে নির্মলানন্দ তান্ত্রিক সাধনা করেন। তাঁর বেদির নিচেই পোঁতা রয়েছে একটা ন বছরের মেয়ের মৃতদেহ। ঘরের চারধারে নরমুণ্ড সারি সারি সাজানো। মাঝখানে হোমকুণ্ড। এর মধ্যে একটা নরমুণ্ডের পুরোপুরি অভিনেতা।

তন্ত্র নিয়েই ছবি। পরিচালক অঞ্জন দাসকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাহায্য করছেন তান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ নিজেই। তন্ত্র হল বিজ্ঞান, কোণের দিকে আঙুল তুলে নির্মলানন্দ বললেন, এটা জাগ্রত। আমিই জাগিয়ে রেখেছি একে। দিনে সিগারেট ও খাবেই। বলেই একটা সিগারেট নরমুণ্ডের মুখে গুঁজে দিলেন তীর্থনাথ। নরমুণ্ড সিগারেট খেতে শুরু করল অবিকল জীবন্ত মানুষের মত। নির্মলানন্দ এদিকে শুটিং জোনে গিয়ে নিজের সংলাপ বলে এলেন। সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমারের সামনে। এ ছবিতে তন্ত্রের সমস্ত ধারাই আসবে। আসবে শবসাধনা। যেখানে মৃতদেহ সরাসরি চিতা থেকে তুলে আনবেন নির্মলানন্দ তীর্থনাথ। পরিচালক অঞ্জন দাস নিজেই এই তান্ত্রিক ছবির আলোকচিত্রী। তাঁর ভয় এই সব দৃশ্য তিনি ক্যামেরায় সাহস করে শেষ অবধি ধরতে পারবেন কিনা।

'তন্ত্র'কে আকর্ষণীয় করার জন্যে এই ছবিতে একটা গল্প থাকছে। আর সেখানেই অভিনয় করছেন সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার প্রমুখরা। আসলে তন্ত্রের গোপন রহস্যকে তুলে ধরার জন্যেই এই ছবি। আর সেই শর্তেই এই ছবিতে অভিনয় করতে রাজি হয়েছে তারাপীঠ শ্মশানের তান্ত্রিক নির্মলানন্দ ও তাঁর সাধন মা শুক্লাতিথি বসু।

রাতের শ্মশানে চিতায় হোম সেরে ভোর হতেই শুটিংয়ে নেমে পড়ছেন এখন তারাপীঠের তান্ত্রিক। যিনি দীর্ঘ বার বছর সাধনার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন, তাঁকে ফিল্মে বন্দী করার মত কঠিন কাজ করছেন পরিচালক অঞ্জন দাস।

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য জানতে চেয়ে রাশি রাশি চিঠি এলো।

২৬ ফেব্রুয়ারি সমিতির তরফ থেকে একটা চিঠি পাঠালাম 'আজকাল' পত্রিকার দপ্তরে। ৬ মার্চ চিঠিটি প্রকাশিত হল।

জাগ্রত নরমুণ্ড : একটি চ্যালেঞ্জ

১৬ ফেব্রুয়ারির আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত 'জাগ্রত নরমুণ্ড সিগারেট টানল' প্রতিবেদনটি পড়ে জানতে পারলাম 'তান্ত্রিক' ছবির শুটিং হচ্ছে তারাপীঠ শ্মশানে। তন্ত্র-সাধনা নিয়ে তোলা হচ্ছে ছবিটি। তন্ত্র-সাধনাকে তুলে ধরার স্বার্থে অভিনয়ে রাজি হয়েছে তান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ ও তাঁর সাধন মা শুক্লাতিথি বসু। ছবিটির পরিচালক অঞ্জন দাস। নির্মলানন্দ নাকি দাবি করেছেন—তন্ত্র হল বিজ্ঞান। তিনি নাকি নরমুণ্ডকে তন্ত্রবলে জাগ্রত করে রাখেন। প্রমাণ হিসেবে নরমুণ্ডের মুখে গুঁজে দিয়েছিলেন একটা সিগারেট। নরমুণ্ড সিগারেট টানতে লাগল অবিকল জীবন্ত মানুষের মত।

'আজকাল'-এর মত একটি সমাজ সচেতন ও যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসারে অগ্রণী পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় স্বভারতই বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আমার ও আমাদের সমিতির বক্তব্য জানতে চেয়ে রাশি রাশি চিঠি এসেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি লেকটাউন বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে আমাদের সমিতির 'অলৌকিক নয় লৌকিক' অনুষ্ঠানে তিনজন জাগ্রত নরমুণ্ডের সিগারেট টানার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে ব্যাখ্যা চান। একজন তো কাগজের কাটিংটি পর্যন্ত হাজির করেছিলেন। সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির অবসান কল্পে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্মলানন্দকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। তিনি নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্য সমাবেশে কৌশল ছাড়া মড়ার খুলিকে দিয়ে সিগারেট টানাতে পারলে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং সমিতির কয়েক'শত সহযোগী সংগঠন ও শাখা সংগঠন তাঁদের সমস্ত রকম অলৌকিক বিরোধী কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকবেন। প্রণামী হিসেবে আমি দেব ৫০ হাজার টাকা। এই চিঠিটি 'আজকাল'-এ প্রকাশিত হওয়ার দশ দিনের মধ্যে নির্মলানন্দ আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করলে অবশ্যই ধরে নেব নির্মলানন্দ একজন বুজরুক, প্রতারক। যদি তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তবে আমরা তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণের এক মাসের মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনেই তাঁর অলৌকিক

ক্ষমতার পরীক্ষা নেব।
প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।
কলকাতা-৭৪

চিঠি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ দেখা করে, ফোনে অথবা চিঠিতে অভিনন্দন জানালেন, এঁদের অনেকেরই বক্তব্য ছিল, "আপনার চ্যালেঞ্জে নির্মলানন্দ আসবেন না। যতসব ফালতু ব্যাপার।" আমার স্ত্রী সীমার তবলচী গোবিন্দ লাহিড়ি ৮ তারিখ সকালে এসে জাগ্রত নরমুণ্ড প্রসঙ্গটি তুলে জানালেন, "গোরক্ষবাসী রোডে এক জ্যোতিষী থাকেন। যিনি আবার তান্ত্রিকও। প্রায় শনিবারই তারাপীঠে যান। পরশুও আমি ও আমাদের পাড়ার কয়েকজন 'আজকাল'টা নিয়ে গিয়েছিলাম দেখাতে। আমরা বললাম, নির্মলানন্দ কি প্রবীরবাবুর চ্যালেঞ্জ নেবেন? তান্ত্রিক ভদ্রলোক বললেন, নির্মলানন্দকে খুব ভালরকমই চিনি। তারাপীঠের সব তান্ত্রিককেই চিনি। নিজেও তন্ত্র বিষয়টা ভালরকম জানি। তন্ত্রের কেউ নরমুণ্ডকে জ্যান্ত করে সিগারেট খাওয়াবে এমন আজগুবি গপ্পো কোন দিন শুনিনি। পত্রিকার সাংবাদিক সিনেমাকে তোল্লা দিতে নিজেই বানিয়ে টানিয়ে ওসব লিখে দিয়েছে।"

গোবিন্দবাবুকে বললাম, "আপনাদের পাড়ার তান্ত্রিকটি বেজায় ধূর্ত। তাই সাংবাদিকের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে নির্মলানন্দকে ও তন্ত্রশক্তিকে বাঁচাতে চাইছেন। আপনার তান্ত্রিক প্রতিবেশী নরমুণ্ডের সিগারেট খাওয়া ব্যাপারটা ঘটানো একেবারেই অসম্ভব বলে সাংবাদিকের উপর খবরটির সব দায়-দায়িত্ব চাপাতে চাইছেন বটে, কিন্তু যদি প্রমাণ করে দিই নরমুণ্ডকে দিয়ে সিগারেট খাওয়ানো আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব তখন তিনি কী বলবেন? যে চিঠিটা আজকাল পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলাম, তার থেকে শেষ কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়নি। প্রকাশিত হলে ওই তান্ত্রিকবাবাজী ও কথা বলতেন না।'

"শেষ অংশে কী ছিল?" গোবিন্দবাবু জানতে চাইলেন।

'অফিস কপি' বের করে ওই অংশটুকু পরে শোনালাম:

"প্রসঙ্গত জানাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি '৯০ লেকটাউন বইমেলার অনুষ্ঠানে দর্শকদের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া একটি ছবির মুখে সিগারেট গুঁজে দিয়ে আগুন জ্বেলে দিতেই ছবিটি সিগারেট টেনেছে, রিং ছেড়েছে জীবন্ত মানুষের মতই। উপস্থিত দর্শকরাই সাক্ষী। ঘটনাটা ঘটিয়ে ছিলাম লৌকিক কৌশলে, ছবির ভূতকে জাগ্রত করে নয়।

একই সঙ্গে পরিচালক অঞ্জন দাসের কাছে দাবি জানাচ্ছি—সত্যের নামে মিথ্যা প্রচার করা থেকে এবং অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন অথবা আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রমাণ করুন তন্ত্র হল বিজ্ঞান।'

আশা রাখি আমাদের এই দাবির সঙ্গে প্রতিটি সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও গণসংগঠন একমত হবেন এবং সোচ্চার হবেন।"

৯ মার্চ '৯০ বর্তমান পত্রিকাতেও ছবি সহ চার কলম জুড়ে একটি প্রতিবেদন

প্রকাশিত হলো—বাংলায় তন্ত্র নিয়ে ছবি হচ্ছে—তান্ত্রিক। প্রতিবেদনটির শেষ অংশে ছিল—"তারাপীঠের শ্মশানে দাঁড়িয়ে শুটিং স্পটে নির্মলানন্দ বলেছিলেন, 'তন্ত্রের প্রভাব এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। কিছু অপপ্রয়োগে তন্ত্র নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হচ্ছে। তন্ত্র এখনও জাগ্রত।'—সেই সময় জনৈক সাংবাদিক বলে ফেললেন, 'দেখাতে পারবেন ?'—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলেই পাশের কুটিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন বিশাল হোমকুণ্ডর সামনে সার সার খুলি। সেই খুলির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট দিলেন—অবিকল মানুষের মত সেই খুলি সিগারেটে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। সাংবাদিকরা বিস্মিত হলেন—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।

১৯ মার্চ '৯০ বর্তমান পত্রিকায় এর উত্তরও প্রকাশিত হলো 'জনমত' বিভাগে।

তান্ত্রিক : চ্যালেঞ্জ জানালো যুক্তিবাদী সমিতি

৯ মার্চ 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলায় তন্ত্র নিয়ে ছবি হচ্ছে—তান্ত্রিক' প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ একটি মড়ার খুলির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দিয়ে দেখালেন যে সেই খুলি সিগারেটে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। অর্থাৎ এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, 'তন্ত্র এখনও জাগ্রত'।

'বর্তমান'-এর মত একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় স্বভাবতই জনমনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আমার ও আমাদের সমিতির মতামত জানতে চেয়ে রাশি রাশি চিঠি এসেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি লেকটাউন বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে আমাদের 'অলৌকিক নয় লৌকিক' অনুষ্ঠানে তিনজন জাগ্রত নরমুণ্ডের সিগারেট টানার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে ব্যাখ্যা চান। কারণ ইতিপূর্বে অন্য একটি পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। একজন তো ঐ পত্রিকার কাটিং পর্যন্ত হাজির করেছিলেন। সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির অবসানকল্পে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্মলানন্দকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, তিনি নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্য সমাবেশে কৌশল ছাড়া মড়ার খুলিকে দিয়ে সিগারেট টানাতে পারলে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ও সমিতির কয়েকশো সহযোগী সংস্থা এবং শাখা সংগঠন তাদের সমস্ত রকম অলৌকিক-বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবে। প্রণামী হিসেবে আমি দেব ৫০ হাজার টাকা।

এই চিঠিটি 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে নির্মলানন্দ আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করলে অবশ্যই ধরে নেবো নির্মলানন্দ পিছু হটেছেন। যদি তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তবে আমরা তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণের একমাসের মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনেই তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ নেবো।

প্রসঙ্গত জানাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি লেকটাউনে বইমেলার অনুষ্ঠানে দর্শকদের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া একটি ছবির মুখে সিগারেট দিয়ে আগুন জ্বেলে দিতেই ছবিটি

একটি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে সিগারেট টানছে মড়ার খুলি

সিগারেট টেনেছে, রিং ছেড়েছে জীবন্ত মানুষের মতই। উপস্থিত দর্শকরাই সাক্ষী। ঘটনাটা ঘটিয়ে ছিলাম লৌকিক কৌশলে, ছবির ভূতকে জাগ্রত করে নয়।

একই সঙ্গে পরিচালক অঞ্জন দাসের কাছে দাবি জানাচ্ছি সত্যের নামে মিথ্যা প্রচার করা থেকে এবং মানুষকে অন্ধকারের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। অথবা আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রমাণ করুন 'তন্ত্র' হলো বিজ্ঞান'।

প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮, দেবীনিবাস রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৪

৩১ মার্চ '৯০ 'আজকাল' পত্রিকায় নির্মলানন্দের পাল্টা চ্যালেঞ্জ প্রকাশিত হয়। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

জাগ্রত নরমুণ্ড : পাল্টা চ্যালেঞ্জ

৬ মার্চের আজকালে 'জাগ্রত নরমুণ্ডু : একটি চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক চিঠি চোখে পড়ল। চিঠিটি লিখেছেন প্রবীর ঘোষ। বলতে বাধ্য হচ্ছি, চ্যালেঞ্জ করাটা প্রবীর ঘোষ

মহাশয়ের একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। ওঁর চিঠিতে 'বুজরুকি' কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে বলেই নেশা কথাটা লিখতে বাধ্য হলাম। হয়তো ওঁর জানা নেই, আত্মার কোন মৃত্যু নেই এবং অভেদানন্দের লেখা 'মরণের পরে' বইটাও হয়ত পড়া নেই। তন্ত্র সাধনা আত্মা নিয়ে খেলা এবং এটা বই পড়ে হয় না। এজন্য চাই কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা। ওর প্রণামীর চাইতে তারা মা এবং গুরুর আশীর্বাদ আমার কাছে যথেষ্ট। নরমুণ্ডের সিগারেট টানার ব্যাপারটা বিতর্কিত ছবির মধ্যে নেই কারণ আমার সাধনার বস্তু কখনই এভাবে প্রকাশিত করা যায় না। তবে বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকেরা যখন ছবির শুটিং দেখতে যান তখন অন্য সকল দর্শনীয় দ্রব্যের সঙ্গে এই নরমুণ্ডের সিগারেট টানা দেখে অবাক হন। তাঁরা পত্রিকায় একথা প্রকাশ করেন। চ্যালেঞ্জ থেকে চ্যালেঞ্জে আসতে বাধ্য হলাম। প্রবীর ঘোষ যেন এই চিঠি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার দশ দিনের মধ্যেই নিজের হাতে আমার সামনে এসে পরীক্ষা করেন। ঐ পরীক্ষা ঐ মহাশ্মশান বা আশ্রমেই করতে হবে। কারণ সাধনার বস্তু কখনই বাজারের ফলমূলের মত তুলে আনা যায় না। যদি উনি না আসেন, তাহলে আমার যা করণীয় তা করব। আমি তান্ত্রিক না সাধক জানি না তবে মাকে নিয়ে পড়ে আছি।

নির্মলানন্দ তীর্থনাথ।
তারাপীঠ মহাশ্মশান।
চণ্ডীপুর। বীরভূম।

৪ এপ্রিল '৯০ 'বর্তমান'—পত্রিকাতেও প্রকাশিত হলো নির্মলানন্দের চিঠি।

প্রসঙ্গ : তান্ত্রিক

গত ৯ মার্চ 'বর্তমান' সংবাদপত্রে 'বাংলায় তন্ত্র নিয়ে ছবি হচ্ছে তান্ত্রিক' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল, আমি সাংবাদিকদের সামনে একটি মাথার খুলির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দেওয়ায় সেই খুলি সিগারেটে ঘনঘন টান দিচ্ছিল। একথা সম্পূর্ণ সত্যি। এরপর গত ১৯ মার্চ আমায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ একটি চিঠি লিখেছেন। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জানাই, স্বামী অভেদানন্দের লেখা বইটি হয়ত তাঁর পড়া নেই। আত্মার কোনও মৃত্যু নেই। তন্ত্র সাধনা আত্মা নিয়ে খেলা এবং এটা বই পড়ে হয় না। কঠোর পরিশ্রম, সাধনা সেই সঙ্গে ঈশ্বরের কৃপা থাকলে তবেই এটা সম্ভব হয়। নরমুণ্ডের সিগারেট টানার ব্যাপারটা 'তান্ত্রিক' ছবির মধ্যে নেই। সাংবাদিকরা অন্য সকল দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে এটা দেখে অবাক হয়ে যান এবং একথা পত্রিকায় প্রকাশ করেন।
আমি চ্যালেঞ্জের জবাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে বাধ্য হলাম। এই চিঠি প্রকাশিত হবার দশ দিনের মধ্যে প্রবীরবাবু যেন নিজের হাতে আমার সামনে এই পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা তারাপীঠের মহাশ্মশানেই করতে হবে। কারণ, সাধনার বস্তু কখনই বাজারের

ফলমূলের মত তুলে আনা যায় না। যদি উনি না আসেন তবে আমার যা করার তাই করবো। আমি তান্ত্রিক না সাধক জানি না—তবে মা-কে নিয়ে পড়ে আছি। পত্রলেখককে অভিনন্দন সহ শ্মশানবাসী এই অনভিজ্ঞ-র এই আবেদন রইল।

নির্মলানন্দ তীর্থনাথ
তারাপীঠ মহাশ্মশান, চণ্ডিপুর, বীরভূম

'আজকাল' ও 'বর্তমান' দুটি পত্রিকাতেই আমরা বক্তব্য পাঠালাম ১ এপ্রিল ও ৪ এপ্রিল '৯০। কিন্তু চিঠি দুটি যে কোনও কারণে হোক প্রকাশিত হয়নি। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ছিল। আমরাই কয়েক শো চিঠি পেয়েছি—যেগুলোতে পত্রলেখক জানতে চেয়েছিলেন নির্মলানন্দের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করেছি কি না?

আজকাল পত্রিকায় পাঠান চিঠিটির একটি প্রতিলিপি এখানে প্রকাশ করলাম। 'বর্তমান' পত্রিকাতেও এই বক্তব্যের চিঠিই পাঠিয়েছিলাম।

১-৪-৯০

৩১ মার্চ আজকাল পত্রিকায় 'জাগ্রত নরমুণ্ড : পাল্টা চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে প্রকাশিত চিঠিটি পড়লাম। তাঁর চিঠির প্রথম অভিযোগের উত্তরে জানাই, 'চ্যালেঞ্জ' ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কর্মধারার বিভিন্ন পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় মাত্র। আমাদের সমিতি কুসংস্কার ও জাতপাতের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তুলতে আমরা তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণের মধ্যে হাজির হয়ে তাদেরই সঙ্গে মিশে গিয়ে কুসংস্কার ও তার মূল কারণগুলোর বিষয়ে সচেতন করছি, নাটক, প্রদর্শনী, গণসংগীত, প্রতিবেদন, বইপত্র, আলোচনাচক্র, শিক্ষাচক্র, ইত্যাদি মাধ্যমে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে কেউ কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা চাইলে দেব। সাধারণ মানুষকে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' মুক্ত করতেই আমাদের চ্যালেঞ্জ। যতদিন সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' থাকবেল ততদিন 'নেশা' কাটাতে আমাদের চ্যালেঞ্জের নেশাও থাকবে।

নির্মলানন্দ জানিয়েছেন, স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পরে' বইটা হয় তো আমার পড়া নেই। উত্তরে বিনীতভাবে জানাই বইটির নাম 'মরণের পারে', 'পরে' নয়। কিন্তু বইটির প্রসঙ্গ টানলেন কেন, বুঝলাম না। আমার পড়া থাকা বা না থাকায় কি আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়?

বইটি পড়া আছে। অভেদানন্দের কথা মত আত্মা মানেই 'চিন্তা', চেতনা', বা 'মন'। শরীর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জেনেছে, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ-কর্মের ফলই হলো 'চিন্তা', 'চেতনা' বা 'মন'। মানুষের মৃত্যুর পর তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের অস্তিত্ব বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই চিন্তারূপী চৈতন্যরূপী আত্মারও মৃত্যুর পর বাস্তব

অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

নির্মলানন্দের পরীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম নিরপেক্ষ স্থানে এবং প্রকাশ্যে। একবারের জন্যেও অনুরোধ করিনি, আমাদের সমিতির কার্যালয়ে এসে তাঁকে প্রমাণ দিতে হবে। জানতাম নির্মলানন্দ কখনই নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যে কোনও কৌশল ছাড়া নরমুণ্ডুকে সিগারেট খাওয়াতে পারবেন না। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই উনি প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ স্থানে হাজির হতে অক্ষমতা জানিয়েছেন। নারাজ হওয়ার পিছনে একটি কুযুক্তিও হাজির করেছেন—"কারণ সাধনার বস্তু কখনই বাজারের ফলমূলের মত তুলে আনা যায় না।"

সিনেমার তো এখন আন্তর্জাতিক বাজার। সেই বাজারে সাধনার ফলকে হাজির করতে পারলে নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যে হাজির করতে অসুবিধে কোথায়? ওঁর আশ্রমে আমি গেলে আমি হারলেও হারবো, জিতলেও হারবো।

চিঠির শেষে নির্মলানন্দ যে প্রচ্ছন্ন হুমকী দিয়েছেন, আমার বা আমাদের সমিতির কাছে সেটা নতুন কিছু নয়। এর আগে যখনই আক্রান্ত হয়েছি, দুর্বার জনরোষ আক্রমণকারীদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আক্রমণকারীরা কখনও হয়েছে ফেরার, কখনও বা সচেষ্ট হয়েছে আত্মহননে।

নির্মলানন্দকে আবারও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, প্রকাশ্য নিরপেক্ষ স্থানে আপনার ক্ষমতার পরীক্ষা দিয়ে কৌশল ছাড়া নরমুণ্ডুকে দিয়ে সিগারেট খাওয়ান। আর প্রকাশ্য স্থানটা কলকাতা প্রেস ক্লাব হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ধৃষ্টতা যদি নির্মলানন্দ দেখান, তাঁর মাথা যুক্তিবাদের কাছে নত হতে বাধ্য হবে। আবারও প্রমাণ হবে অলৌকিকত্বের অস্তিত্ব আছে শুধু কল্পকাহিনীতে।

ঠাকুরনগর খেলার মাঠে ১৩ এপ্রিল বিকেল তিনটেয় আমাদের সমিতির 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে নির্মলানন্দের ছবিকে দিয়েই সিগারেট খাওয়াবো। নির্মলানন্দসহ উৎসাহিতদের উপস্থিতি কামনা করছি।

শুভেচ্ছা সহ
প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮, দেবীনিবাস রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৭৪।

এরপরও আরও কিছু বলার রয়ে গেছে। নির্মলানন্দকে রেজেস্ট্রি ডাকে একটি চিঠি পাঠাই ২৬-৫-৯০। দীর্ঘ চার পৃষ্ঠার চিঠির প্রথম অংশটা ছিল 'আজকাল' ও 'বর্তমান'-এ পাঠান জবাব—যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। শেষ অংশটুকু আপনাদের কৌতুহল মেটাতে তুলে দিচ্ছি।

"ইতিমধ্যে আমরা বহু 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের অনুষ্ঠানে ছবিকে

দিয়ে সিগারেট পান করিয়েছি। ছবি সিগারেট টেনেছে জীবন্ত মানুষের মতই। পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতেও যে কোনও নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যেই এমন ঘটনা ঘটিয়ে দেখাবেন আমাদের সমিতির বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংস্থার হাজার হাজার সভ্যরা। এর জন্য আমরা আশ্রয় নিয়েছি তন্ত্রের নয়, কৌশলের।

মাসিক পত্রিকা 'আলোকপাত' পাঠে জানলাম, আপনি নরকঙ্কালের মুণ্ডুকে দিয়ে কারণবারিও পান করান। ইতিমধ্যে আমাদের সমিতি ও কয়েকশত সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠন নরমুণ্ডুকে দিয়ে দুধ (মদের পরিবর্তে) পান করিয়ে দেখিয়েছেন অন্তত কয়েক হাজার অনুষ্ঠানে।

আমাদের সঙ্গে আপনার পার্থক্য, আমরা এগুলো ঘটিয়ে দেখিয়ে কোনও অলৌকিক ক্ষমতার দাবি রাখি না। আপনি এগুলো ঘটিয়ে দাবি করেন অলৌকিক ক্ষমতার।

যেহেতু নরমুণ্ডুকে দিয়ে সিগারেট পান বা মদ্যপান লৌকিক কৌশলেই করা সম্ভব, তাই আপনার অলৌকিক ক্ষমতার দাবি বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্যোতিষ ক্ষমতার দাবিদারদের দাবির যথার্থতা জানতে সত্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকি। আপনি একজন সৎ মানুষ হলে আমাদের এই সৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে আপনার দাবির ক্ষেত্রে আমাদের সত্যানুসন্ধান চালাতে সমস্তরকম সহযোগিতা করবেন—এ আশা রাখি।

আগামী ১৬ জুন রবিবার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সময় বিকেল চারটা। সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আপনি মড়ার খুলিকে জাগ্রত করে সিগারেট ও মদ খাওয়াতে পারলে আমি ও আমাদের সমিতি পরাজয় স্বীকার করে নেবো। তবে অবশ্যই ঘটনাগুলো আপনাকে ঘটাতে হবে কৌশল ছাড়া।

আমাদের সমিতির এই সত্যানুসন্ধান বিষয়ে সহযোগিতা না করলে অবশ্যই ধরে নেব আপনার তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাগুলো আর যাঁদেরই দেখান না কেন, আমাদের নিরপেক্ষ পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আপনিও আমাদের মতই কৌশলের সাহায্যেই ঘটনাগুলো ঘটিয়ে থাকেন।

শুভেচ্ছা সহ
প্রবীর ঘোষ

না, নির্মলানন্দ চিঠিটি গ্রহণ করেননি। সম্ভবত প্রেরক হিসেবে আমাদের সমিতির ও আমার নামটিই চিঠিটি গ্রহণ করার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিঠিতে পুরো ঠিকানাই অবশ্য ছিল।

শ্রীনির্মলানন্দ
তারাপীঠ মহাশ্মশান, চণ্ডীপুর, বীরভূম।

নির্মলানন্দের জন্য খোলা চ্যালেঞ্জ আজও রইল। সাধ্য থাকলে যেন গ্রহণ করেন।

ছয়

ডাইনি ও আদিবাসী সমাজ

ডাইনি লাগা

'বর্তিকা' পত্রিকার '৮৭ সালের জানুয়ারি-জুন সংখ্যার জন্য লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে, অজিত সিং একটি লেখা পাঠান। লেখাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী। অজিত সিং তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন। আপনাদের অবগতির জন্য লেখাটি এখানে তুলে দিলাম :

আপনার দেওয়া পত্র পাইয়া, আপনার পত্রিকার জন্য চাওয়া বিষয় নিম্নে লিখিয়া পাঠাইলাম।

ডাইনি আজকাল কেউ বিশ্বাস করে না, কারণ বিজ্ঞানের যুগ,—কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে গল্প শুনে নয়, ডাইনি শক্তি চোখে দেখে।

চোখে কি দেখেছি—বলছি।

আজ থেকে কিছুদিন আগেকার ঘটনা। আমি দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলাম। বেশ জমানো তাস খেলা হচ্ছে। এমন সময় একজন এসে খবর দিল যে, ইন্দ্রের মাকে ডাইনি লেগেছে। সবাই খেলা ছেড়ে ইন্দ্রের বাড়ী গেল। গিয়ে দেখি ইন্দ্রের ম্য ভুল বকাবকি করছে। হঠাৎ এই অবস্থা দেখে কেউ যেন কূলকিনারা পাচ্ছে না। কারণ সবাই দেখছে ইন্দ্রের মা এখনি পুকুর থেকে স্নান করে গেছে।

এর আগে তো এমন দেখিনি। যারা ডাইনি বিশ্বাস করে তারা বলছে হয়তো জ্বর হয়নি, যারা বিশ্বাস করে না তারা বলছে হয়তো জ্বর তুলেছে, কিন্তু জ্বর তুললে তো গায়ের তাপ পরিবর্তন হয়। ইন্দ্রের মাকে দেখে মনে হয় না যে, তার জ্বর তুলতে পারে, কারণ সে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে। এই অবস্থায় দেখে গ্রামে এক ওঝা আছে, তাকে ডাকা হলো। ওঝাকে দেখে ইন্দ্রের মা যেন অন্য মূর্তি। ওঝা তার কাছে গিয়ে বসলো। ওঝার কাছে ছিল একটি আলো এবং একটি হাড়ির লাটা। ইন্দ্রের মা তখন আলোর দিকে তাকায়নি, অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। "আলোটার দিকে একবার মুখ ঘুরা মা"—এই বলে ওঝা আলোটা তার মুখের দিকে নিয়ে যায়। তখন ইন্দ্রের মায়ের মুখ ঢাকা নিয়ে অন্য দিকে তাকায় এবং একটু করে হাসছে। তখন ওঝা বাইরে এসে ইন্দ্রকে বলে যে, "প্রকৃত ডাইনি ভর করেছে।" ওঝাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করে বুঝলে যে ডাইনি ভর করেছে" ? ওঝা তার উত্তরে আমাদেরকে বলল, তার কতগুলো

নিয়ম আছে, "যেমন আলোর দিকে তাকায় না, আতা পাতা দিলে তার রাগ হয়। যদি না বিশ্বাস হয় যা দেখি একজন আতা পাতা নিয়ে তার কাছে দিয়ে আয়।" কিন্তু কে যাবে—সবাই এর মনে একটা ভয় আছে। গৌর নামে বছর ৩৫/৩৬ এর একজন লোক এই কথা শুনে কিছু আতা পাতা নিয়ে তার কাছে গেল। যেমনি বিছানার কাছে এসেছে, তেমনি সে তাকে তাড়া করে নিয়ে যেতে লাগল। গৌর তখন কি তার বিছানায় আতা পাতা দিবে—ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এলো। তারপর আবার সে বকাবকি আরম্ভ করে দিল। ওঝা বারণ করে বলল, "শুধু শুধু তার সঙ্গে লাগিস না।"

তখন আর কেউ না লাগিয়ে ওনার রহস্য দেখতে লাগল। ওঝা একটি পাত্রে কিছু আগুন রেখে, মুখে কি বিড় বিড় করে বলল, তারপর আগুনের মধ্যে কিছু ধূনা ফেলে দিল। তখনই ইন্দ্রের মা "ছাড়—ছাড়, আমি ঘর যাব," এই বলে ওঝার কাছ থেকে চলে এলো। কিছুটা গিয়ে ইন্দ্রের মা ফিরে এলো। এইভাবে ওঝা তিন-চার বার করার পরে ও যখন তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পারল না, আবার সে ফিরে এলো। ওঝা তখন বুঝতে পারল যে, এখন ডাইনির ভর তার গা থেকে যাবে না। সন্ধ্যার সময় যাবে। ওঝার এই কথা শুনে একজন বলল যে, কোথাকার ডাইনি, কোন ডাইনি ভর করেছে ? ওঝা কোনো মতেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হয় নাই। কারণ তার বিশ্বাস ডাইনি সহজে তার নাম এবং বাড়ী কোথায় বলে না। বেশী আলতু-ফালতু জিজ্ঞাসা করলে কণ্ঠা ফেলে দেয়। তবু তাকে কোনো মতে রাজি করান গেল। ওঝা তখন ইন্দ্রের মাকে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা করছে যে, "তুমি কোথায় এসেছো ?" এর উত্তরে ইন্দ্রের মা বলল, "কেন আমার পুত্রাবাড়ি এসেছি। আবার কি জিজ্ঞাসা করতে এসেছো ? আমার দরকার ছিল তাই এসেছি ?" তুমি কবে এসেছ ? "কাল থেকে এসেছি।" এই কথা শুনে সবাই মনে ভাবতে লাগল কোথাকার ডাইনি কেউ বুঝতে পারছে না। ওঝা জিজ্ঞাসা করছে, "ঘর কখন যাবে ?" "সন্ধ্যার সময় যাব"। তোর কয় ছেলে মেয়ে ? আমার তিন ছেলে এক মেয়ে। ইন্দ্রের বাবা তোর কে হয় ?—"ভাশুর হয়"। ওঝা তারই বাড়ীর সামনের এক ছেলেকে লক্ষ্য করে বলল—"এ কে হয় ? একে চিনতে পারলাম না।" তখন বুঝতে পারা গেল কোথাকার ডাইনি। ওঝা ইন্দ্রের বাবাকে কাছে ডাকল, কাছে যেতে ইন্দ্রের মা ভাশুর আসছে বলে মাথায় ঘোমটা তুলে ওঝার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল।

ইন্দ্রের বাবাকে ওঝা বলল যে, "গ্রামের যারা ডাইনি বলে পরিচয়, তাদের কারো তো তিনটি ছেলে এবং একটি মেয়ে নেই। পাশাপাশি গ্রামের যারা ডাইনি বলে পরিচয় তাদেরকে লক্ষ্য করলাম। সাতভাণ্ডারী গ্রামের একজনের তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কাল তাদের বাড়ী গিয়েছিল ধানের ব্যাপারে নিয়ে। সবাই জানে সে খুব শান্ত ডাইনি। যাক্ এখন কিছু করার নেই। সন্ধ্যায় যা হবার হবে। সন্ধ্যার সময় ওঝা তার কাজ শুরু করল। চার পাঁচ জন লোক ডেকে বলল, "আমি এখন ধূনার ছাঁট মারব, তোমরা খুব শক্ত করে ধরবে। আর ছাড়া হয়ে গেলে তার পেছন ছাড়বে না। মাটিতে বেশী জোরে পড়তে দেবে না"। এই বলে ওঝা মুখে কি বিড়বিড় করে বলল, তারপর ধূনার ছাঁট মারল। ধূনার ছাঁট মারতে কি করে রাখবো ছাড় ছাড় বলে,—ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং রাস্তায় এসে দড়াম করে পড়ল। সেখান থেকে তুলে আনলে

আবার ধূনা ছাঁট মারল, এবারও তাকে তুলে আনল। তার ঘর কোথা জিজ্ঞেস করল না। তাকে ধরতে না পারলে ঘর জিজ্ঞাসা কী করে করবে। এবার খুব শক্ত করে ধরবে এবং ঘর জিজ্ঞেস করবে। এই বলে ওঝা মুখে কি বিড় বিড় করে বলল এবং মারলো ধূনার ছাঁট। তারা খুব শক্ত করে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "তোর ঘর কোথা ? ছাড় বলছি।" এবার তার গ্রামের নাম সাতভাণ্ডারী বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা করতে পারল না। তারপর রাস্তা থেকে তুলে আনল এবং আবার ধুনার ছাঁট মারল, কিন্তু আর কিছু হলো না। তখন ইন্দ্রর মা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওঝা তখন বলল, তার গায়ে ডাইনি আর ভর করে নেই। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল এবং ইন্দ্রের বাবাকে বলল, কাল যদি এইভাবে বকাবকি করে বা কাউকে না চিনতে পারে, তবে ওঝাকে যেন ডাকে। স্বাভাবিক থাকলে ডাকতে হবে না। সহজেই এইভাবে ডাইনি ধরা যায়।

এই ঘটনাটি নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে 'বর্তিকা'র ওই সংখ্যাটিতে প্রকাশিত শ্রীগঙ্গাধর মাহাত'র অভিজ্ঞতা আপনাদের শোনাতে চাই :

'ডাইনি', শব্দটা অশরীরী, অলৌকিক আর অলৌকিক মানেই তার কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই (অন্তত সাধারণের কাছে), আর আমরা যেহেতু ইলেকট্রনিকস্-এর যুগে বাস করছি সেহেতু স্বভাবতই এর পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা (যদিও মৌলিক নয়) চালাবার চেষ্টা করি আর সেখানেই আমরা সব থেকে বেশি ভুল করি বলেই আমার ধারণা। আমার অবশ্য বিজ্ঞান চিন্তাধারা অনেকটা সীমিত তবু এর মধ্যেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি, কোনও দিন সফলকাম হতে পারিনি। মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করি এসব এক ধরনের রোগ কিন্তু কী রোগ তার কোন সফল ব্যাখ্যা দিতে পারি না কারণ আমি নিজেও জানিনা ব্যাপারটা আসলে কী ?

একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি, কয়েকদিন আগে আমারই এক বন্ধুর বোন, বয়স ৯/১০ বছর, হঠাৎ শুনলাম তার নজর লেগেছে। গ্রামের লোকের কথায় ডাইনি লেগেছে। তড়িঘড়ি করে ছুটলাম, আমার বাড়ির ৩০০ গজের মধ্যে তার বাড়ি। গিয়ে দেখি মেয়েটি মুখ ঢেকে হাত-পা ছুঁড়ছে কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে। মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম তখন তিন জন সমর্থ পুরুষ হিমসিম খেয়ে গেলাম তাকে সামলাতে। এবার গ্রামের প্রথামত আতা পাতা বিছানায় দিলাম। তখন সেকি ছটফটানি সামলে রাখা দায়। ছেড়ে দিলাম, সবিস্ময়ে দেখলাম সমস্ত পাতাগুলো ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত তার যেন স্বস্তি নেই। সবাই একমত হলেন যে ওকে ডাইনি ভর করেছে ওঝা ডাক্তার ব্যবস্থা করা হলো। অবশ্য আমরা মানে আমি এবং আমার বন্ধু যারপরনাই চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ওঝা এসে মন্ত্র পড়ে ধুনোর এ বামর ('একটি পলতেতে আগুন জ্বালিয়ে সেই শিখার উপর দিয়ে ধুনোর গুঁড়োর ঝাণ্টা মারা' এতে অনেক সময় রোগিণীর চামড়া পুরে যায় চুল পুড়ে যায়) মারতেই সে চিৎকার করে উঠলো 'ছেড়ে দে আমি যাবো'। বলেই বিছানা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে দৌড় লাগাল এবং একটি বাড়ির দরজার সামনে পড়ে গেলো। সেই বাড়ির একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক 'ডাইনি' বলে পরিচিত। এর কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি ঘটেছিলো আজ থেকে একবছর আগে, আমার মায়ের ক্ষেত্রে, সবেমাত্র টাইফয়েড ছেড়ে পথ্য করেছেন, দেহ বেশ দুর্বল হাঁটা চলা করেন খুব কম। ঘরের পাশাপাশি সকাল বিকাল একটু বেড়ান। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। সেদিনটা ছিল শনিবার স্কুল থেকে ফিরে মাকে ওষুধ খাওয়ানোর জন্য গিয়েছি। হাত ঘড়িতে তখন বেলা তিনটে। দেখি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মা শুয়ে আছেন আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। আমি ডাকলাম, 'মা ওষুধ খাবে ওঠ' কোন সাড়া নেই, বিড়বিড় করে কী বলছেন শুনতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। গায়ে হাত দিয়ে একটু জোরের সঙ্গে ডাকলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর 'কে তোর মা'। আমি আবার বললাম 'মা আমি গঙ্গাধর'। "দূর শালা দিদি বলতে পারিস না ? আমি তোর মা নই, আমি তোর দিদি।" ভয়ে বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না, প্রথমে ভাবলাম মা কি পাগল হয়ে গেলেন ? পথ্য করার পর থেকে যিনি কথা বলতে হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি এত জোরে কথা বললেন কী ভাবে। হাত ধরে ওঠাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু এত জোরে ঝটকা দিলেন আমি খাট থেকে নিচে নেমে এলাম। অবাক হলাম। যিনি হাঁটতে পারেন না এত জোর পেলেন কোথা থেকে। এবার আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো, মন সন্দিহান হয়ে উঠলো। বাড়ির অন্যান্য লোকদের খবর দিলাম। তাঁরাও এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন একই ধরনের উত্তর। যেমন কাকা এসে বৌদি ডাকতেই বলে উঠলেন 'দূর বেহায়া আমি তোর কাকী হই, লজ্জার মাথা খেয়েছিস।' সবার মনে সংশয় ঘনীভূত হল। এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু মুখ থেকে কাপড় একটুও সরাননি, বিড়বিড় করা অব্যাহত আছে। বাড়ির ও আশেপাশের প্রবীণ-প্রবীণারা আতা পাতা এনে বিছানায় দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাতাগুলি ক্ষিপ্রতার সহিত উনি বিছানার নিচে ফেলে দিলেন। অতঃপর ওঝা এলো, মন্ত্র পড়লো। মা খাট থেকে নেমে বাইরে গেলেন এবং একটি ঘরের দরজার পাশে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন। আমরা সবাই ধরাধরি করে খাটে এনে শুইয়ে দিলাম। প্রচণ্ড ঘাম হলো আর তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আগেও যাঁর শক্তি আমাদের পরাভূত করেছিলো তিনি এখন জ্ঞানহীন, সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় অল্পক্ষণেই জ্ঞান ফিরলো। দুচোখ বড় বড় করে আমাদের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন মনে হলো অন্য কোন গ্রহ থেকে আসা আগন্তুকদের দেখছেন।

ভুতে পাওয়া নিয়ে আগে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, সে আলোচনার আলোকে আপনাদের নিশ্চয়ই বুঝতে সামান্যতমও অসুবিধে হচ্ছে না যে তিনটি ক্ষেত্রেই মহিলা তিনজনই মানসিক রোগের শিকার হয়েছিলেন। এই মানসিক রোগ বিষয়ে ধারণা না থাকলে মনে হতেই পারে, 'ভুতে ভর' বা 'ডাইনি পাওয়া' বিষয়গুলোর পিছনে কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই বলে যে সব ইলেকট্রনিক্স যুগের মানুষ বিষয়টা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরা ভুল করছেন।

এও ঠিক, আমরা সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য তুলে দিতে পারিনি। কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে

যতটুকু কাজ করেছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা এতই অপ্রতুল যে মানুষের মনের 'ভূত-প্রেত-ডাইনি' মন ছেড়ে নির্বাসনে যায়নি। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার, জানান ও বোঝানোর দায়িত্ব কিন্তু বর্তায় প্রধানত বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী, যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং সরকারী প্রশাসনের।

সাঁওতাল সমাজে ডাইনি বিশ্বাস

সাঁওতাল সমাজে ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে বিশ্বাস সমুদ্র-গভীর। এই সমাজের যাঁরা শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তাঁদেরও সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যেও ডাইনিদের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বিষয়ে বিশ্বাস গভীর। একই সঙ্গে তাঁরা জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতায় ও তাঁদের ডাইনি খুঁজে বের করার ক্ষমতায় আস্থাশীল।

যাঁরা ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত: বাস্তবিকই ডাইনি ও জানগুরুদের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে ? কী, নেই ?

সিংরাই মুর্মু বাঁকুড়া জেলায় ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনে নেমেছেন। সিংরাই মুর্মুর কথায়—

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি আছে, আদিবাসী ভাষায় এদের সানি ও সখা বলে। ভালো কথায় জানগুরু। ইনি ভূত প্রেত ধরতে জানেন এবং কেউ ডাইনি হলে ঠিক রকম বলতে পারলে কিন্তু ডাইনি ছাড়াতেও পারে অবশ্য সেই জন্য মোটা টাকা দক্ষিণা হিসেবে দাবি করে। এবং ডাইনি কাউকে করিলে জরিমানা করা হয় বা দিতে হয়। কিন্তু যার দু মুঠো অন্ন সময়ে জোটে না, জীবন শেষ হয়ে যায় তার পক্ষে মোটা টাকা দেওয়া কি রকম কষ্টকর তা সহজেই অনুমেয়। এই ব্যাপারে আমরা বহু সমাজ সমিতি করেছি এবং বহু জায়গায় আমরা আদিবাসীর সমাজে সে আলোচনা করেছি কিন্তু তাতেও কোনো পড়েনি—বেশির দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই ডাইনি বাংলার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের বহুবার তুলে দিয়েছিলাম। কি ভারতবর্ষে সমাজ দিককে নিপুঞ্জকর এবং পুলিশদের হাতেও এই ব্যাপারে তুলে দিয়েছিল, কিন্তু কোনো ফায়দা হয়নি। সে জন্য আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দুঃখিত। আমার জীবনের যাত্রাতে এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা হলো বাংলা ১৩৭৫ সাল ১৫ই আশ্বিন। আমাদের গ্রামে একটি বৃদ্ধা মহিলা মুড়ি ভাজতে গিয়ে তাঁহার বাঁ পাটি উনুনের ভিতর চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঁ পায়ের বাইরের চামড়া আগুনের তাপে ঝলসে যায়। জ্বলে যাবার পর স্থানীয় ডাক্তারের অভাবে তাঁহার পরিবারের লোকেরা জঙ্গলের মধ্যের শিকড়-বাকড়ের ওষুধ বেঁধে সেই ঘায়ের উপর লাগাল। কিছুদিনের পর দেখা গেল ঘা-টি আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে এবং নতুন চামড়া গজাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার সেই বৃদ্ধ মহিলা আর স্থির হতে পারছেন না, চলা

ফেরার জন্য অস্থির। কোনো রকমে আর রাখা গেলো না। যেমনি চলাফেরা করলেন তেমনি তাঁর পায়ের চামড়া ফেটে ঝরঝর করে রক্ত বেরোতে লাগল। পায়ের অবস্থা আরও মন্দ হয়ে দাঁড়ালো। সেই মহিলার একটি ছেলে, যে হচ্ছে একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক। মায়ের কেটে যাওয়া ঘা দেখে তার মধ্যে একটা সন্দেহ ফুটে উঠল। আমার মা আর ভালো হবে না এবং আমার মাকে ডাইনি আক্রমণ করেছে। এতো ওষুধ লাগাচ্ছি ভালো হচ্ছে না কেন ? তাহলে ডাইনি ছাড়া কোনো কিছু আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু এইটুকু শিক্ষক মশাই বুঝতে পারলেন না, মায়ের ঘা এখনও শুকোয়নি চলাফেরা বন্ধ হোক। কিন্তু তা সে করল না। তিনি সোজা গ্রামের মোড়লকে আবেদন দিলেন, মায়ের ঘাটি ভালো হতে হতে কেন রক্তঝরণা হয় ? এতে নিশ্চয়ই কিছু আছে।

মোড়ল শিক্ষক মহাশয়ের আবেদন শুনে ঠিক করল, তাড়াতাড়ি পাড়ার লোককে ডেকে এবং মাস্টার মহাশয়ের ব্যাপারটার একটা সিদ্ধান্ত নেন। আমরা সবাই মোড়লের নির্দেশ অনুযায়ী সব ব্যাপারটা হ্যাঁ করলাম কারণ তাঁর কথা অমান্য করা মানে সংসারে আগুন ফেঁকা। কাজেই মোড়লের আদেশ অনুযায়ী আমরা সবাই পাড়ার লোক তেল ও খড়ি দেখব। কি কারণে মায়ের ঘা ভালো হচ্ছে না। সবাই এক হয়ে একটি ওঝার কাছে যাওয়া গেল। তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন আমাদের শিক্ষক মহাশয় এক মুঠো শালপাতা এবং ২৫০ গ্রাম তেল। সেই তেল দিয়া ওঝাবাবু আমাদের দেবতাকে ধরবে। ওঝাবাবু শালপাতায় তিন ফোঁটা সরিষার তেল দিয়া পানের মতন মুড়ে নিজের গায়ে বুলিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে রাখলেন। মিনিট পাঁচ পরেই সেই শালপাতায় নানারকম ছবি দেখা গেল। এতে আমাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিলেন, তোমাদের সমস্যাটা পুরোপুরি জানলাম। এটা কোনো পাড়ার যোগতী তেল নয়, এটা একটা মালিকের তেল এবং মালিক পাড়ার সহযোগিতা নিয়েছে। সবাই আমরা হাঁ করি এবং পরিষ্কার ভাবে ওঝাবাবু দেখিয়ে দেন, ঘরের পশ্চিম পাশে একটি আধাবয়স্ক মহিলা আছে। সে বিধবা, সেই মায়ের ওপর অত্যাচার আক্রমণ চালাচ্ছে। পরিষ্কার আমাদের মোড়ল থেকে পাড়ার সবাইকে ওঝাবাবু খুশি করিয়ে দেয় কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না কারণ একে সবার চেয়ে বয়েসে ছোট তাই বলার কোনো সুযোগ নাই। পরে সবাই আমরা ওঝাবাবুর মতামত শুনে তাঁকে দশটাকা দক্ষিণা দিয়া সবাই আমরা ওখান থেকে সরে যাই। কিছু কিছুদূর আসার পর আমাদের মোড়লবাবু একটা আদেশ করেন। কি ব্যাপার, কতটা সত্য আরও অন্য দুই জায়গাতে দেখা যাক। পরে আমরা একটা আলো নিয়ে আসব।

সেদিন সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া নাই সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমরা অন্য আরও দুই জায়গাতে দেখলাম। ব্যাপারটি সন্দেহজনক, কিন্তু আমি সন্দেহ করি না। কারণ যদি মহিলাটি ডাইনি হতেন—তাঁর সন্তানের আমার মত বয়স, এবং সে ছেলে আমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করেছে, খাওয়া-দাওয়া করেছে। সবাই আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু উপায় ছিল না। সেদিন আমরা পাড়ার লোক গ্রামে ফিরে আসার পর মোড়লবাবু আর একটি আদেশ করলেন। আমরা যে তিন জায়গাতে তেল খড়ি করলাম আরও আশপাশে তিনটি গ্রামে দিতে হবে। সবাই আমরা আরও তিনটি গ্রামে তেল খড়ি পৌঁছিয়ে

দিলাম এবং সবাইকে এক দুই দিনের মধ্যে Result চাইলাম যথাক্রমে আমরা একই দিনে সব লোকের তেল খড়ি মিলিয়ে দেখলাম ঐ পশ্চিম পাশের মহিলাটি ডাইনি বলে, আমাদের তেল খড়িতে বেরিয়েছে আর কোনো কথা নাই—সবাই গেলাম ওঝাবাবুর কাছে। দিন ঠিক করা হোলো এবং মোড়লবাবুর আদেশ অনুযায়ী আমরা সবাই সখা বাবুর কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু যাবার আগে মোড়লবাবু একটি কথা ঘোষণা করেন যেন আমরা সবাই সখাবাবুর কাছে যাব। যাবার আগে আমি একটা কথা ঘোষণা করছি—"আমাদের মধ্যে কেউ যদি ডাইনি হয়, তাকে জরিমানা হিসেবে ৩০০ টাকা দিতে হবে নইলে পাঁচ বিঘা জমি আমরা দখল করে নেব"। আমার কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে অমত। আমার সন্দেহ একান্ত বৃথা। মোড়লের আদেশ অনুযায়ী সকাল ১০টার সময় সখাবাবু মন্দির মুখে জপ করছিল। আমাদের দলবল দেখে সখাবাবু হাসিমুখ করে কিন্তু আমার মুখ শুকনো। আমরা সবাই সখাবাবুর চরণ ধুলো মাথায় নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষক মহাশয় ২৫০ গ্রাম সরিষার তেল সখাবাবুর হাতে তুলে দিলেন। সখাবাবু নিজের দেবতাকে তাঁর ভাষায় কিছু বলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ফলাফল জানালেন। "তোমাদের তেলের ভিতর দোষ আছে। যদি তোমরা তেল পরিষ্কার করতে চাও তাহলে আমার দক্ষিণা হিসেবে ৩,০০০ টাকা আমার মন্দিরে রাখ এবং আমি তোমাদের সব কিছু পরিষ্কার করে দেব। কোনো চিন্তা নাই।" কিছুক্ষণ পর সখাবাবু বললেন, "ঘরে একটি বিপদ কিছুদিন আগে হয়েছে কিন্তু তোমরা অনেক কিছু করেছ এতে ঠিক হয়নি। যাক ঠিক হয়ে যাবে।" আমরা চাঁদা করে ৩,০০০ টাকা দক্ষিণা হিসেবে মন্দিরে রাখলাম এবং সখাবাবুর কথা অনুযায়ী মাকে কিছুদিন চলাফেরা বন্ধ করা হোলো। একটা ওষুধ দিলেন, দিনে দুবার লাগানোর জন্য—মা কালীকে স্মরণ করে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া নেই। ভালোভাবে ভুঁড়িটি ভরে দিলেন। আমার করার কিছুই ছিল না। পরে বুঝলাম সব। কিছুদিন পরে বৃদ্ধা ভালো হয়ে যান।

ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনের শরিক এবং ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ গুরুচরণ মুর্মুর কথায় "সান্তাড়দের (সাওতাঁলদের) পুরাতন বৃদ্ধ কথায়" (সাঁওতালি ভাষায়-"হড় করেন মারে হাপড়ামক রেয়াও কথা") আছে কিভাবে একজন জ্ঞানী 'জানগুরু' তাঁর অদ্ভুত সব ক্ষমতার পরিচয় দিতেন। জানগুরু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে বলে দিতে পারতেন রোগীর নাম, রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের নাম। রোগিণী বিবাহিতা হলে তাঁর স্বামীর শ্বশুর-শাশুড়ীর নাম পর্যন্ত বলে দিতে পারতেন। অথচ রোগী বা রোগিণী হয় তো দূর গ্রামের বাসিন্দা, বলতে পারতেন, রোগের কারণ অপদেবতা না ডাইনি। অপদেবতা বা ডাইনির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়ও বলে দিত পারতেন।

গুরুচরণের কথা মত, "তখনকার জানদের (জানগুরুদের) বিশ্বাস করানোর মত কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তবে কি ডাইনিও ছিল ? উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে কোন লোকের যদি অলৌকিক ক্ষমতায় ভাল করার শক্তি থাকে তাহলে অলৌকিক ক্ষমতায় মন্দ করার শক্তিকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক। একজনের অলৌকিক শুভ শক্তিকে স্বীকার করলে অন্য আর একজনের অলৌকিক অশুভ শক্তিকেও স্বীকার

করতে হয়। তন্ত্র সাধনার গভীরতায় না গিয়েও বলা যায় ষটকর্মের স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচাটন-মারণের কথাও অনৈতিকহাসিক নয়।"

সুখেন সাঁতরা ডাইনি প্রথার বিরোধী। তাঁর ধারণায়, এইসব ডাইনির মত মধ্যযুগীয় প্রথাগুলো তাঁদের সমাজে আরও বহুদিন প্রচলিত থাকবে। থাকবে না কেন, যে সমাজের তিন ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে আর অশিক্ষা-কুশিক্ষার মধ্যে বাস করে সেই সমাজ থেকে এই অন্ধ সংস্কারের জগদ্দল পাথরকে ঠেলে সরাবার মত মহাজন কোথায় ?

এইসবই সুখেনের কথা। আবার এই সুখেনই বলেন, "রোগীরই অর্ধেক রোগ সেরে যায়। এই রকম ভাবে কারো পেটে সারা হলে পেট ভুটভাট করলে পাড়ায় পাড়ায় বুড়ো-বুড়িদের নুনপড়া দিতে দেখেছি। অর্থাৎ খানিকটা নুন নিয়ে মন্ত্র পড়ে দেয়, সেটা জল দিয়ে তিন দিন খেতে হয়। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি পেটে বায়ু জমা রোগীর পক্ষে নুন জল খুব উপকারি। সেইরকম ভাবে শরীরে কোথাও মোচড় লেগে গেলে তেলপড়ার বিধান। অর্থাৎ, মন্ত্রপূত সরষের তেল দিয়ে মালিশ। এক্ষেত্রে ঐ রোগীর সরষের মালিশটাই কাজ করে। আবার শোয়ার দোষে ঘাড়ে ব্যথা লাগলে বোতলে করে গরম জল ভরে ঘাড়ে তাপ দিতে দিতে মন্ত্র পড়তে দেখিছি। ঐ তাপটাই ঘাড়ের ব্যথা উপশমের কাজ করে এখানে।

এমনি আরো বহুরকম রোগের বহুরকম ঝাড়ফুঁক তুকতাকের ব্যাপার আছে যেগুলোর সঙ্গে আবার কোনরকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই মেলে না। যেমন কাউকে সাপে কাটলে আমি গাঁ-গঞ্জের বহু রোজাকে দেখেছি কেবল মন্ত্র ঝাড়ফুঁক করেই তার বিষ নামিয়ে দেয়। সে বিষধর সাপ হলেও। এইতো কিছুদিন আগে আমার মাকে রাত্রিবেলা চন্দুরে বোরা কামড়ে দিল। বিষের জ্বালায় মায়ের শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল, চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলেন। এইরকম একটি রোগীকে আমাদেরই পাড়ার একটি বউ কি একটা গাছের শিকড় দিয়ে (ওরা নাম বলতে চায় না) হাত চেলে আর ঝাড়ফুঁক দিয়ে মাত্র ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে সারিয়ে তুললো। আমাকে অসংখ্যবার নানা ধরনের সাপে কেটেছে। কিন্তু আমি কখনো হাসপাতালে যাইনি ঐ ঝাড়ফুঁকেতেই ভাল হয়েছি।

আবার সাপে কাটা রোগীকে থালা পড়া, সরা পড়া দিয়েও ভাল করতে দেখেছি। তেমন রোজাও আমাদের গাঁয়ে এখনো আছে। পিতলের থালায় মন্ত্র পড়ে রোগীর পিঠের ওপর ছুঁড়ে দেয়। সেই থালা চুম্বকের মত রোগীর পিঠের ওপর টেনে ধরে। যতক্ষন না বিষ নামে থালা ছাড়তে চায় না। সরা পড়াটা আবার আরো আশ্চর্যের ব্যাপার। রোজা একটা মাটির সরায় মন্ত্র পড়ে দিয়ে রোগীকে ঝাড়ফুঁক করতে থাকে। এবার যতক্ষণ না রোগীর দেহ থেকে বিষ নামবে ততক্ষণ ঐ সরা আছাড় মেরেও কেউ ভাঙতে পারবে না। তবে কোন সাপে কাটা রোগীকে যদি কোন ডাইনি ভেড়ে দেয় তাহলে কোন রোজার বাপ্যের সাধ্যি নেই বিষ নামায়। এইজন্য কাউকে সাপে কাটলে সে কথা রোজার কাছে ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করতে নেই। বলা যায় না কার পেটে কি আছে, যদি ভেড়ে দেয় তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ডাইনিকে তো আর আলাদা করে চেনা যায় না। আমাদের মতই মানুষ সে। সুতরাং চেনা দায়। আমাদের

পাড়াতেও তো এমনি এক ডাইনি বুড়ি আছে। গরুর বাচ্চা হলে এরা বাঁটের দুধ শুকিয়ে দেয় মন্ত্র দিয়ে। সদ্য-প্রসূতি মায়েদের এমন মাখ ভেড়ে দেবে ছেলে আর মাই খাবে না। মাইয়েতে যন্ত্রণা হবে। তখন আবার রোজার কাছে যাও, সে জলপড়া দিয়ে ঝাড়ফুঁক দিয়ে তবে ভাল করবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা মাদুলিও দিয়ে দেয় পাঁচসিকে আড়াই টাকা দাম মূল্য নিয়ে, যাতে ঐ ডাইনিতে পুনর্বার আর মাই না ভাড়তে পারে। গরুর গলাতে জিওলের বোল বেঁধে দিলেও ডাইনিরা আর ভাড়তে পারে না। আবার কারো গায়ে ঘা-ছি হলেও রক্ষে নেই। অমনি ডাইনিরা পাকা আমের মত গন্ধ পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ে দেয় তারা। তখন সেই ঘা আর মোটে সারতে চায় না।

তবে ডাইনিদেরও জব্দ করার রাস্তা আছে। নিজের পায়খানা নিয়ে ওকে খাইয়ে দাও, ব্যাস্, ডাইনি তার মন্ত্র ভুলে যাবে। এমনি একবার এক ঘটনা ঘটেছিল—এক বৌয়ের শাশুড়ী ডাইনি ছিল। তা বৌয়ের পায়ে হোঁচট লেগে খানিকটা কেটে গেছিল। অমনি ডাইনি তা থেকে পাকা আমের গন্ধ পেল। সে আর লোভ সামলাতে পারল না। নিজের বৌকেই ভেড়ে দিল। তা বউতো ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে সারা। কত পয়সা খরচ হতে লাগল, কত ওষুধ খেল কিন্তু সেই ঘা আর ভাল হতে চায় না। হবে কী করে, ঘরেতেই যার ডাইনি। বরং দিনে দিনে তার ঘা আরো বাড়তে লাগল। বউতো মহাচিন্তায় পড়ল। সোয়ামীকে বললে বলে—তোমার জন্যে কি আমি মাকে দূর করে দোব।

চিন্তায় চিন্তায় বউতো শুকোয়। তখন গাঁয়ের এক তিন মাথা বুড়ি তাকে পরামর্শ দিল। বলে,—ওলো বউ, তুই বরং এক কাজ কর, তোর শাউড়ীকে ডালের সঙ্গে গু খাইয়ে দে, দেখবি ও ওর ডাইনি মন্ত্র ভুলে যাবে। নিরুপায় বউ তাই করল। ডাইনিও তার মন্ত্র ভুলে গিয়ে দিনে দিনে রুগ্ন হয়ে একদিন মরে গেল। সেজন্য অবশ্য বউ ডাক ছেড়ে খুব কেঁদেছিল। কারণ শাউড়ী ডাইনি হলেও তার মরণতো সে চায়নি।"

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর "আদিবাসী সমাজের সংস্কার ও কুসংস্কার" লেখাটিতে এক জায়গায় বলছেন, "এটাকে (ডাইনি প্রথাকে) কুসংস্কার কিংবা অন্ধ বিশ্বাস যাই বলি না কেন, ভারতবর্ষের প্রায় সব আদিবাসী সমাজেই এই ক্ষতিকারক বিদ্যার চর্চা দেখা যায়। যদিও সকলেই জানে এর প্রয়োগ অসামাজিক তবুও তারা এর মোহমুক্ত হতে পারেনি। আদিবাসী সমাজের কাছে এটা নিদারুণ অভিশাপ।

অর্থাৎ শ্রীবাস্কের ধারণায়—ডাইনির মত একটা ক্ষতিকারক বিদ্যার চর্চা চলছে। ক্ষতিকারক মানে ? ডাইনি বিদ্যার সাহায্যে, ডাইনি ক্ষমতার সাহায্যে মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব ? অর্থাৎ ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে ?

শ্রীবাস্কে আরও বলছেন, "অনেক আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস, তুক-তাক ও ইন্দ্রজাল (black magic) বিদ্যায় মেয়েরাই পারদর্শী হয়। স্বাভাবিক কারণেই তারা দুর্বল। সমাজে নানা কাজে পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাদের অনেক কিছু স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে ঋতুবতী নারীর সম্পর্কে কিছু কিছু সংস্কার পৃথিবীর সব সমাজেই প্রচলিত আছে। এই অবহেলার জন্য অনেকে ক্রুদ্ধ হয় আর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এ বিদ্যা আয়ত্ত করে থাকে।"

বাস্তবিকই কী 'ডাইন-বিদ্যা'র অস্তিত্ব আছে ? ডাইনি-বিদ্যায় অন্যের মধ্যে রোগ সংক্রামিত করা যায় ? উচাটণ-মারন মন্ত্রে যে কোনও প্রাণীর মৃত্যু ঘটান সম্ভব ?

শ্রী বাস্কের প্রগতিশীল সংগ্রামী মন অবশ্য সেইসঙ্গে একথাও বলে, "এ সব মেয়েরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের ক্ষতি করে এবং তারা মনে করে যে অন্যের ক্ষতি করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাদের আছে। এ ক্ষতি হয়তো কোন অলৌকিক উপায়ে ঘটে না, কৌশলে কার্যকারণের যোগসাজোসেই এ সব হয়তো ঘটিয়ে থাকে।"

শ্রীবাস্কের মনেই সংশয় থেকে গেছে—হয়তো ডাইনিরা অলৌকিক উপায়ে ক্ষতি সাধন করেন না। অর্থাৎ ডাইনিরা হয়তো অলৌকিক উপায়েই ক্ষতি সাধন করে। শ্রীবাস্কের মনেই যদি ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে কী নেই—এই বিষয়ে সংশয় থাকে তাহলে সাধারণ সাঁওতাল সমাজের মানুষের ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক।

শ্রীবাস্কে ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে কতকগুলো উপায় উল্লেখ করেছিলেন। তার মধ্যে ডাইনি বিদ্যার অপকারিতা সম্পর্কে নাটক মঞ্চস্থ ও তথ্যচিত্র তোলার কথা ছিল। কিন্তু ডাইনি বিদ্যা বলে বিদ্যাই যেখানে কল্পনা মাত্র, সেখানে ডাইনি বিদ্যার পক্ষে বা বিপক্ষে বলার প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাস্তব সত্যকে সাধারণের সামনে তুলে ধরা আমাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং আদিবাসী সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য সহজ-সরল

নদীয়া জেলার জনৈক জানগুরু

যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে—ডাইনি বিদ্যা বলে কোনও বিদ্যার অস্তিত্বই নেই। জানগুরু, সখা বা ওঝাদেরও নেই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা।

ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যাঁদের কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তাঁদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় আমি শ্রদ্ধাবনত। শুধু এটুকু মনে হয়েছে—তাঁদের আন্তরিকতার সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে দৃষ্টির স্বচ্ছতা যুক্ত হলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

ডাইনি প্রথা বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যে পত্রিকা ও প্রচারপত্র মারফৎ দাবি জানিয়েছেন সারদাপ্রসাদ কিসকু, সভাপতি, 'সাঁওতাল সাহিত্য পরিষদ' ; মহাদেব হাঁসদা, সম্পাদক, 'তেতরে' মাসিক পত্রিকা ; কলেন্দ্রনাথ মান্ডি, সম্পাদক, 'সিলি' দ্বিমাসিক পত্রিকা ; গুরুদাস মুর্মু, সম্পাদক, 'খেরওয়াল জারপা' ; বালিশ্বর সরেন, সম্পাদক, 'জিরিহিরি'।

দাবি-পত্রে তাঁরা জানিয়েছিলেন, "...ভণ্ড জানগুরুদের কথায় বিশ্বাস করে কত যে অপরাধ, অন্যায়, অবিচার সংগঠিত হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ডাইনি প্রথা একটা অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নাই-ই, পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপকার পাবার প্রশ্নও নেই। এর মূল সমাজের এত ভিতরে প্রবেশ করেছে যে, এক্ষুণি এর অবসান ঘটানো সাধারণের ক্ষমতার অতীত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও ভারতের মত একটা কল্যাণ রাষ্ট্রের এ ধরনের কু-প্রথার অস্তিত্ব বিস্ময়জনক।

এই কুপ্রথার উচ্ছেদকল্পে
সরকার যদি আইন প্রণয়ন করেন, অন্তত
ভণ্ড জানগুরুদের বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন,
তাহলেই এই ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হতে পারে।
আমরা এ বিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের
সহানুভূতি কামনা করছি এবং আশু ডাইনি
প্রথা বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য
অনুরোধ জানাচ্ছি।"

যুগ যুগ ধরে যে বিশ্বাস আদিবাসীদের শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে রয়েছে তা কয়েকজনের ব্যক্তি প্রচেষ্টায় বা কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চেষ্টায় (সে চেষ্টা যতই আন্তরিক ও ব্যাপক হোক না কেন) নিমেষে যাবার নয়। এ জন্য আরও বেশি করে সমাজসচেতন মানুষ ও সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে সরকারী প্রশাসনকে। দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বহুজনের চেষ্টাতেই সম্ভব এই অবস্থা থেকে উত্তরণ। কিন্তু বহুজন কবে এগিয়ে আসবে এ আশায় বসে না থেকে আমাদের কাজ

করতে হবে। আমার কথায় কাজ হচ্ছে, কাজ চলছে। বহু আদিবাসীরাও এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন কিছু প্রতিষ্ঠান। আমাদের সমিতিও সীমিত ক্ষমতায় আদিবাসীদের অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত করতে কাজ করছে বিভিন্ন ভাবে। সারাও পাচ্ছি বিপুলভাবে।

আমরা হাজির হচ্ছি একটু নতুন ভাবে। আমাদের সমিতি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে অনুষ্ঠান করতে বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে প্রতিনিয়ত যাচ্ছে, তার মধ্যে আদিবাসীপল্লীও পড়ে। যখন যাই তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই স্থানীয় বিশাল অঞ্চল জুড়ে যত জানগুরু, সখা, সৎসখা, দিখলী, ওঝা (সচরাচর সাঁওতাল সমাজ যাদের 'জানগুরু' বলে বিভিন্ন আদিবাসী-অধ্যুষিত জেলায় তারাই এ সব নামে পরিচিত) ও অবতারদের বিষয়ে খবর নিই—তারা কি কি ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার (?) অধিকারী। অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালান হয়। ফলে আশ-পাশের গাঁয়ের মানুষ নানা অলৌকিক ঘটনা দেখার উৎসাহে হাজির হন। স্থানীয় অলৌকিক ক্ষমতাবানদের এতদিন ধরে ঘটানো ঘটনাগুলোই আমাদের সমিতির সভ্যরা অনুষ্ঠানে ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন। ঘটনাগুলো দেখবার পর বোঝাচ্ছেন—এগুলো কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়, কৌশলে ঘটাচ্ছি। আপনারাও যে কেউ চেষ্টা করলেই এমনটা ঘটাতে পারবেন, তারপর দর্শকদের দিয়েও ঘটনাগুলো ঘটানো হতে থাকে। উৎসাহী গ্রামবাসীরা হুড়মুড় করে এগিয়ে আসতে থাকেন। এবং অদ্ভুত সব ঘটনা হাতে-কলমে করার কৌতূহলে, আনন্দে, এতদিনের দেখা জানগুরুদের ঘটানো ঘটনাগুলো যে ওঁরাও ঘটাতে পারেন, এই প্রত্যয় বহুর মধ্যে সংক্রামিত হয়। আমরা ঘোষণা করি—আপনারা তো কৌশলগুলো জেনে গেলেন, এবার জানগুরুদের এইসব কৌশল গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে দিন, দেখতে পাবেন ওদের সব জারিজুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো ঘটানোর কৌশলগুলো আপনারা জানতেন না, ওরা জানতো। সেই কৌশল দিয়ে এতদিন আপনাদের ঠকিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করেছে, টোটকা ওষুধে অসুখ সারাতে না পারলে নিজের দোষ ঢাকতে আপনাদেরই কারো পরিবারের নিরীহ মেয়েদের ডাইনি বলে ঘোষণা করেছে। ওরা যা করে সব কৌশলেই করে, অলৌকিক ক্ষমতায় নয়।

আরো একটা কাজও আমরা করি। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগেই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তরা প্রকাশ্যে এবং ব্যাপক প্রচার চালিয়েই স্থানীয় অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণের জন্য সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসেন। চ্যালেঞ্জের জবাবে কেউ হাজির হলে তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্যই পরাজিত হন। হাজির না হলে গ্রামবাসীদের উপর তাঁদের প্রভাব প্রচণ্ড কমে যায়। ওঝা, জানগুরু, সখাজাতীয় অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের বুজরুকি বন্ধ হলে ডাইনি চিহ্নিত করার কাজও বন্ধ হয়, কারণ এঁরাই ডাইনি চিহ্নিত করেন। অবশ্য এরই পাশাপাশি আরো বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করার আশু প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতায় কিছু কিছু পর্যায়ে কাজও করছি।

বিভিন্ন জানগুরুদের ক্ষমতার কৌশল নিয়ে পরে আলোচনা করব। এবং এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য আপাতত কী কী করা যেতে পারে সে প্রসঙ্গেও আসব। কিন্তু

তার আগে 'ডাইনি' নিয়ে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। সমস্যাটির বিষয়ে মোটামুটি ধারণা না দিয়েই সমাধানের বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়াটা বোধহয় সমীচীন হবে না।

বাঁকুড়া জেলা হ্যান্ডবুক, ১৯৫১, থেকে

ডাইনি

ডাইনি হলো আমাদের 'হড়হপনের' (সাঁওতালদের) মস্ত জ্বালা। ডাইনির জন্য লোকে শত্রু হচ্ছে। কুটুম্বদের দুয়ার বন্ধ হচ্ছে। বাপে-ছেলেতে ঝগড়া হচ্ছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধ হচ্ছে। ডাইনি না থাকলে আমাদের অনেক সুখ থাকতো। সাহাব লোকেরা সবই ভাল বিচার করেছেন যতদূর জানা যায় ; কিন্তু ডাইনি সম্বন্ধে কি করে যে অন্ধ হচ্ছেন, বুঝতেই আমরা পারি না। ডাইনিরা আমাদের খায়। আমরা ধরে একটু হুড়ুম হুড়ুম করলে, উল্টো আরও হাকিমরা হাজতে দিচ্ছেন ; মহা জ্বালায় পড়েছি, কি ক'রলে আমাদের ভাল হবে, দিশেহারা হ'য়ে গেছি। হাকিমদের বুঝালেও তাঁরা বিশ্বাস করেন না। বলেন, কৈ দেখি আমার আঙ্গুল খাক্, তবে তো বিশ্বাস ক'রব, ডাইনি আছে বলে—তারপর তোমাকে কয়েদ ক'রে বসল। খাপরি ছুরি নিয়ে ত ডাইনিরা খাচ্ছে না, বিদ্যার জোরে পরপারে পাঠিয়ে দেয়। কি আর একেবারে সোজা। আগে মাঝি, পারানি করা দমন করছিলেন, আর ভাল না হ'লে, পাঁচ জনে মিলে বে-আবরু করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে ছিল, আজকাল হাকিমদেরই বশ ক'রে শেষ ক'রল। সেইজন্য সব পুরুষেই ভয়ে পিছিয়ে গেছে।

পুরুষ মানুষের কথা আর চলছে না, এখনকার যুগে মেয়েরাই রাজা হয়ে গেছে। একটু বেশী কিছু বলেছ কি টক ক'রে মুখে পুরেছে, সেই ভয়ে চুপ ক'রে থাকে। ডাইনিরা রাত্রে জমা হয়, কোন বনে কি মাঠে। যাবার সময় ঠুঁটো ঝাঁটা কি কোন কিছু পুরুষের কাছে রেখে যায়, আর তারা মনে করে, ঘরের মানুষ আমার আছেই, কেবল ধাঁধাতে ঐ ঝাঁটাকে নিজের লোকের মত দেখে তা না হ'লে ওরা দেবতার কাছে বিয়ে হবার জন্য চলে গেছে। জানেন, হেঁটে ওরা যায় না, কোনো গাছে চড়ে বিদ্যার জোরে হাওয়ার মত যায়। দেবতাদের আখড়ায় নেমে, দেবতাদের সঙ্গে নাচে, সিংহদের ডাকে। চুল আঁচড়িয়ে দেয়, চুমা খায়, তারপর দেবতাদের কাবু ক'রে দিব্যি দেয়, যেন কোন রকমে খড়ি দেখার সময় না উঠে। এইসব করে মুরগী ডাকের সময় ঘরে ফিরে আসে

ডাইনীরা অনেক শিষ্য করে। ছোট ছেলেমেয়েদেরও ভুলায় তারা মরে গেলে বীজ যেন থাকে। প্রদীপ নিয়ে রাত্রে ঘুরে লোকের বাড়িতে ঢুকে শিষ্যা কবার জন্য মেয়েদের তুলে আর তারা স্বীকার না করলে বলে : না শিখলে তুমি মারা যাবে, তা না হলে সিংহে খাবে। সেইজন্য ওরা ভয়ে তাড়াতাড়ি শিখে। চেলাদের জাগিয়ে ডাইনীরা ঝাঁটা পরে, আর ভাঙা কুলা কাঁখে নিয়ে জাহেরে যায় প্রদীপ নিয়ে। সেখানে মুরগী পূজা করে আর

খিচুড়ি পিঠা তৈরি করে খায়। চেলাদের সিংহের চুল আঁচড়ান করায়, আর তারা ভয়ে স্বীকার না করলে বলে : কিছুই করবে না, বোন ! ভয় করো না, তারপরে মন্ত্র আর মাড়নি গান শিখিয়ে দেয়, তারপর দীক্ষা দিবার জন্য বলে : যাও বোন, বাবাকে তোমার বড়দাদাকে খাও ।। স্বীকার না করলে জ্বর হওয়ায়, কিংবা পাগলী করে দেয়। 'কাটকম চারেচ' (একরকমের ঘাস) এর দ্বারা কলিজা খুঁটে বার করে, আর সেটা সিদ্ধ করে প্রথমে চেলাদেরই আগে খাওয়ায়। সেইদিন থেকে ঐ চেলাদের সমস্ত দয়া-মায়া শেষ হবে ; রেগে গেলে ছেলে কি বাবা ভাইদেরও খাবে, আর নিজেদের স্বামীদেরও মায়া করে না, খেয়েও ফেলে।

প্রবাদ আছে যে, পুরাকালে দুটি ছোকরাকে মাদল বাজাবার জন্য ডাইনীরা রোজ তুলে নিয়ে যেত। একদিন একটি ছোকরার কলিজা ডাইনীরা বার করে নিয়ে গেল, আর এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, চাল, নুন, হলুদ, হাঁড়ি, খলা তাদের বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে গেল জাহের। সেখানে নিয়ে গিয়ে সেই কলিজা সিদ্ধ করে, সেই ছোকরা দুজনকেও বকরা দিল খাবার জন্য। কিন্তু ওরা খেল না, কোঁচড়ে লুকিয়ে রাখল, শুধু হাঁড়িয়াটুকু খেল। দেবতাদের সঙ্গে নেচে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এল। পরদিন সকাল হতেই কলিজা বার করা ছোকরা মূর্ছা গেল। যে সব লোকে দিশেহারা হোলো, বলতে লাগল ঃ শেষ হয়ে গেল ? ঐ ছোকরাদের মায়া হ'ল। সেইজন্য বলল : যাও অমুক অমুক মেয়েদের ধর তাহ'লে মানুষটি ভালো হবে। তারপর মাঝির বৌ ইত্যাদি ভাল ভাল লোককে ধরে নিয়ে এল ওদের কথা মত। ওরা এসে স্বীকার করতে চায় না, গালাগালি দিতেই চাইছে আর তাদের স্বামীরাও রাগে গরগর করছে, বলছে : প্রমাণ করে দাও তা না হলে ভাল বলছি না। তখন সেই ছোকরা দুটি তাদের দেওয়া ভাগ পাঁচজনের সামনে খুলে বলল : এই যে, বাবা বামাল। সেটা দেখে ডাইনী আর তাদের স্বামীরা চুপ।

তারপর পারগামাকে নিয়ে এল। সে হুকুম দিল : যাও টাঙ্গি নিয়ে এসো, আনিল। সেই সময় পারগামা ডাইনীদের বলল : যাও ভাল কর, তা না হলে কেটে ফাঁক করবো, তোমরা হলে কাঠ ওহোল মরা। তারপর ভয়ে ভালো করে দিল। ভাল না করে দেওয়ার জন্য বহু জায়গায় কেটে দিয়েছে। মাঝির স্ত্রীকে পারামিকের স্ত্রী ডাইনী থাকলে প্রমাণ করা বড় শক্ত, কেন না তাদের স্বামীরা গড়াতে দেয় না। পূর্বে যেমন, একজন ওঝা মানুষ রেগে গিয়ে মাঝি আর পারামিকদের স্ত্রীদের ডাইনী বলেছিল। মাঝিরা তাকে বলল : এটা তুমি প্রমাণ না ক'রলে তোমার মাথা রাখব না। উত্তর দিল : একদিন চোখে দেখিয়ে দিব। তারপর চুপচাপ হল। ওঝা একদিন সন্ধ্যাবেলা খেয়ে দেয়ে তীর ধনুক নিয়ে জাহেরে চলে গেল। সেখানে একটি গাছে উঠে ওৎ পেতে রইল।

সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পরই যাদের দোষ দিয়েছিল সেই ডাইনী মেয়েরা জাহেরে গেল। গিয়েই একপাক নেচে ঘুরল। তারপর তাদের একজন 'রুম' (ঝুঁপার) হ'ল। তারপর সিংহকে ডাকল, লুক্ষু নামে নাম ধরে সিংহকে দুইবার শিস দিয়ে ডাকল, তারপর দুইটিই চলে এল। তারপর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, সেই সময় ওৎপেতে বসা লোকটি বড় সিংহটিকেই তীর মারল। তখন সিংহ মনে করল যে,

এরাই আমাকে কিছু করল বোধ হয়। সেই রাগে এক এক করে এলোপাথাড়ি কামড়িয়ে মেরে ফেলল ডাইনীদের আর অন্য সিংহটিকেও বিধে মেরে ফেলল, তারপর ঘরে ফিরে গেল।

পরদিন সকাল হলে দেখল, তাদের নাই ; তখন ঘরে ঘরে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে যে আমাদের সব কোথায় গেল বলে। তখন ওঝা লোকটি তাদের বলল ; জাহেরের দিকেই দেখে এস, ওইদিকেই যেতে দেখেছিলাম।

তারপর গেল, দেখে যে, "বিলিয়া বিতিদ" সিংহ দুটি কামড়িয়ে তাদের মেরে ফেলেছে আর তারাও পড়ে আছে। তখন চারদিকে গোলমাল হতে ধারে পাশের লোক জমা হয়ে তাদের দেখল। তখন থেকে বিশ্বাস করে আসছি ডাইনীর কথা।

পূর্বপুরুষেরা বলতেন যে, মারাং বুরু বেটাছেলেদের ডাইন শিক্ষা দিচ্ছিলেন কিন্তু মেয়েলোকেরা কোরফান্দী ক'রে গুণ (বিদ্যা) আগেই নিয়ে নিল। একদিন যেমন, বেটাছেলেরা জমা হ'ল পরস্পরকে শিক্ষা দিবার জন্য, নিজেদের ঝগড়াটে বৌদের কি করবে বলে। বলিল : আমরা হলাম বেটাছেলে, কী ক'রে আমাদের কথা চলছে না ? দুই এক কথা মেয়েলোকদের বললে বিশ বাখান গাল দিতে আরম্ভ করে, এ রকম সহ্য করব না। তারপর ঠিক করল; চল্ মারাং বুরুর কাছে যাই; তার কাছে গুণ শিক্ষা করে আসি, যেমন করেই হোক এই মেয়েদের যেন কাবু করতে পারি। তারপর দিন ঠিক করল যে, মাঝ রাত্রে কালনা বনে জমা হবে। গেল। মারাং বুরুকে মিনতি জানাল, ডাকল : ও ঠাকুর্দা, একবার আসুন, বহু লোক এসেছি আপনার কাছে নারাজ হ'য়ে। মারাং বুরু চলে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন : কী দুঃখ তোমাদের আছে নাতি ? তরপর তাদের দুঃখ জানাল আর মিনতি করল যেন গুণ (বিদ্যা) শিখিয়ে দেন নিজেদের বৌদের শায়েস্তা করতে।

মারাং বুরু বলিলেন : শিখাতে পারি, কিন্তু এই সমস্ত পাতায় তোমাদের রক্তে লিখলে তবে। সেই সব শুনে বিস্তর ভয় পেয়ে বলিল : কাল ফিরে এসে লিখে গুণ নিব। তারপর চলিয়া গেল। কিন্তু তাদের স্ত্রীরা লুকিয়ে এসে আড়াল থেকে সব কথা ঠিক শুনে নিল। তখন তারা বলিল : এই পুরুষদের ধর্ম হচ্ছে এই, আমাদিগকে বিয়ে করার আগে কুকুরের মত গোঁসাই গোঁসাই করে পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছিল ; এখন বুড়ি হয়েছি ব'লে খারাপ দেখছে, মেরে ফেলতেই চেষ্টা করছে : আচ্ছা দেখে নেব, কে কাকে মারতে পারে। এইসব যুক্তি করে গলি রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে গেল। রাস্তায় ঠিক করে নিল কী করবে বলে। পুরুষেরাও পরে ঘরে ফিরে এলো। ফিরো আসা মাত্র মেয়েরা তাদের স্বামীদের সোহাগের সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'রল, তাতে বেটাছেলেরা মনে ক'রল, নিজে নিজেই ভালো হয়েছে, কি জন্যই বা যাব ?

পরদিন মেয়েরা নিজেদের স্বামীদের ভাল ক'রে ভাত তরকারি করে দিল, আর বেশি করে সন্ধ্যাবেলা হাঁড়িয়া দিল। পুরুষেরা খেয়ে মাতাল হয়ে বেহুঁস হ'ল। তখন মেয়েরা একত্র হয়ে ধুতি পাগড়ি পরে আর ঠোঁটে ছাগল চুল লাগিয়ে জঙ্গলে মারাং বুরুর কাছে চলল। ডাকিল : ও ঠাকুর্দা, আসুন শীঘ্র তাড়াতাড়ি, আমাদের স্ত্রীরা দিনরাত জ্বালিয়ে মারছে।

মারাং বুরু চলে এলেন। তখন তাকে বলিল : দিন আপনার পাতা বার করুন, নিজে

নিজের দাগ কাটব (লিখব), আর সহ্য করতে পারি না মেয়েদের অত্যাচার। মারাং বুরু তাঁর শাল পাতা বাহির করিলেন, আর তারা ফুঁড়ে রক্ত দিয়ে নিজের নিজের পুরুষের ছবি আঁকিল। তারপর মারাং বুরু মন্ত্র আর ঝাড়ানি শিখিয়ে দিলেন, সিদ্ধাই দিলেন লোক খাওয়ার জন্য। মুচকি মুচকি হেসে তারা বাড়িতে ফিরে এলো।

পরদিন সকালে পুরুষেরা তাড়াতাড়ি উঠছে না বলে ভীষণ গালাগালি দিয়ে মুখ শুকনো করে দিল। পুরুষেরা আঁধা ধুঁদা উঠে চোখ রগড়াতে লাগল, ঘুমও ভেঙে গেল, আর মেয়েরা শান্ত হচ্ছে না তাও বুঝতে পারল। তারপর টলমল বৈঠক বসাল। সেখানে ঠিক ক'রল : চলতো যাই। মারাং বুরু যাই বলুক, গুণ নিশ্চয়ই শিখব। তারপর রাত্রে জঙ্গলে গেল, আর কাক-শকুনের মত বিস্তর মিনতি মারাং বুরুকে করল : দাও বাবা, নিশ্চয়ই শিখিয়ে দাও, মেয়েরা আমাদের ভয়ানক জ্বালাচ্ছে।

সেইসব শুনে মারাং বুরু আশ্চর্য হ'য়ে তাদের বলিলেন : গুণতো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, কী চাইছ ঘন ঘন ? তখন পুরুষেরা একসঙ্গে বলে উঠল : কৈ কখন দিলেন আমাদের ? সেদিন থেকে আমরা তো আসি নাই। সে সব শুনে মারাং বুরু মহা চিন্তায় পড়লেন, বললেন : তোমাদের দিয়েছি নাতো কী করেছি ? এই যে তোমাদের দাগ দেখতো। পুরুষেরা নিজেদের নিজেদের দাগ দেখে বলল: দাগ যেন আমাদেরই কিন্তু আমরা তো দাগ কাটি নাই, কারা যেন আমাদের দাগ কেটেছে (ছবি এঁকেছে)।

তখন মারাং বুরু গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, তারপর বুঝতে পারলেন যে, মেয়েরা আমাকে শুদ্ধ ছেলেমানুষ করে ফেলল। তারপর রেগে গিয়ে ঐ পুরুষদের বললেন : নাও এখানে তাড়াতাড়ি দাগ কাট, ঐ বদমাইস মেয়েদের দেখে নিব ! দাগ দিল, আর তিনি ওঝা আর ডান হবার সিদ্ধাই দিলেন, যেমন করেই হোক ডাইনীদের ধরে যেন সাজা দিতে পারে। তখন থেকে ডাইনী আর ওঝা কি জানদের ভীষণ শত্রুতা আছে। কিন্তু ওঝা আর জানেরা পারছে না ; কেননা ডাইনীরা ওদের দেবতাদের সহজেই কাবু করছে সেইজন্য সহজে ধরতে পারে না, অন্য লোকই খড়ি মাটিতে (খড়ি গুণা) উঠেছে, আর জানেরা আঁধা হয়ে অন্য লোকদের বলছে (দোষ দিচ্ছে)।

কতক লোক বলে যে, ডাইন, ওঝা আর জান সকলেই কামরু গুরুর কাছে শিখেছে। হ্যাঁ বহু পূর্বে আমাদের পুর্ব পুরুষেরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। ওঝা হওয়ার কথা সত্যই ; কেননা ওঝা লোকেরা প্রথমেই তাঁর নাম দেন, তা না হ'লে ডাইন আর জানের কথা জানি না, কামরু গুরুর কাছে শিখেছে কি না জানি না। দোহায়টুকু তাঁর দোহায় দেয় না, সেইজন্য বলছি, তাঁর কাছে শিখে নাই।

ওঝাকো (ওঝারা)

ওঝারা সত্যি কামরু গুরুর কাছে শিখেছে বহু পূর্বে। তাঁর দেশ আর আমাদের দেশ লাগালাগি ছিল, মুরুব্বিরা সেকথা আমাদের বলেছেন। ওঝাদের কাজ হল ছয়টি : (১) খড়ি দেখে, (২) চাল ছড়ায়, (৩) কামড়ায় কিংবা 'লুণ্ডা করে, (৪) দেবতা খুঁড়ে, (৫) দেবতা ছাড়ায়, (৬) লোককে ওষুধ দেয়। রোগী ঔষধে যদি ভাল না হয়, গ্রামের

লোক ওঝাকে দিয়ে খড়ি দেখায়। তেল আর শালপাতা নিয়ে আসে, আর সে বসে দুটি পাতাতে তেল মাখাবে, আর মন্ত্র বলতে বলতে ঘষবে 'তেল তেল রায়ে তেল, মাম তেল, কুসুম তেল, ই তেল পড় হায়েতে, কি উঠো, ডাম উঠো, ভূত উঠো, ফুগিন উঠো, বিষ উঠো, কে পড়হে, গুরু পড়হে, গুরু আগতা মাত্র পড়হে'। এরপর মাটিতে একটু রাখবে। তারপর খুলে দেখবে। লোক ওঝাকে জিজ্ঞাসা করবে : দেন্ বাবা অনুগ্রহ করুন, কী সব পেলেন ? বললে তবে তো আমরা বুঝব। ওঝা খড়ি দেখবারই আগে ঠিক করে রেখেছে যে, এখানে হল জান, এখানে হল ঘরের দেবতা, এখানে হল বাইরের দেবতা, এখানে হল দুঃখ আর এখানে হল বিষ। পাতার যে ঘরের দাগ উঠবে হিজিবিজি, সেইটি বলে দেয়, ডাইন হলে ডাইন, দেবতা হলে দেবতা, দুঃখ হলে দুঃখ, আর বিষ হলে বিষই। ডাইন যদি উঠে, মাঝি পারামিক সন্ধ্যাবেলা বলে যায়। শুন অমুক, অমুকের অসুখ করেছে, ভাল যেন হয়, তোমাকেই ধরেছি, ভাল না হলে তোমাকে বলছি না। তাতে ভাল হলে ভালই। তা না হলে দুইজন করে মাঝি চারদিকে তেল দেখাতে পাঠাবে। সন্ধ্যাবেলা জমা হয় আর তেল দেখাতে যে সব লোক গিয়েছিল তাদের একে একে জিজ্ঞাসা করবে। তিন দিক থেকে ডাইন ঠিক করে আনলে বাছবার জন্য ডাল পুঁতিবে, আর যদি মিল না হয়, আরও পুনরায় খড়ি দেখিয়ে আসবে।

ঘরের দেবতা যদি ওঠে তাহলে রোগীকে বলবে : নাও তোমার ঠাকুর সামলাও। তারপর জল দিয়ে মানৎ করবে যে ভাল হলে পূজা করব। বাইরের দেবতা উঠলে ওঝা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে দেবতাকে চাল ছড়িয়ে দিবে, ('নে তবে কালনা বঙ্গা বুল মায়াম সিটকা ময়াম এমাম্ চালাম্ কামাঞ করিয়াক্—ক কাটিক্ মায়, অকোরে আচু লেৎ মেয়া ডোডে লেৎ মেরা উনিরেন সিরা হপমগে সঠুক সামবাড় কেম্, তেঁঞে খা—দ নিয়া অড়া-: দ ছিকেম্ হাড়িকেম, ওকাড়েতাম মাম বা থাম সেকজং বেরেৎজং মে।) মাও তরে কাল না বঙ্গা জাং এর রক্ত শিরায় রক্ত দিচ্ছি, ভাল যেন হয়ে যায়, যে তোমাকে লাগিয়েছিল তার সেরা ছেলেই সাবাড় করুন, আজ থেকে এ বাড়ি ছেড়ে দেন, নিজের থানে চলিয়া যান। মারাং বুরু আর পারগামাকেও চাল ছড়ায়ে 'বাঁখেড়' (মিনতি) করবে, এই যে অমুক মাঝির ঘরে 'জজম বঙ্গা' (যে দেবতা মানুষকে খায়।) জজম বুরু লেগেছিল পড়েছিল, ধরে সাবুদ করলাম, খুদ চাল তার দিয়ে দিলাম, তারই সাক্ষী সভা করুন, আজ থেকে যেন ভাল হয় রোগী। এইরূপ আলাদা মারাং বুরু আর পারগামাদেরও ওঝা মিনতি করে। শেষে মুড়া ঢড়া সীমা আইলের দেবতাদের চাল ছড়িয়ে মিনতি করে : এই নিন তবে আপনারা মুড়ার খুঁটির, লাটার, লোপাকের সিমার আইলের বড় ছোট ঝুলি ঝোলা কাঁধে, খড়ম হাতে যোগি ইত্যাদি, যাদের চলে তাঁরা আসুন, যাঁদের চলে না তাঁরা দূরে থেকে সাক্ষী শোভা করুন।

দুঃখ উঠলে ওষুধ বাঁটিয়া খাওয়ায় আর বিষ হলে কামড়ায় আর লুণ্ডা করে (ওষুধের গোলা তৈয়ার করে সেটা দিয়ে মালিশ করে)। ওঝারা প্রথমে এক জায়গায় মন্ত্র দ্বারা ঝেড়ে জমা করে, তারপর মুখে কামড় দিয়ে বার করে পাতার খলাতে ফেলবে। কী যেখানে রোগ আছে, গুঁড়ির গোলা তৈরি করে পাতার খলাতে ফেলবে। কি যেখানে রোগ আছে, গুঁড়ির গোলা তৈরি করে মন্ত্র পড়ে লুণ্ডা করে। লোকটি ভাল হলে

ওঝাকে 'সাকেৎ' (মানসিকের) মুরগি দেয়। সেগুলি বলি দিয়ে খায়, আর গ্রামের দুই একজনকে ভাগ দেয়।

ঢাউরা : বিৎ 'ডাল' পোঁতা

ঢাউরা বিৎ হচ্ছে এই রকম : ডাইন কি দেবতা। কি দুঃখ খড়িতে উঠলে, সেটা সঠিক করবার জন্য জলাশয়ের পাড়ে ডাল পোঁতে। সাক্ষী হিসেবে একটি ডাল মাঝখানে প্রথমে পোঁতে তারপর ঘরের দেবতার নামে একটি, তারপর 'মাইহার' এর (শ্বশুরবাড়ির) দেবতার নামে একটি, তারপর ভায়াদি কুটুমের নামে একটি, ওটার পর মেয়ে, বোনদের নামে একটি, সেটার পর প্রতি ঘরের নামে একটি ডাল পোঁতে। প্রতি ডালে সিন্দবুর দিয়ে যায়। তারপর চাল ছড়িয়ে 'বাঁখেড়' করে : প্রণাম তবে সিঞবঙ্গা (সূর্যদেব)। বেড়ার মত চারদিক ঘিরে রেখেছে, চারখুঁট, সারা পৃথিবী ভয়ে রয়েছে তবে এই যে ডালী কালী করছে, দোষেরই দোষ করে, সেইটাই যেন শুকনো হয়ে ঝরে যায়, সাক্ষী রহিলেন আর যদি না হয়, সবুজ হয়ে নূতন পাতা বাহির হবে, সোনার মত সুন্দর থাকবে (বলে ডাল পুঁতবে)।

আরও বলে : যদি দেবতা হয়, এটাই যেন শুকনো মচমচে হয়ে যায়, যদি না হয় সোনার মত সত্যই (খাঁটি থাকবেন) সাক্ষী রইলেন। সেইরূপ প্রত্যেকের নামে প্রতি ডালে 'বাঁখেড়' করবে। এইসব করার পর ঘরে চলে যায়। পাঁচ ঘণ্টা পরে ফিরে আসে ডাল দেখবার জন্য। যে নামের ডাল মরেছে, সেটাই ঠিক হবে। ডাইনে যদি ঠিক হল, যত ঘরের মরে যাবে ওরাই ডাইন হবে। তারপর অন্য গ্রামের পুনরায় সেইরূপ 'সুহি' (বাছাই) করিবে দুই তিন জায়গায়। তারপর সেই দুঃখ পাওয়া লোকটিকে বলবে : এই যে এইটি তোমাকে ঠিক করে দিলাম, এখন গুরুর কাছে নিয়ে যাচ্ছ, না ভাল হয়ে গেছ ? সে উত্তর দিবে : কমছে না, গুরুর কাছ থেকে যাচাই করে নিয়ে আসি। 'দিন ঠিক করে জানের কাছে চলে গেল।

জানকো (জানদের)

জান হচ্ছে আমাদের ডাইনের হাইকোর্ট। ঐ যে যারা ডাইন হয়, ওদেরই সত্যিই ডাইন বলি। কি জানি সত্যিই পায়, না মিথ্যা, আমরা বিশ্বাস করি সত্যিই পায় বলে, কেননা মারাং বুরুর কাছে সিদ্ধি লাভ করেছে। আর পরীক্ষাও করছি, দেবতার শক্তিতেই বলে না ফাঁকিবাজি করে জান হচ্ছে।

কোন লোক ওষুধে ভাল না হলে প্রথমে ওঝার কাছে নিয়ে খাড়ি (গুটি চালান বা খড়ি দেখা) করাই ; তারপর গ্রামে গ্রামে ডাল পুঁতি, অতঃপর জানের কাছে যাই, গ্রাম

শুদ্ধ লোকের অসুখ ক'রলে, মাঝি সমস্ত পুরুষ মানুষদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, আর একজনের অসুখ করলে সেই মাঝির কাছে কাঁদবে, তারপর রোগীর তরফের দুই একজন আর খাড়িতে যাকে পাওয়া গেছে তার স্বামী বা ভাই আর গ্রামের পাঁচ ছয়জন সাক্ষী জানের কাছে যাবে। এক সঙ্গেই থাকবে, যেন কেউ লুকিয়ে জানকে কিছু না বলতে পারে। জানের কাছে একবারে যাবে না (সোজাসুজি যাবে না), বাইরে ডেরা বাঁধে। কোথাকার লোক, কি জন্য এসেছে, কার জন্য এসেছে, আর কি অসুখ, সে সবের কথা কাউকে কিছু বলে না। জানের গ্রামের মাঝিকে বলবে : ওগো বাবা, গুরুর কাছে তেল, পূজা করতে দাও। তারপর সে জিজ্ঞাসা করবে : কতজন পূজা করাবে (দেখাবে) ? বলিল : এতজন অতজন আছি। সেই মাঝি জানের কাছে নিয়ে যাবে। মাঝি তাদিগকে পূজার জিনিস হাজির করাবে, যেমন : একটি সুপারি, একটি ভাঁউনিচ্ (পাতার খলা বা বাটি) আতপ্চাল, তেল সিন্দুর, ধূনা আর বেলপাতা।

তখন জান বলিবে : আচ্ছা এসো তবে পরে এই এই বেলা। তারা ডেরায় ফিরে যাবে। সেখানে গ্রামের কোনো লোক এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কথা বলবে না, অন্য দেশ আর অন্য গ্রামই বলবে। ধার্য সময়ে জানের কাছে যাবে। জান কখনও তার ঘরেরই দোষ দেয়, আর কখনও 'জাহেরে' কি বাইরে। তারা চুপচাপ বসে আছে, আর নিজ আতপ্ চাউল অনেক জায়গায় দেবতার নামে রেখে রেখে যায়, আর বেলপাতা তাতে রেখে যায় ; ওর পর চাল রাখা জায়গাতে সিন্দুর দিয়ে যাবে তেলে গুলে ; আর ধূপের সরার আগুনে ধুনা ফেলে রাখবে, শাঁখ বাজাবে আর পূজার ঘণ্টা বাজাবে আর দেবতাদের পূজা করে তারপর ভর দেয়, ভর দিয়ে বকতে থাকে।

প্রথমে তাদের দেশের নাম বলবে, ওটার পর গ্রাম, তারপর কুলহি (গ্রামের রাস্তা) কোন কোন দিকে আছে, সেই সব বলে : তারপর মাঝি, ওটার পর ফরিয়াদী লোক, ওটার পর তার কাকা, জ্যেঠা, ভাই, ভগিনীদের ছেলেদের, মেয়ে আর ওরা যতজন আর সকলের নাম বলবে।

তারপর জিজ্ঞাসা করবে : কী বাবা এই সমস্ত ঠিক বলেছে কি না ? তারপর তারা বলবে : ঠিকই, বিশ্বাস করলাম, এবারে ভেঙে বলে দেন। জান উত্তর দেয় : দাও 'বুন্দা' (ঠাকুরের টাকা) দাখিল কর ; তবে তো বলবো। তারপর একটি করে টাকা দেয়। আর চুক্তি করে গিয়ে থাকলে, যত টাকা চুক্তি করেছে, সেটাও চেয়ে নিবে ; সে সব দিলে পরে তবে বলবে ডাইন কি দেবতা, আর তারা কারা। তারপর জান বলবে ; এত এত জায়গায় 'ঠালি ঢাউরা' করেছ, এটা-ওটা ঠিক করে ছিলে কী না ? তাহার জবাব দিবে হেঁ বাবা ঐগুলিই। তখন জান তাদের বলবে : যদি তৃপ্ত না হয়ে থাক তাহলে সাত সখার কাছে (সাত জায়গায়) বুঝে দেখ। সাত সখার আলাদা হলে বুন্দা টাকা ফেরৎ দিয়ে দিব। তারপর ঘরে ফিরে আসবে। বঙ্গা ধরা হলে, অসুস্থ লোক রাজী মানত করবে, আর ডাইন ধরা হলে হুড়ুম দুড়ুম করে জরিমানা করে আর বে-আবরু করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এক জানের কাছে ডাইন হয়েছে, লোক খুশি না হলে অন্য জানের কাছে নিয়ে যায়, পুনরায় প্রমাণ করবে বলে কিন্তু সেটা আজকাল, কিন্তু ডাইনেরা এক জায়গায় দোষী হলে, হাজার জানের কাছে গেলেও সেই কথাই বলে। শুধু দুই একজন ডাইনী গুণে (বিদ্যায়) জানদের কথা গড়বড় করতে

পারে মাঝির স্ত্রী ডাইনি ধরা হলে তাড়াতে পারে না : নিজেই উল্টে যে লোকটিকে খাচ্ছে তাকে বলবে : যাও দেখে নাও কোন দিক, সুখ যদি না হচ্ছেত, আমি গ্রাস করেছি ; আমি কোথায় যাব ?

আজকাল জানেরা ভীষণ ঠকাচ্ছে। পূর্বের মত ধরম জানদের (ধার্মিক জানদের) মত সত্য এদের নাই। পূর্বে জানেরা জান শিক্ষা করে নাই, আপনা হতেই পেয়েছিল। তারা ভার দিচ্ছিল না, রাত্রের বেলা স্বপ্নে পেত কী দিনের বেলা জলে দেখে। দেবতা এসব বলে দেয় যে, অমুক অমুক অমুক আসছে এটা ওটার জন্য, তুমি তাদের এইরকম বলবে। আজকাল সে রকম জান নাই, বেশির ভাগই ফাঁকিবাজি করে সূত্র জিজ্ঞাসা করছে, টাকা খাচ্ছে। সেইজন্য 'ফুলধারিয়া' (পূজার ফুল যোগাড় করে জানের পূজা ইত্যাদিতে সাহায্য করে) রেখেছে বেড় কাটাবার জন্য। আর যে জানের 'ফুলধারিয়া' নাই তারা দেখে শুনে বলে। আধা নাম বলে দেখে, আর জান করতে আসা লোকদের দিকে তাকায়, ঠিক কিনা আর বেঠিক হলে আরও নাম বলে দেখবে। সেই জন্য আল জানদের মিল খাচ্ছে না। 'ফুলছারিয়া' রাখা জান সহজেই বের করে নিতে পারে সেরকম জান ঠিক না বলতে পারলে বলে : বাবা বেড় আছে, ওটা সরান করাও। তারপর ফুলধারিয়ার কাছে যায়। বেড় কাটাবার জন্য কি কি লাগিবে, সেসব জান বলে দিয়েছে। ফুলধারিয়া' সেসব পূজা করবে; মুরগি ফরিড়ং কি ব্যাং কি শেওলা কি সাদা বিড়াল। পূজা করবার আগে জিজ্ঞাসা করে : কার নামে বেড় কাটব ? তখন মাঝি পারানিকদের নাম বলে দেয়, ফরিয়াদী লোকের নামও বলে, আরও দুই এক কথা বলে দিয়ে পূজা করবে। তারপর তাদের বলবে : সন্দেহ তোমাদের থাকলে আমাকে পাহারা দিতে পার, জানের কাছে যাব না। কিন্তু নিজের ঘরে যাবেই, আর তার ঘরের লোক আর জানেনর ঘরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারে, তাহলে অনেক চালাকি হতে পারে।

• • •

আদিবাসী সমাজ

সাঁওতাল সমাজের পরম্পরাগত নেতাকে বলা হয় 'মাঝি' সামাজিক কোনও কামকর্ম বা পুজো মাঝির অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। বলতে গেলে মাঝি গ্রামের পুরোহিতের চেয়ে কিছু বেশি। বিয়ে দিতে মাঝির অনুমতি নিয়ে হয়। গ্রামে নতুন বউ এলে বউয়ের বাবা জামাতার গ্রামে মাঝিকে প্রণামী দেন। গ্রামে বর বিয়ে করতে ঢুকলে বরযাত্রীরা বউয়ের গ্রামের মাঝির বাড়িতে আগে যাবেন, সেখানে মাঝিকে সম্মান জানিয়ে তারপর যাবে বিয়ের আসরে। 'পরবে' (উৎসবে) নাচ শুরু হবে মাঝির বাড়ি থেকে। শিকার উৎসবে নিহত পশুদেরর ভাগ দেওয়া হয় মাঝিকে। সমাজের কেউ কোনও সমস্যা নিয়ে হাজির হলে বা সম্পত্তি বণ্টনের জন্য পরামর্শ চাইলে মাঝি প্রয়োজন মনে করলে 'কুলহি দুরুপ' ডাকবেন। 'কুলহি দুরুপ' হল পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের নিয়ে সভা। এই সভায় সকলেই আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন। কিন্তু শেষ কথা বলবেন মাঝি। মাঝিকে সাহায্য করবেন সমাজের পাঁচজন, যাঁদের বলা হয় 'মোরে

হড়' (মোরে=পাঁচ, হড়=মানুষ)। মাঝির অনুমতি পেলে সমাজের কেউ পুলিশের কাছে যান বা আদালতে যান। গ্রামে কোনও অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে সাধারণত মাঝিই থানায় খবর দেন। থানা থেকে কেউ গ্রামে এলে প্রথমে মাঝির সঙ্গেই দেখা করেন।

গ্রাম পত্তনের সময় আদিবাসী সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা মাঝি সহ আরও কিছু সমাজ নেতা নির্বাচন করেন। পদটি সাধারণত বংশানুক্রমিক হলেও 'মাঝি' বড় ধরনের কোনও অপরাধ করলে গ্রামবাসী পুরুষেরা মিলিত হয়ে নতুন কাউকে মাঝি নির্বাচিত করেন।

গ্রামের কেউ দীর্ঘদিন ধরে অসুখে ভুগলে গ্রামের মানুষ সাধারণত মাঝির কাছে 'ডাইনির নজর'-এর সন্দেহের কথা জানান। মাঝির নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা ওঝা বা জানগুরুর কাছে হাজির হন। জানগুরু কাউকে ডাইনি বলে ঘোষণা করলে ঘোষিত ডাইনির বিরুদ্ধে শাস্তিদানও মাঝির নির্দেশেই হয়।

জগমাঝি হলেন সমাজের আর এক প্রধান। জগমাঝি হলেন নৈতিকতার রক্ষক। জগমাঝি দেখেন জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে সহ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো সামাজিক বিধানমতই সমাজের মানুষেরা পালন করছেন কিনা। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নৈতিক ভ্রষ্টাচার, যৌন-ভ্রষ্টাচার রোধ করা এবং প্রয়োজনে তার বিচারের প্রশ্ন এলে বিচারের দায়িত্ব পালন করেন জগমাঝি।

জগমাঝিকে এসব প্রতিটি কাজে সহকারীরূপে যিনি সাহায্য করেন, তাঁকে বলা হয় পারানিক।

'নাইকে' সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত। পদটি বংশানুক্রমিক। সাঁওতাল সমাজের বোঙ্গারা (দেবতারা) দুধরনের বলে সমাজের বিশ্বাস। শুভকারী বোঙ্গা ও অশুভকারী বোঙ্গা। শুভকারী বোঙ্গাদের পুজো নাইকের প্রধান কাজ। পুজোয় বলি দেওয়া পশুর মাথা নাইকে দেওয়া হয়। শিকার উৎসবে যোগদানের আগে গ্রামবাসীরা বোঙ্গার পুজো দেন এবং নাইকেকে এ জন্য দেওয়া হয় পাঁচটা মোরগ।

কুজম নাইকে হলেন নাইকের সহকারী। অর্থাৎ সহকারী পুরোহিত। কুজম নাইকে অশুভকারী বোঙ্গাদের পুজোর অধিকারী। সমাজের বিশ্বাস অশুভকারী বোঙ্গারা গ্রামে মানুষদের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। তাই তাদের তুষ্ট করতে পুজো দেন।

সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের পাঁচজনকে নিয়ে 'মোরে হড়' তৈরি হয়। 'মোরে হড়'-এর প্রতিপত্তি সমাজে যথেষ্ট। সামাজিক অপরাধ, বিবাহ-বিচ্ছেদের বিচার করেন মোরে হড়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারে দোষীদের জরিমানা হয়। অভিযোগকারী পান জরিমানার অর্ধেক। বাকি অর্ধেক মাঝির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাঝি তার থেকে সামান্য রেখে বাকি টাকায় হাঁড়িয়া কিনে সমাজের সকলে এক সঙ্গে পান করেন।

'গোড়েৎ'-এর কাজ মাঝির ডাকা সভার খবর গ্রামে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া।

সমাজের ধর্মীয় জীবনে জানগুরুর কোনও স্থান নেই। আদিবাসী সমাজে পুজো-পার্বণের ভার কখনই জানগুরুকে দেওয়া হয় না। ওঝা বা জানগুরু অথবা আর যে নামেই পরিচিত হোন না কেন এঁরা সমাজের মানুষের ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আদায় করে। নানা কারণে মানুষ ওঁদের পরামর্শ নিতে হাজির হন। রোগের কারণ ও রোগমুক্তির জন্য, বন্ধ্যা রমণী মা হওয়ার বাসনা নিয়ে, চুরি যাওয়া জিনিসের খোঁজে, গৃহপালিত পশুর অসুখের সমস্যা নিয়ে, সন্তান-সম্ভবার সন্তান যেন ভালভাবে হয় এই প্রার্থনা নিয়ে, ডাইনি ধরেছে সন্দেহ করলে, ডাইনির নজর পড়েছে সন্দেহ করলে অথবা ডাইনিকে খুঁজে বের করার আবেদন নিয়ে সমাজের বিভিন্ন মানুষ উদ্ধার পেতে জানগুরুর শরণাপন্ন হন।

সমাজের বিশ্বাস, জানগুরুরা এক বিশেষ ধরনের বোঙ্গার মাধ্যমে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এইসব বোঙ্গাদের সাহায্যে জানগুরু ডাইনিদের এবং অনিষ্টকারী আত্মাদের প্রভাব নষ্ট করতে সক্ষম। জানগুরুরা বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন বোঙ্গাদের কাজে লাগিয়ে অনিষ্টকারী বোঙ্গা, আত্মা, ডাইনিদের নিয়ন্ত্রণ করেন। দু একটি উদাহরণ বরং দিই। প্রসূতির হিতার্থে ভালুয়াবিজয় বোঙ্গা, উলুমপাইকে বোঙ্গা, জুলুমপাইকে বোঙ্গা, খোস-পাঁচড়ায় গোসাঞ্রী-এরা বোঙ্গা, পাগল ভাল করতে নাশন্‌চণ্ডী বোঙ্গা, দুরিয়া বারদো বোঙ্গা, গৃহপালিত পশুদের অসুখে জাহের এরা বোঙ্গাও নাগ-নাগিন বোঙ্গাদের তুষ্ট করে কাজে লাগান হয়। জানগুরুদের বোঙ্গাদের মধ্যে কিছু হিন্দু দেব-দেবীও আছেন। যেমন গঙ্গা, কালী, দিবি (দুর্গা)।

আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস, জাদু দুরকমের—হিতকারী ও অনিষ্টকারী। জানগুরুরা হিতকারী জাদু ক্ষমতার অধিকারী এবং ডাইনি বা ডাইনরা অনিষ্টকারী জাদু ক্ষমতার অধিকারী। সমাজ বিশ্বাস করেন একমাত্র জানগুরুরাই ডাইনির মন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা রাখেন। যদি কোনও ডাইনির শক্তির কাছে একজন জানগুরু পরাজিত হন অন্য জানগুরু আসবেন। জানগুরুরা সমাজের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ।

ডাইন প্রসঙ্গে বহু জানগুরুর সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের অনেকের মত—ডাইনি যার উপর নজর দিয়েছে, তার গু ডাইনিকে খাওয়ালে ডাইনির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আবার অনেকের মতে ডাইনি যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ তাদের ক্ষমতাও কাজ করে।

দ্বিতীয় মতটি সমাজের মানুষদের প্রভাবিত করে বলেই ভীত মানুষগুলো রোগ থেকে নিজে বাঁচতে বা আত্মীয়কে বাঁচাতে জানগুরু যাকে ডাইনি বলে ঘোষণা করে তাকে অতি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করতে সামান্যতম কুণ্ঠিত হন না। বরং অনেক সময় হত্যাকারীরা মনে করেন, ডাইনি হত্যা করে সমাজের উপকারই করেছেন, ভবিষ্যতে কাউকে ডাইনির নিষ্ঠুরতার বলি হতে হবে না। এ ধরনের ঘটনাও বহু ঘটেছে, ডাইনি হত্যাকারী নিজেই বীরের মত থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন।

সমাজ অবশ্য সাধারণভাবে বিশ্বাস করে, ডাইনি ইচ্ছে করলে তার মন্ত্র ফিরিয়ে নিতে পারে।

ধর্ম

সাঁওতাল সমাজের কাছে সিং বোঙ্গার (সূর্যের) স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। সিং বোঙ্গা রোজ পূর্ব দিকে দেখা দেন বলে সমাজের কাছে পূর্ব দিক পবিত্র দিক। পুজো-পাঠ হয় পূর্ব দিকে মুখ করে। নির্দিষ্ট সময় মেনে সিং বোঙ্গার পুজো হয় না। সিং বোঙ্গার করুণা পেতে পাঁচ-সাত-দশ বছরে একবার পুজো দিলেই হলো। পুজোতে সাদা মোরগ অথবা পাঁঠা বলি চড়ান হয়।

'মারাং বুরু' (আক্ষরিক অর্থে বড় পাহাড়) বোঙ্গাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। মারাং বুরু জাতির ও সমাজের পালনকর্তা। ইনিই আদিম মানব-মানবীকে পালন করেছিলেন, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন হাঁড়িয়া তৈরির পদ্ধতি।

শুরুতে মারাং বুরুর পুজোয় দেওয়া হত হাঁড়িয়া বা বাড়িতে তৈরি মদ। পরবর্তীকালে মুণ্ডাদের প্রভাবে মারাং বুরুর কাছে বলি দেওয়া হতে থাকে।

মারাং বুরু কোন কোন খুঁটের (উপগোষ্ঠির) গৃহদেবতা। বীরহোর, ভূমিজ, হো বা মুণ্ডাদের কাছেও পুজিত হন মারাং বুরু।

'জাহের-এরা' জাহের থানের (পবিত্র কুঞ্জ, যেখানে সমাজের সার্বজনীন দেবতারা অবস্থান করেন) অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনেকের ধারণা। জাহের-এরাকে মুণ্ডারা জাহের বুড়ি বলেন, ওরাওঁরা জাহের এরা'কে বলেন ঝাকড়া বুড়িয়া বা সরণা বুড়িয়া। ফাগুয়া বা দোলের দিন জাহের এরার বিশেষপুজো হয়। দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয় যেন গ্রামের ছেলে-মেয়েরা সুস্থ থাকে, খারাপ বাতাস রোগ না বয়ে আনে।

'গোঁসাঞী-এরা' যা-পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগের বোঙ্গা। সাদা মোরগ বলি দিয়ে গোঁসাঞী-এরাকে সন্তুষ্ট রাখা হয়।

'মোরাইকো-তুরুইকো' (আক্ষরিক অর্থে পাঁচ ছয়) বোঙ্গা একজন বোঙ্গা হিসেবেই পুজো পান। মোরাইকো-তুরুইকো গ্রামের ভাল মন্দের দেখাশুনো করেন ; শস্যের ফলন, বৃষ্টি, খরা, মড়ক ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক।

সমাজ বিশ্বাস করে ডাইনি ও ডাইনদের উপর 'পরগনা বোঙ্গা'র নিয়ন্ত্রণ আছে। ডাইনির নজর পরে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে বলে জানগুরু ঘোষণা করলে ডাইনিদের মন্ত্রকে কাটান দিতে জানগুরুরা পরগণা বোঙ্গার পুজো করেন।

গ্রামের প্রান্তে থাকে জাহের থান বা পবিত্র-কুঞ্জ। এই পবিত্রকুঞ্জে সমাজের বোঙ্গা বা দেবতারা থাকেন। পাশাপাশি তিনটি শালগাছের তলার তিনটি পাথর মারাং বুরু, জাহের-এরা ও মোরেইতো-তুরুইকো নামে পুজিত হয়। সমাজের বিশ্বাস পাথরগুলো বোঙ্গারাই রেখে গিয়েছেন। দুটি মহুয়া গাছতলা হয় গোঁসাঞী'-এরা ও পরগনার থান।

জাহের থানে বোঙ্গারা প্রধান প্রধান পরবের বা উৎসবের সময় পুজো পান। প্রধান উৎসবগুলো হলো ফসল তোলার উৎসব 'সোহরাই', ফসল বোনার উৎসব 'এরোক্ সিম্', পুষ্প উৎসব 'বাহা' ইত্যাদি।

জাহের থানের বোঙ্গারা ছাড়া গ্রামের মাঝে থাকে 'মাঝি বোঙ্গা'র থান। মাঝি বোঙ্গাকে 'মাঝি বুড়ি' বা 'মাঝি হড়ম্' নামেও ডাকা হয়। মাঝি থানের অবস্থান গ্রামের মাঝির বাড়ির সামনে। মাঝি বোঙ্গা গ্রামের মাঝির আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার কাজ করে।

মাঝি বোঙ্গা গ্রামের ভাল-মন্দ দেখাশুনো করেন। জাহের থানের বোঙ্গাদের পুজো দেবার আগে মাঝি বোঙ্গার পুজো দেওয়া হয়। মাঝি বোঙ্গার পুজো করেন মাঝি স্বয়ং। পুজোয় মাঝি ব্রোঙ্গাকে নিবেদন করা হয় হাঁড়িয়া, বলি দেওয়া হয় দুটি পায়রা।

সমাজের বিশ্বাস মাঝি বোঙ্গা ও পরগনা বোঙ্গার অন্যান্য বোঙ্গাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে।

যদিও জাহের বোঙ্গারা আদিবাসী অনেক জনজাতির কাছে পূজনীয়, কিন্তু এক গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামের জাহের থানে পুজো দেন না। যদি একগ্রামের মানুষ স্থায়ীভাবে অন্যগ্রামে বসবাস শুরু করেন, তবে তিনি নতুন গ্রামের জাহের থানে পুজো দেওয়ার অধিকার পান্।

এসব ছাড়াও প্রতিটি খুঁটের বা উপগোষ্ঠির রয়েছে নিজস্ব দেবতাও। সাধারণত এঁদের বলা হয় আব্‌গে বোঙ্গা। আব্‌গে বোঙ্গার পুজোর প্রসাদ মেয়েদের খাওয়ার বা ছোঁয়ার অধিকার নেই। প্রসাদে মেয়েদের ছোঁয়া লাগলে দ্বিগুণ নৈবেদ্য দিয়ে আব্‌গে বোঙ্গার পুজো দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

সমাজের বিশ্বাস আত্মা অমর। দেহত্যাগের পর যতদিন তাঁদের কথা বংশধররা মনে রাখেন ততদিন আত্মা বিপদ-আপদে তাঁদের সাহায্য করে। কেউ দেহত্যাগ করার পর বোঙ্গা হয়ে যান। পারলৌকিক কাজ শেষ হওয়ায় পর আত্মার বোঙ্গা সাঁওতালদের বাড়িতে স্থান পান। আত্মার এই বোঙ্গাকে বলে হপ্‌রামপো বোঙ্গা। প্রতি পরবে পরিবারের লোক হপ্‌রামপো বোঙ্গাকে নৈবেদ্য দেয়।

'দিশম সেন্দ্রা' বা বার্ষিক শিকার পরবের সময় সাঁওতাল সমাজ জঙ্গল মহাসভা বা লো বীর' ডাকে। 'লো বীর'-এর নির্দেশ সমাজের সকলেই মান্য করেন। 'ডিহরি' হলেন লো বীর পরবের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

ফাল্গুন মাসে বাহা পরবের পর 'লো সেন্দ্রা' অনুষ্ঠিত হয়। ডিহরি শিকার পরবের দিন ঠিক করেন ও কোথায় কোথায় শিকারীরা রাত্রিবাস করবেন, তাও ঠিক করেন। বিভিন্ন হাটে দূত পাঠান ডিহরি। দূতদের হাতে থাকে 'ধারওয়াক্' (পাতাসমেত শালগাছের ডাল)। হাটের লোকজন 'ধারওয়াক্' হাতে কোনও লোক দেখলেই বুঝতে পারেন ডিহরির দূত এসেছেন। সমাজের লোকেরা দূতের কাছ থেকে জেনে নেন শিকারি পরবের দিনক্ষণ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি।

গ্রামের নাইকে পরবে যাওয়া শিকারীদের কল্যাণ কামনায় পাঁচটা মোরগ উৎসর্গ করে পুজো দেন ডিহরি, শিকার পরবের কয়েকদিন আগে থেকেই সহবাস বন্ধ রাখেন, শয্যা নেন ভূমিতে। শিকার পরবের আগে সন্ধ্যায় পিতলের পাত্রে জলে দুটি শাল-পল্লব রেখে দেন। পরদিন ওই পল্লব-দুটি তাজা থাকলে শুভ লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়, শিকারীরা আসার আগেই ডিহরি তাঁর স্নান সেরে ফেলেন। শিকারীরা হাজির হওয়ার পর ডিহরি বোঙ্গাদের পুজো করেন। বলি দেওয়া মোরগ চালের সঙ্গে রান্না করা হয়। এই খেয়ে ডিহরি তাঁর উপোস ভাঙেন। শিকারীরা বেরিয়ে পরেন শিকারে।

সারাদিন শিকার করার পর সন্ধ্যায় তাঁরা সমবেত হন। এক-এক গ্রামের মানুষ

এক-এক জায়গায় বসেন। রাতের খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকতে যাঁরা 'লো-বীর' সভায় যাবে তারা ছাড়া সকলে মিলে নাচ-গান-বাজনা শুরু করবে। এই প্রমোদ আসরকে বলে 'তোরিয়া'। শিকারের দেবী 'রঙ্গো রুজি' বোঙ্গাকে খুশি করতেই তোরিয়ার আয়োজন। নাচ-গানে রাত শেষ হবে। ডিহরি ভোর বেলায় স্নান সেরে পুজো করবেন, বলি চাপাবেন। শুরু হবে শিকার। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শিকার পরব শেষ হয়। শিকারীরা গ্রামে ফেরেন। শিকারীদের স্ত্রীরা স্বামীদের পা ধুইয়ে স্বাগত জানান।

শিকার পরবের সময় বিবাহিতেরা চুলে ফুল গুঁজতে পারেন না, হাতে পরেন না লোহার বালা। শিকারীরা না ফেরা পর্যন্ত গ্রামে পশু বা মোরগ মারা নিষিদ্ধ।

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে নারী

সাঁওতালদের বহু লোককথায় পুরুষদের বীরসুলভ সরলতা ও নারীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সমাজের নারীদের সম্মানরক্ষাকে পুরুষরা তাঁদের বীর-ধর্ম বলে মনে করেন। এগুলো যেমন সত্যি, পাশাপাশি এ-ও সত্যি পুরুষরা মহিলাদের বিশ্বাস করেন না। সমাজ বিশ্বাস করে মন্ত্র বা অলৌকিক ক্ষমতা দখল করার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রণী। নারীদের বোঙ্গার পুজোর অধিকার দিলে ছলাকলায় তাঁরা বোঙ্গাদের হৃদয় জয় করে নেবেন। নারীরা রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী হলে সমাজের ক্ষতিই হবে।

নারীদের রহস্যময় ক্ষমতাকে ভয় পাওয়ার হদিশ পাওয়া যায় লোকগাথাতেই।

সে অনেক অনেক আগের কথা। সমাজে বাস করতেন এক গুণীন্। তাঁর ছিল অলৌকিক সব ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার জোরে অনেক মৃত আদিবাসীদের নতুন জীবন দিয়েছিলেন। গুণীনের গুণগ্রাহী জুটলো। গুণীন ঠিক করলেন, তাঁদের দীক্ষা দেবেন। গুণীন বুঝেছিলেন তাঁর আয়ু বেশি দিন নয়। ভক্তদের ডেকে বলেছিলেন, তোদেরই তো দীক্ষা দেবো। কিন্তু মনে হচ্ছে, সব কিছু শেখাবার আগেই আমার মৃত্যু হবে। তোদের কয়েকটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন, আমি মারা গেলে আমার মৃতদেহ যেন অবশ্যই দাহ করিস তোরা। চিতা থেকে এক সময় লাফিয়ে উঠবে আগুনের গোলা। আগুনের গোলা দেখে ভয় না পেয়ে তোরা গোলাটাকে গ্রহণ করিস। তাহলেই আমার সমস্ত মন্ত্রশক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা তোরা পেয়ে যাবি।

ভক্তদের দীক্ষা দেওয়ার দিন ঠিক হলো। দীক্ষার দিন গুরু যখন ঘর থেকে বের হচ্ছেন তখন একটা সাপ কামড়াল গুরুর মাথায়। গুরুকে বাঁচাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। গুরুকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতা সাজিয়ে তার উপর শোয়ানো হলো। চিতায় আগুন জ্বলে ওঠার কিছু পর বিশাল শব্দ করে একটা আগুনের গোলা শূন্যে উঠে গেল। ভীত ভক্তেরা সেই শব্দে ও গোলার আগুনের তীব্রতায় পালিয়ে গেলেন। কাছের মাঠে কিছু মেয়ে শুকনো কাঠি কুড়োচ্ছিল। আগুনের গোলাটা তাদের কাছে

পড়তেই তারা গোবর লেপা ঝুড়ি দিয়ে চাপা দিল। ফলে মেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হলো গুণীনের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতার বড় অংশ। পরের যে ছোট আগুনের গোলাটা শূন্যে উঠে মাটিতে এসে পড়েছিল, সেটা সংগ্রহ করেছিলেন ভক্তেরা। ভক্ত পুরুষদের মধ্যেও সংক্রামিত হলো গুরুর শক্তি, তবে তা খুবই কম।

কোন কোন ক্ষেত্রে সাঁওতাল সমাজের মেয়েরা কিছু কিছু হিন্দু দেব-দেবীর পুজো করছেন বটে। (কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি), কিন্তু এগুলো বিরল ব্যতিক্রম। হিন্দু দেব-দেবীদের পুজোর বাইরে কিন্তু সাঁওতাল সমাজ তাঁদের নারীদের বোঙ্গা পুজোর অধিকার স্বীকার করে নেয়নি।

ডাইনি, জানগুরু প্রথার বিরুদ্ধে কী করা উচিত

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সব বছর ভাল ফসল হয়, সমাজে অভাব অনটন কম হয়, সেসব বছর 'ডাইনি' হত্যা বা ডাইনি' বিচারের ঘটনা কম ঘটে। যেসব বছর ফসল ভাল হয় না, গো-মড়ক দেখা দেয়, সেসব বছরগুলিতে ডাইনি নিয়ে অভিযোগ ওঠে বেশি।

জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস সাধারণ মানুষদের এমনি আসেনি। তাঁরা দেখেছেন জানগুরুদের 'অলৌকিক' সব কাণ্ডকারখানা। জানগুরুরা আত্মা, ভূতদের নিয়ে আসতে পারেন, কাজে লাগান। ভূতেরা গ্লাস থেকে তাড়ি খায়। কঞ্চি চালান করে, নখদর্পণে, আটার গোলা ভাসিয়ে, হাতে ছাই ঘষে নাম ফুটিয়ে চুরি যাওয়া জিনিসের হদিশ দিচ্ছেন। যেভাবে এসব ঘটনা জানগুরু ঘটাচ্ছেন, সেগুলোর ব্যাখ্যা সাধারণ বুদ্ধিতে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ঘটনাগুলোকে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ভাবার অবকাশ থাকছে না। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজের শিক্ষিত স্নাতক, শিক্ষকরাও জানগুরুদের নির্দেশকে অভ্রান্ত মনে করে ডাইনি হত্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন।

ডাইনি হত্যার পিছনে রয়েছে ডাইনিদের এবং জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি সাধারণের অন্ধ-বিশ্বাস। অন্ধ-বিশ্বাস কিন্তু শিক্ষার সঙ্গেই শুধুমাত্র সম্পর্কিত নয়। যাঁরা মনে করেন আদিবাসী সমাজকে শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে দিলেই ডাইনি হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁরা প্রকৃত সত্য বিষয়ে বা সমস্যার গভীরতা বিষয়ে ঠিক মত অবহিত নন, এ কথা অবশ্যই বলা চলে। ডাইনি ও জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই দূর করা সম্ভব বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসে আচ্ছন্ন শিক্ষিতের সংখ্যাই যে আমাদের দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সংখ্যাগুরু, এ সত্যকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারি ? বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, বিজ্ঞান পেশার মানুষ, শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এমনকি স্বীকৃত মার্কসবাদীদের মধ্যে কি আমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের সাক্ষাৎ পাই না ? বাস্তব সত্যটি এই যুক্তি দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বোঝালে শুধুমাত্র

শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষরাই নন, শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষরাও সংস্কার মুক্ত হন। এই কথাগুলো কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূত বা ধারণাপ্রসূত নয়, বরং বলতে পারি হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। মানুষ শৈশব থেকেই বেড়ে উঠছে অলৌকিকের প্রতি আস্থাশীল পরিবারে, সমাজে পরিবেশে। পড়ার বই ও গল্পের বইয়ের মাধ্যমেও অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস ও ভুল ধারণাই প্রতিনিয়ত সঞ্চারিত হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে। বিপরীত কোনও যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়ার ফলে অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাসগুলোই দিনে দিনে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে। মানুষ যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে যে আন্তরিকতার সঙ্গেই যুক্তিকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন এই সত্যটুকু যুক্তিবাদী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে উপলব্ধি করেছি।

শত শত বছর ধরে ভাববাদী দর্শন যে অন্ধ-বিশ্বাসগুলোকে, আমাদের চিন্তার জগৎকে, প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে চলেছে যুক্তিবাদী দর্শন মুহূর্তের চেষ্টায় কোটি কোটি মানুষকে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে, এমনটা ভাবা বাতুলতা মাত্র। আমাদের দেশে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য। শিক্ষিতদের মধ্যেও অতি প্রয়োজনীয় (লেখাপড়া শিখতে যতটুকু না কিনলেই নয়) বই কেনা ছাড়া বই কেনার অভ্যাস খুবই কম। অন্ন-বস্ত্রের মত বই কেনাকে বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন বলে মনে করেন না। কিনলেও সাধারণভাবে 'শেষ পাড়ানের করি' হিসেবে ধর্মগ্রন্থই সেখানে গুরুত্ব পায়। কুসংস্কার মুক্তির কাজ এক বা কয়েকজন ব্যক্তির কিছু লেখাতেই সমাধান হয়ে যাবে এমন ভাবাটা একান্তই অমূলক। যুক্তিবাদী লেখা-পত্তর কিছু মানুষ বা কিছু সংগঠনকে যুক্তিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চিন্তার স্বচ্ছতা আনতে সাহায্য করতে পারে, দিশা দিতে পারে মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত মানুষরা বিভিন্ন গণসংগঠন করে যেদিন অক্ষরজ্ঞানহীন, শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া মানুষদের স্বচ্ছ যুক্তির আলোতে উদ্ভাসিত করতে পারবেন, সেদিনই যুক্তিবাদী আন্দোলনে নতুন মাত্রা নতুন গতি যুক্ত হবে।

শিক্ষিত এবং ডাইনি হত্যা বিরোধী মানুষদের লেখাতেও আমরা কিন্তু বার বার লক্ষ্য করেছি, স্বচ্ছতার অভাব। নেতৃত্বের স্বচ্ছতার অভাবই ডাইনি হত্যা বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠার পক্ষে প্রবলতর বাধা। শরচ্চন্দ্র রায়ের বিখ্যাত বই 'ওঁরাও রিলিজিয়ন অ্যান্ড কাস্টমস্'-এ শ্রী রায় এ কথাও লিখেছেন, জানগুরু সম্প্রদায়ের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী মানুষগুলো এ সব বিদ্যা শেখে কখনও ভালবেসে, কখনও আয়ের পথ হিসেবে। এরা বুঝতে পারে কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা অতিপ্রাকৃত। এরা অলৌকিক বিদ্যার পাশাপাশি, ভেষজ বিদ্যাও শেখে।

রেভারেন্ড পি· ও· বক্তি 'ট্যাবু কাস্টমস্ অ্যামাং দি সানতালস্' গ্রন্থে একথাই বলেছেন, মেয়েরা, সে ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যেই হোক, অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর কাছে পৌঁছুতে চায়। সেটা প্রকাশ্যে পারে না। কারণ পুরুষেরা মত দেয় না। তাই গোপনে ডাইনি বিদ্যার অনুশীলন করে।

অসিতবরণ চৌধুরীর 'উইচ কিলিং অ্যামাং দি সানতালস্' বইটি পড়লে কোথাও এমন কথা পাই না যাতে মনে হয় 'জান' এবং 'ডান' কারোই কোনও অলৌকিক

ক্ষমতা-টমতা বলে কিছু নেই। বরং শ্রীচৌধুরীর কথায় সন্দেহ জাগে এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস রয়েছে দোদুল্যমান অবস্থায়।

শ্রী চৌধুরীর বিভিন্ন লেখা পড়েও এ বিষয়ে তাঁর মতামত বুঝে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর কথায়, 'মন্ত্র-তন্ত্রসমন্বিত জানগুরুর কার্যকলাপকে আমরা হিতকারী জাদু বা white magic বলে অভিহিত করতে পারি। অনুরূপভাবে, অনিষ্টকারী যেসব ব্যক্তি মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁদের কার্যকলাপকে অহিতকারী জাদু বা black magic আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সাঁওতাল সমাজে যারা black magic করছে বা জাদু করছে, তাদের 'ডান' আখ্যা দেওয়া হয়।'

তার মানে ? তিনি কি 'ডান' সত্যিই আছে কিনা'র উত্তরে জানাচ্ছেন 'ডানরা black magic করছে' ? এতো ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তীর মত 'ওয়ার্ল্ড উইচ ফেডারেশন'-এর সর্বময়কর্ত্রী বলবেন! অসিতবরণ চৌধুরী'র লেখা-পত্তরকে যেখানে আমাদের সমাজের উচ্চকোটির মানুষ ও পত্র-পত্রিকা মূল্যবান বলে মনে করেন, সেখানে তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তিগুলো কী ? এ বিষয়ে জানার আগ্রহ যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষেরই স্বাভাবিক।

শ্রীচৌধুরী লেখাটিতে ঠিক পরের লাইনটিতেই বলেছেন, 'এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সাঁওতাল অধ্যুষিত সব জেলাতেই বহু প্রাণহানি ঘটেছে 'ডান' হওয়ার অভিযোগে।'

না। 'ডান' প্রথা বন্ধে এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। বরং মনে হয়েছে—যেহেতু তাঁর লেখা-পত্তর 'ডান' প্রথা বিরোধী বলে প্রচলিত, তাই এ বিষয়ে তাঁর আরও সতর্কতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল।

ডাইনি প্রথার মত একটা অমানবিক প্রথার অবসান প্রতিটি মানবিকতায় বিশ্বাসী যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী আন্তরিকভাবেই চান। যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল বিভিন্ন সংস্থা ও মানুষ ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে যাতে আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে পারেন, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই সাঁওতাল সমাজ বিষয়ে কিছু আলোচনায় গিয়েছিলাম। আলোচনা অনেকের কাছে নিরস মনে হতেই পারে, কিন্তু যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী, তাঁদের আগেই জেনে নেওয়া উচিত, স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ, কাদের জন্য করছি ? কী তাঁদের সমাজ জীবন ? কী তাঁদের সমস্যা ইত্যাদি। যাঁদের সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবন ও সমস্যা বিষয়ে আমরা অন্ধকারে থাকবো, তাদের সঠিক আলোর সন্ধান দেওয়া দুরূহ।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করার ইচ্ছেতে রাশ টানতে পারলাম না। সম্প্রতি মদনপুর থেকে একটি তরুণ এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, তিনি একজন যুক্তিবাদী। যুক্তিবাদ বিষয়ক কিছু লেখা লিখতে আগ্রহী। তাঁর ইচ্ছে 'যুক্তিবাদীর চোখে স্বামী বিবেকানন্দ' এই নামে একটি বই লিখবেন। বললেন, এই বিষয়ে নিরঞ্জন ধরের একটি বই পড়েছেন। আর কী কী বই পড়লে লেখার খোরাক পাবেন, এই বিষয়ে আমার মতামত চাইলেন। বলেছিলাম "আপনার উচিৎ সবার আগে স্বামী বিবেকানন্দকে জানা। তাঁর লেখা-পত্তর ও কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তারপর আপনার যুক্তিতে স্বামীজীর লেখাপত্তর বা কাজ কর্মের

যেগুলোকে যুক্তিহীন বা যুক্তি বিরোধী মনে হবে, সেই বিষয়ে আপনি আপনার যুক্তি দিয়ে পাঠকদের বোঝাতে চেষ্টা করুন, কেন আপনার চোখে স্বামী বিবেকানন্দের ওই সব কাজকর্ম যুক্তি বিরোধী।" তরুণটি বললেন, বিবেকানন্দ রচনাবলী তাঁর পড়া আছে। বললাম, তাতে কোনও কিছু যুক্তি বিরোধী মনে হয়েছে কী ?

তরুণটি বললেন,—না, তেমন কিছু চোখে পড়েনি। বিবেকানন্দ রচনাবলী থেকেই কিছু কিছু কথা বলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এসব বিকোনন্দেরই কথা, আপনি কি মনে করেন, এগুলোর পিছনে যুক্তি আছে ? তরুণটি বললেন, "বিবেকানন্দ এ ধরনের কোনও কথা বলেছেন বলে তো কোনও বইতে পাইনি।" একটা ডাইরীর পৃষ্ঠা খুলে কলম বাগিয়ে বললেন, "ঠিক লাইনগুলো কি একটু বলুন না ? অথবা বইটার নাম ? পৃষ্ঠা সংখ্যা ?"

বলেছিলাম, "বিবেকানন্দ রচনাবলী থেকেই কথাগুলো বললাম। আপনি রচনাবলী ভালমত পড়লে কথাগুলো অপরিচিত মনে হত না। বাস্তবিকই যুক্তিবাদী মানসিকতা নিয়ে লিখতে চাইলে যে বিষয়ের বিরোধিতা করতে চান, সেই বিষয়টিকে আগে ভালমত জানার চেষ্টা করুন। তার দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা, যুক্তিহীনতাকে খুঁজে বের করুন, তবে তো ভাল লেখা হবে। আপনি যদি লেখার শর্ট-কার্ট কিছু রাস্তার খোঁজে আমার কাছে এসে থাকেন তো বলব সে বিষয়ে সাহায্য করতে আমি অক্ষম।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। '৮৯-এর জানুয়ারি। একটি বিজ্ঞান ক্লাবের অলৌকিক বিরোধী শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করতে গিয়েছি। এই উপলক্ষে দু-দিনের একটি বিজ্ঞান মেলারও আয়োজন করা হয়েছে। বড়-সড় মেলা। আশেপাশে কয়েকটি জেলা থেকেও এসেছেন অনেক বিজ্ঞান ক্লাব। ব্যবস্থাপক বিজ্ঞান ক্লাবের সম্পাদক এক তরুণ শিক্ষক। আমাকে সম্পাদক জানিয়েছিলেন, শিক্ষণ-শিবিরে আমি যেন আত্মা, জাতিস্মর, প্ল্যানচেট, সম্মোহন, ভূতে ভর, ঈশ্বরে ভর এইসব বিষয়ের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি। জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে ক্লাবের সভ্যদের জ্ঞান যথেষ্ট গভীর। মনে আছে, আমি একটু মজা করতেই বলেছিলাম, "জ্যোতিষ শাস্ত্রের পক্ষে বক্তব্য রাখি, আমাকে আপনারা হারাতে পারবেন তো?" সম্পাদক দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন, 'অবশ্যই'।

মাঠের তিন পাশ ঘিরে রঙিন কাপড় দিয়ে তৈরি এক একটি ঘরে এক একটি বিষয় নিয়ে মডেল ও ছবির সাহায্যে বিজ্ঞান বোঝাবার প্রদর্শনী চলছিল। প্রথম দিন বিকেলেই জ্যোতিষ বিষয়ক প্রদর্শনী কক্ষে যুক্তির আক্রমণ চালালেন দুই জ্যোতিষী। একজন স্থানীয় এবং একজন নৈহাটির জ্যোতিষী। ওই কক্ষে টাঙান দুটি চার্ট দেখিয়ে জ্যোতিষী দুজন ক্ষোভ প্রকাশ করে জানালেন, এই পোস্টার দুটিতে দেওয়া তথ্যগুলো ভুল। এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রকে মিথ্যা প্রমাণ করতেই মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান ক্লাবের অনেকেই বিতর্কে অংশ নিলেন, অংশ নিলেন সম্পাদক স্বয়ং। শেষ পর্যন্ত সম্পাদকই আমাকে ওখানে ডেকে নিয়ে গেলেন। জ্যোতিষী দুজনের অভিযোগের উত্তরে বিনীতভাবেই স্বীকার করে নিলাম, পোস্টার দুটিতেই ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। একই জন্ম সময় নিয়ে বিভিন্ন জ্যোতিষী বিভিন্ন ধরনের গ্রহ অবস্থান দেখিয়ে ছক করছেন এটা অবিশ্বাস্য। বরং এই ছক তিনটি দেখলে সন্দেহ জাগে,

জ্যোতিষ শাস্ত্রকে এবং জ্যোতিষীদের হাসির খোরাক করতে গিয়ে নিজেরাই মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বিতীয় পোস্টারটিতে কয়েকটি গ্রহরত্ন বিষয়ে তথ্যগত ভুল ছিল। সম্পাদক জানালেন, তাঁরা এই তথ্যগুলো একটি বিজ্ঞান পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছেন। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। শর্টকার্ট-এ বাজিমাৎ যে করা যায় না, অন্তত নেতৃত্ব দিতে গেলে প্রতি-আক্রমণের মুখে সামাল দিতে, যাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানবো, তাদের বিষয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। এর কোনও ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। নতুবা তেমন আঘাতের মুখে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

আবার আমাদের মূল আলোচনায় ফেরা যাক। আদিবাসীদের বা সাঁওতালদের মধ্যে যাঁরা খৃস্টান বা হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তারাও কিন্তু ডাইনি বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কারণ, সমাজের আশেপাশের মানুষদের ডাইনির প্রতি বিশ্বাস তাঁদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছিল।

এও দেখেছি সাঁওতাল গ্রামের আশেপাশের শহরের বা গ্রামের ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত জানগুরুদের কাছে দৌড়োন নানা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায়।

ডাইনি ও জানগুরুর অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি যে বিশ্বাস বংশপরম্পরায় সমাজজীবনে চলে আসছে, তারই পরিণতিতে ঘটে চলেছে ডাইনি হত্যার মত বীভৎস প্রথা।

এ সমস্যা সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা। এর জন্য শুধু আইন নয়, প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের। অন্ধ-বিশ্বাসী মানুষগুলোকে বোঝাতে হবে 'ডান' বা 'জান' কারোর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। এসব বোঝাতে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে জানগুরুদের তথাকথিত অলৌকিক-ক্ষমতার রহস্য ফাঁস। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অনেকেই উদ্যোগ নিয়ে ডাইনি বিরোধী নাটক লিখছেন।

**যদি এমন নাটক আদিবাসী
সমাজের কাছে হাজির করা হয় যাতে
সেই এলাকার জানগুরুদের ঘটানো তথাকথিত
অলৌকিক ঘটনার কৌশলগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হবে,
তবে সে নাটকই হবে জানগুরুদের প্রতি সবচেয়ে
বড় আঘাত। জানগুরুদের প্রতি ছুঁড়ে
দেওয়া এই চ্যালেঞ্জ তাদের
অস্তিত্বকেই বিপন্ন
করে তুলবে।**

জানগুরুরা বুজরুক, জানগুরুদের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই, যুক্তি দিয়ে এই বিশ্বাস মানুষের ভিতর যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে ডাইনি হত্যা বন্ধের ক্ষেত্রে

অনেকটাই এগোন যাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বলা সোজা, কিন্তু করা কঠিন, কারণ জানগুরুদের কৌশলগুলো জানবো কেমন করে ? উৎসাহী আন্দোলনের সাথীদের উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, আমার সঙ্গে আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করলে কৌশলগুলো অবশ্যই তাঁদের হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেব। ডাইনির ভর, ডাইনির নজরলাগা মানুষগুলোর 'আতা-পাতা' সহ্য করতে না পারার কারণ বিষয়েও নাটকে ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব যাঁদের উপর তাঁদের নিয়ে শিক্ষণ শিবির করে শেখাতে হবে ভূতে ভর, জিনের ভর, ডাইনির নজর লাগা, জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য। ছাত্র-ছাত্রীদের এই বাস্তব সত্যকে জানালে কার্যকর হবে। এই বিষয়ে আমি ও ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সমস্ত রকমের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে তৈরি আছি।

ডাইনি প্রথা রোধে
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যদি
আন্তরিক ও নির্ভীক হন তবে এই বিষয়ে
নিশ্চয়ই কার্যকর ভূমিকা নেবে এবং আমাদেরও
সহযোগিতা গ্রহণ করবে। সরকারের যদি এই ধারণা হয়
আদিবাসী সমাজের এই অন্ধ-বিশ্বাসের (যেগুলো
ওঁদের ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে
রয়েছে) উপর আঘাত হানলে আদিবাসী
সমাজ ক্ষেপে উঠবে তাহলে
স্পষ্টভাবে জানাই,
এ ধারণা আদৌ
সত্য নয়।

সাঁওতাল সমাজের অনেকেই আজ এই প্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী। সরকার তাঁদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে অবশ্যই ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনে নতুন গতি যুক্ত হবে।

এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, জানগুরুদের অর্থের লোভ বা রাজনৈতিক ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে অনেক ব্যক্তি বা রাজনীতিক তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ডাইনি-বিশ্বাসকে কাজে লাগাচ্ছেন। এই স্বার্থভোগীরা যে ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে ব্যর্থ করতে সচেষ্ট হবে এই কথা স্পষ্টভাবে মাথায় রেখেই সরকারকে এগুতে হবে।

ডাইনি হত্যা বন্ধে যে সব পরিকল্পনা এখুনি সরকারের গ্রহণ করা উচিত

তথ্যচিত্র ও স্লাইড দেখিয়ে আদিবাসী সমাজের মানুষ ও পশুদের নানা রোগ ও তার প্রতিকারের উপায় বিষয়ে বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে খরা, অজন্মার পিছনে কারণগুলি কোনও সময়েই অতিপ্রাকৃতিক নয়। বোঝাতে হবে অপুষ্টি থেকে হওয়া শিশু রোগ ও বিভিন্ন 'ভর' বিষয়ে। দেখাতে হবে জানগুরুদের অলৌকিক কার্যকলাপের গোপন রহস্য। এ সবের মধ্য দিয়ে মানুষের বিজ্ঞান চেতনা বাড়াতে হবে।

শিক্ষার, বয়স্ক শিক্ষার, নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পরিকল্পনা নিতে হবে। এই বিষয়ে সরকারকে যেমন উদ্যোগ নিতে হবে, তেমনই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

জানগুরুদের ব্যবসার বিরুদ্ধে জনমত তৈরির চেষ্টার পাশাপাশি প্রয়োজনে পুলিশ ও প্রশাসনকে জানগুরুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জানগুরু কাউকে ডাইনি বলে ঘোষণা করলে জানগুরুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই ঝাড়ফুঁক, মন্তর-তন্তরে রোগ সারে না, অতএব তোমরা ওঝা, গুণীন, জানগুরুদের কাছে যেও না বললে কিছুতেই কাজ হতে পারে না। "কেরোসিনের কম আলোয় কাজ করলে বা পড়লে চোখের ক্ষতি হয়" এ উপদেশ তখনই দেওয়া সাজে যখন কেরোসিনের বিকল্পে প্রায় সমমূল্যে বিদ্যুৎ সেইসব মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

রোগ সারাতে ঝাড়-ফুঁকের বিকল্প হিসেবে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধে (অবশ্যই বিনামূল্যে) না দিয়েই ঝাড়-ফুঁকের বিরুদ্ধে যতই বক্তব্য রাখি, তা কার্যকর হবে না।

একই সঙ্গে এ-ও সত্যি—স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে দিলেই আদিবাসী মানুষরা তাঁদের এতদিনের গড়ে ওঠা বিশ্বাস বর্জন করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দৌড়োবেন না। সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে যে খবর পেয়েছি এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে এটুকু বলতে পারি, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে যেখানে দেওয়া হচ্ছে সেখানকার আদিবাসী মানুষেরা ধীরে ধীরে সেসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতেও শুরু করেছেন। আদিবাসী সমাজের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা-মাফিক সমস্ত কাজ-কর্ম একযোগে শুরু করলে আদিবাসী সমাজের মানুষদের কাছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো আরও বেশি বেশি করে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে থাকবে।

পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব এবং তার দরুন জল-বাহিত বিভিন্ন রোগের আক্রমণের শিকার হন এইসব বঞ্চিত মানুষজন। এ বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রশাসনের নিতে হবে।

বহির্জগতের সঙ্গে আদিবাসীদের মেলামেশা, যোগাযোগ যাতে বাড়ে, সে বিষয়েও দৃষ্টি দিতে হবে। সরকারী তত্ত্বাবধানে আদিবাসীদের জমির মালিকানা ফিরিয়ে দিতে হবে।

জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য সন্ধানে

রেভারেন্ড পি ও বডিং-এর লেখা থেকে ব্রিটিশ আমলের সাঁওতাল পরগনার এক সহকারী কমিশনারের কথা জানতে পারি, যিনি অদ্ভুত কৌশলে অনেক ঘোষিত ডাইনির জীবন বাঁচিয়েছিলেন। ঘটনাটা ঘটাতেন অনেকটা সীতার অগ্নি পরীক্ষার ধাঁচে। সহকারী কমিশনার সাহেব ব্যাটারি চালিত বিদ্যুৎ সৃষ্টির একটি জাদু-দণ্ড তৈরি করিয়েছিলেন। কাউকে ডাইনি ঘোষণা করা হয়েছে খবর পেলেই জাদু-দণ্ডটি নিয়ে সেই গ্রামে হাজির হতেন। যে জানগুরু বা জানগুরুরা ডাইনি ঘোষণা করেছে তাদের হাজির করতেন আদিবাসীদের সামনে। আনা হতো ঘোষিত ডাইনিকেও। সাহেব এবার জনসমক্ষে জানাতেন এই আশ্চর্য দণ্ড কোনও মিথ্যাচারী স্পর্শ করলে তার শরীরে আকাশের বজ্র এসে আঘাত করবে। মৃত্যু না হলেও অনুভব করবে মৃত্যু যন্ত্রণা। সত্যভাষীদের এই দণ্ড স্পর্শে কোনও বিপদ ঘটবে না। তারপর সাহেব জানগুরুদের দিয়ে ঘোষণা করাতেন কে ডাইনি। ঘোষণার পর জানগুরুরা দণ্ড ছুঁতেন। সাহেব দণ্ডে প্রবাহিত করতেন বিদ্যুৎ। জানগুরুরা বিদ্যুৎ তরঙ্গের আঘাতের আকস্মিকতায়, তড়িতাহত বিষয়ে অজ্ঞতায় ভীত, আতঙ্কিত হয়ে আর্তনাদ করে উঠতেন। এবার ঘোষিত ডাইনিকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কী ডাইনি?" মেয়েটি জানাতেন, "না"। এবার মেয়েটিকেও দণ্ডটি স্পর্শ করতে হতো। সাহেব এবার দণ্ডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতেন না। আদিবাসী সমাজ এমন একটা অসাধারণ প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস করে নিতেন, মেয়েটি নির্দোষ। জানগুরুরা মেয়েটির প্রতি কোনও আক্রোশ মেটাতে ডাইনি বলে ঘোষণা করেছিল।

সাহেব নাকি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কৌশল প্রয়োগ করে ঘোষিত ডাইনিদের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এবারের ঘটনাস্থল নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী। সময় '৮৯-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। গিয়েছিলাম বেথুয়াডহরী বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত একটি বিজ্ঞান মেলায় বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করতে। খবর পেলাম বেথুয়াডহরীর উপকণ্ঠে এক সাঁওতাল পল্লীতে এক রমণীকে 'ডাইনি' ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিয়ে গ্রামে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। বিজ্ঞান পরিষদের সক্রিয় তরুণের সংখ্যা প্রচুর। তাঁরা ওই গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরকে হাজির করলেন আমার কাছে। ওঁদের কাছে আমার পরিচয় দিয়েছিলেন কলকাতার বড় গুণীন হিসেবে। কথা বলে জানলাম, গত ছয় মাসে ওদের পল্লীর সাত জন মারা গেছেন। ডাইনিই নাকি ওদের খেয়েছে। এক জানগুরুর কাছে ওরা গিয়েছিলেন গাঁয়ের মাঝিকে নিয়ে। জানগুরুকে তেল-সিঁদুর দিতে শালপাতায় তেল ছিটিয়ে, ধূনো জ্বেলে, শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে মন্ত্র পড়ে শেষে শালপাতা দেখে জানিয়েছেন মৃত্যুর কারণ ডাইনি। যাঁর বউকে ডাইনি ঘোষণা করা হয়েছিল তিনিও এসেছিলেন। ওঁদের বললাম, "আমি কাল দুপুরে যাব, তোমাদের গাঁয়ের সকলকে হাজির থাকতে বোলো।"

পরের দিন গেলাম। সঙ্গী বিজ্ঞান পরিষদের বহু তরুণ, আমার পুত্র পিনাকী ও স্ত্রী সীমা। আমরা ঘুরে ঘুরে ওদের ছোট্ট গ্রাম দেখছিলাম। পরিচ্ছন্ন গ্রাম। গ্রামের মানুষ

ভিড় করে এলেন। একটা খাটিয়া পেতে দিলেন পরম যত্নে। বসলাম। ওঁদের সঙ্গে গল্প করলাম। ওঁদের গান গাইতে অনুরোধ করলাম। গান শুনলাম, মাদলের তালে তালে। এবার শুরু করলাম যে জন্য আসা, সে কাজের প্রস্তুতি। একটা মাটির পাত্র দিতে বললাম। পাত্র এলো। পাত্রের উপর স্তূপ করলাম আখের শুকনো ছিবড়ে। একটা ছোট্ট বাটিতে করে জল দিতে বললাম, জল এলো। এবার একটা আতা পাতা ছিঁড়ে বিড়বিড় করতে করতে গ্রামের চারপাশটা ঘুরলাম, আর মাঝে মাঝে আতা পাতায় জল তুলে মাটিতে ছেটাতে লাগলাম। ঘোরা শেষ হতে এসে বসলাম মাটির সরার কাছে। পাশে রাখলাম জলের বাটিটা। জানালাম সত্যের অগ্নি-পরীক্ষা নেব। কিছুক্ষণ 'অং-বং' মন্ত্র পড়ে বললাম, "এগ্রামের যে কজন গত ছ-মাসে মারা গেছেন, তাঁদের একজনকে যদি 'ডাইনি'তে খেয়ে থাকে তবে মন্ত্র শক্তিতে এই মাটির পাত্রে আগুন জ্বলে উঠবে।"

বাটির জল নিয়ে আখের শুকনো ছিবড়ের উপর ফেললাম, আগুন জ্বলল না। গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে সামান্যতম উত্তেজনা লক্ষ করলাম না। বুঝলাম, আগুন না জ্বলাটাই স্বাভাবিক ঘটনা বলে ওরা ধরে নিয়েছে।

এবার বললাম, "গত ছ'মাসে যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের কাউকেই যদি ডাইনি না খেয়ে থাকে, ঠিক মত ওষুধ না খাওয়ায় মারা গিয়ে থাকে, তবে জল ঢাললেও আগুন জ্বলবে।"

আতা পাতায় জল তুলে ছিবড়েতে ঢালতেই আগুন জ্বলে উঠলো। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখে বাচ্চা-বুড়ো, পুরুষ-মহিলা সকলেই উত্তেজনায় সোরগোল তুললেন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওই পল্লীর সাঁওতালরা বিশ্বাস করেছিলেন, জানগুরুর ক্ষমতা নেই। জানগুরুর জড়িবুটিতে তাই রোগ সারেনি। ব্যর্থতা ঢাকতে একটা নিরীহ মানুষকে ডাইনি বলেছিল।

জানি, যে পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে সে দিন একজন ঘোষিত ডাইনিকে বাঁচিয়েছিলাম, সে রকমভাবে একজনকে শুধু বাঁচান যেতে পারে মাত্র, কিন্তু এর দ্বারা আদিবাসী সমাজ থেকে 'ডাইনি' ও 'জানগুরু'দের অলৌকিক অশুভ ও শুভ ক্ষমতা বিষয়ে গড়ে ওঠা অন্ধ বিশ্বাস দূর হবে না।

আদিবাসীদের মধ্য থেকে কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার, এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। তবু একটি হত্যা রোধ করতে তাৎক্ষণিক আর কোনও উপায় আমার জানা ছিল না।

যেভাবে আগুন জ্বালিয়েছিলাম, তার মধ্যে যে কোনও অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার ছিল না, এটা নিশ্চয়ই নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজ্ঞান পরিষদের ছেলেদের সাহায্যে দুটি জিনিস সংগ্রহ করেছিলাম—পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও গ্লিসারিন। সবার দৃষ্টির আড়ালে আখের ছোবড়ায় ফেলে দিয়েছিলাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। গ্রাম ঘোরার সময় বাটির পুরো জলটাই ছিটিয়ে বা ফেলে শেষ করে দিয়েছিলাম। হাতের কৌশলে, সবার নজর এড়িয়ে বাটিতে ঢেলে দিয়েছিলাম গ্লিসারিন।

প্রথম দফায় গ্লিসারিন ঢেলে ছিলাম ছিবড়ের সেই জায়গাগুলোতে, যেখানে

পটাশিয়াম পারমাঙ্গ্যানেট নেই। দ্বিতীয় দফায় গ্লিরসারিন ঢেলেছিলাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের গুঁড়োর উপর। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গ্লিসারিনের সংস্পর্শে এসে তাকে অক্সিডাইজ করেছে। অক্সিজেনের ফিজিক্যাল পরিবর্তনের ফলে ওই রাসায়নিকের উত্তাপ বেড়ে গিয়ে এক সময় আগুন জ্বলে উঠেছে।

যেখানে গ্রামবাসীরা ঘোষিত ডাইনিকে গ্রাম ছাড়া করেছে অথবা 'এখুনি' হত্যা করবেন না মনে হচ্ছে, সেখানে গ্রামবাসীদের অন্যভাবে সত্যকে বোঝান যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে একটা ঘটনা তুলে দিচ্ছি।

এবারের ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়ার সাঁওতাল পল্লী। সালটা ১৯৫৮। ঈশ্বর সোরেন বছর কুড়ির এক তরুণ, কিছু দিন ধরে কাশতে কাশতে রক্ত বের করে ফেলছিল মুখ থেকে। শরীরও শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এমনটা কেন হচ্ছে? ঈশ্বরের বাবা ছোট্ সোরেন জানগুরুর জড়িবুটি খাওয়াচ্ছিল কিন্তু তাতে কোন কাজ হচ্ছিল না। জানগুরু শেষে জানাল ঈশ্বরকে ডান খাচ্ছে। ডান কে তাও জানাল। ঈশ্বরের বিমাতা চুরকীই ঈশ্বরকে খাচ্ছে।

চুরকীকে ডাইনি ঘোষণা করায় প্রাণ বাঁচাতে চুরকী বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়। বাপের বাড়ি কাছেই পশুই গ্রামে।

মনিগ্রাম বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে ঈশ্বর লেখাপড়া শিখতে আসতেন। শিক্ষক কমলারঞ্জন প্রামাণিকের সন্দেহ হলো ঈশ্বরের টি বি রোগ হয়েছে। কমলারঞ্জন গ্রামের মানুষদের বোঝালেন ঈশ্বরের এক ধরনের অসুখ হয়েছে। এই অসুখে এমনিভাবেই মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। চুরকী যে ঈশ্বরকে খাচ্ছে, এ কথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে? গ্রামের অনেকেই যদিও প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করে জানিয়েছিলেন তাঁরা দেখেছেন চুরকী ডাইনি। কিন্তু কী দেখেছে, যাতে ডাইনি বলে জানতে পেরেছে—কমলারঞ্জনের এই প্রশ্নে অনেকে অস্বস্তিতে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত কমলারঞ্জন ঈশ্বর ও ছোট সোরেনের সমর্থন পেয়ে অন্যদের রাজি করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। বহরমপুর সদর হাসপাতালে বুকের ছবি তুলে চিকিৎসক জানালেন টি বি। চিকিৎসক কমলারঞ্জনের কাছে পূর্ব-সমস্যার কথা শুনে ঈশ্বরকে বোঝালেন, কেন এই রোগ হয়েছে, কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসা শুরু হলো। পরবর্তীকালে কমলারঞ্জন ঈশ্বরকে হাজির করলেন গ্রামের মানুষদের সামনে। ঈশ্বর জানালেন চিকিৎসকের মতামত। মানুষগুলো কিন্তু যুক্তি মেনে নিলেন। মেনে নিলেন চুরকী ডাইনি নয়। ছোট সোরেন চুরকীর গ্রামবাসীদের ৬০ টাকা জরিমানা দিয়ে চুরকীকে ফিরিয়ে আনেন। তিন ছেলে এক মেয়ে নিয়ে চুরকীর এখন ভরা সংসার।

গুণীন কালীচরণ মুর্মু

কালীচরণ মুর্মু জগমাঝি। এই নামেই পরিচিত গুণীন কালীচরণ। 'জগমাঝি' কালীচরণের উপাধি নয়। 'জগমাঝি' সাঁওতাল সমাজের নৈতিকতার রক্ষক ও সমাজের অন্যতম প্রধান। গুণীনের অভ্রান্ত গণনার কথা শুনে প্রতিদিন অনেকেই

আসেন। কেউ আসেন হারানো গরু, চুরি যাওয়া জিনিস-পত্তরের খোঁজে, কেউ বা আসেন নিখোঁজ আপনজনের হদিশ জানতে। গুণীনের টানে আসা মানুষজন সাধারণত নদীয়া ও তার আশেপাশের জেলার মানুষ। ট্রেনে এলে নামতে হয় মদনপুর-এ। ছোট স্টেশন। স্টেশনের বাইরে মিলবে রিক্সা ভ্যান। ভ্যানে পনের মিনিটের পথ জঙ্গল গ্রামের মোড়। সেখানে নেমে জিজ্ঞেস করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে কালীচরণের বাড়ি। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। কালীচরণের বয়স ষাটের ধারে কাছে। বয়সের ঠাওর মেলবে না শরীরে। কাজ করতেন কল্যাণীর স্পিনিং মিলে। অবসর নেওয়ার পর পুরো সময়ের গুণীন। ওর তুক-তাক্, ঝাড়ফুঁক, গোনার ক্ষমতায় বিশটা গাঁয়ের লোকের তরাস লাগে।

তরাসের হাওয়া লাগেনি সম্ভবত মদনপুরের কিছু এঁচোড়ে পাকা দামাল ছেলে-মেয়েদের। এদের জাতপাতের বালাই নেই, ঈশ্বর-আল্লা না মেনেও এরা বুক ঠুকে বলে, আমরা সাচ্চা-ধার্মিক। এমনি দুটি ছেলে ভানু হোর রায় আর রেজাউল হক গিয়েছিল গুণীনকে কিঞ্চিৎ বাজিয়ে দেখতে। এখন ৯০ সালের অক্টোবরের শেষ। আশপাশের গাঁ-শহরের রাজনীতির বাবু মশাইরা কদিন আগেও বড়ই ব্যস্ত ছিলেন দুর্গাপুজো, কালীপুজো নিয়ে। কালীঠাকুরকে জলে ডুবিয়েই বাবুদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার হাত থেকে দেশ উদ্ধারে। জঙ্গলগ্রাম অবশ্য এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। 'রাম-বাবরি'র বিষের হল্কা নানা বাঁক ঘুরে এখানে পৌঁছোবার আগেই ঝিমিয়ে পড়েছে।

চির, রেজাউল, কালীচরণ, মুর্মু ও ভানু

গুণীন কালীচরণ গুণে-গেঁথে রেজাউল আর ভানুর আসার উদ্দেশ্য বের করে ফেলেছিলেন। বললেন, 'তোমরা এসেছ কেন, জানি। তোমাদের গ্রামে একটা গণ্ডগোল বেধেছে তাই....'

'উঁহু, সে জন্যে তো আসিনি। আর আমাদের গ্রামে গণ্ডগোলও কিছু বাধেনি।'

গুণীন ওদের এমন বেখাপ্পা কথায় চটলেন,

বললেন, 'আমার ক্ষমতায় সন্দো ? তোমাদের ভাল হবে না। আমি যদি তোমার চারপাশে গণ্ডি কেটে দিই, সে গণ্ডি আমি না কাটান দিলে পেরোতে পারবে ? পিঁড়িতে বসিয়ে মন্ত্র পড়ে দিলে পিঁড়ি পাছায় এমন সেঁটে যাবে, তখন বুঝবে সন্দো করার মজাটা।'

ভানুও ঝপাং করে তেতে গেল। বললো, 'বেশ তো গণ্ডি কেটে আমাকে বন্দী করুন তো ! আজই করে দেখাতে পারলে পাঁচ'শ টাকা দেব। আর যদি কয়েকটা দিন পরে দেখান—পঞ্চাশ হাজার দেব।'

'তোমাদের দেখছি বড় চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা, বড় টাকার গরম ! পুঁইচচ্চড়ি চিবোন চেহারা আর মুখে পঞ্চাশ হাজারের গপ্পো। বোঙ্গা ক্ষেপলে ও সব বুকনি ঠাণ্ডা মেরে যাবে।'

রেজাইল সামাল দিল, 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির নাম শুনেছেন, আমরা সেই সমিতিরই ছেলে। যারা আপনার মত ক্ষমতার দাবি করে, তাদের দাবি সত্যি কি মিথ্যে, পরীক্ষা করি আমরা। কী সব যুগ পড়েছে, 'ঠগ বাছতে গাঁ-উজাড়'। পরীক্ষা না করে কারো দাবি মানা কি উচিৎ ? আপনিই বলুন না ?'

কালীচরণ জুলজুল করে রেজাউলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সুর নামিয়ে বললেন, 'আসল কথা কি জান, গণ্ডি দিতে অনেক হ্যাপা। অনেক জিনিস-পত্তর যোগাড় করতে হয়। এই বয়সে তোমাদের জন্যে এতো হ্যাপা তুলতে পারব না।'

ভানু, রেজাউল অত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। ভানুর নাছোড়বান্দা আবদার, 'তাহলে মন্ত্রে পিঁড়ি সাঁটাটা অন্তত দেখান। এত নাম-ডাক আপনার, শুনেছি বোঙ্গার কৃপায় আপনি তুক্-তাক্, রোগ চালান, ঝাড়-ফুঁকে অনেক অসম্ভব সম্ভব করেন। আমাদের ওই পিঁড়ির ব্যাপারটা দেখাতেই হবে।'

কালীচরণ নরম হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, কাল সকালে এসো।'

সকালে দুজনের বদলে সমিতির আটজন হাজির হলো কালীচরণের আস্তানায়—তবে নানা দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা ভাবে। তারপর কী ঘটেছিল, শোনা যাক মদনপুর শাখার সম্পাদক চিররঞ্জন পালের কাছ থেকেই।

'আমার সঙ্গী ছিল অসীম। সাহসী, বেপরোয়া অসীম আমারই মত তরুণ এবং সমিতির পুরো সময়ের কর্মী। মুখে যতদূর সম্ভব চিন্তার ভাব ফুটিয়ে কালীচরণকে বললাম, 'বড় একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি, আপনাকে সমাধান করে দিতেই হবে।'

জগমাঝি কালীচরণ আমাদের অপেক্ষা করতে বলে উঠে গিয়ে নিয়ে এলো দশ-বারোটা সবুজ কাঁঠাল পাতা। হাঁক্ পাড়তেই একটি ছোট মেয়ে একটা তেলের শিশি দিয়ে গেল, সঙ্গে কিছু কাঠি। জগমাঝি বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছিল আর একটা করে কাঁঠাল পাতা তুলে নিয়ে তাতে দু-ফোঁটা তেল ছিটিয়ে পাতাটা ভাঁজ করে একটা

করে কাঠি গুঁজে দিচ্ছিল এ-ফোঁড়, ও-ফোঁড় করে।

আমাকে নিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের সমিতির আট জন সদস্য এখানে আছি। ভানু রেজাউলও এসেছে। সম্ভবত তথাকথিত কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে ভানু, রেজাউলকে অবাক করে দিয়ে পিঁড়ি আটকানোর চ্যালেঞ্জটা এড়াতে চায় বলেই ভানুরা আমার আগে আসা সত্ত্বেও আমার সমস্যা নিয়ে গুণতে শুরু করলো কালীচরণ।

ছটা পাত্মায় তেল দিয়ে ভাঁজ করে কাঠি গুঁজে রেখে শুরু করলো নানা অঙ্গভঙ্গি করে বেজায় রকম মন্ত্র পড়া। এক সময় একটা পাতা তুলে নিয়ে কাঠি খুলে ফেলে পাতাটার ভাঁজ খুলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেদিকে। একটু পরে বললো, 'তুমি যার জন্যে এসেছ সে মেয়ে।'

বললাম, 'না, সে তো মেয়ে নয়।'

জগমাঝি এবার আর একটা পাতা তুলে নিল। পাতা খুলে তেল পড়া দেখে বললো, 'যার জন্য এসেছো সে একটা বাচ্চা ছেলে।'

বললাম, 'না, সে তো বাচ্চা ছেলে নয়।'

জগমাঝি এবার তৃতীয় পাতা তুলে নিল, 'তার পেটে ব্যথা হয়।'

বললাম, 'ব্যথাটা পেটে তো নয়, বুকে।'

জগমাঝি ওই তৃতীয় পাতাটার দিকেই আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'বুকের ব্যথাটা ওই পেটের জন্যেই। ডাক্তার দেখাচ্ছো। ওষুধ খাওয়াচ্ছো, তাও ভাল হচ্ছে না। ওষুধে ভাল হবে না। খারাপ হাওয়া লেগেছে। ঝাড়তে হবে। রোগীকে নিয়ে এসো ঝেড়ে দেব।'

বললাম, 'রোগীর এত বয়স হয়েছে, রোগে ভুগেও কাহিল, নিয়ে আসাটাই সমস্যা।'

আবার পাতার দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে একটু পরেই আমাকে বললো, 'হ্যাঁ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বুড়ো, খুব বুড়ো। ও তোমার কে হয়?'

বললাম, 'ঠাকুরদা'।

'হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। এখন খুব কষ্ট পাচ্ছে। বুক চেপে ধরে রয়েছে। বাড়ি ফিরে ঠাকুরদাকে জিজ্ঞেস করো, ঠিক এই সময় বুকে ব্যথা উঠেছিল কি না, তাইতেই আমার ক্ষমতা বুঝতে পারবে।' ভানু ও রেজাউলের দিকে চেয়ে বললো, 'তোমরাও যাও না কেনে ওর সঙ্গে। গেলেই বুঝতে পারবে আমি জগমাঝি ঠগ্ কি গুণীন।'

জগমাঝি কি ঠগ্? সে উত্তর আমাদের পাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরদা মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর। কিন্তু সে প্রসঙ্গ ওখানে তুললাম না, জগমাঝির মিথ্যাচারিতা ধরতে আমি যে অভিনয়ের আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেটা উপস্থিত অন্ধ-বিশ্বাসী ভক্তরা কিভাবে নেবে—এই ভেবে। ওর মিথ্যাচারিতার মুখোশ অন্য ভাবে খোলাটাই এক্ষেত্রে শ্রেয়। আর সেই শ্রেয় পথটিই অবলম্বন করলো ভানু। ভানু বললো, 'আজ কিন্তু আমাদের দুজনকে আসতে বলেছিলেন। আপনি আমাদের দুজনের যে কোনও এক জনকে পিঁড়িতে বসিয়ে মন্ত্র পড়ে পিঁড়ি পেছনে আটকে দেবেন বলেছিলেন। এখন দিন। আপনি পারলে গুণে গুণে পাঁচশো টাকা দিয়ে যাব।'

হাসলো জগমাঝি, 'কেউ টাকার লোভ দেখালেই কি ক্ষমতা দেখাতে হবে? আমি বা আমার বোঙ্গা কি তোমাদের জন-খাটার মানুষ যে, তোমরা বললেই দেখাবো?'

অক্ষমতা এড়াবার কু-যুক্তিটা ভালই রপ্ত করেছে জগমাঝি ওরফে ঠগমাঝি।

প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে জগমাঝি উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললো, 'পরীক্ষা নেওয়ারও নিয়ম-কানুন থাকে। এই যে ছেলেটির ঠাকুরদার বুকে ব্যথার কথা গুণে বলে দিলাম, সত্যিই কি মিথ্যে খোঁজ নিয়ে এসে না ক্যানে। হারানো জিনিসের খোঁজ চাইতে, গুণে বলে দিতাম।'

কথাটা শেষ করতেই ভানু বললো, 'আমার একটা কলম হারিয়েছে, দামী কলম, মনে হয় চুরি করেছে আমারই কোনও বন্ধু। গুণে বের করে দিলে প্রণামী দেব।'

আবার কাঁঠাল পাতা এলো, তেল ছিটিয়ে আগের মতই মন্ত্র পড়ে পাতা খুলে তেল পড়া দেখে জগমাঝি বললো, 'হুঁ চিনের কলম।'

ভানু বললো, 'না, জাপানের।'

'ওই হলো। আচ্ছা, তুমি কি পেনটা নিয়ে বাজারে বা দোকানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, তা গিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ছে দোকানে কলমটা দিয়ে লিখেছি, পকেটে পুরেছি কি না, মনে পড়ছে না।'

জগমাঝি আর একটা পাতার তেলপড়া দেখে বললো, 'ওই দোকানের মালিকের কাছেই আছে।'

'পেনটা ফেরৎ যাতে পাই, তার ব্যবস্থা করে দিন।'

'কলমটা কার আছে, বলে দিয়েছি। দোকানদারকে চাপ দিলে ফেরৎ পেতে পার। কিন্তু সে যদি ফেরৎ না দেয়, অস্বীকার করে, তা আমি কী করবো? প্রণামী তিনটে টাকা আর তেল পড়ার জন্য যা খুশি দিয়ে যাও।' এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমিও প্রণামী তিনটে টাকা আর তেল পড়ার জন্য যা খুশি নামিয়ে রাখ।'

বললাম, 'ঠিক উত্তর দিলে নিশ্চয়ই প্রণামী দিতাম। কিন্তু প্রথম থেকেই তো দেখছি, আপনি সব উল্টোপাল্টা বলে যাচ্ছেন। না আমারটা বলতে পেরেছেন, না বলতে পেরেছেন ওঁর কলমের ব্যাপারে কিছু।'

জগমাঝি কালীচরণ বোধহয় নিজের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের উপস্থিতির মধ্যে কোনও পরিকল্পনার সম্ভাবনা অনুমান করে হঠাৎ কেমন চুপ মেরে গেল। তার চোখ দুটোতে একবারের জন্যেও জ্বলে উঠলো না চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন, বরং চোখ দুটোয় আমানির ছলছল নেশা।

আমার ঠাকুরদার বুকে ব্যথার মতোই কলম হারানোর ব্যাপারটাও ছিল পুরোপুরি কাল্পনিক!

সাত

আদিবাসী সমাজের তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আদিবাসী সমাজের জানগুরুরা (অঞ্চলভেদে তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন) চোর ধরতে, চুরি যাওয়া জিনিসের হদিশ দিতে, অথবা চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রচলিত দেশীয় ওষুধ ঠিক মত নির্ণয় করতে না পারলে অর্থলোভে, জীবিকার স্বার্থে অথবা নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কোনও মানুষকেই ডাইন বা ডাইনি ঘোষণা করে এ সবের জন্য দায়ী করে। এ শুধু লোক ঠকানোর ব্যাপার নয়, শুধুই প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার মাধ্যমে এরা অজ্ঞ গ্রামবাসীদের আর্থিকভাবে শোষণই করে না, এরা ঠাণ্ডা মাথায় খুনে। এরা শুধু যে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতেই কাউকে ডাইন ঘোষণা করে, তা নয়। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে স্বার্থান্বেষীর হয়ে ঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে, কাউকে ডাইনি ঘোষণা করে।

মানুষের দুর্বলতা ও অজ্ঞতাই জানগুরুদের শোষণের হাতিয়ার। মন্ত্রশক্তিকে নয়, বিজ্ঞানের কৌশলকে কাজে লাগিয়েই ওরা মানুষ ঠকিয়ে চলেছে। কী সেই কৌশল ? আসুন, সেগুলো নিয়েই এখন আমরা একটু নাড়াচড়া করি।

চোর ধরে আটার গুলি

বাড়িতে চুরি হলে ওঝার কাছে বাড়ির লোক হাজির হন। ওঝা পয়সা ও পাঁচপো আটা আনতে বলে। গৃহস্বামীর কাছ থেকে জেনে নেয় কাকে কাকে তিনি সন্দেহ করছেন। আটাতে মন্ত্র পড়া হয়। মন্ত্র পড়া আটা থেকে কিছুটা নিয়ে প্রয়োজনমাফিক জল ঢেলে শক্ত করে মাখা হয়। এবার আসে একটি জলভর্তি বাটি। ওঝা মাখা আটা থেকে একটু করে আটা ছিঁড়ে নিয়ে একটি করে গুলি পাকায়, একজন করে সন্দেহভাজন মানুষের নাম বলে বাটির জলে ফেলতে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে আটার গুলি জলে ডুবে যাওয়ার কথা। যেতেও থাকে তাই। কিন্তু দর্শকরা হঠাৎ দেখতে পান একটা গুলি জলে ডুবে গিয়ে আস্তে আস্তে আবার ভেসে উঠছে। এমনটা তো ঘটার কথা নয় ? কার নামে আটা ফেলা হয়েছিল ? যার নামে আটা ফেলা হয়েছিল গ্রামবাসীরা তাঁকেই ধরেন। অনেক ক্ষেত্রে ধৃত ব্যক্তি চোরাই জিনিস বের

করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে জানান জিনিসটা বিক্রি করে দিয়েছেন অথবা জিনিসটা যেখানে রেখেছিলেন, সেখানে এখন পাচ্ছেন না। কেউ বোধহয় চোরের উপর বাটপাড়ি করেছে।

এখন দেখা যাক কীভাবে আটার গুলি জলে ভাসে। কীভাবেই বা সত্যিই চোর ধরা পরে ?

আটার গুলি বানাবার সময় আটার ভিতরে মুড়ি, খই, শোলার টুকরো বা থার্মোকলের টুকরো ঢুকিয়ে দিলে এবং মুড়ি খইয়ের উপর অতি সামান্য আটার আস্তরণ থাকলে, আটার তৈরি গুলিটা সম-আয়তনের জলের চেয়ে হালকা হলে, গুলি জলে ফেলার পর ভেসে উঠবে। মুড়ি বা খইয়ের চেয়ে শোলা বা থার্মোকল অনেক বেশি হালকা তাই শোলা বা থার্মোকলের টুকরো আটার গুলিতে ঢোকালে সেই আটার গুলি আরও কম আয়েশে ভাসান যাবে।

চোর কী করে ধরা পড়ে ? এটা আগেই মনে রাখা প্রয়োজন চুরি করার কথা স্বীকার করার অর্থ কিন্তু এই নয়, বাস্তবিকই সে চোর।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। যতদূর মনে আছে ঘটনাটা এই ধরনের: একটি মহিলার বিকৃত মৃতদেহ পুলিশের হাতে আসে। পুলিশ দপ্তর থেকে ছবিটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি পরিবারের একাধিক ব্যক্তি ছবি দেখে এবং অন্যান্য পোশাক-আশাক ও চেহারার বিবরণ দেখে জানান এটি তাঁদের পরিবারের মেয়ে। মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি স্বামী-রত্নটি বউয়ের খোঁজে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন। বউ নাকি ঝগড়া করে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ । শ্বশুরবাড়িতে এসেছে কি না, তারই খোঁজ করতেই স্বামী বাবাজীর এখানে আসা।

স্বামীটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোর্টে কেস ওঠে। স্বামী শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন, তিনিই স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন। কেসের বিবরণ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবার ঘটে যায় আর এক নাটক। যাঁর হত্যা নিয়ে এই বিচার, তিনি স্বয়ং আদালতে হাজির হয়ে জানান, তিনি জীবিত, বাস্তবিকই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর ছেড়েছিলেন। এতদিন ছিলেন এক বান্ধবীর বাড়িতে। পত্রিকায় তাঁর হত্যার কথা স্বামী স্বীকার করেছেন খবরটি পরে হাজির হয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া একটা অদ্ভুত ঘটনায় মিটে গেল।

স্বামীটি হত্যা না করেও কেন হত্যার অপরাধ স্বীকার করে কঠিন শাস্তিকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন ? সম্ভবত শারীরিক বা মানসিক অথবা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মুখে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এর চেয়ে যে কোনও শাস্তিই অনেক লঘু।

ডাইনি প্রথার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বহু ঘোষিত ডাইনি গ্রামবাসীদের অত্যাচারে ভেঙে পড়েন এবং স্বীকার করেন, তিনিই ডাইনি। ঘোষিত চোর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একান্ত বাঁচার তাগিদে অপরাধ না করেও বলেন, আমিই অপরাধী।

আটার গুলি ভাসার ক্ষেত্রে যে সব সন্দেহজনক ব্যক্তির নাম গৃহস্বামী দেন, তাদের মধ্যে কেউ চুরি করতেই পারে। তার নামের গুলি ওঝা জলে ভাসালে গণপ্রহারে চোর চুরি যাওয়া জিনিস বের করে দেয়। কিন্তু যদি ভালমানুষের নামের গুলি ভাসে তখন

গণপ্রহার থেকে বাঁচতে ভাল মানুষটিও অপরাধ স্বীকার করে জরিমানা দেওয়াকেই শ্রেয় বলে মনে করেন।

হাতে ফুটে ওঠে চোরের নাম

শুধু আদিবাসী সমাজেই নয় বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে অদ্ভুত পদ্ধতিতে চোর ধরা হয়। ওঝা মন্ত্র শক্তিতে চোরের নাম বলে দিতে পারেন, এই বিশ্বাস নিয়ে যখন কেউ নিজের চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করতে ওঝার দ্বারস্থ হন, তখন ওঝা জেনে নেন সন্দেহজনকদের নাম। অনেক ক্ষেত্রেই নাম জানার পর ওঝার এজেন্টরা এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আরও কিছু তথ্য সরবরাহ করে ওঝাকে।

দক্ষিণার বিনিময়ে ওঝা চোর ধরতে নানা ধরনের অং-বং-চং মন্ত্র আওড়ায়। তারপর একটা কাগজে লিখে ফেলে সম্ভাব্য চোরেদের নাম। সেই কাগজ পুরিয়ে তৈরি করা হয় ছাই। সেই ছাই ওঝা নিজের হাতে বা সহকারী কারো হাতে ঘষে ছাই ঝেড়ে ফেলতেই উপস্থিত দর্শকরা দেখতে পান ছাই ঘসা হাতে কালো হরফে ফুটে উঠেছে একটা নাম। যার নাম উঠেছে সে সন্দেভাজন একজন। তার ওপর চাপ পড়লে কখনো-সখনো চাপে পরে স্বীকার করে চুরির কথা। কখন চুরির মাল ফেরৎ পাওয়া যায়। কখনও বা জরিমানা দিয়ে উদ্ধার পেতে হয়। ঘোষিত চোর কেন অপরাধ স্বীকার করে ? সে প্রসঙ্গে গেলে, বার বার একই কথা শোনাতে হবে বলে নীরব রইলাম। বরং আসি, কী করে ওঝা ছাই ঘষে হাতে নাম ফুটিয়ে তোলে।

ঘন সাবান জল অথবা বটের আঠা অথবা ঐ জাতীয় কিছুকে কালির মত ব্যবহার করে কাঠিজাতীয় কিছু দিয়ে হাতে চোর হিসেবে যার নাম ঘোষণা করা হবে, তার নামটি লিখে রাখা হয়। অর্থাৎ হাতে লেখা হল আঠা-জাতীয় জিনিস দিয়ে। ছাই ঘষতেই লেখার আঠা ছাইগুলোকে ধরে নেয়। মুখের ফুঁয়ে বা হাতের ঝাপটায় উড়ে যায় বাকি ছাই। তাই পরবর্তী পর্যায়ে দর্শকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ছাইয়ে লেখা নামটি।

চোরের কলা কাটা পড়ে মন্ত্রে

ওঝা সন্দেহভাজনদের হাতে ধরিয়ে দেয় একটা করে খোসা সহ গোটা পাকা কলা, চলতে থাকে মন্ত্র-তন্ত্র। মন্ত্রের পাঠ চুকতে একজন করে সন্দেহভাজন মানুষ এগিয়ে আসেন। কলার খোসা ছাড়ায় সকলের সামনে। খোসা ছাড়াবার পর ওঝা পরীক্ষা করে দেখেন কলাটার ভিতরটা দু'টুকরো করে কাটা কিনা। গোটা থাকলে কলা ধরেছিল যে খায়ও সে। এরই মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে ঘটে যায় বিস্ময়কর কিছু। খোসা ছাড়াতেই দেখা যায় কলাটা পরিষ্কার দু'টুকরো করে কাটা। অবাক কাণ্ড!
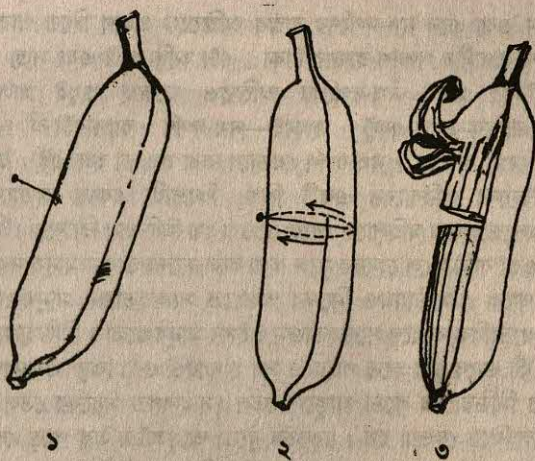
তখনও খোসা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, খোসা গোটাই রয়েছে।

প্রতিটি আপত-অলৌকিক ঘটনার মতই চোরের কলা কাটা পড়ে মন্ত্রে নয়, কৌশলে। কৌশলটাও অতি সহজ সরল, একটা গোটা কলা নিল। একটা পরিষ্কার ছুঁচ। এবার ছুঁচটা কলার যে কোনো এক জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে কলার শাঁসের চার-পাশটা ঘোরান। পুরোটা ঘোরান হলে ছুঁচটা বের করে নিন। কলার খোসার গায়ে ছুঁচের সূক্ষ্ম ছিদ্র ছাড়া আর কিছু নজরে পড়বে না। অথচ ভিতরের কলাটা কাটা পড়েছে ছুঁচটা পুরোটা ঘুরে আসার ফলে। খোসা ছাড়াতেই কাটা কলা দৃশ্যমান হবে।

নখদর্পণ

যাঁর বাড়িতে চুরি হয়, সাধারণত তাঁদের পরিবারের কোনও শিশু, কিশোর বা মহিলাকে দেখান হয় নখ-দর্পণ বা নখের আয়না। সেই দর্পণে ফুটে ওঠে চোরের ছবি। এমনকি অনেক সময় নাকি, কেমন ভাবে চুরি হয়েছিল, কী ভাবে চোর এলো, কী ভাবে চোর পালাল, সমস্ত ব্যাপারটাই চলচ্চিত্রের মতই একের পর এক নখের উপর ফুটে ওঠে। পুরো ঘটনাটাই ঘটানো হয় অপ্রাকৃতিক উপায়ে, গুণীন বা ওঝার 'অলৌকিক' ক্ষমতায়।

বহু ওঝার নখ-দর্পণ ক্ষমতার খবর পেয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খবরদাতাদের বলেছি, আমি একটা জিনিস লুকিয়ে রাখবো। নখ দর্পণে ওঝা লুকোন জিনিস বের করে দিতে পারলেই দেবো পঞ্চাশ হাজার টাকা। খবরদাতারা প্রায়শই প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন। সেই ওঝাকে পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেবেন কথা দিয়েও কেউ রাখেনি। এখনও আমি সেই একই ভাবে নখ-দর্পণ করতে পারা ওঝার খোঁজে আছি।

যে কেউ এমন ওঝা এনে নখ-দর্পণের বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারলে ওঝার হাতে তুলে দেব প্রণামীর পঞ্চাশ হাজার টাকা। এটা অতি স্পষ্ট এবং সত্য যে প্রতিটি অলৌকিক ঘটনার মতই নখ-দর্পণের অস্তিত্বও রয়েছে শুধুই গাল-গল্পে ও মিথ্যাভাষণে। এদিকে এখন একটু তাকাই—নখ-দর্পণ ব্যাপারটা কী ? সত্যিই কি তাহলে কিছুই দেখা যায় না ? নখ-দর্পণ যেভাবে করা হয় তা হল এই : যাঁদের বাড়ি চুরি হয়েছে তাঁদের পরিবারের একটি শিশু, কিশোরী একান্ত অভাবে একজন আবেগপ্রবণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলাকে বেছে নেওয়া হয় মিডিয়াম হিসেবে। মিডিয়ামকে পাশে বসিয়ে ওঝা বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলে সন্দেহভাজন মানুষদের নামগুলো জেনে নিতে থাকে। মিডিয়ামও নিজের অজ্ঞাতে সন্দেহভাজন মানুষগুলো বিষয়ে জেনে নেয়। স্বাভাবিক কারণে সন্দেহভাজন এইসব মানুষগুলোও মিডিয়ামের পরিচিত ব্যক্তিই হয়। কী ভাবে চুরি হতে পারে এ সব বিষয়েও ওঝা কিছু কথাবার্তা চালিয়ে যায়। তারপর মিডিয়ামের বুড়ো আঙুলে তেল (সাধারণত সরষের তেল) সিঁদুর বা তেল-কাজল লাগিয়ে দেওয়া হয়। চক্চকে বুড়ো আঙুলটায় মন্ত্র পড়ে দেওয়া হয়। ওঝা বলতে থাকে, 'বুড়ো আঙুলে এবার চোরের ছবি ভেসে উঠবে, চোরের ছবি ভেসে উঠবে। একমনে দেখতে থাক, দেখতে পাবে চোরের ছবি। 'সম্মোহনের মত করেই

নখদর্পণ করা হচ্ছে

মিডিয়ামের মস্তিষ্ককোষে ধারণা সঞ্চার করা হতে থাকে যে চোরের ছবি ভেসে উঠবে। সম্মোহিত করে ধারণা সঞ্চারের মাধ্যমে যে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটান যায় বা দেখান যায় এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর প্রথম খণ্ডে। তাই আবার এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না।

একসময় সম্মোহনী ধারণা সঞ্চারের ফলে মিডিয়াম বিশ্বাস করতে শুরু করে বাস্তবিকই চোরের ছবি ফুটে উঠবে তার নখে। আবেগপ্রবণতা, বিশ্বাস ও সংস্কারের ফলে এক সময় মিডিয়াম সঞ্চারিত ধারণার ফলে দেখার আকুতিতে অলীক কিছু দেখতে থাকে। এটা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় Visual hallucination। মিডিয়াম মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সন্দেহভাজন কোন একজনের অস্পষ্ট একটা ছবি নিজের নখে দেখতে পাচ্ছে বলে বিশ্বাস করতে থাকে। কখনও বা অস্পষ্ট ছবি স্পষ্টতরও হয় মস্তিষ্ককোষে ধারণা সঞ্চারের গভীরতার জন্য। কখনও হাতের নখে মিডিয়ামে দেখতে পায় চোরের আসা, চুরি করা এবং পালান পর্যন্ত।

কখন কখন নখ-দর্পণের ক্ষেত্রে Visual illusion- হ্যাঁ, ভ্রান্ত দর্শনের ঘটনাও ঘটে। তেল-সিঁদুর নখে মাখিয়ে দেওয়ায় নখটি চকচকে হয়ে ওঠে। অনেক সময় আশেপাশের মানুষজন, গাছপালা ইত্যাদির ছবি অস্পষ্টভাবে চকচকে নখে প্রতিফলিত

হয়। অস্পষ্টতার দরুন দড়িকে সাপ ভাবার মতই প্রতিফলিত অস্পষ্ট ছবিকেই চোরের ছবি বা চুরির ঘটনার ছবি বলে মিডিয়াম বিশ্বাস করে নেয়।

যেহেতু সন্দেহভাজন একজনের কথাই মিডিয়াম বলে, তাই তার ঘোষিত মানুষটি চোর হতেও পারে। চোর না হলেও চুরি করেছে, এমন স্বীকারোক্তিও প্রহার থেকে বাঁচতে যে দিতেই পারেন, সে বিষয়ে আগেই যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

বাটি চালান

চুরি যাওয়া জিনিসের হদিশ পেতে বা চোর ধরতে বাটি চালানের ব্যাপক প্রচলন এখনও আছে। নখ-দর্পণের সঙ্গে বাটি চালানের কিছুটা মিল রয়েছে। বাটি চালানের মিডিয়াম ঠিক করা হয় সাধারণত যার বাড়ি চুরি হয়েছে, তাঁদেরই পরিবারের কোনও

কিশোর-কিশোরীকে। এখানেও ওঝা বা গুণীন মিডিয়ামকে পাশে বসিয়ে চুরির খুঁটিনাটি ঘটনা শুনতে থাকে গৃহস্বামীর কাছ থেকে। শুনে নেয় কাদেরকে চোর বলে সন্দেহ করছেন গৃহস্বামী। গৃহস্বামীর সন্দেহ মিডিয়ামকে প্রভাবিত করে। তারপর একসময় বাটি চালানের বাটি আসে। মিডিয়ামকে বাটির উপর দু'হাতের ভর দিয়ে উবু করে বসান হয়। গুণীন ঘন ঘন মন্ত্র আওড়ায়, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে থাকে, বাটিটা এবার মিডিয়ামের হাত দুটোকে টানবে। বাটিটা যে মিডিয়ামের হাত টানবেই, এই কথাটাই বার বার গভীরভাবে টেনে টেনে বলে যেতে থাকে ওঝা। আমাদের হাত নড়ে, মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষের নিয়ন্ত্রণে ঐচ্ছিক মাংসপেশীগুলোর সংকোচন-প্রসারণের ফলে। ওঝার কথা এক মনে শোনার ফলে আবেগপ্রবণ মস্তিষ্কে ধারণা সঞ্চারিত হতে থাকে, বাটিটা তার হাত টানছে, বাটিটা একটু একটু করে গতি পাচ্ছে। বাটিটা চোরের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। অনেক সময় সন্দেহভাজন মানুষদের বাটি চালানের সময় হাজির রাখা হয়। সে ক্ষেত্রে মিডিয়াম ভাবতে থাকে, বাটি চোরের দিকে যাচ্ছে। একই সঙ্গে বাটির ওপর হাতের ভর রেখে উবু হয়ে বসার ফলে ধারণা সঞ্চারের ফল দ্রুততর হয়।

বাটি-চালানোর একটি দৃশ্য

এমনিতেই বাটির ওপর শরীরের ভর আড়াআড়ি ভাবে থাকায় বাটির সরে যাবার বা এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও 'বাটি চোর ধরতে এগোবে' এই বিশ্বাস যখন তীব্রতর হয় তখন অবচেতন মন থেকেই মিডিয়ামে বাটিটিকে ঠেলতে শুরু করে। অর্থাৎ মিডিয়াম নিজের অজান্তেই বাটিকে চালনা করে। মিডিয়ামের মনের ভিতর চোর সম্বন্ধে একটা ধারণা সঞ্চারিত বাটিটিকে ঠেলতে শুরু করে। মিডিয়াম নিজের অজান্তেই বাটিকে চালনা করে। মিডিয়ামের মনের ভিতর চোর সম্বন্ধে একটা ধারণা সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে। মিডিয়ামের সেই সঞ্চিত ধারণার প্রভাবে অবচেতন মন বাটিটিকে কোনও একজন সন্দেহভাজন মানুষের দিকে অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

কঞ্চি চালান

চোর ধরার ব্যাপারে 'কঞ্চি-চালান' ওঝা, জানগুরুদের একটি জনপ্রিয় তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন। 'নখ-দর্পণ' এবং 'বাটি চালান'-এর মতই কঞ্চিও চালান হয় মিডিয়ামের সাহায্যে। একই ভাবে মিডিয়াম হয় চুরি যাওয়া বাড়ির স্বল্পবয়স্ক কেউ

কঞ্চি চালন হচ্ছে হারানো জিনিস পেতে

অথবা আবেগপ্রবণ সংস্কারাচ্ছন্ন মহিলা। চোর সম্বন্ধে মিডিয়ামের চিন্তায় কিছু নাম ঘোরাঘুরি করে, যে নামগুলো বাড়ির মানুষদের কাছ থেকে সন্দেহজনক বলে ইতিপূর্বেই শুনেছে।

মিডিয়াম কঞ্চি ধরে থাকে। কোনও ক্ষেত্রে কঞ্চির এক প্রান্ত ধরা থাকে মিডিয়ামের হাতে, অন্যপ্রান্ত মাটি স্পর্শ করে থাকে। এ ছাড়াও আরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও কঞ্চি ধরার প্রথা আছে।

ওঝার মন্ত্রে বাটির মতই কঞ্চি গতি পায়। কঞ্চি অনেক সময়ই চোর বা চোরের বাড়ি চিনিয়ে দেয়। গণ-প্রহার, চুরি স্বীকার করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা করলে অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে ভেবে নিয়ে কলম সংযত করলাম।

কুলো চালান

শুধু আদিবাসী সমাজেই নয়, গ্রামে-গঞ্জে, আধা শহরে এমনকি খোদ কলকাতাতেও 'কুলো-চালান' দিব্বি 'চলছে-চলবে' করে ঠিকই টিকে রয়েছে। কুলো-চালানে বিশ্বাসী সংখ্যাও কম নয়। আসলে একবার কুলো-চালানে নিজে অংশ নিলে অবিশ্বাস করা বেজায় কঠিন। কেন কঠিন, সে আলোচনায় যাওয়ার আগে কুলো-চালানে কী হয়, তাই নিয়ে একুট আলোচনা করে নিলে বোধহয় মন্দ হবে না।

যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'-তে দেওয়া সম্ভব তার সবই নাকি কুলো-চালানে জেনে নেওয়া সম্ভব। যেমন ধরুন—'আমি পরীক্ষায় পাশ করব কি না?' 'আমার প্রমোশনটা এবারে হবে কি না?' ' এ বছরের মধ্যে আমার চাকরি হবে কি না?' 'সুদেষ্ণার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কি না?' 'এ বছর মেয়ের বিয়ে দিতে পারব কি না?' 'আমার ঘড়িটা গঙ্গাধর চুরি করেছে কি না?' 'চাঁদু হাসদা আমার গরুটাকে বান মেরেছে কি না?' এমনি হাজারো প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে। তবে প্রশ্ন পিছু নগদ দক্ষিণা চাই। দক্ষিণা নেবেন ওঝা, গুণীন বা তান্ত্রিক, যিনি মন্ত্র পড়ে কুলোকে চালাবেন। কুলো ঘুরবে, বিনা হাওয়াতেই ঘুরবে।

কুলো চালানে'র কুলোর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। না, একটু ভুল বললাম। কুলোতে বৈশিষ্ট্য নেই। তবে এই কুলোর উঁচু কানায় গেঁথে দেওয়া হয় ধারাল ছুঁচলো লম্বা কাঁচি। যে কাঁচি দিয়ে নাপিতেরা চুল ছাঁটে, সেই ধরনের কাঁচিই কুলো-চালানে ব্যবহৃত হয়। কাঁচির হাতল বা আঙুল ঢোকাবার দিকটা থাকে কুলোর ওপরে। তলার ছবিটা দেখলে একটা আন্দাজ পাবেন।

কুলোতো তৈরি হলো। ওঝা মন্ত্রও পড়ল। কিন্তু তারপর? তারপর নয়, মন্ত্র পড়ার সময়ই প্রশ্নকর্তা কাঁচির একদিকের হ্যান্ডেলের তলায় একটা আঙুল রাখেন। সাধারণত তর্জনী স্থাপন করতে বলা হয়। অন্য হ্যান্ডেলের তলায় তর্জনী রাখেন প্রশ্নকর্তার পরিচিত কেউ অথবা গুণীন স্বয়ং। আবার একটা ছবি দিলে কেমন হয়?

গুণীন এবার প্রশ্নকর্তাকে বলেন, আপনি মনে মনে আপনার প্রশ্নটা ভাবতে থাকুন।

গভীরভাবে ভাবতে থাকুন। আপনার প্রশ্নের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, দেখবেন কুলোটা আপনা থেকে ঘুরে যাবে আর, উত্তর যদি 'না' হয়, কুলোটা ঘুরবে না। একই রকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রশ্নকর্তা ভাবতে থাকেন। এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় কুলোটি কখনো ঘুরে যাচ্ছে। কখনোও বা রয়েছে নিশ্চল।

কুলোর এই ঘুরে যাওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে প্রশ্নকর্তার অবচেতন মন।

ওঝার কথায় প্রশ্নকর্তা বিশ্বাস করলে একসময় ভাবতে শুরু করেন, বাস্তবিকই মন্ত্রপূত কুলোটা সমস্ত প্রশ্নের 'হ্যাঁ' বা 'না'-জাতীয় উত্তর দিতে সক্ষম। উত্তরটা 'হ্যাঁ' হওয়ার প্রতি প্রশ্নকর্তার আগ্রহ বেশি থাকলে তার অবচেতন মন নিজের অজান্তেই আঙুল নেড়ে কাঁচি ঘুড়িয়ে কুলোকে ঘুরিয়ে দেয়। প্রশ্নকর্তার অবচেতন মন 'না' উত্তরে আগ্রহী হলে কাঁচির তলাকার আঙুল স্থির থাকে। অতএব স্থির থাকে কুলো। অবচেতন মনের এই জাতীয় কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকলে প্রশ্নকর্তা অবশ্যই বিশ্বাস করে নিতে বাধ্য হন, তাঁর প্রশ্নের উত্তরেই মন্ত্রপূত কুলো ঘুরছে অথব স্থির থাকছে।

জানগুরু কাঁচি ধরলেও সাধারণত সে তার আঙুল স্থির রেখে দেয়। কারণ সে এই

কলকাতার বুকে কুলোচালান
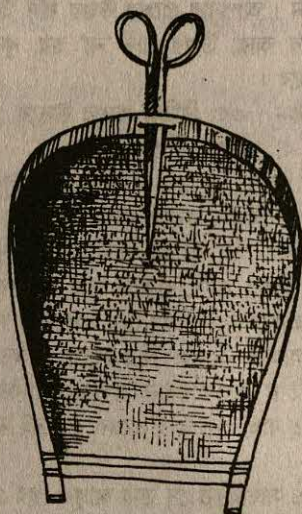
কুলো চালানের কুলো

মনস্তত্ত্বটুকু জানে, তার আঙুল নেড়ে কুলো চালাবার কোনও প্রয়োজনই নেই। কুলো চালাবে প্রশ্নকর্তার অবচেতন মন।

অবচেতন মন দিয়ে আংটি চালানোর বিষয়ে ভূতে ভর নিয়ে আলোচনায় যেহেতু যথেষ্ট সময় নিয়েছি, তাই আর আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম না। শুধু এটুকু বলি—আপনি নিজে কুলো-চালানের কুলো নিয়ে বসুন। সঙ্গী করুন কাউকে। তাকে বলুন, কোনও প্রশ্ন গভীরভাবে চিন্তা করতে। তবে প্রশ্নটা যেন এমন হয় যাতে তার উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'-তেই পাওয়া যায়। একমনে চিন্তা করতে শুরু করলেই প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কুলো ঘুরবে, 'না' হলে কুলো স্থির থাকবে।

একটু অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন মজা। দেখবেন, আপনার সঙ্গীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে কুলো কখনও ঘুরছে, কখনও বা স্থির থাকছে।

এমন পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারবেন জানগুরু বা তান্ত্রিকদের কুলো-পড়া মন্ত্রের বুজরুকি।

থালা পড়া

থালা-পড়া দিয়ে সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ান রোগীকে ভাল করার মত ওঝা ও গুণীন এখন এদেশে অনেক আছে—এ ধরনের বিশ্বাস অনেক মানুষের মধ্যেই বর্তমান। আবারও বলি, শুধুমাত্র আদিবাসীদের মধ্যেই এই বিশ্বাস সংক্রামিত হয়নি,

ছড়িয়ে পড়েছে বহু শহরবাসী বা শহুরে চাকুরীয়াদের মধ্যেও।

রোগী রোদ্দুরে পিঠ খুলে বসে থাকে। গুণীন পিতল বা কাঁসার থালায় মন্ত্র পড়ে পিঠে থাবড়ে বসিয়ে দিতেই অবাক কাণ্ড! থালাটা রোগীর পিঠের উপর সেঁটে বসে যায়। যেন চুম্বকের টানে আটকে আছে লোহা। গুণীন যতক্ষণ মন্ত্র পড়ে অর্থাৎ যতক্ষণ সাপের বা কুকুরের বিষ শরীর থেকে না নামে, ততক্ষণ থালা আটকে থাকে পিঠে। বিষ নামলেই পিঠের থালাও সুরসুর করে নেমে আসে।

বহু প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে জানিয়েছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাকি রোগী থালা-পড়াতে বিষ-মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু মূল প্রশ্নটা এই, কী করে প্রত্যক্ষদর্শী সিদ্ধান্তে এলেন রোগী বিষ-যুক্ত ছিলেন? কুকুরে কামড়ালেই জলাতঙ্ক হয় না। জলাতঙ্ক হয় এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ থেকে। যে কুকুরটি কামড়েছে সে যদি আগে থেকেই জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত থাকে শুধুমাত্র তবেই তার কামড়ে সৃষ্ট ক্ষত ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

কুকুর জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হলে সাধারণত ছয় দিনের বেশি বাঁচে না। জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার চারদিন আগেই কুকুরের লালায় রোগের ভাইরাস থাকতে পারে। তাই চিকিৎসকরা সাধারণভাবে বলেন, যে কুকুর কামড়েছে সেটাকে দশ দিন পর্যন্ত লক্ষ্য করবেন। দশ দিনের পরও কুকুরটি বেঁচে থাকলে Anti Rabies Vaccine বা ARV নেওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না। কোনও কারণে কুকুরটিকে নজরে রাখা সম্ভব না হলে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ARV ইনজেকশন নেওয়া উচিত। বর্তমানে অবশ্য কার্যকর আরো কিছু Vaccine বেরিয়েছে। যেমন inactivated Rabies Vaccine তার মধ্যে একটি।

বিড়াল, শেয়ালের বা নেকড়ের কামড়েও জলাতঙ্ক হতে পারে, যদি যে কামড়েছে সে জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

সাপে কাটার ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে বলতে হয়, সাপে কামড়ালেই বিষাক্ত সাপ কামড়েছে ভাবার কোনও কারণ নেই। আমাদের দেশে নির্বিষ সাপই সংখ্যাগুরু (শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ)। আবার সংখ্যালঘু বিষাক্ত সাপ কামড়ালেই যে সে কামড় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনটা ভাবারও কোন কারণ নেই। দেখতে হবে সেই কামড়ে একজনের মৃত্যু ঘটানোর মত পরিমাণে বিষ ঢালতে পেরেছে কি না। অনেক সময় এমনটাও হয়ে থাকে, ছোবল মারছে দেখে দ্রুততার সঙ্গে শরীর সরিয়ে নেওয়ায় জন্য বা অন্য কোনো কারণে বিষাক্ত সাপ অতি সামান্য বিষ ঢালতে সক্ষম হয়। এইসব ক্ষেত্রেও রোগীর বিষ থেকে মৃত্যু-সম্ভাবনা থাকে না।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, কুকুর বা সাপ কামড়ালেই 'কুকুরের বিষ' বা 'সাপের বিষ' মুক্ত করার প্রয়োজন হয় না, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বিষমুক্তই থাকে। কিন্তু বাস্তবিকই যদি জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুর, বিড়াল বা শিয়াল কামড়ায় তবে ARV ইনজেকশন নেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কম বেদনাদায়ক টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, ইনজেকশন বা ওষুধও হয়তো আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু কোন ক্রমেই থালা পড়ায় জলাতঙ্কের বিষ টেনে নিয়ে রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

কুকুরে কামড়াবার পর পিঠে থালা বসান হয়েছে।

একই কথা সাপের বিষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিষাক্ত সাপ উপযুক্ত পরিমাণে শরীরে বিষ ঢাললে এ্যান্টিভেনম সিরাম নিতে হবে অথবা অন্য কোনও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে মন্ত্রঃপূত থালা কোনও ভাবেই বিষ মুক্ত করে রোগীকে বাঁচাতে পারবে না।

কোনও ভাবেই বিষ মুক্ত করে রোগীকে বাঁচাতে পারবে না।

তবে থালা আটকায় কীভাবে ? সে প্রসঙ্গেই আসি। ওঝা যে থালা ব্যবহার করে, সেটা অবশ্যই যার পিঠে বসান হবে তার পিঠের চেয়ে ছোট মাপের। পিতল বা কাঁসার থালাটির মাঝখানটা চারপাশের চেয়ে কিছুটা উঁচু। রোদে বসিয়ে রাখা তথাকথিত রোগীটির পিঠ স্বাভাবিকভাবেই ঘামে ভিজে ওঠে। থালাটির পিছন দিকটি এবার সজোরে রোগীটির পিঠের উপর এমন ভাবে বসান হয় যাতে থালাটির চারপাশ ও পিঠের মধ্যে সামান্যতম ফাঁক না থাকে। পিঠের ঘাম ফাঁক হওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ করে। জোরে প্রায় ছুঁড়ে থালাটি পিঠে বসানোয় এবং থালাটির মাঝখানটা সামান্য উঁচু হওয়ায় থালা ও পিঠের মাঝখানে বায়ু থাকে না বা কম থাকে। ফলে বাইরের বাতাসের চাপে থালা পিঠ আঁকড়ে থাকে।

সময় যতই পার হতে থাকে একটু একটু করে বাতাসও ঘামের সূক্ষ্ম ফাঁক-ফোকর দিয়েও ঢুকতে থাকে। ফলে এক সময় থালা পিঠ থেকে খসে পড়ে।

আপনারাও হাতে-কলমে পরীক্ষা করেই দেখুন না। কোনও সাপে কাটা বা পাগলা কুকুরে কামড়ানো রোগী লাগবে না। লাগবে না কোনও মন্ত্র-তন্ত্রর। একই পদ্ধতিতে

থালা আটকাবার কৌশল

ঘামে ভেজা থালা চেপে ধরলেই কিছুক্ষণের জন্য আটকে থাকবে।

থালা পড়ায় যে সব মানুষ সাপের বিষ বা জলাতঙ্ক থেকে মুক্ত হচ্ছেন, থালা পড়া না দিলেও এবং কোনও ওষুধ গ্রহণ না করলেও তারা সাপের বিষ ও জলাতঙ্ক থেকে মুক্ত হতেন। কারণ তাঁদের শরীরে সাপের বিষ বা জলাতঙ্কের ভাইরাসই ছিল না। কামড়ে ছিল নির্বিষ-সাপ আর ভাইরাস-মুক্ত কুকুর।

'বিষ-পাথর' ও 'হাতচালায়' বিষ নামান

বিষ-পাথরে সাপের বিষ তোলা যায়, এই ধরনের বিশ্বাস বহু মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। আদিবাসী ওঝা, গুণীনের পাশাপাশি অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিষ-পাথরের প্রচলন রয়েছে।

বিষ-পাথর ব্যবহার করা হয় এইভাবে। সাপে কাটা রোগীকে আনার পর তার ক্ষতস্থানে বিষ-পাথর ধরা হয়। পাথর নাকি ক্ষতস্থান থেকে দ্রুত বিষ শুষে নিতে থাকে। পাথরটাকে বিষ মুক্ত করতে এক বাটি দুধে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হয়। দুধের রঙ সাপের বিষে নীল হতে থাকে। পাথরটা তুলে আবার ক্ষতস্থানে বসান হয়। কিছু পরে পাথরের বিষ নামাতে আবার চলে পাথরের দুধ-স্নান। এমনি চলতেই থাকে। এরই মাঝে রোগীকে গোলমরিচ খাওয়ান হয়। রোগীকে জিজ্ঞেস করা হয় ঝাল লাগছে কি না। রোগী জানান, ঝাল লাগছে না। আবারও চলতে থাকে বিষ পাথরের

বিষ তোলা। এক সময় রোগী জানান, গোলমরিচ ঝাল লাগছে। আনা হয় আর এক বাটি দুধ। এবার ক্ষতস্থানে বিষ-পাথর বসিয়ে পাথর দুধে ফেলা হয়। দর্শকরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেন দুধ আর নীল হচ্ছে না। পাথরের অদ্ভুত ক্ষমতায় প্রতিটি প্রত্যক্ষদর্শী অবাক মানেন। রোগীও বাড়ি ফেরেন সুস্থ শরীরে।

বিষ পাথর বিষ তোলে না। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তবে দুধ কেন নীল হয় ? উত্তর একটাই—ওঝা বা গুণীন দুধে ছোট্ট একটা নীলের টুকরো ফেলে দেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুধে নীল দ্রবীভূত হতে থাকে এবং দুধও গভীর থেকে গভীরতর নীল রং ধারণ করতে থাকে।

রোগী কেন তবে গোলমরিচের ঝাল অনুভব করতে পারেন না ? উত্তর এখানেও একটাই—গোলমরিচ বলে রোগীকে খাওয়ান হয় পাকা পেঁপের বীচি। ঝাল লাগবে কী করে ?

কিন্তু অসুস্থ সাপে কাটা রোগী সুস্থ হয় কী করে ? উত্তর এখানেও একটাই—কামড়ে ছিল নির্বিষ সাপ। তাই, বিষে অসুস্থ হওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না।

গোলমরিচ পরে কেন ঝাল লেগেছে বা দুধ পরে কেন নীল হয়নি, এর উত্তর নিশ্চয়ই আপনারা পেয়েই গেছেন, ঝাল লেগেছে তখনই যখন গোল মরিচই খেতে দেওয়া হয়েছে। দুধ সাদা থাকে তখনই, যখন দুধে নীল পড়েনি।

এও তো ঠিক, নির্বিষ সাপের কামড় চিনতে না পারলে মৃত্যু-ভয়ে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তেই পারে। আবার বিষ-পাথরের পুরো কর্মকাণ্ড দেখার পর বিষ-মুক্ত হয়েছেন বিশ্বাসেই মানসিক অসুস্থতা বিদায় নেয়।

এই প্রসঙ্গে জানাই, কৃষ্ণনগরে জনৈক পাদ্রী সাহেব দাবি করেন, তিনি বিষপাথরে রোগীর দেহ থেকে সাপের বিষ টেনে নিতে সক্ষম। ওই দাবিদারকে আমাদের সমিতির তরফ থেকে বার বার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। আমাদের সহযোগী সংস্থা কৃষ্ণনগরের 'বিবর্তন' পত্রিকা গোষ্ঠী আয়োজিত কৃষ্ণনগরেরই বিভিন্ন প্রকাশ্য সভায় আমরা এই চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছি। নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় '৮৮ ও ৮৯' সালে পোস্টার নিয়ে বিশাল পদযাত্রাও হয়েছে। সেখান থেকেও ঘোষিত হয়েছে আমাদের সমিতির সরাসরি চ্যালেঞ্জ।

উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরেও আর এক চিকিৎসক উত্তমকুমার বিশ্বাস একইভাবে বিষ-পাথরের সাহায্যে সাপে-কাটা রোগীদের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইনিও নাকি কৃষ্ণনগরের পাদ্রী সাহেবের মতই বেলজিয়ামের বিষ-পাথর দিয়ে সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসা করেন। দাবি করেন হাসপাতাল যে রোগীকে ভর্তি করতে সাহস করেননি, সেইসব রোগীদেরও তিনি ভাল করে দেন।

এই দুই বেলজিয়াম বিষ পাথর প্রয়োগকারী যে ভাবে বিষ-পাথর ব্যবহার করেন সেটা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। রোগীর সাপে কাটা জায়গাটর আশেপাশের কয়েকটা স্থান নতুন ব্লেড বা ধারাল অস্ত্র দিয়ে চিরে ফেলেন। চেরা জায়গার উপর বিষ-পাথর বসিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন। ব্যাণ্ডেজ খুলে আমাকে এবং 'ইন্ডিয়া টু-ডের' প্রতিনিধিকে দেখিয়েছেন, বিষ-পাথর শরীরে লেগে রয়েছে। বিষ-পাথরগুলোকে দেখে আপাতভাবে পাথর বলে মনে হয়নি। একটা স্লেটকে বহু ছোট ছোট টুকরো করলে যে

ধরনের দেখাবে, বিষ-পাথরগুলো অনেকটা সে ধরনের। পার্থক্য এই বিষ-পাথর কিছুটা আঠা আঠা তেলতেলে ও চক্‌চকে। শরীরে একটু চেপে দিয়ে দেখেছি, কিছুক্ষণের জন্য বসে যায়। পাথরের তিনটে টুকরো সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। ভূতত্ত্ববিদ সংকর্ষণ রায়কে একটি পাথর দিয়েছিলাম। তাঁর অভিমত—ন্যাচারাল পাথর নয়। কৃত্রিমভাবে তৈরি। আঠাজাতীয় কিছু রয়েছে।

৩ জুন '৯০। বিকেলে ডাক্তার বিশ্বাসের চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। সেদিন তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগী ভর্তি হয়েছিলেন ন'জন। তাদেরই একজন সাধনা মণ্ডল। থাকে, ঠাকুরনগর চিকনপাড়ায়—কিশোরী। ডাক্তারবাবু জানালেন, 'সাধনাকে পদ্ম-গোখরো কামড়ে ছিল। খুব যন্ত্রণা ফিল করেছিল।' সাধনাও জানাল, 'যখন কামড়েছিল তারপর থেকে যন্ত্রণা প্রচণ্ড বেড়েই যাচ্ছিল।'

অথচ মজা হলো, এই পদ্ম-গোখরো কামড়ালে যন্ত্রণা বাড়ত না। কারণ এই সাপে বিষ স্নায়ুগুলোকে অসাড় করে। ডাঃ বিশ্বাস এই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই কেমন পসার জমিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করে চলেছেন। কারণ '৯০ সালের জুনেই তাঁর কাছে চিকিৎসিত হতে এসে কয়েকজন রোগী মারা যান। মৃতেরা বিষাক্ত সাপের কামড় খেয়েছিলেন এবং ডাক্তার বিশ্বাসের পক্ষে বা বিষ-পাথরের পক্ষে রোগীকে বিষ-মুক্ত করা সম্ভব নয় বলেই রোগীদের মৃত্যু হয়েছিল।

ডাঃ বিশ্বাস ও কৃষ্ণনগরের পাদ্রি নিঃসন্দেহে ঘাতকের ভূমিকাই পালন করে চলেছেন। রোগী ও তার আত্মীয়দের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শোষণ ও হত্যা চালিয়েই যাচ্ছেন।

আমাদের সমিতির তরফ থেকে এই দুই ডাক্তারসহ সব বিষ-পাথরের দাবিদারদের জানাচ্ছি খোলা চ্যালেঞ্জ। তাঁরা প্রমাণ করুণ তাঁদের বিষ পাথরের বিষ শোষণ করার ক্ষমতা আছে। সর্ত এই—আমরাই বিষাক্ত সাপ সরবরাহ করবো। এবং বিষাক্ত সাপের কামড় খাবে যে পশুটি, সেটাও আমরাই সরবরাহ করবো। একই সঙ্গে সরকারী প্রশাসনের কাছে দাবি—মানুষের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

এমন সর্তের পিছনে কারণটি হলো—বিষ থলে অপারেশন করে বাদ দেওয়া সম্ভব। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নাজির আলির কাছে অনেক সাপের ওঝা ও তথাকথিত সর্পবিশারদ এসে বিষের থলিহীন বিষ দাঁতওয়ালা সাপ কিনে নিয়ে যান। এক্ষেত্রে সাপটি বিষাক্ত এবং বিষ দাঁতওয়ালা হলেও বাস্তবে কিন্তু নির্বিষ। তাই সাপটি সরবরাহের দায়িত্ব রাখতে চাই নিজেদের হাতে। পশুটিকেও আমরাই হাজির করতে চাই এ জন্যে, যাতে বিষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা একটু একটু করে পশুর শরীরে গড়ে তুলে সেই পশুটিকে হাজির করে বিষ-পাথরের কারবারিরা আমাদের মাৎ না করতে পারেন।

অনেকের বিশ্বাস ওঝা, গুণীনদের অনেকে হাত চেলে সাপের বিষ নামাতে সক্ষম। ধারণা অমূলক। মন্ত্র পড়ে হাত চালিয়ে ওঝারা তাঁদেরই সুস্থ করতে সক্ষম যাঁদের বিষাক্ত সাপ দংশন করেনি।

বিষাক্ত সাপ কামড়েছে অনুমান করে মানসিকভাবে যাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁরা
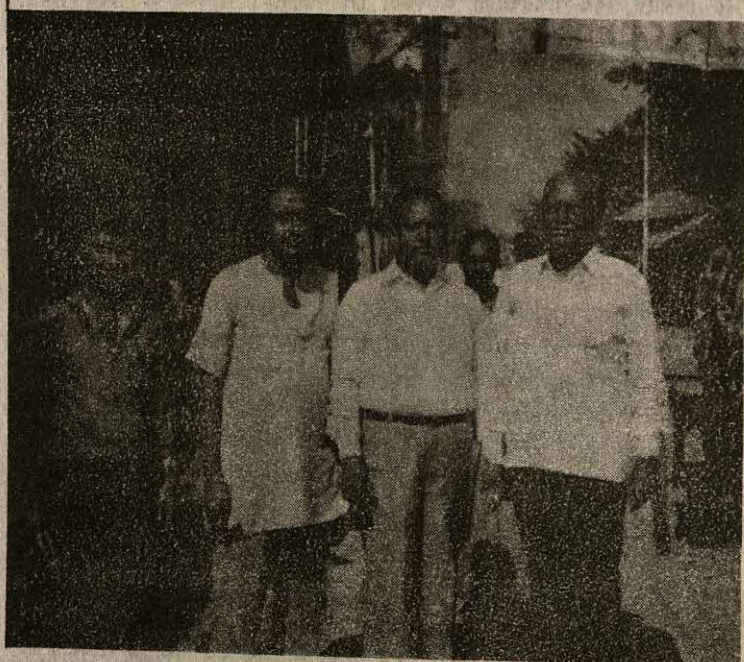
বাঁ দিক থেকে ডাঃ সন্দীপ পাল, লেখক, বিষপাথর চিকিৎসক ডাঃ উত্তমকুমার বিশ্বাস ও যুক্তিবাদী সমিতির সহ-সভাপতি ডাঃ বিরল মল্লিক।

যখন দেখেন হাত চেলে দুধে হাত ধুয়ে ফেলতেই দুধ নীল হয়ে যাচ্ছে, গোল মরিচ কামড়েও ঝাল না পাওয়া অসাড় জিব একটু একটু করে সার ফিরে পাচ্ছে, অনুভব করতে পারছে গোল-মরিচের ঝাল স্বাদ, তখন স্বভাবতই হাত-চালার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে ফেলেন।

পেট থেকে শিকড় তোলা

অনেক ওঝা বা গুণীন রোগী দেখে জানায়, কেউ রোগীকে তুক্ করে শিকড় খাইয়ে দিয়েছে, তাতেই এই ভোগান্তি। রোগীকে বা রোগীর বাড়ির লোকের হাতেই ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি পিতল বা কাঁসার ঘটি। বলে পাশের পুকুর, কুয়ো, টিউবকল বা জলের হাঁড়ি থেকে জল ভরে আনতে।

জল ভরা ঘটি গুণীনের হাতে দিতে সে রোগীর পেটে জল ভরা ঘটি বসিয়ে মন্ত্র পড়তে থাকে। এক সময় ঘটি নামিয়ে গুণীন রোগী বা রোগীর বাড়ির লোককে ঘটির জল পরীক্ষা করতে বলে। বিস্ফারিত চোখে রোগী ও তাদের বাড়ির লোক দেখতে

পায় শিকড় বা ওই জাতীয় কিছু। খালি ঘটিতে শিকড় এলো কোথা থেকে ? জল তো গুণীন বা তার কোনও লোক আনেনি ? তবে ?

দু-ভাবে এমন ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকে। কখনও পিতল কাঁসার ঘটির ভিতরের

পেট থেকে শিকর তুলছেন জনৈক পুরহিত

গলার দিকে (সে দিকটা সাধারণভাবে দৃষ্টির আড়ালে থাকে) আটার আঠা ও ওই ধরনের কিছু দিয়ে শিকড়টা জল আনতে দেওয়ার আগেই আটকে রাখে গুণীন। মন্ত্র-পরার মাঝে সুযোগ বুঝে আটকে রাখা শিকড়কে মুক্ত করে। বিষয়টা ছবিতে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

কখনও বা মন্ত্র-পড়ার ফাঁকে গুণীন সবার চোখের আড়ালে একটা শিকড় জলে ফেলে দেয়।

এ সত্ত্বেও অনেক সময় রোগী কিছুটা সুস্থবোধও করেন। বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে বহু অসুখই সারান সম্ভব। মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ চিকিৎসক। এমনকি

চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতেও তার প্রচুর উদাহরণও আছে। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। কোন কোন অসুখের ক্ষেত্রে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে অসুখ সারান সম্ভব এবং কেন তা সারে—এই প্রসঙ্গ নিয়ে তাই আবার পুরোন আলোচনায় ফিরলাম না।

চাল-পড়া

বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে হার, দুল, আংটি টাকা পয়সা বা ঘড়ি—এমন ক্ষেত্রে এই একবিংশ শতাব্দীতে পা বাড়াবার মুহূর্তেও অনেকেই থানা-পুলিশ করার চেয়ে গুণীনের দ্বারস্থ হওয়াটাই বেশি পছন্দ করেন।

শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষ ও আদিবাসী সমাজের মানুষরাই গুণীনের চোর ধরার ক্ষমতায় বেশি রকম আস্থাবান। গুণীনদের অনেকেই চোর ধরতে সন্দেহজনকদের 'চাল-পড়া' খাওয়ায়।

চোর ধরতে চাল-পড়ার প্রচলন বহু প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। 'চাল পড়া' জিনিসটা কী ? আসুন ছোট্ট করে বলি। ধরুন আপনার বাড়িতে চুরি হয়েছে। বুঝতে আপনার অসুবিধে হয়নি, এ সিঁধেল চোরের কাণ্ড নয়। আপনারই চেনা-জানা, বাড়ির কাজের লোক অথবা পাড়ারই কোনও হাত-টান দু-চারজনকে সন্দেহও করছেন। হাতে-নাতে প্রমাণ নেই, তাই বসে বসে হাত-কামড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই বলে যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই খবর পেলেন তিন মাইল দূরের সাঁওতাল পল্লীর কার্তিক মুর্মু খুব বড় গুণীন। অব্যর্থ ওর চাল পড়া। আপনি হারানো জিনিস ফেরৎ পেতে পুলিশের ওপর নির্ভর করাটা ডাহা বোকামো ধরে নিয়ে কার্তিক মুর্মুর দ্বারস্থ হলেন। কার্তিক জানালেন কবে কখন যাবেন। আপনাকে নির্দেশ দিলেন সেই সময় পরিবারের

সকলকে এবং সন্দেহজনকদের হাজির রাখতে। সময় মত কার্তিক এলেন। সঙ্গে এক ফুলধারিয়া। শুরু হলো কার্তিকের বকবকানি। তার মন্ত্রঃপূত চাল পড়া খেয়ে কোন্ গ্রামের কে কবে মারা গেছে তার এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করে উপস্থিত অনেকেরই পিলে চমকে দিলেন। যারা হাজির রয়েছে তারা চাল পড়া খাইয়ে চোর ধরার অনেক কাহিনীই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে। তাই কার্তিক যখন বলল, সে চালে মন্ত্র পড়ে দেওয়ার পর প্রত্যেককে খাওয়াবে, যে চুরি করেছে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হবে, বুক ধড়ফড় করতে থাকবে, চুরির কথা স্বীকার না করলে মুখ থেকে রক্ত উঠে মারা যাবে—তখন কার্তিকের কথায় অবিশ্বাস করার কোনও কারণ উপস্থিত কেউ খুঁজে পেল না।

আপনার গৃহিণীর কাছ থেকে সামান্য চাল নিয়ে মন্ত্র পড়া শুরু করলেন কার্তিক। সে কী মাথা ঝাঁকানি। ফাঁপানো বাবড়ি চুলগুলো উথাল-পাথাল করতে লাগলো। কার্তিকের শরীর দুলতে লাগলো, মাঝে মাঝে হুঙ্কার। এক সময় রক্ত লাল চোখ মেলে কার্তিক এক একজনকে ধরে ধরে খাওয়াতে লাগলো মন্ত্রঃপূত চাল বা চাল পড়া। এরপর তিন রকমের যে কোনও একটি ঘটনা ঘটতে পারে। একজন চাল পড়া হাতে পেয়ে মুখে পোরার পরিবর্তে আশেপাশে পাচার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলে একবার গুণীনের কাছে আছড়ে পড়ে, একবার আপনার পা ধরে, অপরাধ স্বীকার করে বার বার ক্ষমা চাইতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটতে পারে এই ধরনের—চাল পড়া খাওয়া মানুষদের মধ্যে একজন কেমন যেন অসুস্থ বোধ করতে থাকে। শ্বাস কষ্ট হতে থাকে, বুক ধড়ফড় করতে থাকে, বুক জ্বলে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় আতঙ্কে। নিজেকে বাঁচাতে অপরাধ স্বীকার করে। গুণীনের পায়ে মাথা কুটে বার বার করুণ আবেদন জানাতে থাকে—'মরে গেলাম, আর সহ্য করতে পারছি না, মন্ত্র কাটান দাও।'

আবার এমন ঘটতে পারে, সবাইকে চাল পড়া খাওয়াবার পরেও কারো শরীরেই সামান্যতম অস্বস্তি দেখা গেল না, অপরাধী ধরা পড়লো না। গুণীন ঘোষণা করলো, 'যারা এখানে উপস্থিত তাদের মধ্যে চোর নেই।' গুণীনের এই ঘোষণাকে অনেক মানুষই সত্য বলে মেনে নেয়।

ঘটনা তিনটিকে আমরা একটু যুক্তি দিয়ে বিচার করি আসুন। চাল পড়ার ক্ষেত্রে এই তিন ধরনের যে কোনও একটি ঘটনাই ঘটে থাকে—তবে হয়তো সামান্য রকমফের করে। এর কোনটিই চাল পড়ার অভ্রান্ততা বা অকাট্যতার প্রমাণ নয়। চাল পড়া না খেয়েই চোর কেন অপরাধ স্বীকার করে এটা নিশ্চয়ই আপনারা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাই বুঝতে পেরেছেন। গুণীনের কথায় চোর বিশ্বাস করেছে। তাই চাল খেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে অপরাধ স্বীকার করাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছে।

চাল পড়া খেয়ে কেন চোরের শারীরিক নানা অসুবিধে হতে থাকে, সে বিষয়ে নতুন করে বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না। কারণ 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর প্রথম খণ্ডে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা বহু উদাহরণ সহ হাজির করা হয়েছে। যাঁরা এখনও প্রথম খণ্ড পড়ে উঠতে পারেননি, তাঁদের জন্য খুব সংক্ষেপে দুচার কথায় ব্যাখ্যা হাজির করছি।

যে সব সন্দেহভাজনদের চাল পড়া খাওয়ানো হয়, তাদের মধ্যে চোর থাকতেই পারে। চোরের মনে চাল পড়ার প্রতি ভীতি থাকতেই পারে। যে সব আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু ইত্যাদির মধ্যে সে বড় হয়েছে তাদের অনেকের কাছেই হয় তো নানা অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছে, শুনছে তুক্-তাক, ঝাড়ফুঁকের নানা বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা। পড়তে জানলে ছোটবেলা থেকেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি পড়ে অলৌকিক নানা ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। গড়ে উঠেছে অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস। অনেক সময় চেতন মন অনেক অলৌকিক কাহিনীকে অগ্রাহ্য করতে চাইলেও মনের গভীরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা অলৌকিক বিশ্বাস কিন্তু দুর্বল মুহূর্তে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

চোর হয়তো ইতিপূর্বে মা-ঠাকুমা, পাড়া-পড়শী অনেকের কাছেই চাল পড়া খাইয়ে চোর ধরার অনেক গা শির-শির করা ঘটনা শুনেছে। শুনেছে চাল পড়া খেয়ে চোরের বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা ইত্যাদি নানা গল্প। বিশ্বাসও করেছে। হয়তো গুণীনের দেওয়া চাল পড়া খাওয়ার আগে গুণীনের ক্ষমতা বিষয়ে সন্দেহ ছিল। এমনও হতে পারে, মন্ত্র-শক্তির প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। আর তাইতেই খেয়ে ফেলেছে। খাওয়ার পর দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল মনে চিন্তা দেখা দিল—চাল পড়ার সত্যিই যদি ক্ষমতা থাকে তবে তো আমি মারা যাবো। মৃত্যুর আগে আমার শ্বাসকষ্ট হতে থাকবে, বুক ধড়ফড় করবে, বুক জ্বালা করবে। আমার কি তেমন করছে ? কোনও অস্বস্তি কি শরীরে অনুভব করছি ? হ্যাঁ। আমার যেন কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে ! দম বন্ধ হয়ে আসছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুকেও যেন কেমন একটা জ্বালা জ্বালা করছে ? আমি মিথ্যে ভয় পাব না। কিন্তু এ তো মিথ্যে ভয় নয়। সত্যিই তো বুকে জ্বালা করছে। বুক জ্বলে যাচ্ছে। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে।

বাস্তবিকই চোরটি তখন এইসব শারীরিক কষ্ট অনুভব করতে থাকে। চাল পড়ার ক্ষমতার প্রতি চোরটির বিশ্বাস বা আতঙ্কই তার এই শারীরিক অবস্থার জন্য পুরোপুরি দায়ী। এই শারীরিক কষ্টগুলো সৃষ্টি হয়েছে মানসিক কারণে, চাল পড়ার অলৌকিক ক্ষমতায় নয়।

একটি মাত্র উদাহরণ হাজির করে আপনাদের ধৈর্যের ওপর অত্যাচার থেকে বিরত হবো। '৮৮ সালের ঘটনা। ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতার তখন রমরমা বাজার। পত্র-পত্রিকা খুলেই ঢাউস-ঢাউস ঈপ্সিতা। ঈপ্সিতার নাম, অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পত্র-পত্রিকাগুলোর প্রচারের ঠেলায় আমাদের সমিতির সভ্যদের তখন পিঠ বাঁচানোই দায়। ঠিক করলাম, ঈপ্সিতার মুখোমুখি হবো। শুনে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির জনৈক সদস্য আমাদের বললেন, 'আরে ধু-র-, ঈপ্সিতার কোনও ক্ষমতাই নেই। ওর বুজরুকি ফাঁস করতে আবার সময় লাগে ? গিয়ে একবার চ্যালেঞ্জ করুন না, ভুডু বাণ মেরে আপনাকে মেরে ফেলতে ; দেখি কেমন ভাবে মারে ?'

বললাম, 'ঠিক আছে, তাই হবে, কাল দেখা করে সেই চ্যালেঞ্জই জানাবো। বলবো বাণ মেরে আপনাকে মারতে।'

শুনেই উনি হঠাৎ দপ্ করে রেগে উঠলেন। বললেন, 'আমাকে কেন মারতে বলবেন ? চ্যালেঞ্জ জানান আপনি। আপনি নিজেকে মারতে বলুন।'

পরের দিন রাত ন'টা নাগাদ আমার বাড়িতে হাজির হলেন ওই সদস্য। সরাসরি জানতে চাইলেন ঈপ্সিতাকে বাণ মারার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি কি না। বললাম, 'জানিয়েছি। এবং আমাদের সমিতির তরফ থেকে আপনিই বাণের মুখোমুখি হতে চান, এ কথাও জানিয়েছি। আমার কাছ থেকে আপনার কিছু পারটিকুলার্স নিয়েছেন। জানিয়েছেন, তিন দিন তিন রাতের মধ্যেই আপনার ওপর বাণের অ্যাকশন শুরু হবে।'

ব্যাঙ্ক আন্দোলনের নেতা ওই তরুণ তুর্কি আমার কথা শুনে কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। তারপর বার কয়েক মিন মিন করে বললেন, 'আমি তো ওঁকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইনি। আমাকে এর মধ্যে জড়ান নীতিগত ভাবে আপনার উচিত ছিল না।'

পরের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই খবর পেলাম, তরুণ তুর্কির স্ট্রোক হয়েছে। দৌড়লাম দেখা করতে। প্রথমেই ওঁর স্ত্রীর মুখোমুখি হলাম। আমাকে জবাবদিহী করালেন, 'আপনার কি উচিত ছিল, ঈপ্সিতার বিরুদ্ধে আমার হাসব্যান্ডকে লড়িয়ে দেওয়া ?'

বুঝলাম কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে। আসামী আমি রোগী ও তার স্ত্রী দুজনের কাছেই এবার সত্য প্রকাশ করলাম, 'ঈপ্সিতার সঙ্গে ভুডু মন্ত্রে কাউকে মারবার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাই হয়নি। মজা করতে আর কিছুটা পরীক্ষা করতেই মিথ্যে গল্পটা ফেঁদেছিলাম।'

এক্ষেত্রে তরুণ বন্ধুটি ঈপ্সিতার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে আতঙ্কের শিকার হয়েছিলেন। হয় তো মরেও যেতেন। মারা গেলে যেতেন ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতায় নয়, ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতার আতঙ্কে।

বাণ-মারা

সাধারণভাবে বহু মানুষের মধ্যেই একটা ধারণা রয়েছে, সত্যিই কারো কারো 'বাণ মারা'র ক্ষমতা আছে। আদিবাসীরা যেমন বাণ মারায় গভীর বিশ্বাসী, তেমনি অ-আদিবাসীদের মধ্যেও বাণ মারায় বিশ্বাসীর সংখ্যা কম নয়।

বাণ মারায় যারা বিশ্বাসী, তাদের চোখে বিষয়টা কী ? একটু দেখা যাক। বাণ মারা এক ধরনের মন্ত্রশক্তি, যার সাহায্যে অন্যের ক্ষতি করা যায়—তা সে যত দূরেই থাকুক না কেন। ক্ষতি করা যায় নানা ধরনের, যেমন ঘুসঘুসে জ্বর, কাশি, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা, শরীরে ঘা হওয়া, ঘা না শুকোনো, ঘন ঘন অজ্ঞান হওয়া, প্রস্রাবে রক্ত পড়া, গরুর বাঁট দিয়ে রক্ত পড়া, শরীর দুর্বল করে দেওয়া, শরীর শুকিয়ে দেওয়ায় মৃত্যু, অপঘাত মৃত্যু, অন্যের রোগ চালান করা। এছাড়াও দেখা যায়, কেউ হয়তো শত্রুতা করে কারো গরুর ওপর বাণ মারলো। এবেলা ওবেলা মিলিয়ে তিন সের দুধ দিত। কোথায় কিছু নেই গরুর বাঁট থেকে বেরোতে লাগল দুধের বদলে রক্ত। বাগানে থন্‌থন্‌ করে উঠেছিল কুমড়ো গাছ। মাচান বেঁধে গাছটাকে ওপরে তুললেন। কড়া পড়লো রাশি রাশি। কী বিপুল সংখ্যায় কুমড়ো হবে ভেবে যখন প্রতিদিন পরম যত্নে জলসিঞ্চন করে চলেছেন, তখন হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলেন গাছটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। গোড়ার মাটি আলগা করে সার চাপালেন। কিন্তু কোনও কাজ হলো না,

গাছটা শুকিয়ে মরে গেল। অতএব ধরে নিলেন, আসলে বাঁচানো সম্ভব ছিল না। গাছের অত ফলন দেখে কেউ হিংসেয় বাণ মেরে দিয়েছে। অতএব...।

এমনি বাণ মারার ফলেই নাকি অনেকের কোলের বাছা হঠাৎ কেমন ঝিম্ মেরে যায়। শরীরের পেটটা শুধু বাড়ে, আর সমস্ত শরীরটাই কমতে থাকে। কোমরের তামার পয়সা, জালের সীসে লোহা—কোন কিছুতেই কাজ হয় না। হবে কী করে, ওকে যে বাণ মেরেছে! পোয়াতি জলজ্যান্ত বউটা বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে মারা গেল। কেন? কেউ নিশ্চয়ই বাণ মেরেছে। এমনই শতেক অসুখ আর ঘটনার পিছনে অনেক মানুষই সর্বনাশা মন্ত্রের অদৃশ্য বাণ বা তীরের অস্তিত্ব খুঁজে পায়।

বাণ মারা শুধুমাত্র সাঁওতাল আদিবাসীদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে নেই। অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, সিকিম, উত্তরবঙ্গ, এবং ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই বাণ মারার প্রতি গভীর বিশ্বাস রয়েছে। আরব কি আফ্রিকা, কানাডা কি অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রই বাণ মারায় বিশ্বাসী মানুষ রয়েছেন। আফ্রিকাবাসীদের অনেকেই মনে করেন, ভুডু মন্ত্রে বাণ মেরে যে কোনও শত্রুরই শারীরিক ক্ষতি করা সম্ভব। আফ্রিকার ভুডু মন্ত্রের চর্চা ইউরোপিয় দেশগুলোতেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

শরীর বিজ্ঞানে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষ জানতে পেরেছে, বুঝতে শিখেছে আমাদের রোগের কারণ কোনও তুক্-তাক্, বাণ মারা ইত্যাদি অশুভ শক্তির ফল নয়, নয় পাপের ভোগ। প্রতিটি রোগকে বিশ্লেষণ করলেই অলৌকিক কারণের হদিশ পাওয়া যাবে। যদিও এটা বাস্তব সত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও সব রোগ মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করতে পারেনি। পারেনি মৃত্যুকে ঠেকাতে। কিন্তু না পারার অর্থ এই নয়—রোগের পিছনে বাণ মারা, তুক্-তাকের মত অলৌকিক কিছু শক্তি কাজ করে। ক্যানসার, যক্ষ্মা, ধনুষ্টঙ্কার, গ্যাংগ্রিন, ম্যালেরিয়া, অনাহারজনিত অপুষ্টি ইত্যাদি রোগের লক্ষণকেই অনেকে বাণ মারা বা তুক্-তাকের অব্যর্থ ফল বলে ধরে নেয়।

আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির, শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থাগুলো আজ পর্যন্ত দু'শোর ওপর বাণ মারার দাবীদারদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রেই বাণ মারায় সমিতির কোনও সদস্যের মৃত্যু হয়নি—যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাণ মেরে মেরে ফেলার দাবীই ওঝা, গুণীন, তান্ত্রিকরা করেছিল। বাণ মারার শারীরিক প্রতিক্রিয়া দুর্বল চিত্তের অলৌকিকে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেই শুধু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর সে সব ক্ষেত্রে গুণীন, তান্ত্রিকদের ক্ষমতার কাহিনী পল্লবিত হয়, ওদের ক্ষমতায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়ে, রমরমা বাড়ে।

বাণ মেরে কারও যেমন মৃত্যু ঘটানো সম্ভব নয়, তেমনই সম্ভব নয়, মন্ত্রে অন্যের শরীরে রোগ চালান করা বা রোগমুক্ত করা। অনেক সময় রোগী চিকিৎসক ও গুণীনের সাহায্য একই সঙ্গে গ্রহণ করে। চিকিৎসার গুণে রোগ সারানোও রোগী অনেক সময় বাণ মারার ক্ষমতায় বিশ্বাসী হওয়ার দরুন গুণীনের কৃপায় রোগমুক্তি ঘটেছে বলে মনে করে। আবার অনেক সময় শুধুমাত্র গুণীনের বাণ মারায় রোগমুক্তি ঘটেছে এমন কথা দিব্যি গেলে বলার মত অনেক লোকও পেয়েছি। তাদের কেউ কেউ হয়তো

মিথ্যাশ্রয়ী। কিন্তু সকলেই নন, কারণ এমনটা ঘটা সম্ভব।

রোগ সৃষ্টি ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের বহু রোগের উৎপত্তি হয় ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি থেকে। মানসিক কারণে বহু অসুখই হতে পারে, যেমন—মাথাধরা; মাথার ব্যথা, শরীরের কোনও অংশে বা হাড়ে ব্যথা, স্পন্ডালাইটিস, স্পন্ডালোসিস, আরথ্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল অ্যাজমা, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, কামশীতলতা, পুরুষত্বহীনতা, শরীরের কোনও অঙ্গের অসারতা, কৃশতা এমনি আরো বহু রোগ মানসিক কারণে সৃষ্ট। এইসব রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা অনেক সময়ই ঔষধি-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করেন, সঠিক এবং আধুনিকতম চিকিৎসার সাহায্যে রোগ মুক্ত করা হচ্ছে, এই ধারণা রোগীর মনে সৃষ্টি করে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যান। এই রোগীর বিশ্বাস নির্ভর এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। প্ল্যাসিবো চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির প্রথম খণ্ডে বহু উদাহরণ সহ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে আর বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না। শুধু এটুকু বলেই শেষ করতে চাই, যারা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া বাণ মারা বা তুক্‌তাকের ক্ষমতায় মুক্ত হয়েছে বলে মনে করে, তারা প্রতি ক্ষেত্রেই মানসিক কারণে নিজের দেহে রোগ সৃষ্টি করেছিল। এবং তাদের আরোগ্যের পেছনে বাণ মারা, তুকতাক বা তন্ত্রমন্ত্রের কোনও গুণ বা বৈশিষ্ট্য সামান্যতম কাজ করেনি, কাজ করেছে বাণ মারা, তুকতাক ও মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতি রোগীদের অন্ধ বিশ্বাস।

গরুকে বাণ মারা

গ্রামের মানুষ মাঝে-মধ্যে ওঝা বা গুণীনের কাছে হাজির হয় দুধেল গাইয়ের সমস্যা নিয়ে। কেউ বাণ মেরেছে, অথবা কোনও ডাইনির নজর পড়েছে। গরুর বাঁট থেকে দুধের বদলে বের হচ্ছে রক্ত।

ওঝা ঝাড়-ফুঁক করে টোটকা ওষুধ দেয়। তাতে গরুর রক্ত দুধ সাদা না হলে শালপাতায় তেল পড়ে ঘোষণা করে কোনও ডাইনির নজর লেগেছে। কখনও বা ডাইনি কে তাও ঘোষণা করে গুণীন। পরিণতিতে নিরীহ কোন রমণীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

গরু শুধু নয়, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর সবার ক্ষেত্রেই দুধের পরিবর্তে রক্ত ও পুঁজ বের হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। ভাইরাস থেকেই এই রোগ হয়। পশু চিকিৎসকদের ভাষায় এই রোগকে বলা হয় 'ম্যাসটাইটিস' বা 'ঠুনকো'। আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যেই এই রোগ সারান যায়।

ভোলায় ধরা

নির্ধা গাঁয়ের মানুষ। প্রতিদিন বিশাল ধূ-ধূ মাঠটা পারাপার করছে এবেলা ওবেলা।

হঠাৎই এক ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে মাঠ পার হয়ে বাড়ি আসতে গিয়ে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। কোথায় বাড়ি ? কোথায়ই বা গাঁ ? সেই সকালে চাট্টি আমানি পেটে ঢুকেছিল, যাতে ভাতের চেয়ে জলই ছিল বেশি। তিন ক্রোশ পথ হেঁটে টাঙির কোপে জ্বালানী কাঠ জোগাড় করে মাথায় বোঝাটা চাপাবার আগে গলায় ঢেলে নিয়েছিল এক বোতল তরল আগুন। এই আগুন শরীরে না ঢেলে দিলে তিন ক্রোশ পথের আকাশের আগুনকে শরীরকে সামাল দেবে কেমন করে ? বেচাল আগুনে হাওয়া ঠেলে চলেছে—সে অনেকক্ষণ। এতক্ষণে ছ'ক্রোশ পথ বোধহয় হাঁটা হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় রাংচিতা আর ঢোলকমলির বেড়ায় ঘেরা গাঁয়ের বাড়িগুলো ? ভয় ধরে মনে। পথ ভুল হচ্ছে। এত দিনের চেনা পথ, তবে তো ভোলায় ধরেছে। ভোলায় ভুলিয়ে মারতে চায়। গরম গা ভয়ের ঠেলায় ঠাণ্ডা মেরে যায়। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। জ্বালানীর খোঁজে আসা কয়েকটি কিশোরী ও বৃদ্ধা ওকে অমন পানা পড়ে থাকতে দেখে দৌড় লাগায় গাঁয়ে। ধাঁ-ধাঁ করে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। নিধাকে গাঁয়ের লোকেরা নিয়ে আসে বাড়ি। কিন্তু এ কোন্ নিধা ? ডাকাবুকো মানুষটা কেমন হয়ে গেছে। হাবার মত চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। কোন কিছুই ঠাওর করতে পারছে না। নিধার বউ গোপা অমন অবস্থা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। নিধার ছেলে-মেয়েগুলো বড়দের ভিড় ঠেলে বাপের কাছে এগুতে সাহস পেল না। অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে সকলের কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। নিধার বাপ হরি বাউড়ি মেলা সোরগোল তুলে চেঁচাল, 'ওরে নিধাকে ভোলায় ধরেছে, জল নিয়ে আয়।' পুরুলিয়া জেলার এমন শুখো জায়গায় জলের অভাবে মাটিতে ফাটল ধরে। শীর্ণ গরুগুলো জল-ঘাসের অভাবে ধুঁকছে। তবু জল হাজির হয়। নিধাকে দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসিয়ে গায়ের ঘামটা মেরে দাঁড় করিয়ে দেয় পাড়াপড়শীরা। মাথায় জল ঢালা হতে থাকে। তারই মাঝে শ্বশুরের আদেশে নিধার কাপড়ের কসিতে টান মারে গোপা। একেবারে পুরুষ মা কালী। ঠা-ঠা করে হাসতে থাকে দু-চারজন মেয়ে মর্দ। নিধা চমকে উঠে গোপার হাত থেকে কাপড় টেনে নিয়ে আব্রু বাঁচাতে তৎপর হয়। গোপার আতঙ্ক দূর হয়। মুখে হাসি ফোটে। 'ভোলা' ছেড়ে দিয়েছে।

এতক্ষণ যে ঘটনাটি বললাম, তাতে স্মৃতির সঙ্গে সামান্য কল্পনার মিশেল দিয়েছি পাঠক-পাঠিকাদের ভোলায় পাওয়া মানুষটির মানসিকতা বোঝাতে। ঘটনাস্থল পুরুলিয়া জেলার আদ্রা শহরের উপকণ্ঠের বাউড়ি পল্লী। ওই মাঠ পার হতে গিয়ে অনেককেই নাকি ভোলায় পেত, শৈশবে এমন গল্প অনেক শুনেছি। আমার জ্যাঠতুতো মেজদাও যখন ষণ্ডা চেহারার এক প্রখর জেদি যুবক, তখন এক সন্ধ্যায় ওই মাঠ পার হতে গিয়ে তিনিও নাকি একবার ভোলার পাল্লায় পড়েছিলেন। যে মাঠ অগুণতি বার পার হয়েছেন, সে মাঠের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা অর্জুন হরিতকির গাছের কাছে পথ ভুলেছিলেন। এদিক-ওদিক উল্টোপাল্টা ছোটাছুটি করে যখন শীতের সন্ধ্যাতেও ঘেমে নেয়ে একশা তখন সাউথ ইনস্টিটিউটের বনাদা আবিষ্কার করলেন মেজদাকে। বিহ্বল মেজদার গায়ে শীতের রাতেও বালতি বালতি কুয়োর জল ঢালতে দেখেছি।

ভোলায় ধরা যুবতীকে উর্ধাঙ্গ অনাবৃত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে তার মাথায় অনবরত জল ঢালতে দেখেছি। আর একগাদা নানা বয়সী নারী-পুরুষের সামনে বয়স্কা

মহিলাকে দেখেছি যুবতীটির অনাবৃত স্তন টিপতে। তাদের ধারণা, এই ভাবে বিভিন্ন বয়সী বিভিন্ন সম্পর্কের নারী-পুরুষদের সামনে ভোলায় ধরা মানুষটিকে লজ্জা পাইয়ে দিতে পারলে ভোলায় ধরা ছেড়ে যায়।

পথিকের আত্মবিস্মৃত হওয়া বা ভুলে যাওয়া থেকেই ভোলায় ধরা কথাটি এসেছে। বিশাল ফাঁকা মাঠ অতিক্রম করতে গিয়ে কিছু কিছু সময় কারো কারো দিক বিভ্রম ঘটতেই পারে। ঠা-ঠা রোদ্দুর ও অন্ধকার রাতে এমন ধরনের দিক-বিভ্রম ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। তার ওপর আবার মাঠটির যদি 'ভোলায় ধরার মাঠ' হিসেবে কুখ্যাতি থাকে, তবে তো সোনায় সোহাগা। ভোলায় ধরার আতঙ্ক থেকেই তাকে ভোলায় ধরে—ভূতে ধরার মতই। ভোলায় ধরার ভয় আদৌ না থাকলে দিক্‌বিভ্রম ঘটলেও ভোলায় ধরে না কখনই।

রাত দুপুরে অতি পরিচিত পথ চলতে গিয়ে দিক ভুল করার অভিজ্ঞতা কম বেশি অনেকেরই আছে। ধরুন শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেছেন আরো পাঁচটা দিনের মত। রাতের আলো ঝলমল শিয়ালদহ। আপনার সঙ্গী যে দিকে এগুলো তা দেখে অবাক হলেন। 'ওদিকে যাচ্ছিস কেন ?' জিজ্ঞেস করতেই জবাব পেলেন, 'গেট দিয়ে বেরুবো না।' আবার আপনার অবাক হওয়ার পালা। গেট আবার ওদিকে কোথায় ? ওতো গেটের ঠিক উল্টো দিকে হাঁটছে। আপনি কিছুটা হতভম্ব, কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে সঙ্গীকে অনুসরণ করতে গিয়ে আবারও অবাক হলেন। অতি স্থির ভাবে মনে হচ্ছে উল্টো দিকে হাঁটছেন কিন্তু ওই দূরে গেটটাও দেখতে পাচ্ছেন। এমন ভুল শ্যামবাজার মোড় গড়িয়াহাটের মোড় বা পৃথিবীর যে কোনও স্থানেই হতে পারে। এই সাময়িক দিক নির্ণয়ে ভুল করাকেই কিছু কিছু মানুষ ভাবেন—কোনও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল মৃত্যুর গভীরে। ভোলায় মারার আগে অন্যের নজরে পড়ায় জীবনটা বেঁচেছে, কিন্তু ভোলায় ধরার পরিণতিতেই এমন স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে।

ভোলা নামক অলীক কিছুর জন্য দিক খুঁজে পাচ্ছে না ভেবে দিক-হারা মানুষটি কেবলমাত্র ভয়েই মারা যেতে পারে। ভয়ে মস্তিষ্ক কোষের ভারসাম্য সাময়িকভাবে নষ্ট হতেও পারে। 'ভোলায় ধরলে সব ভুলে যায়' এমন একটা ধারণা শোনা কিছু কাহিনী বা দেখা কিছু ঘটনা থেকে পথিক প্রভাবিত হতেই পারে। প্রভাবিত পথিক যদি তীব্র আতঙ্কে ভাবতে শুরু করেন, আমাকে ভোলায় ভুলিয়ে নিয়ে ঘোরাচ্ছে, আমাকে হয় মেরে ফেলবে নতুবা সব কিছু ভুলিয়ে দেবে—তবে পথিকের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যেমন বন্ধ হতে পারে, তেমনই ঘটতে পারে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশের ঘটনা।

আবারও বলি দিক্ বিভ্রমের মত ঘটনাকে ভোলায় ধরার মত অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে ভয় না খেলে মৃত্যু বা স্মৃতিভ্রংশতা দেখা দেয় না কখনই।

জন্ডিসের মালা

জন্ডিস বা ন্যাবা রোগে মন্ত্রঃপূত মালা পরার প্রচলন শুধু যে আদিবাসী সমাজ বা গঞ্জেই ব্যাপকতা পেয়েছে, তা নয়। বিভিন্ন শহরে এমনকি কলকাতাতেও মন্ত্রপূত

জন্ডিসের মালার প্রতি জন্ডিস রোগীদের আগ্রহ ও বিশ্বাস লক্ষ্য করার মত।

কলকাতার দর্জিপাড়ার মিত্তির বাড়ির থেকে জন্ডিসের মালা দেওয়া হয় প্রতি শনিবার। তিন-চার পুরুষ ধরেই তাঁরা এই মালা দিয়ে চলেছেন। সংগ্রহকারীদের ভিড়ও দেখার মত।

জন্ডিসের মালায় কী হয়। জন্ডিস রোগী এই মালা পরে সাধারণত প্রাপ্ত নির্দেশ মত দুদিন স্নান করেন না। তেল, ঘি, মাখন খাওয়া বারণ। নিতে হয় পূর্ণ বিশ্রাম। মন্ত্রঃপূত মালা জন্ডিসের রোগ যতই শুষে নিতে থাকে ততই মালা বাড়তে থাকে। বুক ছাড়িয়ে পেটের দিকে নামতে থাকে। আর পাঁচটা স্বাভাবিক মালার মত এ মালা একই আয়তন নিয়ে থাকে না। মালার অদ্ভুত ব্যবহারে ব্যবহারকারীর বিশ্বাস বাড়ে। এবং সাধারণত দেখা যায় রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

সমগ্র বিষয়টার মধ্যে একটা অলৌকিকের ছোঁয়া ছড়িয়ে আছে। কোনও মালা কি এমনি করে বাড়ে ? বাড়ে বইকি, মালাটা যদি বিশেষভাবে তৈরি হয় ফুলের বদলে বামনহাটি, ভৃঙ্গরাজ অথবা আপাং গাছের ডাল দিয়ে। এইসব গাছের ডাল ফাঁপা এবং দ্রুত শুকিয়ে কৃশ থেকে কৃশতর হতে থাকে।

এই জাতীয় গাছের ডাল ছোট ছোট করে কেটে তৈরি করা হয় মালা। ডালের টুকরোগুলোকে গেঁথে মালা তৈরি করলে সে মালা কিন্তু বাড়বে না। মালা বাড়াতে গেলে সুতো বাড়াতে হবে। ছুঁচে গাঁথা মালায় বাড়তি সুতো পাওয়া সম্ভব নয় বলেই সে মালা বাড়ে না। জন্ডিসের মালা তৈরি হয় বিনা ছুঁচে। বলা চলে জন্ডিসের মালা বোনা হয়। এই বোনার কৌশলেই বাড়তি সুতো মালা বাড়ায়। এবার আসা যাক মালা বানাবার পদ্ধতিতে।

বামনহাটি, ভৃঙ্গরাজ বা আপাং অথবা ফাঁপা অথচ দ্রুত শুকোয় এমন কোনও গাছের ডাল কেটে বানান হয় ছোট ছোট কাঠি, এক একটা কাঠি আড়াআড়িভাবে ধরে আঙুলের সাহায্যে ফাঁস দিয়ে গা ঘেঁষে ঘেঁষে বাঁধা হতে থাকে কাঠিগুলো। এই বিশেষ পদ্ধতির ফাঁস বা গিঁটের নাম শিফার্স নট্ (shiffer's knot) বা সেলর্সি নট্ (sailor's knot)।

গা ঘেঁষে ফাঁস জড়ান কাঠিগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যতই শুকোতে থাকে ততই সুতোর ফাঁক ঢিলে হয়, দু'কাঠির মধ্যে ফাঁক বাড়ে। মালা বাড়তে থাকে।

এই মালা বাড়ার পিছনে যেমন মন্ত্রশক্তি কাজ করে না, তেমনই জন্ডিস রোগ শুষে নেওয়াও এই বাড়ার কারণ নয়। এই একই পদ্ধতিতে মন্ত্র ছাড়া আপনি নিজে হাতে মালা বানিয়ে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন। মন্ত্র নেই, জন্ডিস নেই তবুও মালা বাড়ছে।

জন্ডিস হয় বিলিরুবিন নামে হলুদ রঙের একটি রঞ্জক পদার্থের জন্য। স্বাভাবিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর পিত্তে বিলিরুবিনের অবস্থান। রক্তে এর স্বাভাবিক উপস্থিতি প্রতি ১০০ সি·সি--তে ০·১ থেকে ১ মিলিগ্রাম। উপস্থিতির পরিমাণ বাড়লে প্রথমে প্রস্রাব হলুদ হয়। তারপর চোখের সাদা অংশ ও শরীর হলুদ হতে থাকে। রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বিভিন্ন কারণে বাড়তে পারে। প্রধানত হয় ভাইরাসজনিত কারণে। 'স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকলে, বিশ্রাম নিলে, চর্বি

জাতীয় খাবার গ্রহণ না করলে রোগী কিছুদিনের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করেন।

এছাড়াও অবশ্য জন্ডিস হতে পারে। পিত্তনালীতে পাথর, টিউমার, ক্যানসার হওয়ার জন্য অথবা অন্য কোন অংশে টিউমার হওয়ার জন্য পিত্তনালী বন্ধ হলে পিত্ত গন্তব্যস্থল ক্ষুদ্রান্তে যেতে পারে না, ফলে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং জণ্ডিস হয়।

আবার কোনও কারণে রক্তে লোহিত কণিকা অতিরিক্ত মাত্রায় ভাঙতে থাকলে হিমোগ্লোবিনের তুলনায় বেশি পরিমাণে বিলিরুবিন তৈরি হবে এবং জণ্ডিস হবে।

ভাইরাসজনিত কারণে জণ্ডিস না হয়ে অন্য কোনও কারণে জণ্ডিস হলে চিকিৎসার সাহায্যে মূল কারণটিকে ঠিক না করতে পারলে জন্ডিস-মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্রাম ও খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন মেনে জন্ডিস থেকে মুক্ত হওয়া যায় বটে (তা সে জন্ডিসের মালা পরুন, অথবা নাই পরুন), কিন্তু জন্ডিসের মালার ভরসায় থাকলে ভাইরাসজনিত কারণে হওয়া জন্ডিস থেকে মৃত্যুও হতে পারে। যকৃত স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে চিরকালের জন্য যেমন ভুগতে হতে পারে। তেমনই বিলিরুবিনের মস্তিষ্কে উপস্থিতি স্থায়ী স্নায়ুরোগ এমনকি মৃত্যুও হানতে পারে।

জন্ডিস হলে চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে জানা প্রয়োজন জন্ডিসের কারণ। পরবর্তী ধাপ হবে প্রতিকারের চেষ্টা।

জন্ডিস ধোয়ান

জন্ডিস হলে রোগীরা যেমন মালা পড়তে দৌড়ান, তেমনি অনেকে দৌড়োন জণ্ডিস ধোয়াতে।

ওঝা বা গুণীন জন্ডিস রোগীর শরীরে মন্ত্র পড়ে হাত বুলিয়ে জলে হাত ধুতেই মন্ত্র শক্তির প্রভাবে জল হলুদ রঙ ধারণ করতে থাকে। আপনি যদি ভেবে থাকেন 'রামবাবু' বা 'শ্যামবাবু' যে কেউ রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে জলে হাত ধুলেই জল জন্ডিসের বিষ ধারণ করে হলুদ বর্ণ ধারণ করবে তবে ভুল করবেন। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখার পর অনেক বিজ্ঞান পড়া মানুষ যদি মন্ত্র-তন্ত্র বা আদিবাসীদের তুক্-তাক্, ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলেন, তবে অবাক হবো না। আমাদের যুক্তিতে কোনও কিছুর ব্যাখ্যা খুঁজে না পেলে অহংবোধে ধরে নিই, এর কোনও ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব নয়, অর্থাৎ ব্যাখ্যার অতীত, অলৌকিক। আমরা অনেক সময়ই বিস্মৃত হই, আমার জ্ঞানের বাইরের কোনও কারণ দ্বারাই এমন কাজটি ঘটা সম্ভব।

প্রসঙ্গে ফেরা যাক। বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায় রোগী একটু একটু ভালও হচ্ছেন। জন্ডিস-ধোয়া গুণীনের নাম ও পসার বাড়ে। কেন সারে, এই প্রসঙ্গের আবার অবতারণা করা অপ্রয়োজনীয়, কারণ জন্ডিসের মালা নিয়ে আলোচনাতে এই প্রসঙ্গে আমি এসেছিলাম। বরং এই প্রসঙ্গে আসি, কী করে জন্ডিস রোগীর গায়ে বোলান হাত ধুলে জল হলুদ হয়।

একটু কষ্ট করে আম ছাল বেটে রস তৈরি করুন। একটা পাত্রে জল নিয়ে তাতে চুন ফেলে রাখুন। ঘণ্টা কয়েক পরে যে পরিষ্কার চুন জল পাবেন সেটা একটা বাটিতে ছেঁকে স্রেফ জল বলে যার সামনেই হাজির করুন—সকলেই সাধারণ জল বলেই বিশ্বাস করবেন। হাতে ঘষুন আমগাছের রস। এবার একজন সুস্থ মানুষের গায়ে হাত বুলিয়ে হাতটা বাটির চুন জলে ধুতে থাকুন, দেখবেন সেই অবাক কাণ্ডটাই ঘটে যাচ্ছে—জল হলুদ হয়ে যাচ্ছে।

যেসব প্রচলিত তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম, এর বাইরেও কিছু কিছু থেকে গেছে, যেগুলো অপ্রধান বলে আলোচনায় আনিনি, অথবা এমন কিছু কিছু তুক-তাক নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হতো, যেগুলোর বিষয়ে আমি এখনও কিছু শুনিনি বলে আলোচনা করতে পারলাম না। সে সব তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁকের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিয়ে কেউ যদি এর লৌকিক ব্যাখ্যা চান, নিশ্চয়ই দেব। এই বিষয়ে আপনাদের কোনও অনুসন্ধানে প্রয়োজনে আমার এবং আমাদের সমিতির সমস্ত রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি রইলো। শুধু অনুরোধ, চিঠি জবাবী খাম সহ পাঠাবেন।

আট

ঈশ্বরের ভর

ঈশ্বরের ভর কখনও মানসিক রোগ, কখনও অভিনয়

মনসা, শীতলা, কালী, তারা, দুর্গা, চড়ক পুজোর সময় শিব এবং কীর্তনের আসরে রাধা বা গৌরাঙ্গের ভর, এমনি আরও কত পরিচিত, অল্পপরিচিত, অপরিচিত ঠাকুর-দেবতারা যে মানুষের ওপর ভর করে তার ইয়ত্তা নেই। ঠাকুরে ভর হওয়া মানুষগুলোর বেশিমাত্রায় খোঁজ মিলবে মফস্বলে গ্রামে-গঞ্জে। শহর কলকাতাতেও অবশ্য ভর হওয়া মানুষের সাক্ষাৎ মেলে। ভবিষ্যৎ জানতে, অসময় থেকে উত্তরণের জন্য দৈব ওষুধ পেতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বহু মানুষই এইসব ভর হওয়া মানুষগুলোর দ্বারস্থ হন। অনেক ক্ষেত্রে ঠাকুরে ভর হওয়া মানুষগুলো এমন সব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য আচরণ করেন যে সাধারণ বুদ্ধিতে অনেকে এতে অলৌকিকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। বিশ্বাস করেন মানুষটির শরীর ঈশ্বর দখল করাতেই এমনটি ঘটছে।

কৈশোরের একটি ঘটনা। তখন দমদম পার্ক-এ থাকি। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে মাঝে-মধ্যে নাম গানের আসর বসত। শুনেছিলাম নাম-গান শুনতে শুনতে বন্ধুর মায়ের ওপর রাধার ভর হত। একবার দেখতে গেলাম। বন্ধুর মা নাম সঙ্কীর্তন করতে করতে এক সময় হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে মাথা দোলাতে লাগালেন। মনে হতে লাগল মাথাটাই বুঝি বা গলা থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। উন্মত্তের মত আচরণ করতে লাগলেন। ভক্তরা তাঁকে ধরাধরি করে এক জায়গায় বসালেন। ভক্তরা অনেকেই এই সময় বন্ধুর মাকে শুয়ে পড়ে প্রণাম জানাচ্ছিলেন। সেদিন শারীর-বিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানের অভাবে বন্ধুর মায়ের এমন অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ আমার অজানা ছিল, তাই বিস্মিত হয়েছিলাম। আজ কিন্তু শারীর-বিদ্যার কল্যাণে জানতে পেরেছি সে-দিন আমার বন্ধুর মা নাম-সঙ্কীর্তন করতে করতে ভক্তিরসে, ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যা যা করেছিলেন সে সব ছিল হিস্টিরিয়া রোগেরই অভিব্যক্তি, অথবা নিজেকে অন্যদের চেয়ে বিশিষ্ট, শ্রদ্ধেয় বলে প্রচার করার মানসিকতায় তিনি ইচ্ছে করেই পুরো ব্যাপারটা অভিনয় করছিলেন।

প্রাচীন যুগ থেকেই হিস্টিরিয়া রোগকে মানুষ অপার্থিব বলেই মনে করতেন।

রোগের উপসর্গকে মনে করা হত ভূত বা ঈশ্বরের ভরের বহিঃপ্রকাশ। এ যুগেও সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে এখনও অনেক ক্ষেত্রেই হিস্টিরিয়া রোগী পূজিত হয় ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসেবে। সাধারণভাবে অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা প্রগতির আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই এই ধরনের হিস্টিরিয়া রোগীর সংখ্যা বেশি। সাধারণভাবে এই শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করার ক্ষমতা অতি সীমিত। বহুজনের বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা যাদের কম তারা এক নাগাড়ে একই ধরনের কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময় মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। একান্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ভূতে বিশ্বাসের ফলে রোগী ভাবতে থাকে তার শরীরে ঈশ্বরের বা ভূতের আর্বিভাব হয়েছে, ফলে রোগী ঈশ্বর বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভুত সব আচরণ করতে থাকে।

'ভূত-ভর' প্রসঙ্গে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আগে করা হয়েছে। তাই পাঠকদের একই ধরনের কথা বলে তাঁদের ধৈর্যের উপর অত্যাচার করার চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত করলাম। বরং এখানে একটি গণহিস্টিরিয়ার উদাহরণ তুলে দিচ্ছি।

হিস্টিরিয়া যখন ভর

১৯৬৬ সালের মে মাসের ২৭ তারিখ। স্থান—রাঁচীর উপকণ্ঠের পল্লী। সময়—সন্ধ্যা। নায়িকা একটি কিশোরী। প্রচণ্ড মাথা দোলাতে-দোলাতে শরীর কাঁপাতে-কাঁপাতে কী সব আবোল-তাবোল বকতে লাগল।

সন্ধে বেলায় জল বয়ে আনার পরই এমনটা ঘটেছে, নিশ্চয়ই ভূতেই ধরেছে। বাড়ির লোকজন ওঝাকে খবর দিলেন। ওঝা এসে কাঠকয়লায় আগুন জ্বেলে তাতে ধুনো, সরষে আর শুকনো লঙ্কা ছড়াতে শুরু করল, সঙ্গে নানা অঙ্গভঙ্গি করে মন্ত্র-পাঠ। মেয়েটি কঠিন গলায় ওঝার ওইসব কাজ-কর্মে বিরক্ত প্রকাশ করল। ওঝা দেখলে ভর করা ভূতেরা চিরকালই ক্ষুব্ধ হয়। অতএব ভূতের রাগে ওঝার উৎসাহ তো কমলই না, বরং দ্বিগুন উৎসাহে মন্ত্রসহ নাচানাচি শুরু করল।

গম্ভীর গলায় মেয়েটি জানাল, সে ভূত নয়, ভগবান, সে 'বড়ি-মা' অর্থাৎ মা' দুর্গা। ওঝা ওর সামনে বেয়াদপি করলে শাস্তি দেবে। ওঝা অমন অনেক দেখেছে। ভূতের ভয়ে পালাবার বান্দা সে নয়। সে তার মত মন্ত্র-তন্ত্রে পাঠ চালিয়ে যেতে লাগল। মন্ত্র পড়া সরষের কিছুটা কাঠকয়লার আগুনে আর কিছুটা মেয়েটির গায়ে ছুঁড়ে মারতেই মেয়েটি অগ্নিকুণ্ড থেকে টক্‌টকে লাল একমুঠো জ্বলন্ত কাঠ কয়লা হাতে তুলে নিয়ে ওঝাকে বলল, "এই নে ধর প্রসাদ।" ওঝার হাতটা মুহূর্তে টেনে নিয়ে মুহূর্তে ওর হাতে উপুড় করে দিল জ্বলন্ত কাঠকয়লাগুলো।

তাপে ও যন্ত্রণার তীব্রতায় ওঝা চিৎকার করে এক ঝটকায় কাঠ কয়লা উপুড় করে ফেলে দিল। মেয়েটি কিন্তু নির্বিকার। তার চোখে-মুখে যন্ত্রণার সামান্যতম চিহ্ন লক্ষ্য করা গেল না। এমনকি হাতে ফোস্কা পর্যন্ত নয়। উপস্থিত প্রতিটি দর্শক হতচকিত,

বিস্মিত। এ মেয়ে 'বড়ি-মা' না হয়েই যায় না। প্রথমেই নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করল ওঝাটি। তার বশ্যতা স্বীকারে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো।

মেয়েটি তার মা-বাবাকে নাম ধরে সম্বোধন করে জানাল, "আমার কাছে মানত করেও মানত রাখিসনি বলে আমি নিজেই এসেছি।"

মা-বাবা ভয়ে কেঁপে উঠলেন, মানত করে মানত না রাখতে পারার কথাও তো সত্যি। মা-বাবা মেয়ের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন। মেয়েটি রাতারাতি 'বড়ি-মা' হয়ে গেল। আশপাশের গ্রামগুলো থেকে দলে দলে মানুষ বড়ি-মা'-র দর্শনের আশায়, কৃপালাভের আশায়, সমস্যা সমাধানের আশায় রোগ-মুক্তির আশায় হাজির হতে লাগলেন। কিশোরীটির ব্যবহারে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসে গেছে। কেউ জুতো পায়ে, লাল পোশাক পরে বা চশমা পরে ঢুকতে গেলেই র্ভৎসনা করছে। বড়দেরও নানা ধরনের আদেশ করছে। ভক্তরা ফল, ফুল, মেঠাইয়ে ঘর ভরিয়ে তুলতে লাগলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে চলতে লাগল। বড়ি-মার পুজো। এরই মধ্যে বড়ি-মার কিছু সেবিকাও জুটে গেছে। বড়ি-মার আবির্ভাবের দিন দুয়েকের মধ্যে এক বয়স্কা বিবাহিতা সেবিকা ঘন ঘন ফিট হতে লাগলেন। এক সময় বড়ি-মার মতন মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘোষণা করলেন তিনি 'ছোটি-মা'। একই ঘরে দু-মায়েরই পুজো শুরু হয়ে গেল।

কিশোরী ও বিবাহিতা মহিলার ওপর বড়ি-মা ও ছোটি মা-র ভরের কাহিনী ঘিরে আশেপাশে বিরাট অঞ্চল নিয়ে তখন দারুণ উত্তেজনা ; বলতে কি ধর্মোন্মাদনা। ৩০মে এক অষ্টাদশী তরুণী ঘন ঘন ফিট হতে লাগলেন। পড়শীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মেয়েটিকে ভূতে পেয়েছে কি ঠাকুরে—বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওঝা আসবে, কি পুজো করবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তাঁদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মেয়েটি ঘোষণা করল, সে মা কালী। এখানেও দলে দলে ভক্ত জুটে গেলেন। রাঁচীর আশেপাশে ঈশ্বরের ঘন ঘন আবির্ভাবে ভক্তরা শিহরিত হলেন। বুঝলেন কলির শেষ হলো বলে। কলি যুগ ধ্বংস করে আবার সত্য যুগ প্রতিষ্ঠা করতে এবার হাজির হলেন ধ্বংসের দেবতা মহাদেব। আট বছরের একটি বালকের মধ্যে তিনি ভর করলেন।

৩১মে একটি বিবাহিতা তরুণীর ওপর ভর করলেন 'মাঝলী-মা'। সে-রাতেই এক সদ্য তরুণী নিজেকে ঘোষণা করল 'সাঁঝলি-মা' বলে। এদের ক্ষেত্রেও মায়েদের আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল ঘন ঘন ফিট ও হিস্টিরিয়া রোগীর মতই মাথা ঝাঁকান, শরীর দোলানর মধ্য দিয়ে।

রাঁচীর মানসিক আরোগ্যশালার চিকিৎসকদের দৃষ্টি স্বভাবতই এমন এক অদ্ভুত গণহিস্টিরিয়া ঘটনার দিকে আকর্ষিত হয়েছিল। সাত দিনের মধ্যেই এইসব ভরের রোগীরা তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। রাঁচী মানসিক আরোগ্যশালার চিকিৎসকদের মতে, গ্রামের ভরে পাওয়া রোগীরা প্রত্যেকেই পরিবেশগতভাবে বিশ্বাস করত, ঈশ্বর সময় সময় মানুষের শরীরে ভর করে। একজন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে হিস্টিরিয়ার শিকার হলে সে নিজের সত্তা ভুলে গিয়ে ঈশ্বরের সত্তা নিজের মধ্যে প্রকাশিত ভেবে অদ্ভুত সব আচরণ করতে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগই শিক্ষালাভে বঞ্চিত, ধর্মান্ধ, যুক্তি-বুদ্ধি কম, আবেগপ্রবণ এবং তাদের

মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা কম। ফলে একজনের হিস্টিরিয়া রোগ অন্যের মধ্যে দ্রুত সঞ্চারিত হয়েছে। যারা হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিল ঈশ্বর তাদের ওপরেও ভর করেছে। শুরুর পর্যায়ে তাদের ভাবনা ছিল আমার ওপরেও যদি ঈশ্বর ভর করে ? এক সময় 'যদি' বিদায় নিয়েছে। রোগীরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল ঈশ্বর তার ওপর ভর করেছে। যে ঈশ্বর অপর একজনের ওপর ভর করেছে, সে আমার ওপরেও ভর করতে পারে। এই বিশ্বাস থেকেই তাদের প্রত্যেকের ওপর ভর করেছে এক একটি নতুন নতুন ঈশ্বর।

কল্যাণী ঘোষপাড়ায় সতীমা'য়ের মেলায় ভর

নদীয়া জেলার কল্যাণী ঘোষপাড়ায় প্রতি বছর দোল উৎসবে সতী'-মার বিরাট মেলা বসে। সার্কাস, সিনেমা, ম্যাজিক, নাগরদোলা, বাউলের গান, দোকান-পাঠ আর লক্ষ লক্ষ ভক্ত। সমাগমে মেলা আশপাশের বিরাট অঞ্চলকে জাঁকিয়ে রাখে। 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের আউলিয়া এই মেলায় দেড়শ-দু'শ তাঁবু ও আখড়া হয়, পুলিশ ফাঁড়ি বসে। পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ নানা মানসিক ও প্রার্থনা নিয়ে আসেন। কেউ আসেন রোগ মুক্তির কামনা নিয়ে, কেউবা আসেন সন্তান কামনায়, কেউবা অন্য কোনও সমস্যা নিয়ে। এখানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'গণ-ভর'। কয়েক শত পুরুষ ও মহিলার উপর সতী'-মার ভর হয়।

সতীমায়ের বাক্‌সিদ্ধ হওয়ার যে কাহিনী ভক্তদের মুখে মুখে ঘোরে, তা এরকম। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় ভাগ্য-অন্বেষণে রামশরণ পাল এসে বসবাস শুরু করেন নদীয়া জেলার কল্যাণীর কাছে ঘোষপাড়ায়। বিয়ে করেন সদগোপ জমিদার গোবিন্দ ঘোষের মেয়ে সরস্বতীকে। আউলচাঁদ ফকিরের সঙ্গে পথে আলাপ রামশরণের। রামশরণ তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন। আউলচাঁদ ডেরা বাঁধেন রামশরণের বাগানের ডালিমতলায়। পাশেই হিমসাগর পুকুর দেখে ফকির আনন্দে আত্মহারা। বললেন, "বাঃ, এটায় চান করলেই গঙ্গা চানের কাজ হয়ে যাবে। এর সঙ্গে গঙ্গার যোগাযোগ রয়েছে রে।"

অদ্ভুত ব্যাপার, তারপর থেকে গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে পুকুরেও জোয়ার-ভাটা হতো। রামশরণ ও সরস্বতী বুঝেছিলেন, ফকির বাক্‌সিদ্ধ। একদিনের ঘটনা, সরস্বতী কিছুদিন ধরেই অসুখে ভুগছিলেন। সে-দিন অসুস্থতা খুব বাড়তে চিন্তিত রামশরণ দৌড়ালেন কবিরাজ মশাইকে ধরে আনতে। পথে আউলচাঁদ রামশরণকে থামালেন। সরস্বতীর অসুস্থতার খবর শুনে বললেন, "তোকে আর কবিরাজের কাছে যেতে হবে না। আমাকে বরং তোর বউয়ের কাছে নিয়ে চল।"

রামশরণের কী যে কি হলো। কবিরাজের কাছে না গিয়ে আউলচাঁদকে নিয়ে ফিরলেন। ফকির সরস্বতীর শরীরে হাত বুলিয়ে দিতেই রোগের উপশম হলো। মুগ্ধ,

ভক্তি আপ্লুত রামশরণ ও সরস্বতী আউলচাঁদ ফকিরের কাছে দীক্ষা নিলেন। সিদ্ধপুরুষ আউলচাঁদ জানান, সরস্বতী বাক্‌সিদ্ধ হবেন। পরবর্তী ছয় পুরুষও হবেন বাক্‌সিদ্ধ। রামশরণ ও সরস্বতীর কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কর্তা হয়ে আউলিয়া ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করেন। সরস্বতীর বাক্‌সিদ্ধ ক্ষমতার কথা প্রচারিত হতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষের স্রোত এসে ভেঙে পড়তে লাগল সরস্বতীর বাড়িতে। বাক্-সিদ্ধা সরস্বতী যাকে যা বলতেন তাই হতো। যে রোগীদের উপর সদয় হতেন, বলতেন, "যা ভাল হয়ে যাবি। একটু হিমসাগরের জল আর ডালিমতলার মাটি মুখে দে গে যা।" রোগীরা ভালও হয়ে যেত। একটিই শুধু নিষেধ ছিল—শুক্রবার মাছ, মাংস, ডিম, রসুন, পেঁয়াজ, মুসুরডাল আর পুঁই খাওয়া চলবে না, চলবে না কোনও নিমন্ত্রণ খাওয়া।

শুক্রবারটা সরস্বতী ও রামশরণের কাছে ছিল পুণ্য-বার। ওই দিনেই আউলচাঁদ ফকির ডালিমতলায় এসেছিলেন।

দ্রুত বাক্-সিদ্ধা সরস্বতী ভক্তদের কাছে হয়ে উঠলেন সতীমা। রামশরণ ও সতীমা বিশ্বাস করতেন, গৌরাঙ্গই আউলচাঁদ ফকির বেশে এসেছিলেন। আউলচাঁদ দীক্ষা দিয়েছিলেন বাইশ জনকে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও বাইশ জনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। দু'জনের মধ্যে ছিল এমনি নাকি আরও অনেক মিল।

সতী'-মার মৃত্যুর পর দোল পূর্ণিমায় মেলা হচ্ছে তাও বহু বছর হলো। এই সতীমার মেলায় নাকি রামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেরী সাহেব, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অনেকেই গিয়েছিলেন। নবীন সেনের আত্মজীবনীতেও মেলার গণ-ভরের বিবরণ মেলে—

"আমি দেখিয়াছি যে, শতশত নরনারী 'সতীমাঈ'-র সমাধি সমীপস্থ 'দাড়িম্বতলায়' বৈষ্ণবদের মত দশাপ্রাপ্তা হইয়া অচৈতন্য অবস্থার দিনরাত্রি ধরণা দিয়া পড়িয়া থাকে, কেহ বা অপদেবতাশ্রিত লোকের মত মাথা ঘুরাইতেছে ও কেহ উন্মাদের মত নৃত্য করিতেছে।"

এখনও একই জিনিস চলছে। অনেক ভক্তরাই হিমসাগরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে দণ্ডী খেটে ডালিম তলা ঘুরে আবার হিমসাগরে যায়। ডালিমতলার মাটি আর হিমসাগরের জল এখনও বহু বিশ্বাসীই পরম ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন। অনেকে মানত করে ডালিমতলায় বর্তমানে যে ডালিম গাছ আছে তাতে ঢিল বেঁধে যায়। মনস্কামনা পূর্ণ হলে অনেকেই ডালিমতলায় সতীমাকে শাড়ি চড়ায়। মেলায় তিন দিনে শ'পাঁচেক শাড়ি তো চড়েই। 'গদি'-তে আসীন 'বাবুমশায়'-কে ভক্তরা প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে তাঁদের সমস্যার কথা জানান। ভক্তেরা বিশ্বাস করেন, গদি'-তে বসার অধিকারী বাবুমশায় সতীমার কৃপায় সে-সময় বাক্-সিদ্ধ হন। বাবুমশায় অনেককেই বলেন, "যা তোর সেরে যাবে," কারও হাতে তুলে দেন ফুল, কাউকে আদেশ দেন ডালিমতলার মাটি নিয়ে যেতে, যাকে যেমন ইচ্ছে হয় তেমনই আদেশ করেন। প্রণামী পড়ে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা।

মেলায় ভর দেখার মত ব্যাপার। কয়েক'শ মহিলা পুরুষ ভরে আক্রান্ত হন। তাদের মাথা প্রচণ্ডভাবে দুলতে থাকে, কেউ মাটিতে সশব্দে মাথা ঠুকতে থাকেন, কেউ ছেঁড়েন চুল। হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষগুলো এক সময় ঝিমিয়ে মাটিতে লুটিয়ে

পড়েন। 'গদি'-র 'বাবুমশায়' ভরে ঝিমিয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলোর হাতে ফুল ধরিয়ে দিতেই তাঁদের ভর কেটে যায়, উঠে পড়েন। গত পনের বছর ধরে গদিতে আসিন অজিতকুমার কুণ্ডুই এই দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন।

হাড়োয়ার উমা সতীমার মন্দিরে গণ-ভর

উত্তর ২৪-পরগনার হাড়োয়াতে জন্মাষ্টমীর দিন উমা সতীমার মন্দিরে কর্তাভজা আউলিয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয়। উমা বিশ্বাস সতীমা হিসেবেই পরিচিতা। ওখানেও গদিতে বসেন, 'বাবুমশায়' অজিতকুমার কুণ্ডু। ভক্তেরা রোগ ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বাবুমশায়ের কাছে প্রণামী নিয়ে মানত করে যান, বাবুমশায় নানাজনকে নানা রকমের ব্যবস্থাপত্র দেন।

এখানেও ৬০ থেকে ৮০ জনের ভর হয়। এই ভরও একান্তভাবেই গণ-হিস্টিরিয়া। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতই মাথা দোলানো, মাথা-ঠোকা, হাত-পা ছোঁড়া, সবই করেন এঁরা। শারীরিক তীব্র আক্ষেপের ফলে একসময় রোগীরা ঝিমিয়ে পড়েন। ঝিমিয়ে পড়ে থাকা রোগীদের হাতে বাবুমশায় অজিত কুণ্ডু ফুল গুঁজে দিতেই ভর কেটে যায়। রোগীরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।

যোগীপাড়ায় শ্রাবণী পূর্ণিমায় গণ-ভর

দমদমের যোগীপাড়ায় জীবনী দাসের মন্দির। জীবনী দাস কর্তাভজা আউলিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। এখানে শ্রাবণী পূর্ণিমায় কর্তাভজা আউলিয়া সম্প্রদায়ের ভক্তরা আসেন। গানের মাঝে ভক্তদের অনেকেরই ভর হয়। প্রতি বছরই শ্রাবণী পূর্ণিমার উৎসবে ১৫ থেকে ২৫ জন ভরে পড়েন। এখানেও ভর থাকে মিনিট পঁয়তাল্লিশের মত। ভর একজনের শুরু হতেই তার দেখাদেখি অন্যরাও ভরে আক্রান্ত হয়। প্রত্যেকেই হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করেন, প্রচণ্ড বেগে মাথা ঘুরিয়ে দোলাতে থাকেন। যখন শরীর আর দেয় না, অবসন্ন হয়ে পড়েন তখন 'গদি'-র বাবুমশায় অজিত কুণ্ডু ভক্তদের হাতে ফুল ধরিয়ে দেন। ভক্তদের ভর কাটে।

সতী -মা মেলার 'গদি'-র বাবুমশায় যুক্তিবাদী হলেন

১৯ মার্চ '৯০-এর সন্ধ্যা। অজিতকুমার কুণ্ডু এলেন আমার ফ্ল্যাটে। কিছুটা অভাবনীয় ঘটনা, সন্দেহ নেই। আমিই সাধারণত অবতার- জ্যোতিষীদের কাছে যাই। তাঁদের আসাটা তুলনায় খুবই কম। অজিত কুণ্ডু হাসিখুশি মানুষ। চোখের দৃষ্টিতে যথেষ্ট বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। ফর্সা, মেদহীন লম্বা চেহারা। তীক্ষ্ণ নাক, কাঁচা-পাকা চুল, পড়নে ধুতি পাঞ্জাবি, যদিও বয়স সাতাত্তর কিন্তু চেহারা ও সপ্রতিভতা দেখে বয়সটা ষাটের বেশি কিছুতেই মনে হয় না।

আসার উদ্দেশ্যটা যখন জানালেন, তখন আরও কিছুটা বিস্মিত হলাম। অজিতবাবু

আমাদের সমিতির সদস্য হতে চাইলেন। অবশ্য অজিতবাবুই প্রথম ধর্মীয় নেতা নন, যিনি আমাদের সমিতির সদস্য হতে চাইলেন। এর আগে একাধিক জ্যোতিষী আমাদের সমিতির প্রচেষ্টায় বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্র আদৌ কোনও বিজ্ঞান নয়, লোক ঠকানোর ব্যবস্থামাত্র এবং তারপর জ্যোতিষ চর্চা বন্ধ করে আমাদের সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করে মানুষ গড়ার কাজে ব্রতী হয়েছেন। একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃ-স্থানীয় একাধিক ধর্মীয় নেতা আমাদের সদস্য হয়েছেন। তাঁরাই তথাকথিত ধর্মীয় সংস্থাটির অনেক নৈতিক অপরাধ, যৌন বিকৃতির খবর জানিয়েছিলেন। অতি উচ্চশিক্ষিত এই ধর্মীয় নেতারা প্রতিষ্ঠানটির নামে, ঈশ্বরকে পাওয়ার আকুতিতে, মানব সেবার মধ্য দিয়ে মানবিকতার বিকাশ ইচ্ছাতে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। মোহ ভঙ্গ হয়েছে। বুঝেছেন ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর অনুভূতি মানসিক ভারসাম্যহীনতা থেকে আসা অলীক দর্শন বা অলীক অনুভূতি মাত্র। আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় এমনই এক প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা জানিয়েছিলেন গ্রামাঞ্চলে ভূতে ভর দেখেছেন, আধুনিক মানসিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই সারিয়েছেন, কিন্তু সে বিষয়ে মুখ না খুলে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার দ্বারা ভূত তাড়িয়েছেন বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় নেতারা এ-ও জানিয়েছেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন শাখায় তাঁদের উদ্যোগেই গোপনে পড়ান হচ্ছে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি। জানিয়েছিলেন, অনেকেই আমাদের সমিতির হয়ে কাজ করতে উৎসাহী। অনেক সন্ন্যাসীই সরাসরি আমাদের হয়ে কুসংস্কার-বিরোধী কাজে সামিল হতে চান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে। আমাদের কাছে আলোচকরা একটি সমস্যার কথা বলেছিলেন, যেটা আমাদের ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা বাধার প্রাচীর তুলে রেখেছে। উচ্চ শিক্ষিত সন্ন্যাসীরা চেয়েছিলেন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করে বহু সন্ন্যাসীরা তাঁদের ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। তবে, তার আগে আমাদের সমিতিকে সন্ন্যাসীদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

'৮৮-র ১১ ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনেও আমরা এই প্রসঙ্গটি তুলে জানিয়েছিলাম, সরকারি সহযোগিতায়, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারলে আমরা সাংবাদিক সম্মেলনেই ওই সন্ন্যাসীদের হাজির করব।

সেদিন আর্থিক সঙ্গতি-শূন্য আমরা লড়াকু সন্ন্যাসীদের আরও কাছে আরও লড়াইতে নিয়ে আসতে পারিনি। আজ পর্যন্ত আমরা পারিনি তাঁদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিতে।

বাবু মশায় অজিতবাবুকে নিয়ে দ্বিধা ছিল অন্য রকম। তিনি কি বাস্তবিকই ওয়াকিবহাল তাঁর চিন্তাধারার বিপরীত শিবিরে আমাদের বাস। ধর্মগুরু সাজাটা যে মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে লোক ঠকানোরই নামান্তর মাত্র, এটাই তো তথ্য-প্রমাণ সহযোগে আমরা প্রমাণ করি।

অজিতবাবুকে সদস্য করতে আমাদের সমস্যা কোথায়, সবই খোলাখুলি জানালাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের একজন হওয়ার বিনিময়ে সতী মেলার গদীতে বসা বন্ধ রাখতে পারবেন ?"

অজিতবাবু জানালেন, "আমি কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আসিনি, আপনাদের কাছ থেকে কিছু শিখে নিয়ে, সে-সব কাজে লাগিয়ে আরও বড় অবতার হয়ে বসব। আমার এখানে আসার কারণ আপনার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি। আমি যখন গদীতে বসি, তখন আমি যেন কেমন একটা শক্তি পাই। কেউ যখন প্রণাম করে উপায় জানতে চায়, আমার তখন মনে হয় সতীমাই যেন আমার মুখ দিয়ে কথা বলিয়ে নিচ্ছেন। বছরের পর বছর দেখে আসছি লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের মানত জানাতে আসছে। আবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছে। আপনার বইটা পড়ার পর মনে হলো, আমি ছোটবেলা থেকেই সতীমা, তাঁর অলৌকিক বাক্-সিদ্ধ ক্ষমতা, সতী মেলায় গদির ক্ষমতা, এইসব শুনে শুনে এগুলোকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার প্রচণ্ড আবেগকে, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভক্তি, বাউল গান, সতীমার জয়ধ্বনি এইসব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা ভক্তিরসাশ্রিত পরিবেশ আরও বেশি প্রভাবিত করত। তারই ফলে গদিতে বসলেই আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মনে করতে থাকতাম আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। আমার কথাগুলো সতীমারই নির্দেশ।

আপনার বইটার 'বিশ্বাসে অসুখ সারে' অধ্যায়টা পড়ার পর আমার মনে হচ্ছে, যারা সতীমার মেলায় এসে রোগ মুক্ত হচ্ছে, তারা সতীমার প্রতি বিশ্বাসে, আমার কথায় বিশ্বাস করেই রোগ মুক্ত হচ্ছে। এবার দোলের মেলায় যাদের ভর হয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করে আমার মনে হয়েছে আপনার কথাই সত্যি। ওরা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড আবেগে, অন্ধবিশ্বাসে হিস্টিরিয়া রোগের শিকার হয়েছিল। একজনের ভর দেখে আরেকজন, তাকে দেখে আরেকজন, এভাবেই জনে জনে স্রেফ হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে উন্মত্ততা দেখিয়েছে, আর তাকেই সাধারণ মানুষ মনে করেছে সতীমার কৃপার ফল, স্থান মাহাত্ম্য ইত্যাদি। যখনই দেখেছি ভরে পাওয়া মানুষগুলো উন্মত্ততা প্রকাশ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে তখনই ওদের হাতে একটা করে ফুল ধরিয়ে দিয়েছি। যারা এখানে আসে তারা এও জানে আমি ফুল হাতে দিলে ভর কেটে যায়। তাদের এই অন্ধ-বিশ্বাসের ফলেই ফুল হাতে পেতে ভর কেটেছে।

১৯ মার্চ '৯০ শেষ সন্ধ্যায় বাবুমশায় অজিতকুমার কুণ্ডুকে যুক্তিবাদী অজিত কুণ্ডু করে নিয়েছি। লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে জানিয়েছেন—আগামী বার থেকে আর বাবুমশায়ের ভূমিকা নেবেন না। প্রত্যাশা রাখি, তিনি কথা রাখবেন।

আর একটি হিস্টিরিয়া ভরের দৃষ্টান্ত

এবার যে ঘটনার কথা বলছি সেটা ঘটেছিল তেলাড়ী গ্রামে। তেলাড়ী, সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত একটি গ্রাম। খেটে খাওয়া গরিবরাই সংখ্যাধিক। শিক্ষিতের হার শতকরা কুড়ি ভাগ। গ্রামের প্রভাবশালী মণ্ডল পরিবারের উদ্যোগে প্রতি বছর একবার মহোৎসব হয়। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকেই চাল, ডাল, টাকা তোলা হয়।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই মহোৎসবে যোগ দেয়।

বছর কয়েক আগে পূর্ণিমার পরের দিন মহোৎসবের অনুষ্ঠানে সহদেব পণ্ডিতের বউয়ের ভর হলো। বউটি উপোস করে ঘুরে ঘুরে মাগন মেগে (ঈশ্বরের নামে ভিক্ষা চাওয়া) এসে স্নান করে ভিজে কাপড়ে গণ্ডী কাটছিলেন। দু'তিনটে গণ্ডী কাটার পর উঠেই কেমন নাচতে লাগলেন। নেচে নেচে ঘুরতে ঘুরতে বলতে লাগলেন, "তোরা ঠিকমত আমার পুজো দিসনি। তোদের পুজোয় ত্রুটি রয়েছে।"

ধুলো-কাদা মাখা শাড়ি, খোলা লম্বা ধুলো মাখা ভেজা চুল, পাগলের মত দৃষ্টি, অনর্গল কথা শুনে উপস্থিত প্রায় সকলেই ধরে নিলেন—সহদেবের বউয়ের উপর ঠাকুরের ভর হয়েছে।

মহিলাটি পুজো মণ্ডপ ঘুরছেন আর নির্দেশ দিয়ে চলেছেন কী কী করতে হবে। ব্যবস্থাপকরা প্রত্যেকেই ওঁর কথাকেই ঠাকুরের নির্দেশ ধরে নিয়ে তা পালন করতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন। ঠাকুরের আদেশ অমান্য করার পরিণতির কথা ভেবে তাঁদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না।

আবার নতুন করে পুজোর আয়োজন চলতে লাগল। মহিলার আদেশে হরিনামের দল নামগান সর্বোচ্চসুর তুলে শুরু করলেন, খোলের উপর চাঁটিও পড়তে লাগল আরও জোরে। এমন এক অসাধারণ অলৌকিক দেবমাহাত্ম্য যাঁরা দেখার সুযোগ পেলেন তাঁরা নিজের জীবন ধন্য মনে করে অনেকেই আনন্দে কেঁদে ফেললেন। ঝড়ের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহোৎসবের চারিপাশে শুধু মানুষ, আর মানুষ। অনেকেই ধারণা ব্যক্ত করলেন, "আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে কি আর আগের মত করে ভক্তি ভরে পুজো হয় ? কেউবা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হাতটাও ভাল করে না ধুয়ে পুজোর আয়োজনে লেগে পড়ল। আরে, পুজো কি তোদের ছেলেখেলা ?"

এই ধরনের একটা মানসিকতা হয় তো মহিলাটিরও ছিল। হয় তো পরম ভক্ত মহিলাটির পুজোর আয়োজনের অনেক কিছুই মনে ধরেনি। বরং বিরক্তিতে মন ভরেছে। তারই ফলে এক সময় মেয়েটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন তার উপর দিয়েই বর্ষিত হচ্ছে ঈশ্বর নির্দেশ—বাস্তবে যা ছিল একান্তভাবে তাঁরই নির্দেশ।

চিন্তামণির ভর মানসিক অবসাদে

হিস্টিরিয়া ছাড়া ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ রোগীরাও অনেক সময় নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তার প্রকাশ ঘটেছে বলে বিশ্বাস করে অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা করতে থাকেন, যা স্বাভাবিক অবস্থায় সম্ভব নয়। ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ রোগীরাও বেশির ভাগই অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত এবং কুসংস্কারে ও ধর্মীয় বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। আক্রান্তদের বেশির ভাগই মহিলা এবং বিবাহিতা। পারিবারিক জীবনে এরা অনেক সময়ই অসুখী এবং দায়িত্বভারে জর্জরিত। এবং তার দরুন মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত। বছর তিরিশ আগের ঘটনা। খড়গপুরের চিন্তামণি বাড়ি বাড়ি বাসন

মাজার কাজ করত। যখনকার ঘটনা বলছি তখন চিন্তামণি তিনটি ছেলেমেয়ের মা। স্বামী রেল ওয়াগন ভেঙে মাঝে-মধ্যে যা রোজগার করে তার সিংহভাগই নেশার পিছনে শেষ করে দেয়। মাঝে-মধ্যে নানা কারণে জেলে ঘুরে আসতে হয়। চিন্তামণির শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য চিন্তামণিকেই দোষ দেয়। স্বামী মাঝে-মধ্যে নেশার টাকার জন্য চিন্তামণিকে প্রচণ্ড প্রহার করে। এক সময় স্বামী কয়েক মাস জেলের লপ্‌সি খেয়ে ফিরে এসে চিন্তামণির চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কয়েকটা দিন ওর ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে অকথ্য অত্যাচার চালাল। একদিন রাতে হঠাৎ স্বামীর তর্জন-গর্জন শুরু হতেই চিন্তামণি ততোধিক গর্জন করে তার স্বামীকে আদেশ করল, সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণাম করতে। আদেশ শুনে স্বামী তাকে প্রহার করতে যেতেই চিন্তামণি পাগলের মত মাথা দোলাতে দোলাতে দিগম্বরী হয়ে স্বামীর দুগালে প্রচণ্ড কয়েকটি চড় কষিয়ে বলল, 'জানিস আমি কে? আমি মা-কালী।'

চিন্তামণির এই ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ রোগ অনেকের চোখেই ছিল নেহাতই ঈশ্বরের লীলা। জনৈক রেলওয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক চিন্তামণির স্বামীকে বলেছিলেন, অসুস্থ চিন্তামণির চিকিৎসা করাতে। বুঝিয়েছিলেন এটা একটা পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু চিন্তামণির স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি কেউই চিকিৎসকের সাহায্য নিতে রাজি হয়নি। রাজি না হওয়ার একটা অর্থনৈতিক কারণও বোধহয় ছিল। ভক্তদের কাছ থেকে রোজগারপাতি খুব একটা কম হচ্ছিল না। স্কিজোফ্রিনিয়া রোগীদের মধ্যে

স্কিজোফ্রিনিয়া রোগীদের মধ্যে ভর জিনিসটা অনেক সময় দেখা দেয়। স্কিজোফ্রিনিয়া রোগীরা অতি আবেগপ্রবণ, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে শ্রেণীর হোন না কেন। এই আবেগপ্রবণ মনে ঈশ্বর বিশ্বাস অনেক সময় এমনই প্রভাব ফেলে যে রোগী মনে করতে থাকেন ঈশ্বর বোধহয় তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। স্কিজোফ্রিনিয়া এই ধরনের ভুল দেখায় বা ভুল শোনায়। এই ভুল থেকেই তাঁরা নিজের সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের সত্তাকে অনুভব করে।

আমাদের দেশে ভরে পাওয়া রোগীর চেয়ে ভরের অভিনয় করা অবতারদের সংখ্যা অনেক বেশি। এইসব অবতার মাতাজী বাবাজীদের বেশির ভাগই হিস্টিরিয়া, ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ বা স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের শিকার নয়। এরা মানুষের অজ্ঞতার ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পকেট কাটে। সোজা কথায় এরা রোগী নয়, এরা অপরাধী প্রতারক।

মা মনসার ভর

দমদম জংশনের কাছে নিমাই হাজরার বাড়িতে মনসার থান। সেখানে ফি হপ্তার মঙ্গলবার নিমাইয়ের বিবাহিতা বোন লক্ষ্মী ময়রার ভর হয়। ভর করেন মা মনসা। ভিড় নেই-নেই করেও কম হয় না। ৭০ থেকে ১০০ ভক্তকে নানা সমস্যার বিধান দেন মা মনসা। ভর দুপুরে ভর লাগে। শেষ ভক্তটি বিদায় নিতে ঘণ্টা তিনেক সময় কেটে যায়।

আমাদেরই এক প্রতিবেশীর কাছে শুনেছিলাম লক্ষ্মীর অতিপ্রাকৃতিক সব ক্ষমতার

কথা। তিনি বললেন, লক্ষ্মীকে দেখার আগে বিশ্বাসই করতেন না, ঈশ্বর সর্বত্রগামী, তাঁর অজ্ঞাত কিছুই নেই। ভরে লক্ষ্মী এমন সব কথা বলেছে, যেগুলো সর্বত্রগামী ঈশ্বর ছাড়া কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। শুনলাম প্রতিবেশী স্বপ্নাদেশে মা মনসার ঘট পেতেছেন। ২৪ মার্চ'৯০-এ লক্ষ্মীমা ওঁর বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। দুপুরে গেলাম। লক্ষ্মীমা তখনও ভরে বসেননি। আলাপ করিয়ে দিলেন প্রতিবেশী। পাতলা, শ্যামা তরুণী। একমাথা বব্ করা চুলে আজ তেল ছোঁয়ানো হয়নি। ডাগর দুটি চোখ। কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম ফুলঝুড়িতে আগুন দিয়েছি। অনেক অনেক অলৌকিক ঘটনার কাহিনী শোনালেন। শুনলাম, স্বামী রিক্সা চালান। পুজোর সঙ্গী হিসেবে ভাই দেবাশিসও এসেছিলেন। বি কম পাশ। টিউশনি করে সামান্য রোজগার। লিখি শুনে তিনিও আমাকে শোনাতে লাগলেন দিদি ও মনসাকে ঘিরে অদ্ভুত সব ঘটনার বিবরণ। লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা মনসাকে দেখছেন ?"

লক্ষ্মীর জড়তাহীন উত্তর, "বহুবার।"

আমি : কেমনভাবে দেখেছেন, একেবারে স্পষ্ট ?

লক্ষ্মী : "নিশ্চয়।"

আমি : 'দেখতে কেমন ?'

লক্ষ্মী : দারুণ সুন্দরী। এক মাথা চুল প্রায় পায়ের হাঁটু ছুঁয়েছে।'

আমি : 'গায়ের রঙ কেমন ?'

লক্ষ্মী : একটু শ্যামা, এই কিছুটা আমার মত, তবে এত সুন্দরী যে বলার নয়।'

আমি : 'ফিগার কেমন ? দেখলে বয়স কেমন মনে হয় ?'

লক্ষ্মী : 'একেবারে সিনেমার হিরোইনের মত। দেখলে মনে করবেন সদ্য যুবতী। উনি যখনই আসেন, তখন অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ সারা বাড়ি ছড়িয়ে থাকে।'

প্রতিবেশীর উচ্চ-শিক্ষিতা স্ত্রী জানালেন, তিনিও মায়ের শরীরের অদ্ভুত গন্ধ পেয়েছেন।

এক সময় পুজো শুরু হলো। পুজোয় সময় লাগে খুবই কম। ইতিমধ্যে বহু ভক্ত মানুষই হাজির করলেন পেন, ডটপেন। এগুলো দিয়ে লিখলে নাকি কৃতকার্য অনিবার্য, দেবাশিস জানালেন।

তৃতীয় ও শেষবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়েই লক্ষ্মীমা শরীরে বার কয়েক দুলুনি দিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়লেন মেঝেতে। তারপর কাটা মুরগীর মত ছটফট করতে লাগলেন, সঙ্গে দুহাতে চুল ধরে টানাটানি।

শিক্ষিত-শিক্ষিতা ভক্তেরা লক্ষ্মীমাকে না ছুঁয়েই গদগদ ভক্তিতে প্রণাম জানাতে শুরু করলেন। কাঁসার ঘণ্টা, শাঁখ উলু বেজে চলল, সেই সঙ্গে ভক্তরা জোড় হাত করে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, 'মা তুমি শান্ত হও মা, মা তুমি শান্ত হও।'

মা এক সময় শান্ত হলেন। উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন। গৃহকর্ত্রী পরম ভক্তিভরে মাকে নানা সমস্যার কথা বলছিলেন। উত্তরণের উপায় হিসেবে মা মনসা ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছিলেন, কখনও পুজোর ফুল ছুঁড়ে দিয়ে সঙ্গে রাখতে বললেন, কখনও দিলেন ঘটের জল পানের বিধান, কখনও বা অদেখা মানুষটির রোগ মুক্ত করতে বিষহরি মা মনসা হঠাৎ হঠাৎ মাথা তুলে বড় বড় পাগল পাগল চোখে তাকিয়ে তিন বার ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে

দিলেন।

এক সময় আমাকে প্রশ্ন করতে বললেন গৃহকর্ত্রী। মা মনসার পাশে বসলাম। আমার সম্বন্ধে লক্ষ্মীমা এবং দেবাশিস কেউই বোধহয় কিছু জানতেন না। হাতে গ্রহরত্নের রুপোয় বাঁধান আংটি গলায় ঝোলান একটা তাবিজ দেখে সন্দেহের উর্ধ্বেই রেখেছিলেন। এটা-সেটা জিজ্ঞেস করার পর বললাম, "আমার ছোট বোনের গলায় ক্যানসার ধরা পড়েছে। চিকিৎসা চলছে। ভাল হবে মা?"

বহু ভক্ত কলরোল তুললেন, "বোনের নাম বলুন।"

বললাম, "রঞ্জিতা রুদ্র।'

মা মনসা বললেন, "ভাল হবে না। এই বৈশাখের আগেই মারা যাবে।"

আরও কিছু কথা-বার্তার পর ফিরে এসেছিলাম।

সে-রাতেই প্রতিবেশী আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। আমার বোনের ক্যানসারের কথা লক্ষ্মীমা কেমন অদ্ভুত রকম বলে দিলেন, সেই প্রসঙ্গ প্রতিবেশী উত্থাপন করতে জানালাম, "বোন রঞ্জিতা বহাল তবিয়তেই আছে ক্যানসার তো হয়নি। বৈশাখে গিয়ে দেখেও আসতে পারেন। এতদিন মা লক্ষ্মীর কথা শুধু শুনেছিলাম। ওর ভরের মহিমা পরীক্ষা করতেই মিথ্যে বলেছিলাম। আপনারা শিক্ষিত হয়েও এত আবেগতাড়িত হয়ে ঠকতে চান-কেন বলুন তো?"

জানি না আমার কথাগুলো উনি কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

মীরা সাঁই

মহারাষ্ট্রের কোকন জেলায় মীরার আদি নিবাস। আঠারটি বসন্ত অতিক্রম করার আগেই মীরা ভালোবেসে বিয়ে করেন মেহেমুদকে। মেহেমুদ যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন, তখন মীরা ছ-মেয়ের মা। মীরা এই সময় সিরডী'র সাঁই-এর ভক্ত হয়ে ওঠেন। সাঁই ভক্তদের সঙ্গে গড়ে ওঠে পরিচয় ও সম্পর্ক। সাঁই ভক্তদের সামনেই একদিন মীরার ভর হয়। ভরে মীরা জানান, তিনি সিরডীর সাঁই। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই মীরার ওপর সাঁইয়ের ভর হতে থাকে। দ্রুত ভক্ত সমাগমও বাড়তে থাকে। ভক্তরাই মীরার নতুন নাম রাখেন মীরা সাঁই, মীরা ভক্তদের পান করতে দিতেন মন্ত্রপড়া পবিত্র জল। মীরা বেশ কয়েকবার ভক্তসহ পদযাত্রায় তীর্থভ্রমণ করলেন, মীরা সাঁইয়ের খ্যাতি এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, একটি সেবা সংস্থা তাঁকে দিল দু-একর জমি ও একটি বাংলো।

এই সময় মীরা বিয়ে করেন চন্দ্রকান্তকে। চন্দ্রকান্ত মীরা সাঁইয়ের নামে করে দিলেন তাঁর নাসিকের কারখানা। চন্দ্রকান্ত ও মীরার নতুন আবাস হয় ৫৫ আরামনগর কাকেরী কমপ্লেক্সে। মীরার ভর ও ভক্ত সমাগম বাড়তেই থাকে।

এই সময় নরেশ মাগনামী ডি এম নগর থানায় এফ আই আর করেন, মীরা সাঁই তাঁর স্ত্রী পুনমকে প্রতারণা করে আড়াই লক্ষ টাকার গয়না আত্মসাৎ করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে থানা একটি মামলা রুজু করে। পুলিশ কেসের তদন্তের দায়িত্ব এসে পড়ে সাব-ইন্সপেক্টর রাজা সন্তের উপর। সন্তের নেতৃত্বে পুলিশ প্রথমেই মীরা সাঁইয়ের

কাকোরী কমপ্লেক্সের বাড়িতে হানা দেন। বাড়িতে মীরা ছিলেন না, ছিলেন তাঁর দুই মেয়ে। বাড়ি সার্চ করার সময় ঠাকুর ঘরে একটি মাঝারী আকারের তালাবন্ধ বাক্স দেখতে পান। মেয়েরা জানান, বাক্সের চাবি মায়ের কাছে আছে। মা আছেন সিরডীর কোপর গাঁও-এর বাড়িতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে তালা ভাঙা হয়। বাক্সে ছিল দু'লক্ষ টাকার মত গয়না। বাক্সে একটি কাগজে 'উষা' লেখা ছিল, তলায় ঠিকানা।

বাক্স নিয়ে পুলিশ বাহিনী থানায় ফেরে। কাগজের ঠিকানায় পুলিশ পাঠান হয়। পুলিশ সেখানে উষা নামের এক বিবাহিত মহিলার খোঁজ পেয়ে তাঁকে থানায় আনেন।

থানায় জেরার জবাবে তিনি জানান, আমার স্বামী মদ ও জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েন। স্বভাবতই তাঁর খরচের বহরও দিন দিন বেড়েই চলেছিল। আমি মীরা সাঁই-এর কথা শুনে তাঁর কাছে হাজির হই এবং তার উপর সাঁইয়ের ভর দেখে বাস্তবিকই ভক্তি আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে মীরা সাঁইয়ের শরণাপন্ন হই। মীরা সাঁই আমাদের গয়নাগুলো আমার স্বামীর হাত থেকে বাঁচাতে সেগুলো তাঁর কাছে রাখতে বলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে মীরা সাঁইয়ের কাছে গয়নাগুলো ফেরত চাইলে তিনি প্রতিবারই নানা বাহানা বানিয়ে আমাকে ঘুরিয়েছেন। আজ পর্যন্ত সে গয়না আর ফিরিয়ে দেননি, ফিরে পাব এ আশাও ছেড়েছি।

থানায় কেন অভিযোগ করেননি, গয়নার মূল্য কত হবে বলে উষার ধারণা, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে উষা জানান, তাঁর হাতে লিখিত কোনও প্রমাণ না থাকায় তিনি মীরা সাঁইয়ের মত প্রচণ্ড প্রভাবশালিনী মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে গিয়ে আরও বেশি বিপদে জড়িয়ে পড়তে চাননি। গয়নার আনুমানিক মূল্য ছিল দু থেকে আড়াই লাখ টাকা। কিছু কিছু গয়নার খুঁটিনাটি বিবরণও উষা দেন। বিবরণ মিলে যাওয়ায় উষাকে বাক্সের গয়নাগুলো দেখান হয়। তিনি জানান এগুলোই মীরা সাঁইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

মীরা সাঁইয়ের দুই মেয়েকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে থাকে। পুলিশবাহিনী সেদিনই রওনা হন কোপ গাঁও-এ। ভোর রাতে মীরা সাঁইকে গ্রেপ্তার করা হয়। থানায় নিয়ে এলে মীরা সাঁই জেরার উত্তরে কোনও কথা বলতে অস্বীকার করেন। ১০ জানুয়ারি '৮৬ পুলিশ মীরা সাঁইকে আন্ধেরীর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করেন, এবং ১৪ দিন পরে তাঁকে আবার পুলিশ হাজতে ফিরিয়ে আনা হয়। দু-দিনের একটানা জেরায় মীরা সাঁই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েন এবং তাঁর অপরাধ স্বীকার করে জানান পুনমের আত্মসাৎ করা গয়না রয়েছে তাঁর মেয়ে জামাই ফতিমা ও বুল্লু শেখের কাছে। পুলিশ ফতিমা ও বুল্লুর হেফাজত থেকে পুনমের গয়না উদ্ধার করেন।

তারা মা-র ভর

২২/১, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডে তারা কুটিরে প্রতি শনি, মঙ্গলবার অসংখ্য

মানুষের ভিড় হয়। ভক্তেরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। কেউ তারা মাকে প্রণাম জানাতে ছুটে আসেন। কেউ আসেন সমস্যার সমাধানের আশায়। এখানে শনি-মঙ্গলে বিজলী চক্রবর্তীর ওপর মা তারার ভর হয়, অর্থাৎ সহজ-সরল অর্থে ঈশ্বর তারা মা ভক্তদের আর্জি মত প্রশ্নের উত্তর, সমাধানের উপায় বাৎলান মিডিয়াম বিজলী চক্রবর্তীর মাধ্যমে।

৩০-৩৫ বছর আগে স্বপ্নে তারা মূর্তি দেখেন বিজলী। এই সময় থেকে ভরের শুরু। প্রথম ভরের সময় পাড়ার ছেলেরাই ডাক্তার ডেকে আনেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে অবাক হন। সব কিছুই স্বাভাবিক। বিজলী দেবীর দাবি মত ডাক্তার রোগ সারাতে তাঁর অক্ষমতা জানান। কোনও ওষুধ প্রেসক্রাইব না করেই বিদায় নেন। এর কিছুদিন পর দ্বিতীয় ভর সন্ধ্যের সময় তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়ে, সেই সময় মা তারা নাকি বিজলীর মুখ দিয়ে জানান তাঁর ঘট-স্থাপন করে পুজো দিতে। তারপর থেকে ঘট-স্থাপন ও পুজো। মন্দিরে মায়ের যে মূর্তিটি আছে বিজলীর ভগ্নিপতিই তা তৈরি করান স্বপ্নে দেখা মূর্তির অনুকরণে।

বিজলী তারা মা নামেই বেশি পরিচিতা। তিনি যে সব ওষুধ দেন বা যাঁদের ঝেড়ে দেন, তাঁদের অনেকেই নাকি রোগমুক্ত হয়েছেন। তারামার কথায়: দৈব ওষুধ-টষুদের আমি কিছুই জানি না। আমার অলৌকিক কোনও ক্ষমতাই নেই। যা করেন, যা ক্ষমতা সবই মা তারার।

অসুখ-বিসুখে অনেকে ঝাড়াতে যান। ভরে তারা মা ঝেড়েও দেন। কয়েক বছর আগে আমি তাঁরই এক ভক্ত শিষ্যের সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলাম। অতি স্পষ্টভাবেই জেনে ফিরেছিলাম, 'তারা মা'র সত্যি-মিথ্যা বোঝার সামান্যতম ক্ষমতাও নেই।

দুপুর থেকে সন্ধে তারাপীঠ ছেড়ে 'মা' নেমে আসেন নমিতা মাকাল-এর শরীরে

নাওভাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে শান্তিনগর ইস্টার্ন বাইপাসে ভাঙরের একটি অতি সাধারণ ঘরে থাকেন নমিতা মাকাল। সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় ছবি সহ তাঁকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় সময় ভালই যাচ্ছে। ভক্তেরা প্রণামী দিচ্ছেন টাকা-পয়সা, শাড়ি, কাপড়, এটা-ওটা। শহরতলীর এই এলাকাটি কিছুদিন আগেও ছিল হতশ্রী। এখন কিছুটা রং ফিরেছে।

নমিতার বয়স বছর তিরিশ। বিয়ে বছর পনের আগে। স্বামী ও দুই ছেলে নিয়ে সংসার। দ্বিতীয় সন্তান হবার এক বছর বাদে বাড়িতে প্রথম কালীপুজো হলো নমিতারই একান্ত আগ্রহে। মূর্তি বিসর্জনের সময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। নমিতার দাবি—কেউই মায়ের মূর্তি তুলতে পারেনি। সকলে বললেন, মা যখন যেতে চান না, এখানেই থাকুন। সেই থেকে এখানেই মা আছেন। মায়ের মন্দিরও তৈরি হয়েছে বছর ছয়েক হলো।

কালীপুজোর মাস দুয়েক পরের ঘটনা। বাড়িতে জন্ম অশৌচ চলছিল। সেদিনটি ছিল মঙ্গলবার। নমিতার বোন এসেছেন বাড়িতে। তাঁকেই ঠাকুরের কাছে সন্ধ্যাদ্বীপ

দিতে পাঠান নমিতা। বোন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ফিরে আসেন। বলেন, ঘরে কে যেন আছেন মনে হলো, সারা শরীরের লোম আমার খাড়া হয়ে উঠল সেই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে। আমি প্রদীপ জ্বালতে পারব না। অশৌচ থাকা সত্ত্বেও নমিতাই গেলেন। প্রদীপ জ্বালতেই কি যে হয়েছিল, নমিতার জানা নেই। পরে তিনি বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীদের কাছে শুনলেন, মা তারা তাঁর ওপর ভর করেছিলেন। ভরে জানিয়েছেন, প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার আসবেন।

আগে ভর হতো সন্ধ্যের সময়। এখন হয় দুপুরে। এই বিষয়ে নমিতার বক্তব্য—সন্ধ্যের সময় তারাপীঠে মায়ের সন্ধ্যারতি হয়, তাই দুপুর ১টা ১৫ থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত মা তারা আসেন নমিতার শরীরে।

নমিতার কথা শুনে একটা নতুন তথ্য জানতে পারলাম, তারা মা ঈশ্বর হলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে একই সঙ্গে একাধিক স্থানে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। নমিতার দাবি, ভরের সময় যে কেউ যে কোনও সমস্যা নিয়ে গেলে মায়ের কৃপা হলে সমস্যার সমাধানের পথও তিনি করে দেন। যাঁরাই বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন, তাঁরাই ফল

নমিতা মাকাল

পেয়েছেন, ডাক্তার না ডেকেও শুধুমাত্র মায়ের দয়ায় জীবন পেয়েছে এমন অনেক উদাহরণও আছে।

নমিতা মাকালকে বলেছিলাম, "আপনার কথা শুনে বুঝতেই পারছি মা শনি-মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যে থাকেন আপনার কাছে, রাতে তারাপীঠে। এবং রাতে তারাপীঠে থাকেন বলেই আপনার কাছে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ দেখুন, বেলেঘাটা থেকে এক ভদ্রলোক জ্যোতি মুখোপাধ্যায় আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন—শনি-মঙ্গলবার দুপুর ১ টা ১৫ থেকে ৬টা পর্যন্ত মা তারা তাঁর কাছেই থাকেন, এবং তিনি নাকি তাঁর এই কথার স্বপক্ষে প্রমাণও দেবেন। আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, আপনি স্রেফ টাকা রোজগারের ধান্দায় লোক ঠকাতে ভরের গপ্পো ফেঁদেছেন। জ্যোতিবাবু আরও জানিয়েছেন, আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে তিনি প্রমাণ করে দেবেন আপনি একজন প্রতারক। জ্যোতিবাবু এই বক্তব্য জানিয়েই আপনার বিষয়ে যে পত্রিকা প্রচার করেছে, তাদের কাছেও একটি চিঠি দিয়েছেন। আমি একটি বিজ্ঞান সংস্থার সম্পাদক, জ্যোতিবাবু চান, আমি আপনাদের দুজনের দাবির বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ে জানাই কার দাবি যথার্থ। আপনি কি আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা করবেন ?"

নমিতা'র সহজ-সরল বক্তব্য, "আ মোলো যা, ওই লোকটার কুঠ হবে, কুঠ হবে গো ! ভাত দেওয়ার মুরদ নেই কিল মারার গোঁসাই !"

না, নমিতা আমাদের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করতে রাজি হন না। এবার একটা গোপন খবর ফাঁস করছি, জ্যোতি মুখোপাধ্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসে, ঘুমে-নিঘুমে যুক্তিবাদী, আমাদের সমিতির অতি সক্রিয় এক আটান্ন বছরের কিশোর, চ্যালেঞ্জটা রেখেছিলেন নমিতা মাকালকে 'মাকাল' প্রমাণ করতে।

একই অঙ্গে সোম-শুক্কুর 'বাবা' ও 'মা'য়ের ভর

নদীয়া জেলার মদনপুর স্টেশনে নেমে সগুণা গ্রাম, সে গ্রামের গৌরী মণ্ডলের ওপর ভোলাবাবা ও সন্তোষী মা'র অপার কৃপা। সোম-শুক্কুর পালা করে তাঁরা গৌরীর ওপর ভর করেন। গৌরী আঠাশ-তিরিশের সুঠাম যুবতী। ভরে পড়লে নাকি যে কোনও প্রশ্নের নিখুঁৎ উত্তর দেন। বাৎলে দেন নানা সমস্যার সমাধানের উপায়। হপ্তার ওই দুটি দিন গৌরী মা'র থানে বেজায় ভিড় হয় বলে লাইন ঠিক রাখতে স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবিকারা দর্শনার্থীদের নম্বর লেখা টিকিট ধরিয়ে দেয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির মদনপুর শাখার দুই সদস্য অসীম হালদার এবং সুবীর রায় শাখা সম্পাদক চিররঞ্জন পালের কথা মত হাজির হলেন গৌরী মা'র থানে। গৌরী মা'র ছোট বোন সন্ধ্যা অসীম ও সুবীরের হাতে নম্বর লেখা টিকিট ধরিয়ে দিলেন। বাঁশের বেড়ার দেওয়াল ও টালির ছাদের নিচে বসেন গৌরী মা। ধীরে ধীরে লাইন এগোচ্ছিল। সুবীরের ঢোকার সুযোগ যখন এলো, পিছনে তখনও বিরাট লাইন। এক স্বেচ্ছাসেবিকা জানালেন, জুতো খুলে পা ধুয়ে ঢুকুন। ভিতরে ঢুকতেই আবার

স্বেচ্ছাসেবিকা। তিনি বললেন, "ষোল আনা দক্ষিণা নামিয়ে রেখে প্রণাম করে বলুন—বাবা আমি এসেছি।"

আজ সোমবার ২০ অক্টোবর '৯০ । অতএব বাবার ভর লেগেছে গৌরীর ওপর। সুবীর পরম ভক্তের মতই নির্দেশ পালন করলেন। চোখ বোলালেন ঘরের চারপাশে। একটা বড় সিংহাসনে অনেক দেব-দেবীর মূর্তি। কিন্তু যে বস্তুটি বিশেষ করে নজর কাড়লো, সে হলো একটা বিশাল উই ঢিবি। ঢিবিটা কিসের প্রতীক কে জানে ? তবে নজর টানে।

গৌরী মা, একটু ভুল হলো, আজ তিনি বাবা, সামনে পিছনে দোল খাচ্ছিলেন। খোলা ছড়ানো চুলগুলো একবার নেমে আসছিল সামনের দিকে, ঢেকে যাচ্ছিল মুখ। আর একবার চলে যাচ্ছিল পিছনে। 'বাবা'র পাশে বসে এক প্রৌঢ়া।

প্রৌঢ়া বললেন, "বাবা প্রশ্ন করলে উত্তর দিও। উত্তর দিলে সায় দিও।"

সুবীর মাথা নাড়ালেন। বাবা মাথা নাড়তে নাড়তেই জিজ্ঞেস করলেন, "কার জন্যে এসেছিস ?"

"আমার আর দাদার জন্যে।"

"তোর মন স্থির নেই। কোনও কাজে মন দিতে পারিস না। নানা দিক থেকে বাধা বিপত্তি হাজির হচ্ছে। তোর কাজ হতে দিচ্ছে না।"

সুবীর প্রৌঢ়ার নির্দেশমত প্রতি কথায় সায় দিয়ে 'হ্যাঁ' বলে যেতে লাগলেন। 'বাবা' সামান্য সময়ের জন্য কথা বলা থামালেন। তারপর বললেন, "তোর সমস্যা মিটিয়ে দেবো, খুশি করে দেবো। তুইও আমাকে খুশি করবি তো ?"

—"নিশ্চয়ই করব বাবা।"

—"তুচ্ছ করবি না তো ?"

—"না, না।"

—"আমার আদেশ মানবি ?"

—"নিশ্চয়ই মানব।"

—"আগামী সোমবার একটা জবা ফুল আর একটা বোতাল নিয়ে আসিস। ফুলটা পড়ে দেব। ওটাকে রোজ সন্ধ্যায় ধূপ আর বাতি দিবি, ভক্তি ভরে পুজো করবি। কাউকে নোংরা কাপড়ে ছুঁতে দিবি না। ঘটে জল পড়ে দেব। রোজ সন্ধ্যায় ফুল পুজো সেরে একটু করে খাবি। যা এবার।"

—"কিন্তু বাবা, আমার আসল সমস্যার কথাই তো কিছু বললেন না।"

—"সেটা আবার কী ?"

—"পেটে প্রায়ই ব্যথা হয়·····"

—"সুবীরের কথা শেষ হবার আগেই স্বর্গ থেকে গৌরীতে নেমে আসা ভোলাবাবা বলতে শুরু করলেন, "তোর অম্বলের রোগ আছে। গলা বুক জ্বালা করে, প্যাটে ব্যথা হয়, খিচ ধরে। যখন ব্যথা ওঠে সহ্য করতে পারিস না।"

সায় দেন সুবীর—"হ্যাঁ। কিন্তু কী করলে সারবে ?"

—"আরে জল পড়াটা সে জন্যেই তো দিয়েছি। অসুখ তো তোর আসল সমস্যা নয়, আসল সমস্যা তোর মন নিয়ে, কাজে বাধা নিয়ে। যা, এবার আয়।"

—"আমার দাদার বিষয়ে কিছু বললেন না ?"

—"তোর দাদার বুকে যন্ত্রণা হয়, গা-হাত-পায়ে ব্যথা, বুক জ্বালা করে, প্যাটে ব্যথা হয়। তোর দাদাও ফুল পুজো করবে, ধূপ আর বাতি জ্বেলে। পুজো সেরে জল পড়া খাবে।"

—"কিন্তু দাদাকে ফুল-জল দেব কেমন করে ?"

—"কেন, বাড়ি এলে দিবি ?"

—"ওখানেই তো সমস্যা। দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, কেমন আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, কিছুই জানি না।"

—"চিন্তা করিস না। ওই ফুলের অপার ক্ষমতা। ফুলই তোর দাদাকে এনে দেবে।"

—"কবে ?"

—"তাড়াতাড়ি।"

—"তাড়াতাড়ি মানে দু মাসও হতে পারে, আবার দশ বছরও হতে পারে ? ঠিক কবে নাগাদ আসবে ?"

—"ছ'মাস থেকে এক বছরের মধ্যে।"

সুবীর বেরিয়ে আসতেই গৌরীর বোন সন্ধ্যা বললেন, "আপনি আমাকে আগে বলবেন তো—দাদা নিখোঁজ। সমস্ত উত্তর পাইয়ে দিতাম। মনে হয় ওকে কেউ ওষুধ করেছে।"

ইতিমধ্যে আরও কিছু ভক্ত ঘিরে ধরলো। তাদের অনেক প্রশ্ন—"আপনার দাদা বুঝি নিখোঁজ ?" "বাবা বলে দিয়েছেন কবে আপনার দাদা ফিরবে ?" "মনে হয় আপনাদের বাড়িতে কেউ ওষুধ পুঁতেছে।"

সন্ধ্যা ভক্তদের বোঝাতে লাগলেন, "বাবার কাছে অজানা তো কিছু নেই, তাই ওঁকে দাদা নিখোঁজ হওয়ার কথা বলে দিয়েছেন। কবে ফিরবে, তাও। তবে নিয়ম পালন করতে হবে নিষ্ঠার সঙ্গে।"

সন্ধ্যার কথায় আরো অনেক ভক্ত উৎসাহী হলেন। এঁদের অনেকেই হয় তো গৌরী-সন্ধ্যাদের এজেন্ট, কেউ বে-ফাঁস কিছু বলে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করলে নেবার জন্য মজুত রয়েছেন। সুবীর তাই ওখানেই সোচ্চার হতে পারলেন না--নিজের পেটে ব্যথার গপ্পোটা বাবা-মা'র ভরের পরীক্ষা নিতেই বলানো। আর দাদার নিখোঁজ হওয়াটা ? নিজেই বড় ভাই। দাদা কই, যে নিখোঁজ হবে ?

আমাদের সমিতির শাখা ও সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভরের জালিয়াতি ধরেছে কাজল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আমাদের সমিতির ময়নাগুড়ি শাখা—১৯টি। তারপরই অমিত নন্দীর নেতৃত্বে আমাদের চুঁচড়ো শাখা ৩টি। শশাঙ্ক বৈরাগ্যের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরের 'বিবর্তন'—৩টি।

ঈশ্বরে ভর নিয়ে আমাদের সমিতির বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংস্থা কম করে এক'শর ওপর (আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির হিসেব বাদ দিয়ে) শীতলা, মনসা, কালী,

তারা, বগলা, তারকভোলা, পাঁচুঠাকুর, বনবিবি, ওলাইচণ্ডী, জ্বরাসুর, পীর গোরাচাঁদ, ওলাবিবি ইত্যাদি দেবতার ভরের দাবিদারদের ওপর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে এবং অনুসন্ধানকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সঙ্গে সহমত হয়েছি—এঁরা কেউই মানসিক রোগী নন। ভর এঁদের ভড়ং। অর্থ উপার্জনের সহজতর পন্থা। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের শক্তি বা ক্ষমতা বিষয়ে অতি সচেতন। ভরের রোগী হলে সচেতনতা বোধ দ্বারা কখনই তাঁরা পরিচালিত হতে পারতেন না।

একশোর ওপর এই ভরে পাওয়া বাবাজী-মাতাজীর বিষয়ে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখতে পাচ্ছি—এঁরা প্রত্যেকেই রোগ মুক্তি ঘটাতে পারেন বলে দাবি রাখেন। ভরে পাওয়া অবস্থায় এঁরা বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় বাৎলে দেন বলেও দাবি করেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভর হওয়ার আগে নিম্নমধ্যবিত্ত বা গরিব ছিলেন। ভর পরবর্তীকালে এঁদের প্রত্যেকেরই আর্থিক সঙ্গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এঁরা অনেকেই ক্যানসার সারিয়েছেন, বোবাকে দিয়ে কথা বলিয়েছেন, অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি রেখেছেন। এইসব দাবিদারদের প্রতিটি দাবির ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানকারীরা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, ওই নাম-ঠিকানার কোনও মানুষের বাস্তব অস্তিত্বই নেই বা ছিল না। আবার কোন কোনও ক্ষেত্রে সেইসব মানুষদের হদিশ পাওয়া গেলেও তাঁরা বাস্তবিকই বোবা, বা অন্ধ ছিলেন, অথবা ক্যানসারে ভুগছিলেন—এমন কোনও তথ্যই ওইসব মানুষগুলো হাজির করতে পারেননি। বরং দেখা গেছে ওইসব মানুষগুলো হয় ভর হওয়া বাবাজী-মাতাজীদের
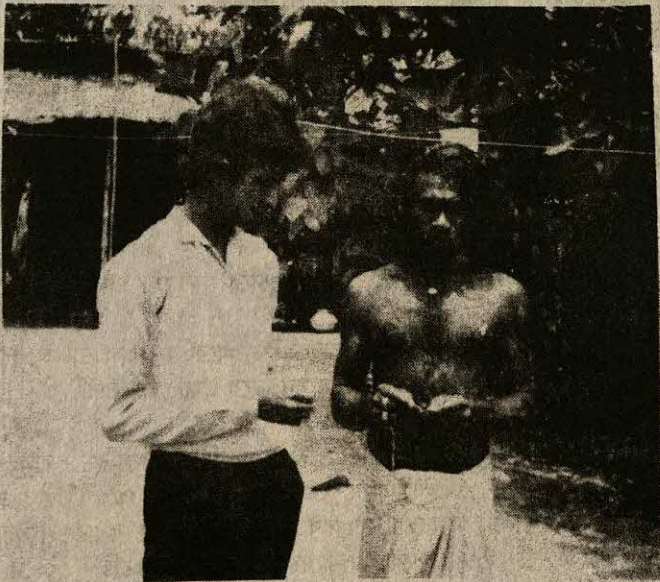
কাজল ভট্টাচার্য ও জনৈক অলৌকিকক্ষমতার দাবিদার

আত্মীয়, অথবা ভক্ত। ওরা যে এজেন্ট হিসেবে প্রচারে নেমেছে, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

শ্রদ্ধেয় পাঠকদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ—কারো কথায় কারো অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থা স্থাপন না করে একটু জিজ্ঞাসু মন নিয়ে ভরের অবতারটিকে বাজিয়ে দেখুন—আপনার চোখে তার মিথ্যাচারিতা ধরা পড়বেই।

তবু আমরা, সাধারণ মানুষরা, বিভ্রান্ত হই। আমাদের বিভ্রান্ত করা হয়। নামী দামী বহু প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় অলৌকিকতা, জ্যোতিষ বা ভরের পক্ষে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিই আমাদের, সাধারণ মানুষদের, বিভ্রান্ত করার হাতিয়ার।

বহু থেকে একটি উদাহরণ হিসেবে আপনাদের সামনে হাজির করছি। ৩০ মে '৯০ আনন্দবাজার পত্রিকায় বহুবর্ণের তিনটি ছবি সহ একটি বিশাল প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো "পূজারিণীর শরীর বেয়ে" শিরোনামে। আপনাদের অবগতির জন্য এখানে তুলে দিচ্ছি।

পূজারিণীর শরীর বেয়ে

দেবদেবীর ভর হয় পূজারিণীর শরীরে। সে সময় যা বলা যায় তাই মেলে। যা দাওয়াই দেওয়া হয় তাতেই রোগ নির্মূল হয়। ভর হয় কীভাবে?

শনিবার বেলা দুটো। ঢাকুরিয়া স্টেশনের পাশে তিন-চার হাত উঁচু ছোট্ট একটি কালী মন্দির। মন্দিরের মাথায় চক্র ও ত্রিশূল। মন্দিরটির নাম **'জয় মা রাঠের কালী।'** মন্দিরের সামনে একটি সিমেন্টের বাঁধানো চাতাল। সেই চাতাল ও পাশের মাঠে ইতস্তত ছড়ানো অনেক লোক। আর সেই দাওয়ার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে এক যুবতী, পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি এলোমেলো, চোখ দুটি বোজা, নাকের পাটা ফোলা, মুখের

দুপাশে ক্ষীণ রক্তের দাগ। মহিলাটির ভর হয়েছে। কালী পুজো করতে করতে অচেতন হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন মহিলা। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। হঠাৎ মহিলা বলে উঠলেন, 'স্বামীর লগে এয়েছিস কে ?' উপস্থিত জনতার মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। শাঁখা-সিঁদুর মাঝবয়সী এক আধা-শহুরে মহিলা ঠেলাঠেলি করে সামনে এলেন। মন্দিরে ছোট দরজার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে 'মা' বলে হাতজোড় করে ডাকতে লাগলেন। 'মা' বললেন—'সব ঠিক হয়ে যাবে। কিচ্ছু হবে না। আমার জল পড়া খাইয়েছিস ?'

'খাইয়েছি মা। সারছে না মা'।

'ওতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এরপর 'মা' ডেকে উঠলেন, "ব্যবসার জন্য এয়েছিস কে ? বোস। আমার কাছে আয়।" শার্ট-প্যান্ট পরা মাঝবয়সী ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। একইভাবে—হাত জোড়। হাঁটু মুড়ে বসা। 'মায়ের কাছে সমস্যার কথা জানালেন। মা অভয় দিলেন। ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফের 'মা' ডাকলেন : 'কোমরে পিঠে পেটে ব্যথার জন্য এয়েছিস কে ? আয়, আয় সামনে আয়।'

এক এক করে ছেলে মেয়ে বুড়ো মাঝবয়সী সবাই হাজির হতে লাগল। 'মা তাদের কোমরে, পিঠে পেটে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারা এক এক করে চলে গেলে একটি যুবক এগিয়ে এল। 'মা' তার পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন নাভিতে হাত রাখলেন। 'মা'য়ের মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। মায়ের 'ঝাড়া'র রকমই এই।

'সন্তানের লগে এয়েছিস কে ?' যুবকটি চলে যেতেই 'মা'-য়ের ডাক। শিশুকোলে এক রমণী এগিয়ে এলেন। 'মা' শিশুটাকে তাঁর বুকের ওপর শুইয়ে দুই হাতে সজোরে শিশুটির পিঠের ওপর চড় মারতে লাগলেন। তারপর শিশুটিকে দু হাত দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরলেন এবং আবার চড় মারতে লাগলেন, এরপর 'মা' শিশুটিকে তার মা-য়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

মায়ের ভরমুক্তির সময় হয়ে এল। মহিলা, পুরুষ ঠেলাঠেলি করে এগোতে লাগলেন। নিজের নিজের সমস্যার কথা বলবেন এঁরা। মায়ের ভরমুক্তি হল। চিৎ হওয়ার অবস্থা থেকে উপুড় হয়ে শুলেন 'মা'। কিছুক্ষণ পর উঠে বসলেন তিনি। পুজো করতে লাগলেন। মন্ত্র পড়ে, হাততালি দিয়ে দেবীর আরাধনা চলল।

এক মধ্যবয়সী মহিলার হাত-পা কাঁপে। উঠে বসতে পারেন না। কথা বলতেও কষ্ট হয়। জানা গেল, তাঁর অসুখ দীর্ঘদিনের। তাঁকে 'মা' সামনে বসিয়ে প্রথমে মন্ত্র পড়ালেন। তারপর ওঠ বস করতে বললেন। মহিলা ওঠবস করতে পারছিলেন না। তাঁকে জল পড়া খাওয়ানো হল। মহিলা উঠে বসলেন। এক মধ্যবয়স্ক পুরুষের পিঠ ও কোমরের ব্যথা এবং এক মহিলার গ্যাসট্রিকের বেদনার একইভাবে উপশম করলেন 'মা'। পরিচয় হল বিজয়ভূষণ গুহর সঙ্গে। তিনি ন্যাশনাল হেরাল্ডের সঙ্গে যুক্ত। তিন-চার বছর আগে তাঁর স্ত্রীর হাঁপানি সেরে যাওয়ার পর থেকে তিনি 'মা'য়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। এখন 'মা'য়ের কাছে আসেন নিয়মিত। কোনও উদ্দেশ্য নয়, শুধু 'মা'-য়ের টানে আসেন।

মহিলার নাম প্রতিমা চক্রবর্তী। স্বামী রেলে কাজ করেন। ছেলে একটিই। বয়স,

বারো তেরো। স্বাস্থ্য মাঝারি, চোখগুলি কোটরে বসা, গভীর। চেহারার গড়ন মজবুত হলেও কোথাও একটা ক্লান্তির ছাপ আছে। মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কাজ করতে পারেন না। 'মা'য়ের দয়াতেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

যাদবপুর পলিটেকনিকের ঠিক পেছনে শীতলবাড়িতেও ভর হয়। এখানে একটি নেপালী পরিবার থাকে। যাদবপুর পলিটেকনিকের পিওনের কাজ করতেন ভদ্রলোক। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন।। তাঁর স্ত্রীর ভর হয় প্রতি শনিবার। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের কোটায়, গায়ের রঙ কালো হলেও চেহারায় বেশ একটি সুশ্রী আছে। মুখের গড়নটি ভারি সুন্দর। ছেলে, নাতি-নাতনী নিয়ে তিরিশ বছরের পরিপূর্ণ সংসার। ৬৫ সালে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা। যাদবপুর পলিটেকনিকের কর্মী হিসেবে পলিটেকনিকের পিছনেই থাকার জায়গা পেয়েছিলেন তাঁরা। ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলনের সময় দিল্লি থেকে আসা ১৬০০ পুলিশ ইউনিভার্সিটির চত্বরেই বাস করতে থাকে। তারা চাঁদা তুলে 'মা'য়ের জন্য পাকা দালান তৈরি করে দেয়। এখন সেই দালানে প্রতি শনিবার ভক্ত সমাগম ঘটে। যে যার সমস্যা নিয়ে আসে। পুজো শুরু করার কিছুক্ষণ পরই 'মা'য়ের ভর হয়। তখন সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করে এবং 'মা' প্রশ্নের উত্তর দেন। সব মিলে যায়। একটি বোবা মেয়েকে সারিয়ে তুলেছেন 'মা'। মায়ের দেওয়া জলপড়ায় উপশম ঘটেছে একটি সুন্দরী নববধূর জটিল ব্যাধির, একটি শিশুর কঠিন অসুখ।

কলকাতার বাইরে আন্দুলের সরু রাস্তা দিয়ে ঘেরা একটি পুকুরের পিছনে বহুদিন থেকে একটি বাড়িতে পাশাপাশি রয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ ও কালী। বাংলা ১৩৭১ সালে মূর্তি প্রতিষ্ঠা। তার আগে একটি ছোট্ট বেড়া দেওয়া ঘরে পুজো হত। তখনই 'মা'-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এখানে ওখানে।

মন্দিরে যিনি পুজো করেন, তাঁর বয়স ষাটের কোঠায়। শীর্ণকায়। বিধবা, কিছুদিন হল স্বামী-বিয়োগ হয়েছে। ভক্তদের দেওয়া অর্থেই সংসার চলে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পুজোয় বসার পর 'মা'য়ের ভর হয়। তখন 'মা'-কে যে প্রশ্ন করা যায়, 'মা' তার উত্তর দেন। প্রশ্ন করার জন্য কুড়ি পয়সা দক্ষিণা। পুজোয় বসার কিছুক্ষণ পর মায়ের মাথা দুলতে থাকে। কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মাথার দোলাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। তারপর একসময় 'মা'য়ের হাত থেকে ফুল খসে পড়ে, ঘণ্টা স্খলিত হয়। 'মা' আচ্ছন্ন হয়ে যান। ভর হয়। ভক্তরা তখন প্রশ্ন করতে শুরু করেন। 'মা' আচ্ছন্ন অবস্থায় উত্তর দিয়ে থাকেন।

এবং উত্তর মিলেও যায়। রোগভোগ সেরে যায়। মানুষগুলির ভিড় তাই বাড়ে।

□ **সাবর্ণী দাশগুপ্ত**
ছবি □ **শুভজিৎ পাল**

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আমার ও আমাদের সমিতির কাছে প্রশ্ন হাজির করেছিলেন, এই বিষয়ে আমাদের মতামত কী? আমরা কি তুড়ি দিয়েই প্রতিবেদকের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে চাই? আমরা কি ঈশ্বরের ভরে পাওয়া ওইসব পূজারিণীদের মুখোমুখি হবো? আমার বন্ধু আকাশবাণী

কলকাতার অধিকর্তা ডঃ মলয় বিকাশ পাহাড়ীও জানতে চেয়েছিলেন, ভরে পাওয়া মানুষগুলো বাস্তবিকই রোগীদের সারাচ্ছেন কী ? সারালে কীভাবে সারাচ্ছেন ? উত্তর কি সত্যি মেলে ? মিললে তার পিছনে যুক্তি কী ? এ জাতীয় প্রশ্ন শুধু ডঃ পাহাড়ীকে নয়, বহু মানুষকেই দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল।

যথারীতি উত্তর দিয়েছিলাম। ৩ জুলাই, '৯০ আনন্দবাজারে আমাদের সমিতির একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

পূজারিণীর শরীরে দেবতার ভর ?

সাবর্ণী দাশগুপ্তের 'পূজারিণীর শরীর বেয়ে' প্রতিবেদনটি (৩০ মে) পড়ে অবাক হয়ে গেছি। লেখাটি পড়ে বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, সার্বণী দাশগুপ্ত 'ভর' হওয়ার বিজ্ঞানসম্মত কারণগুলি বিষয়ে অবহিত নন এবং উনি ভরগ্রস্তদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। অবশ্য তিনি তাঁর লেখার সত্যতা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন তবে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এ বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে মুক্ত মনে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছে। সাবর্ণীর হাতে তুলে দেব কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা ভরগ্রস্তদের কাছে প্রশ্ন রাখবেন। তুলে দেব পাঁচজন রোগী। ভর লাগা পূজারিণীরা রোগীদের রোগ মুক্ত করতে পারলে এবং প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নে সঠিক উত্তর পেলে আমরা সাবর্ণীর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব এবং আমরা অলৌকিকতা-বিরোধী ও কুসংস্কার বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকব।

শারীর-বিজ্ঞানের মতানুসারে 'ভর' কখনও মানসিক রোগ, কখনও স্রেফ অভিনয়। ভরলাগা মানুষগুলো হিস্টিরিয়া, ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ, স্কিটসোফ্রিনিয়া—ইত্যাদি রোগের শিকার মাত্র। এইসব উপসর্গকেই ভুল করা হয় ভূত বা দেবতার ভরের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। সাধারণভাবে যে সব মানুষ শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, পরিবেশগত ভাবে প্রগতির আলো থেকে বঞ্চিত, আবেগপ্রবণ, যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা সীমিত তাঁদের মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতাও কম। তাঁরা এক নাগাড়ে একই কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময় মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। দৈবশক্তির বা ভূতে বিশ্বাসের ফলে অনেক সময় রোগী ভাবতে ৎ থাকে, তাঁর শরীরে দেবতার বা ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। ফলে রোগী দেবতার বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভুত সব আচরণ করতে থাকেন। অনেক সময় পারিবারিক জীবনে অসুখী, দায়িত্বভারে জর্জরিত ও মানসিক অবসাদগ্রস্ততা থেকেও 'ভর' রোগ হয়। স্কিটসোফ্রিনিয়া রোগীরা হন অতি আবেগপ্রবণ, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে শ্রেণীরই হোন না কেন। এই আবেগপ্রবণতা থেকেই রোগীরা অনেকসময় বিশ্বাস করে বসেন তাঁর উপর দেবতা বা ভূত ভর করেছে।

তবে 'ভর' নিয়ে যারা ব্যবসা চালায় তারা সাধারণভাবে মানসিক রোগী নয় ; প্রতারক মাত্র।

ভর-লাগা মানুষদের জলপড়া, তেলপড়ায় কেউ কেউ রোগমুক্তও হন বটে, কিন্তু

যাঁরা রোগমুক্ত হন তাঁদের আরোগ্যের পিছনে ভর-লাগা মানুষের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা সামান্যতমও কাজ করে না, কাজ করে ভর লাগা মানুষদের প্রতি রোগীদের অন্ধবিশ্বাস। রোগ নিরাময়েরর ক্ষেত্রে বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। হাড়ে, বুকে বা মাথায় ব্যথা, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, গ্যাসট্রিকের অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল-অ্যাজমা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে রোগীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে ওষুধ-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইঞ্জেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়। একে বলে 'প্ল্যাসিবো' চিকিৎসা পদ্ধতি।

'যা বলা যায় তাই মেলে'—এক্ষেত্রে কৃতিত্ব কিন্তু ভর-লাগা মানুষটির নয় ; তাঁর খবর সংগ্রহকারী এজেন্টদের।

প্রবীর ঘোষ। সাধারণ সম্পাদক,
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি,
কলিকাতা-৭৪।

না, সাবর্ণী দাশগুপ্ত বা ভরে পাওয়া পূজারিণীদের কেউ আজ পর্যন্ত আমার বা আমাদের সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা বা সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। কারণটি শ্রদ্ধেয় পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন।

অবাক মেয়ে মৌসুমী'র মধ্যে সরস্বতীর অধিষ্ঠান (?) ও প্রডিজি প্রসঙ্গ

মৌসুমী প্রসঙ্গে গণমাধ্যম

১৯৮৯-এ রকেট গতিতে প্রচারের ব্যাপকতা পেয়ে দেশ-বিদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমবাংলার রুক্ষ জেলা পুরুলিয়ার এক সাত বছরের বালিকা মৌসুমী। অবাক মেয়ে মৌসুমী যে 'Prodigy' অর্থাৎ 'পরম বিস্ময়কর প্রতিভা', এই বিষয়ে প্রচার মাধ্যমগুলো সহমত পোষণ করলেও, কত বড় মাপের 'প্রডিজি' এটা প্রমাণ করতে দস্তুর মত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যেন, যে পত্র-পত্রিকা বা প্রচার-মাধ্যম মৌসুমীকে যত বড় প্রডিজি বলে প্রমাণ হাজির করতে পারবে, তার তত সুনাম, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাবে। সেই সময় মৌসুমী সম্বন্ধে প্রচার মাধ্যমগুলোর বক্তব্য কী ধরনের ছিল সেটা বোঝাতে বহু থেকে গুটিকয়েক উদাহরণ এখানে হাজির করছি।

১৩ আগস্ট '৮৯-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রতিবেদক বিমল বসুর প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো "বুদ্ধিতে যে প্রতিভার ব্যাখ্যা নেই" শিরোনামে। প্রতিবেদক বিজ্ঞান-লেখক হিসেবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিচিত। সাতটি ছবিসহ প্রচুর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির শুরুতেই বড় বড় হরফে লেখা ছিল, "অল্প বয়সে অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সম্প্রতি হইচই ফেলে দিয়েছে পুরুলিয়ার মৌসুমী।" লেখাটিতে শ্রীবসুর স্পষ্ট ঘোষণা—"মৌসুমী এক বিস্ময় বালিকা। এককথায় প্রডিজি।

এখন তার বয়স ঠিক সাত। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি—এই তিনটি ভাষায় যেমন বিস্ময়কর তার দক্ষতা, তেমনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ইত্যাদি বিষয়েও সে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।"

ওই প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, "কলকাতা পাভলভ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডি এন গাঙ্গুলী বিস্ময় বালিকা মৌসুমী সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর রাখেন। তাঁর এক ছাত্রকে পাঠিয়েও ছিলেন আদ্রায় মৌসুমীর সঙ্গে কথা বলতে। শ্রীগাঙ্গুলীর মতে, মৌসুমীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির পিছনে আছে সম্ভবত বহু প্রজন্ম পূর্বের কোনও সুপ্ত জিন, এই মেয়েটির মধ্যে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।"

প্রতিবেদনটিতে ডি এন গাঙ্গুলীর মতামত হিসেবে আরও প্রকাশিত হয়েছে, "মৌসুমীর বুদ্ধির যে স্তর তাতে তার জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। বিদেশে, বিশেষত আমেরিকায় উচ্চবুদ্ধির ছেলেমেয়েদের বাছাই করে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের পাঠক্রম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।"

প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক জানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এবং মস্তিষ্কবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডঃ জে জে ঘোষ আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, "মৌসুমীর মতো প্রডিজির সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও এখানকার বিজ্ঞানীরা ওকে নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না, সিরিয়াস গবেষণার কথা ভাবছেন না।"

জনপ্রিয় পাক্ষিক 'সানন্দা'র ৭ সেপ্টেম্বর '৮৯ সংখ্যায় মৌসুমীকে নিয়ে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী "বিশেষ রচনা" প্রকাশিত হয়। শিরোনামে ছিল 'অবাক পৃথিবীর অবাক মেয়ে"। আটটি রঙিন ছবিতে সাজান এই বিশেষ রচনার রচয়িতা সুজন চন্দ মৌসুমীর ইংরেজি উচ্চারণ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, "একেবারে মেম সাহেবের মতো উচ্চারণ।" শ্রীচন্দ আরও জানাচ্ছেন, "সেই তুলনায় বাংলা উচ্চারণ ততটা ভাল নয়। কিছুটা আঞ্চলিক টান আছে তাতে। তবে হিন্দি উচ্চারণে বেশ মুন্সিয়ানা আছে।"

মৌসুমীর টাইপের স্পিড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীচন্দ জানাচ্ছেন, "ও যেভাবে দ্রুত টাইপ করছিল তাতে হলফ করেই বলা যায় স্পিড কম করেও ৪৫। চমৎকার ফিঙ্গারিং।"

প্রতিবেদক আরও জানিয়েছেন, শুধু জ্ঞানের পরীক্ষায় নয়, বুদ্ধির ও রাজনীতির পরীক্ষাতেও মৌসুমী পাকা ডিপ্লোমেট। মৌসুমী এখন গবেষণা করছে কয়লাকে সালফারমুক্ত করা নিয়ে। এ কাজে সফল হলে বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত হবে পৃথিবী। মৌসুমীর ধারণা ও সফল হবেই, নোবেল প্রাইজ পাবে ওর সাড়ে ন'বছর বয়সের মধ্যেই।

জনপ্রিয় বাংলা মাসিক 'আলোকপাত' মৌসুমীকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ করে সেপ্টেম্বর '৮৯ সংখ্যায়। শিরোনাম—"বিস্ময় বালিকা মৌসুমী : সাত বছরের সরস্বতী", সঙ্গে ছিল আধ ডজন ছবি। প্রতিবেদনটির শুরুতেই বড় বড় হরফে লেখা ছিল—

"আদ্রা রেলশহরের ৭ বছরের মৌসুমী চক্রবর্তী বাংলা, হিন্দী, ইংরাজি ভাষায় সারা বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, অধ্যাত্মবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে ৯ বছর বয়সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবার অনুমতি পেয়ে 'বিস্ময় বালিকা' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিস্ময়বালা মৌসুমীর এই জীবন কাহিনী পেশ করা হল তার সঙ্গে দুদিনব্যাপী দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা ধরে নেওয়া ইন্টারভিউ-এর প্রেক্ষাপটে।"

শিরোনামে মৌসুমীকে কেন সরস্বতী বলা হয়েছে, তারই উত্তর মেলে মৌসুমীর মা শিপ্রাদেবীর কথায়। প্রতিবেদকের ভাষায়, "শিপ্রাদেবী জানান, মৌসুমীর জন্মের আগে এক আশ্চর্য অনুভূতি মাঝে মধ্যে গ্রাস করে ফেলত শিপ্রাদেবীকে। শিপ্রাদেবী তা স্বামীকেও বলতেন। মাতৃগর্ভে মৌসুমীর আসার আগে শিপ্রাদেবী এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন তাঁর আরাধ্য দেবী লক্ষ্মী শ্বেতবর্ণা রূপ নিয়ে অনেক দূরের থেকে হেঁটে আসছেন তাঁর দিকে। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি দেখলেন কোলের কাছে আসামাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

শিপ্রাদেবীর এই স্বপ্নের কথা পাঠকরা 'খেয়েছিলেন' ভাল, যুক্তিটা তাঁদের অনেকেরই মনে ধরেছিল—স্বয়ং সরস্বতী ভর না করলে এমন বিদ্যে-বুদ্ধি কী এই বয়সে হওয়া সম্ভব ?

প্রতিবেদক আরও জানিয়েছেন, "মৌসুমীর সঙ্গে বর্তমান প্রতিবেদক দু-দফায় প্রায় ১৮ ঘণ্টা সাক্ষাৎকার করেন। সেই সাক্ষাৎকারে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, আধ্যাত্মবাদ কিছুই বাদ ছিল না। আর প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী এই প্রতিবেদকের জ্ঞানের সীমারেখা থেকে অনেক উঁচুতে থেকে সব উত্তর দিয়েছেন।"····"সাত বছরের মৌসুমী টাইপেও সিদ্ধহস্ত। ওর সমস্ত রিসার্চ পেপার ও নিজেই টাইপ করে। টাইপে ওর স্পিড ইংরাজিতে ৯০ এবং বাংলায় ৪০। মৌসুমী খুব ভাল গানও গাইতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগপ্রধান দুধরনেরই।"

আরও বহু পত্র-পত্রিকার মত এই পত্রিকাতেও ঘুরে ফিরে মৌসুমীর রিসার্চের কথা এসেছিল। প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, মৌসুমীর বাবা "সাধনবাবুরব্যবহার খুবই আন্তরিক। আমাদের জন্য চা পর্বের ব্যবস্থা করে এসে জানালেন—মৌসুমী একটু রিসার্চের কাজ

করছে। আধঘন্টা পরেই আসবে।

রিসার্চ ? চমকে উঠলাম, সাত বছরের মেয়ে রিসার্চ করছে—সে আবার কি ? মনের ভাব গোপন রেখে বললাম,—রিসার্চ ? আপনার মেয়ে রিসার্চও করে নাকি ?

—হ্যাঁ, তবে বিষয়টা বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, যে বিষয়টা নিয়ে ও রিসার্চ করছে সেটা অবশ্যই মানব কল্যাণের পক্ষে।

—মৌসুমী বহুবারই বলেছে সে ডাক্তার হতে ভালবাসে। তা এই রিসার্চ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন কাজে লাগবে ?

—বললাম তো, ওর রিসার্চ সফল হলে ভারতের মর্যাদা বিশ্বের দরবারে বেড়ে যাবে। আর এই রিসার্চ এত গোপনীয় রাখার কারণ হল, বিষয়টি এতই নতুন এবং প্রয়োজনীয় যে খবর বাইরে গেলে আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি।"

—আচ্ছা, এর আগে মৌসুমী কি কোন বিষয়ের উপর রিসার্চ করেছে ?

—কয়লার ওপর কাজও করেছে। তবে সেটা উল্লেখ করার মত নয়। আর সে ব্যাপারটায় ওকে আগাতে দিইনি। এই বড় কাজটির দিকে তাকিয়ে। আসানসোল বি ই কলেজের অধ্যাপকরা ওকে নিয়ে এখানে একবার একটা গ্রুপ ডিসকাশন করেছিলেন।"

মৌসুমী রিসার্চ করছে। অর্থাৎ ওর জ্ঞান বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রির সীমাকে অতিক্রম করেছে এবং ও আর আড়াই বছরের মধ্যে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবে এই বিশ্বাস বহু বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীকে প্রাণীত করেছিল, গর্বিত করেছিল।

৩০ জুলাই ১৯৮৯। দিল্লি দূরদর্শনের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ইংরেজি সংবাদে প্রায় দুমিনিট ধরে নানাভাবে মৌসুমীকে হাজির করা হলো কোটি কোটি দর্শকদের কাছে। মানুষ দেখলেন, পরিচিত হলেন 'ওয়ান্ডার গার্ল'-এর বিস্ময়কর প্রতিভার সঙ্গে।

এরও দু'বছর আগে আমরা একটু পিছিয়ে গেলে মন্দ হয় না। 'দ্য স্টেটসম্যান' দৈনিক পত্রিকা ২১ এপ্রিল '৮৭ মৌসুমীর এক বিশাল ছবি সহ দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল, "Wonder girl of Purulia Village"। প্রতিবেদক অলোকেশ সেন। তখন মৌসুমীর বয়স মাত্র চার বছর আট মাস।

প্রতিবেদক মৌসুমী প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, "Mousumi's interest in studies became evident when she was only one and a half years old. Since then she has learnt to read, write and speak in Bengali, Hindi and English. At present, she is learning German at home."'

অর্থাৎ, মৌসুমীর পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ সূচিত হয় মাত্র দেড় বছর বয়সে। তারপর ও বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে পড়তে, লিখতে ও বলতে শিখেছে। বর্তমানে বাড়িতেই জার্মান শিখছে।

প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী টাইপ করছে। ছবির তলায় লেখা—Mousumi Chakraborty typing out some paragraph from one of her text books.

সমাজ সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক বলে স্ববিজ্ঞাপিত মাসিক পত্রিকা 'উৎস মানুষ' আগস্ট '৮৭ সংখ্যায় মৌসুমীকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী করলেন, ছবি সহ। শিরোনাম ছিল,

"পুরুলিয়ার আশ্চর্য মেয়ে মৌসুমী।" প্রতিবেদক অভিজিৎ মজুমদার।

পাঠকরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার সময়ও মৌসুমী পাঁচের কোঠায় পা দেয়নি। প্রতিবেদক অবশ্য জানাচ্ছেন সাড়ে চার বছরের মৌসুমীকে ধানবাদের সেন্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানীরা "অজস্র প্রশ্ন করেছে ইংরাজি, বাংলা বা হিন্দীতে। যেমন, সালফিউরিক বা নাইট্রিক অ্যাসিডের সাংকেতিক নাম কিংবা কয়লা গবেষণা বিষয়ে নানা জটিল উত্তর দিয়ে সবাইকে অবাক করেছে।" সেই সঙ্গে প্রতিবেদক এও জানিয়েছেন, এত সব উত্তর দিচ্ছে—"যদিও সব কথা এখনো স্পষ্ট নয়।" সত্যিই তো সাড়ে চার বছর আধো-আধো কথা বলারই বয়স।

উৎস মানুষ আরো জানাচ্ছে, "বিস্ময়ের ব্যাপার, মৌসুমী টাইপ মেসিনে অনায়াসে টাইপ করতে পারে নির্ভুল ফিংগারিং-এ প্রায় চল্লিশ স্পিড-এ।"...."এই শেষ নয়। মৌসুমী জানে বাংলা ব্যাকরণ, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের নানা কথা। অঙ্কের অনেক ফরমূলাই ওর ঠোঁটের ডগায়। অনুবাদ করতে পারে বাংলা, ইংরাজি বা হিন্দীতে। সম্প্রতি ও জার্মান ভাষা শিখছে।"...."মৌসুমীর মাও খুব ভাল ছাত্রী ছিলেন।" আর মৌসুমীর বাবা ? প্রচার মাধ্যমগুলোর কল্যাণে তাও কারোই অজানা ছিল না। তিনি ছিলেন জুনিয়র সাইনটিস্ট।

মৌসুমীকে নিয়ে গণ-উন্মাদনার মতই এক ধরনের প্রচার-উন্মাদনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং তা প্রভাবিত করেছিল বিভিন্ন পেশার মানুষকে। ফলশ্রুতিতে আমি এবং আমাদের সমিতি প্রচুর চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলো এসেছিল মৌসুমীর বিষয়ে বিভিন্ন রকমের কৌতূহল নিয়ে, দ্বন্দ্ব নিয়ে, বিভ্রান্তি নিয়ে, জিজ্ঞাসা নিয়ে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত অগুনতি সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৌসুমীকে নিয়ে হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েই চলেছি। প্রশ্নগুলো মোটামুটি এই জাতীয়—মৌসুমীর এই পরম বিস্ময়কর প্রতিভার ব্যাখ্যা কী ? বাস্তবিকই কি মৌসুমী পরম বিস্ময়কর প্রতিভা ? মৌসুমী কি তবে জাতিস্মর ? অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী ? ও কি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে সক্ষম ? ওর মধ্যে বাস্তবিকই কি ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে ? মা লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে ঘিরে মৌসুমীর মা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মৌসুমীর প্রতিভা কি সেই স্বপ্নেরই বাস্তবরূপ নেওয়ার প্রমাণ নয় ? মৌসুমী কি লক্ষ্মী ও সরস্বতীরই অংশ ? স্বয়ং সরস্বতী মৌসুমীর জিবের ডগায় না থাকলে মুখে ভালমত বুলি ফোটার আগেই কী করে গবেষণা করে, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে পরীক্ষক গুণীজনদের হতবাক্ করে দেয় ?

এরই পাশাপাশি অন্য ধরনের প্রশ্নও এসেছে— মৌসুমী '৯১-তে মাধ্যমিক দেবে, অর্থাৎ ওর বিদ্যে বুদ্ধি ক্লাস নাইনের মানের। অথচ অনেক পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী গবেষণা করছে বিজ্ঞান নিয়ে। ওর বিদ্যে-বুদ্ধি অনার্স গ্র্যাজুয়েট স্তরের। ইংরাজি টাইপের স্পিড কেউ বলছেন কম করে ৪৫, কেউ ৬০, কেউবা বলছেন ৯০। বাংলায় টাইপ করছে ৪০ স্পিডে। কখনও জানা যাচ্ছে মৌসুমী বিজ্ঞানী হতে ইচ্ছুক, কখনও জানা যাচ্ছে ডাক্তার হতে চায়। কোন প্রতিবেদক

লিখলেন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, অধ্যাত্মবাদ, নিয়ে প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী প্রতিবেদকের জ্ঞানের সীমারেখা থেকে অনেক উঁচুতে থেকে সব উত্তর দিয়েছে। কেউ জানাচ্ছেন, মৌসুমী তার সাড়ে ন'বছর বয়সেই গবেষণার ফসল হিসেবে আনবে নোবেল পুরস্কার। বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি তিনটি ভাষাতেই বিস্ময়কর তার দক্ষতা। জানে ডাচ, জার্মান। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত সবেই ওর অগ্রগতি বিস্ময়কর। স্বভাবতই বহুজনের কাছেই বিরাট জিজ্ঞাসা—মৌসুমীর শিক্ষার প্রকৃত মান কী? আর এইসব জিজ্ঞাসারই মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে বার বার এবং তা শুধু সেমিনারে নয়, বিয়েবাড়িতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, অফিসে, সহযোগী বিজ্ঞানীকর্মীদের কাছে, সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে। একাধিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এই বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রত্যেকেই বিনীতভাবে জানিয়েছিলাম, "এখনও মৌসুমীকে দেখিনি, মৌসুমীর মুখোমুখি হইনি। তাই মৌসুমীর বিষয়ে কোনও কিছু মন্তব্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" জনৈক সাংবাদিক কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম জানিয়ে বলেছেন, এঁরা প্রত্যেকেই মৌসুমীকে পরীক্ষা না করেই তো মতামত জানিয়েছেন। বলেছিলাম, ওঁরা আপনাদের বা নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য কারও মাধ্যমে মৌসুমীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে মতামত জানাবার যে ক্ষমতা রাখেন, আমার সে ক্ষমতা নেই। এই অক্ষমতা বিনীতভাবে স্বীকার করে নিয়েই জানাচ্ছি—মৌসুমীকে নিজে পরীক্ষা না করে কোনও মন্তব্য করতে আমি অপারগ।"

প্রডিজি কী ? ও কিছু বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা

পরম বিস্ময়কর শিশু প্রতিভার অনেক কাহিনীই মাঝে-মধ্যে শোনা যায়। এদের বেশির ভাগই বিখ্যাত হয় মিথ্যা প্রচারে, গুজবে, অলীক-কল্পনায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ঈশ্বরের কৃপাধন্য, ঈশ্বরের অংশ বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নেই—ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হয়। বেশ কিছু শিশু প্রতিভার খবর অবশ্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে নিই। বাস্তবিকই যারা পরম বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা তাদের ক্ষেত্রেও 'বুদ্ধিতে যে প্রতিভার ব্যাখ্যা নেই' ধরনের কোনও বিশেষণ প্রয়োগ একান্তই বিজ্ঞান বিরোধী, বিজ্ঞানমনস্কতা বিরোধী চিন্তার ফসল। একজন বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার সঙ্গে যুক্ত মানুষ এই ধরনের বাক্য প্রয়োগ করলে যে কোনও যুক্তিবাদী মানুষকেই তা ব্যথিত করে, শঙ্কিত করে। কারণ,—

**বিজ্ঞান বর্তমানে যতটুকু
এগুতে পেরেছে তারই সাহায্যে যে
কোনও অসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভাধরের
কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ;
তা সে শিশু মস্তিষ্কের স্বাভাবিক
শারীরভিত্তিক ধর্মের অকাল বিকাশের
ফলেই হোক, জেনেটিক কোনও
কারণেই হোক, অথবা অন্য যে
কোনও কারণেই হোক।**

সব দেশেই বিভিন্ন সময়ে বিস্ময়কর প্রতিভাধর শিশুর দেখা মেলে। এরা কেউ পড়াশুনোয়, কেউ খেলাধুলায়, কেউ সঙ্গীতে, কেউ নৃত্যে, কেউ বা ছবি আঁকায় অথবা অন্য কোনও বিষয়ে বিরল প্রতিভা বলে চিহ্নিত হয়েছে। এদের অনেকেই পরবর্তীকালে চূড়ান্তভাবে নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছে, আবার অনেকে হারিয়ে গেছে সাধারণের মিছিলে।

আবার এর বিপরীতটাও ঘটতে দেখা গেছে বহুক্ষেত্রে। শৈশবে যার মধ্যে অসাধারণত্বের হদিশ খুঁজে পাওয়া যায়নি, পরবর্তী সময়ে তারই প্রতিভাকে মানুষ বার বার সেলাম জানিয়েছে। মাইক্রোসস্কোপের আবিষ্কারক লিউয়েনহুক, বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চালর্স ডারউইন, বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শরৎচন্দ্র—এঁরা কেউই শিশু প্রডিজি ছিলেন না। বরং লিউয়েনহুক এবং ডারউইন

'ফালতু' বলেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। লেখাপড়ায় মোটেই জুতসই ছিলেন না, ছিলেন নড়বড়ে। ছাত্র জীবনে আইনস্টাইনও এঁদের থেকে ভিন্নতর কিছু ছিলেন না। একবার পদার্থবিদ্যায় অকৃতকার্যও হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনও কৃতিত্বপূর্ণ ছিল না, শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই কথাই বলতে হয়। বিশ্বত্রাস বোলার চন্দ্রশেখর শৈশবে পোলিও-তে আক্রান্ত হয়ে চিহ্নিত হয়েছিলেন 'বিকলাঙ্গ' হিসেবে। তাঁর ক্রীড়া-জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের কথা সেই সময় কারো কষ্ট-কল্পনাতেও আসেনি। এমন উদাহরণ বহু আছে।

আমাদের দেশে শুধু মৌসুমীই নয়, বর্তমানে আরো কয়েকজনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা বিস্ময়কর শিশু প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। এমনই একজন চার বছরের মেয়ে পায়েল। '৮৯-তে পুনে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় ২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ৫২ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে সারা বিশ্বকে চমকিত করেছে। দৌড়ের সময় পায়েলের ওজন ছিল মাত্র ১৫ কেজি, উচ্চতা ·৫৪ মিটার। অনসূয়া নটরাজন ১১ বছরের বালিকা। নিবাস কোলকাতায়। ভরতনাট্যমে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে বহু গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইতিমধ্যেই। তাল ও লয়ের দখল, ভাব উপলব্ধির ক্ষমতা বিস্ময়কর।

মধ্যপ্রদেশের গ্রামের ছেলে ন' বছরের বীরেন্দ্র সিং ইতিমধ্যেই ৩০০ কবিতা লিখেছে, যেগুলো কাব্যগুণে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভূপালের কবি মহল থেকে পেয়েছে 'বাল কবি নাদান' উপাধি। ওর প্রতিভার প্রকাশ মাত্র চার বছর বয়সে। ওর কাব্য প্রতিভা শুধু কবিতাতেই আবদ্ধ থাকেনি। বেশ কিছু গল্পও লিখেছে, লিখেছে সিনেমার চিত্রনাট্য। ইতিমধ্যে বোম্বাই ফিল্ম জগতের চিত্র-পরিচালক শেখর কাপুরের ফিল্মে স্যাহায্যকারী হিসেবে নাকি থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছে।

অমিত পাল সিং চাড্ডা ক্লাস থ্রির ছাত্র। পড়ে বালভারতী এয়ারফোর্স স্কুলে। ইতিমধ্যে জীবন্ত 'ইয়ার বুক' হিসেবে অনেক প্রচার মাধ্যমের নজর কেড়েছে। টু-তে পড়তে ওর বাবা কিনে দিয়েছিলেন 'কম্পিটিশন সাকসেস রিভিউ'। মাত্র দু-ঘণ্টায় মুখস্থ করে অমিত শুরু করেছে ওর জয়যাত্রা।

আমেরিকান টেলিভিশন একটি সাত বছরের শিশুর অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে কোটি কোটি দর্শকের। শিশুটি ভারতীয়—জিপসা মাক্কর। মারুতি, ফিয়াট ও মারুতি জিপসি ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগের দুরন্ত-গতির স্টিয়ারিং কন্ট্রোল করছে চূড়ান্ত নিখুঁতভাবে।

অন্ধ্রে কিশোর শ্রীনিবাস মাত্র ছ-বছর বয়সেই ম্যান্ডলিন বাজানো শুরু করেছিল। বর্তমান বয়স ১৯। বিদেশী এই যন্ত্রে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সুর সাগরে দেশ বিদেশের সুর-রসিকদের ভাসিয়ে দিয়ে গেছে।

পেরামবুরের ন'বছরের বাসুদেবন মুখে মুখে চার অঙ্কের যে কোনও সংখ্যার স্কোয়ার রুট, কিউব রুট, ফোরথ রুট কষে ফেলছে।

তের বছরের ভরতনাট্যম শিল্পী বর্ণনা বসু তালে, লয়ে, ভাবে বিস্ময়কর শিশু প্রতিভার প্রমাণ রেখেছে।

অনুসূয়া নটরাজন

বীরেন্দ্র সিং

আমিত পাল

জিপসা মাক্কর

বাসুদেবন

পিনাকী
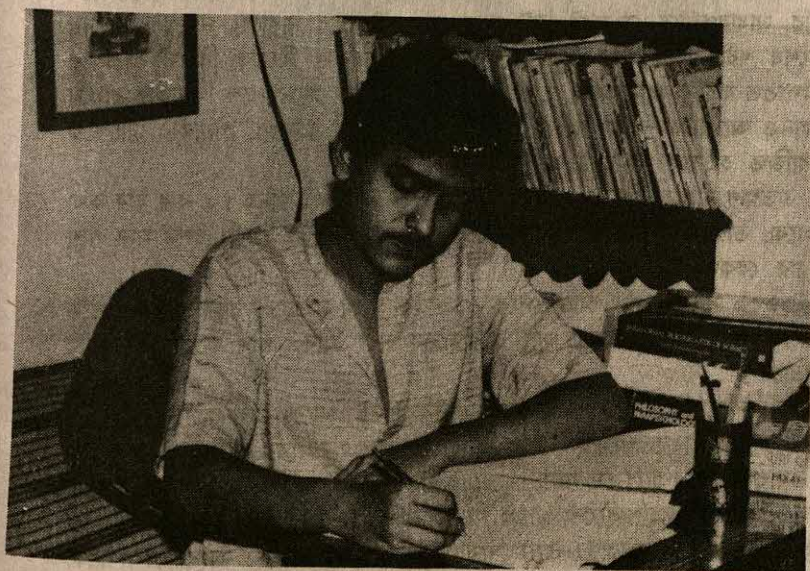
ক্যালিফোর্নিয়ার প্রবাসী ভারতীয় ন'বছরের শ্বেতা ভরদ্বাজ আজ ভরতনাট্যমের পেশাদার নৃত্য শিল্পী। মুদ্রা, তাল, লয়, ভাবে এক কথায় অনন্য।

বাঙ্গালোরের ১৬ বছরের কিশোর আর নিরঞ্জন কম্পিউটার প্রয়োগে নতুন তত্ত্ব হাজির করে বিশ্বের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে।

প্রবাসী ভারতীয় বালা অম্বতি মাত্র ১১ বছরের বয়সে অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ্‌দের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। ও ইতিমধ্যে একটি বইও লিখেছে—এইডস্ নিয়ে। বালা এ বছর কলেজে পড়ছে, বয়স মাত্র ১৩।

১৬ বছরের কিরণ কেডলায়া ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ম্যাথামেটিক্যাল অলিম্পিয়াডে প্রথম স্থান দখলে রেখে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। অঙ্কের বিরল প্রতিভা কিরণের দখলে আজ বহু পুরস্কার।

নেহাতই উদাহরণ টানতে এই প্রসঙ্গে এমন একজনের প্রসঙ্গ টানতে চলেছি, যে আমারই পুত্র হওয়ার দরুন একান্তভাবেই সঙ্কোচ অনুভব করছি। পিনাকী যখন ১১ বছরের বালক, ক্লাস ফাইভের ছাত্র তখন থেকেই সম্মোহন করতে সক্ষম। না; জাদুকরদের মত নকল বা সাজান অথবা লোক ঠকানো সম্মোহনের কথা বলছি না; বলছি পাভলভিয় পদ্ধতি অনুসরণ করে মনোরোগ চিকিৎসকরা বা মনোবিজ্ঞানীরা যে সম্মোহন করেন—তার কথা। আমার যে কোনও পাণ্ডুলিপি প্রকাশের আগে একজনই পড়ে, পিনাকী। সংযোজন, সংকোচন বা পরিমার্জনের ক্ষেত্রে ওর মতামতকে বহুক্ষেত্রেই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনার দায়িত্ব ওর ওপরই তুলে দিয়েছিলাম। ওর বয়স এখন ষোল, ক্লাস টেনের ছাত্র।

আমরা আপাতভাবে যে-সব ঘটনা দেখে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ বলে মনে করি, সাধারণভাবে সে-সবই ঘটে থাকে হয় কৌশলের সাহায্যে, নতুবা আমাদের বিশেষ শরীরবৃত্তির জন্য। জাদু কৌশল ও শরীরবৃত্তি বিষয়ক বিষয়ে পিনাকীর আপাতত যতটুকু জ্ঞান আছে, তাতে কোনও অলৌকিক বাবার পক্ষে পিনাকীর সামনে কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখিয়ে পার পাওয়া অসম্ভব, পিনাকীর চ্যালেঞ্জে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় একশো ভাগ।

এতক্ষণ যাদের কথা বললাম, তারা সকলেই এ-যুগেরই মানুষ। এ-বার যাঁর কথা বলবো, তাঁর মুঠোতেই রয়েছে সবচেয়ে কম বয়সে ম্যাট্রিক অর্থাৎ দশম মান পাশ করার রেকর্ড।

১৯৩৯ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ৫১ বছর আগে মাত্র ১০ বছর ৭ মাস বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন বাণী ঘোষ। পাশ করেছিলেন প্রথম বিভাগে।

বাণীদেবীর বিয়ের পর পদবী হয়েছে গুহঠাকুরতা। থাকেন কলকাতার বেহালায়। বাবা ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রমোহন ঘোষ ছিলেন নেপাল সরকারের চিকিৎসক। থাকতেন কাঠমাণ্ডুতে। নেপালে সে সময় মেয়েদের পড়াশোনার চল ছিল না। তাই মেয়েদের স্কুলও ছিল না। গৃহশিক্ষকের কাছেই পড়াশোনা। গৃহশিক্ষক আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে, নেপালের মহারাজা এনে দিয়েছিলেন জিতেন্দ্রমোহনের অনুরোধে। কাকা

শচীন্দ্রমোহন ছিলেন কলকাতায় স্মল জাজেস কোর্টের উকিল। তিনিই নিয়মিত বইপত্র ও সিলেবাস পাঠাতেন কাঠমাণ্ডুতে। পরীক্ষার তিন মাস আগে কলকাতায় এলেন। এখানেও গৃহশিক্ষকের কাছেই পড়েছিলেন। আমহার্স্ট স্ট্রিটের সিটি গার্লস স্কুল থেকে পরীক্ষা দেন।

দশ বছরে ম্যাট্রিক পাশ করেই বাণীদেবী বসে থাকেননি। '৪১-এ মাত্র ১২ বছর বয়সে বেথুন কলেজ থেকে পাশ করেন ইন্টারমিডিয়েট। এটাও সবচেয়ে কম বয়েসে ইন্টারমিডিয়েট পাশের রেকর্ড। খবরটা লন্ডন টাইমস, আনন্দবাজার, যুগান্তর সহ বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। '৪৩-এ বি এ পাশ করলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে। বয়স তখন ১৪। ভর্তি হলেন এম এ ক্লাসে। '৪৫-এ বিয়ে হলো। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। তারপর আর পড়তে পারেননি।

বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রে বাণীদেবীর বহু রম্যরচনা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অংশ নিয়েছেন আকাশবাণীর কথিকায়। বাণীদেবী এখনও প্রচণ্ড কর্মক্ষম। দুই মেয়ে এক ছেলে। এক মেয়ে ডাক্তার, অন্যজন আর্কিটেক্ট। একমাত্র ছেলে ইঞ্জিনিয়ার।

বাণী গুহঠাকুরতা (ঘোষ)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় দেশগুলোতে প্রডিজি চিহ্নিত প্রতিভার দেখা মেলে আমাদের দেশের তুলনায় বহুগুণ বেশি। প্রডিজির আবির্ভাব অনেক ঘটে, কিন্তু কালজয়ী প্রতিভার আবির্ভাবের ঘটনা একান্তই বিরল। প্রডিজি পরম বিস্ময়কর প্রতিভা বলে যাকে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি তার প্রতিভার সঙ্গে মৌলিকত্ব যুক্ত হলে তবেই কালজয়ী প্রতিভা হিসেবে বিকশিত হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভার দ্রুত বিকাশ-গতি শিশুকাল থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়েই চলে। ফলে সমাজ পায় এক এক অসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরকালে এদের বিকাশ-গতি মন্থর হয়ে আসে। ফলে সম্ভাবনাময় শিশু-প্রতিভা পরবর্তীকালে নেমে আসে প্রায় সাধারণের পর্যায়ে। যে হেতু শিশু বিকাশের উচ্চগতির সঙ্গে সাধারণভাবে আমরা পরিচিত নই। তাই এই ধরনের শিশু প্রতিভার সঙ্গে যখন আমরা পরিচিত হই, তখন তার অনেক কিছুই আমাদের কাছে রহস্যময়, বিস্ময়কর, ব্যাখ্যাহীন,অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ, ঈশ্বরের দান, ঈশ্বরের প্রকাশ, জাতিস্মরতার প্রমাণ ইত্যাদি মনে হয়।

'আই কিউ' প্রসঙ্গে

মানুষ আজ অনেক এগিয়েছে, এগিয়েছে বিজ্ঞান। বহু আবিষ্কার মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করেছে। বহু তত্ত্ব ও তথ্য অজানা অনেক কিছুকে জানতে সাহায্য করেছে। আমরা আপাত অদৃশ্য অণু-পরমাণুর অবয়ব নির্ণয় করতে পেরেছি। পেরেছি মহাকাশ গবেষণার মাধ্যমে বহু অজানাকে জানতে, অধরাকে ধরতে। অথচ আমাদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিষয়ে আমরা শতকরা দশভাগ খবরও জানতে পেরেছি কি না সন্দেহ। এ সন্দেহ আমার নয়, বিজ্ঞানীদের। এই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ থেকেই চিন্তা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞার উৎপত্তি। উনিশ শতকে হার্বার্ট স্পেনসার, কার্ল পিয়ারসন, ফ্রান্সিস গ্যালটন প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দার্শনিকরা বুদ্ধির বিকাশ, বিবর্তন, বংশগত ভিত্তি, বুদ্ধির পরিমাপ ইত্যাদি নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন।

ইংলন্ডের প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ চার্লস স্পিয়ারম্যান প্রথম বুদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণাকে রূপ দেন এক সুনির্দিষ্ট গাণিতিক তত্ত্বে। স্পিয়ারম্যানের ওই মতবাদ সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানীদের কেউই প্রায় মেনে নেননি। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর তত্ত্ব অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। স্পিয়ারম্যান মনে করতেন, একটি মানুষের সার্বিক বোধশক্তি জন্মগত।

এলেন ফরাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনেট। সে সময় ফ্রান্সে ছাত্রদের নিয়ে এক অভূতপূর্ব সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশাল সংখ্যক স্কুল ছাত্ররা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতে থাকে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা কোন্ কোন্ ছাত্রদের বেশি, তাদের সনাক্তকরণের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিনেটকে। উদ্দেশ্য ওই সব চিহ্নিত ছাত্রদের বিশেষ প্রশিক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষায় কৃতকার্য করা যায়। বিনেটের দায়িত্ব

পাওয়ার সময় ১৯০৪-০৫ সাল। সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে বিনেট যে অভীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করেন, তা সবই ছিল ছাত্রদের বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্কুলের পরীক্ষায় সাফল্য ও ব্যর্থতা বুদ্ধি ও মেধার তারতম্যের ফল, এই ধারণা থেকেই এই অভীক্ষা প্রশ্নকে 'বুদ্ধি অভীক্ষা' নামে বা আই কিউ (Intelligence Quotient সংক্ষেপে I. Q.) নামে অবহিত করা হতে থাকে।

'আই কিউ'তে যে নম্বর দেওয়া হতো, তার হিসেব করা হতো এইভাবে : প্রশ্নাবলীর বিন্যাস হতো বয়স অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। উত্তরদাতা যে বয়সের, সেই বয়সের জন্য নির্ধারিত সঠিক উত্তর দিলে উত্তরদাতার মানসিক বয়স (mental age) ও প্রকৃত বয়স (chronological age) সমান বলে ধরে নিয়ে তাকে দেওয়া হতো ১০০ নম্বর। অর্থাৎ দশ বছরের কোনও বালক দশ বছরের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারলে তাকে দেওয়া হবে ১০০। এর অর্থ দশ বছর বয়সে সাধারণ মানের ছেলেমেয়েদের যে ধরনের বুদ্ধি থাকা উচিত, তা আছে। ১০ বছরের বালকটি ২০ বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের সবগুলোর ঠিক উত্তর দিতে পারলে তার প্রাপ্য বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি বার করতে হলে যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, সেই মানসিক বয়সের সংখ্যাটিকে উত্তরদাতার প্রকৃত বয়সের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বালকটির বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি হবে $\frac{২০}{১০}\times১০০=২০০$। আবার দশ বছরের বালকটি যদি কেবল মাত্র ৫ বছরের একটি শিশুর বয়সের উপযোগী প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তবে তার মানসিক বয়স ধরা হবে ৫। অতএব বালকটির বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি হবে $\frac{৫}{১০}\times১০০=৫০$। মানসিক বয়স ÷ প্রকৃত বয়স × ১০০ করলে বেরিয়ে আসবে বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি।

বিশ শতকের প্রথম দশকে আলফ্রেড বিনেট যে বুদ্ধি পরিমাপক প্রশ্নাবলী তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, বিভিন্ন সময়ে তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের নামে বিকৃতকরণের পর আমরা পেলাম বর্তমান আই কিউ-এর রূপ। ব্রিটেন ও আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষীরা আউ-কিউকে সামাজিক শ্রেণী ও জাতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু করলো। অর্থাৎ, যে আই কিউ বিনেট প্রয়োগ করা শুরু করেছিলেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাই প্রযুক্ত হতে লাগলো সমষ্টির ক্ষেত্রে। বিকৃতকারীরা এই প্রয়োগের দ্বারা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইলো, সাদা চামড়াদের আই-কিউ কালো চামড়াদের চেয়ে অনেক বেশি ; আই কিউ মেধা বা বুদ্ধির পরিমাপক এবং মেধা বা বুদ্ধি অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ জন্মগতভাবে সাদা চামড়াদের মেধা ও বুদ্ধি কালো চামড়াদের তুলনায় অনেক উন্নত।

আই কিউ-এর প্রয়োগ সামাজিক শ্রেণী, বর্ণ বা জাতি গোষ্ঠীর উপর প্রয়োগ না করে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেই আই কিউ অভীক্ষার প্রশ্নাবলী নির্ভরযোগ্যতা পাবে, এমনটা ভাবারও কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। কারণ প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত অনুশীলনে আই কিউ বাড়ানো সম্ভব, এমনকি স্মৃতিকেও বাড়ানো সম্ভব। প্রতিভা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, যা আই কিউ-এর প্রাপ্ত সংখ্যা বা পরীক্ষা সাফল্যের ওপর সব সময় নির্ভর করে না। বহু ক্ষেত্রেই আই কিউ-এর সাহায্যে জিনিয়াস দূরে থাক, বুদ্ধি

বৃত্তিরও কোনও হদিশ মেলে না। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যার 'নিউ সাইনটিস্ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক একজেটার (Exeter বিশ্ববিদ্যালয়ের Human cognition বিভাগের অধ্যাপক এম হাও (M. Howe) সত্তর জন বিরল সংগীত প্রতিভার জীবন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—

জিনিয়াস তৈরি হয়,জম্মায় না (Geniuses may be made rather than born)

আমরা পরীক্ষার সাফল্য নিয়ে বিচারে বসলে আইনস্টাইন, ডারউইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসু প্রমুখ বহু প্রতিভাধরদের ক্ষেত্রেই একেবারে বোকা বনে যেতাম।

বংশগতি বা জিন প্রসঙ্গে কিছু কথা

বিগত একশো বছরে আমরা Biological determinist (এঁরা মনে করেন মানব প্রতিভা বিকাশে জিনই সব) Cultural determinist (এঁদের মতে পরিবেশই মানব প্রতিভা বিকাশে সব) এবং Interactionist (এঁদের মতে জিন ও পরিবেশ দুইই মানব প্রতিভা বিকাশে ক্রিয়াশীল)-এদের নানা বক্তব্য ও ব্যাখা শুনেছি। সে-সব নিয়ে সামান্য আলোচনায় ঢোকার প্রয়োজন অনুভব করছি।

ইদানীং মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ব্যাপক গবেষণা চলছে মানুষের বুদ্ধির ওপর বংশগতি বা জিনের প্রভাব ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে।

আধুনিক বংশগতি বিদ্যা ও জিন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে আপনাদের মূল বিষয় জানার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে চাই না। জিন আলোচনা তাই স্বল্প বাক্যে সীমাবদ্ধ রাখবো।

মানুষের জন্মের শুরু ডিম্বকোষ শুক্রাণুদ্বারা নিষিক্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকে। নিষিক্ত কোষ দু-ভাগ হয়ে গিয়ে হয়ে যায় দু-টি কোষ। দুটি কোষ বিভক্ত হয়ে হয় চারটি কোষে। এমনিভাবে চার থেকে আট, আট থেকে ষোল—প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত বিভাজন ক্রিয়া চলতেই থাকে।

বেশিরভাগ কোষের দুটি অংশ। মাঝখানে থাকে 'নিউক্লিয়াস' ও তার চারপাশে ঘিরে থাকে জেলির মত জলীয় পদার্থ 'সাইটোপ্লাজম'। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে 'ক্রোমোজোম'। এই ক্রোমোজোম আবার জোড়া বেঁধে অবস্থান করে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোম আবার এক বিশেষ ধরনের 'ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড'-এর (Deoxyribonucleic

acid) অণুর সমষ্টি—সংক্ষেপে ডি এন এ। দু-গাছা দড়ি পাকালে যেমন দেখতে হবে, অণুগুলো তেমনি ভাবেই পরস্পরকে পেঁচিয়ে থাকে। সব প্রাণীর বংশগতির সংকেত এই ডি এন এ-তেই ধরা থাকে। ডি এন এ থেকে আর এন এ বা (Ribonucleic acid) তৈরি হয়। আর এন এ থেকে তৈরি হয় প্রোটিন (Protein)।

২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রতিটি জোড়ার ক্ষেত্রে একটি আসে পুরুষের শুক্রাণু থেকে, অন্যটি নারীর ডিম্বাণু কোষ থেকে। ক্রোমোজোমের এই জিন এককভাবে বা অন্য জিনের সঙ্গে মিলে দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। চুলের রঙ, চোখের তারার রঙ, দেহের রঙ ও গঠন, রক্তের শ্রেণী (O, A, B, AB) ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ বিশেষ জিনের ভূমিকা রয়েছে।

জিন বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা মনে করেন নারী-পুরুষের মিলনের ফলে ক্রোমোজোমের সংযুক্তি ৮০ লক্ষ রকমের যে কোনও একটি হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই দেখা যায়, একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে বহু ধরনের অমিল থাকতেই পারে। লম্বা-বেঁটে, মোটা-রোগা, বাদামী চোখ, নীল চোখ, শান্ত-ছটফটে ইত্যাদি।

মা-বাবার চোখের মণি কালো, কিন্তু সন্তানের চোখের মণি কটা, মা বাবা স্বল্প দৈর্ঘ্যের মানুষ সন্তান বেজায় লম্বা, মা বাবা ফর্সা সন্তান কালো অথবা এর বিপরীত দৃষ্টান্তও প্রচুর চোখে পড়বে একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেললে। বাবা সন্তানের প্রকৃত জনক হলেও এমনটা ঘটা সম্ভব। কিছু মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, পিতা সন্তানের প্রকৃত জনক হলেও এমন ঘটা সম্ভব একাধিক বা বহু প্রজন্ম পরে জিনের সুপ্তি ভাঙার জন্য। যেখানে বাবাই প্রকৃত সন্তানের জনক সেখানে অনুসন্ধান চালালে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যাবে সন্তানটির মা অথবা বাবার পূর্বপুরুষদের কারো না কারো চোখের মণি ছিল কটা, কেউ না কেউ ছিলেন লম্বা, গায়ের রঙ ছিল কালো ইত্যাদি। আমার এক নিকট আত্মীয়ার দু-হাতের কড়ে আঙুল থেকে বেরিয়ে এসেছিল বাড়তি দুটো আঙুল। আত্মীয়ার নামটি প্রকাশ করায় অসুবিধে থাকায় আমরা এখানে বোঝার সুবিধের জন্য ধরে নিলাম, নামটি তার মাধুরী। মাধুরীর মা এবং বাবার নাম মনে করুন মিতা ও আদিত্য। মিতা ও আদিত্যের কোনও হাতেই বাড়তি আঙুল নেই। মাধুরীর এই বাড়তি আঙুলের মধ্যে আদিত্য রহস্য খুঁজে পেয়েছিলেন। মিতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। নিজেকে মাধুরীর জনক হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। স্রেফ দুটি বাড়তি আঙুল ওদের শান্তির পরিবারে নিয়ে এসেছিল অশান্তির আগুন।

ওঁদের অশান্তির কথা আমার কানেও এসেছিল। মিতা বাবাকে হারিয়ে ছিলেন শৈশবে। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে জানতে পারি, মিতার বাবার দু'কড়ে আঙুল থেকেই বেরিয়েছিল বাড়তি দুটি আঙুল। একটা পুরোন ছবিও উদ্ধার করা গিয়েছিল, যাতে মিতার মা ছিলেন চেয়ারে বসে, বাবা দাঁড়িয়ে। বাঁ হাতের দৃশ্যমান কড়ে আঙুল নজর করলেই চোখে পড়ে বাড়তি আঙুল। এটুকু বললে বোধহয় খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আদিত্যকে বুঝিয়েছিলাম, জিনের সুপ্তি ভাঙার তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের মতামত। ওদের পরিবারে ফিরে এসেছিল শান্তি।

এই তত্ত্ব ঠিক হলে এমনটা ঘটাও অস্বাভাবিক নয়—যে পূর্বপুরুষের প্রতিভা

বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, অনুকূল পরিবেশের অভাবে বিকশিত হয়নি, সেই প্রতিভাই আজ বিকশিত হয়েছে উত্তর-পুরুষের মধ্যে।

বিস্ময়কর স্মৃতি নিয়ে দু-চার কথা

বেদ রচিত হয়েছিল ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বে। সে-যুগের ঋষিরা বেদকে লিপিবদ্ধ না করে কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। বিপুল সংখ্যক শ্লোকগুলো তাঁরা যে অসাধারণ স্মৃতির মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চারণে, সুর ও ছন্দ বজায় রেখে কণ্ঠস্থ রেখেছিলেন, তা বাস্তবিকই অতি-বিস্ময়কর।

প্রাচীন যুগে স্মৃতির সাহায্যেই গুরু শিক্ষাদান করতেন। শিষ্যরাও তা স্মৃতিতেই ধরে রাখতেন এবং পরবর্তীকালে স্মৃতিকে কাজে লাগিয়েই শিক্ষা দিতেন। স্বভাবতই সে যুগের পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুদের স্মৃতি হয়ে উঠেছিল অসাধারণ। তাঁদেরই কিছু কিছু প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (recessive) জিন বিবর্তন পরম্পরায় বাহিত হয়ে বহু প্রজন্ম পরে কোনও ব্যক্তির মধ্যে এসে থাকতে পারে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিন ঋষিরা পেয়েছিলেন কোন্ পূর্বপুরুষের থেকে ? আসলে এঁরা শ্লোকগুলো স্মৃতিতে ধরে রাখতে তীব্রভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং প্রয়োজনে স্মৃতিতে ধরে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এত দীর্ঘ সময় কি জিন প্রচ্ছন্নভাবে নিজ বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে সক্ষম ? এই প্রশ্নের উত্তরে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীরা উদাহরণ হাজির করেন—অনেক শিশু জন্মায় মনুষ্যেতর প্রাণীর অঙ্গ নিয়ে—যেমন ছোট্ট 'লেজ' একটি দৃষ্টান্ত। তাঁদের মতে মনুষ্যেতর যে প্রাণীটি অতীতে ছিল, তারই প্রচ্ছন্ন জিনের বর্তমান উপস্থিতিই এর জন্য দায়ী।

একান্ত প্রয়োজনে ঋষিরা বা গুরুরা শাস্ত্রকে স্মৃতিতে ধরে রাখতেন ; তেমন উদাহরণ এ যুগে আমাদের দেশে বিরল হলেও অসম্ভব নয়। বিদেশে প্রচুর উদাহরণ তো আছেই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল আলোড়ন তুলেছে কর্নাটকের যুবক রাজেন শ্রীনিভাসন মহাদেবন। অংক শাস্ত্রে 'পাই' π এর অর্থ বৃত্তের পরিধিকে ব্যাস দ্বারা ভাগের ফল। এই ফল প্রায় ২২÷৭ এবং মোটামুটি ধরে নেওয়া হয় সংখ্যাটা ৩·১৪। কারণ দশমিকের পর সংখ্যার শেষ নেই। ৩·১৪১৫৯২৬৫৩৫ ......এভাবে চলতেই থাকবে। রাজন ১৯৮১ সালে ৫ জুলাই গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এর নেওয়া পরীক্ষায় দশমিকের পর ৩১, ৮১১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একের পর এক বলে গেছে নির্ভুল ভাবে স্মৃতি থেকে। সময় লেগেছিল ৩ ঘন্টা ৫৯ মিনিট। প্রতি মিনিটে রাজন বলেছিল গড়ে ১৫৬·৭টি করে সংখ্যা। কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে বলেছিল, ভাবতে অবাক হতে হয়। এখানেই রাজনের বিস্ময়কর স্মৃতির শেষ নয়, ও উল্টো দিক থেকেও 'পাই' বলে যেতে পারে। রাজনের এই অনন্যসাধারণ স্মৃতি-শক্তির কার্য-কারণ জানতে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ডলারের গবেষণা প্রকল্পে হাত দিয়েছেন।

রাজেন শ্রীনিবাসন মহাদেবন

রাজন-বিস্ময় এখানেও শেষ নয়। 'গীতা' রাজনের মুখস্থ। স্মৃতি থেকে বলে যেতে পারে ব্র্যাডমানের লেখা 'ফেয়ারওয়েল টু ক্রিকেট' বইটির প্রতিটি লাইন, ভারতীয় রেলওয়ের 'টাইম টেবিল' ওর কণ্ঠস্থ দূরত্ব, ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য সবই স্মৃতি থেকে যখন তখন আহরণ করতে পারে।

বিদেশের প্রচুর উদাহিরণ থেকে একটি দিই। জাপানের হিদেয়াকি টোমোওরি ১৯৮৭ সালে রাজনের গিনিস রেকর্ড ভেঙে বলেছে দশমিকের পর ৪০ হাজার পর্যন্ত সংখ্যা। রাজনও ছাড়ার পাত্র নয়। প্রস্তুত হচ্ছে ১ লক্ষ সংখ্যা পর্যন্ত বলে রেকর্ডকে নিরাপদে রাখতে।

পানিহাটির এক পণ্ডিতের অসাধারণ স্মৃতির কথা আজও কিংবদন্তি হয়ে রয়েছে। পণ্ডিতের নাম জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তখন ইংরেজ আমল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একদিন নিত্যকার মত গেছেন গঙ্গা স্নানে। ঘাটে তখন দুই সাহেবের মধ্যে তুমুল ঝগড়া আর হাতাহাতি চলছে। কয়েক দিনের মধ্যে দুই সাহেবের লড়াই গড়ালো আদালতের কাঠগোড়ায়। সাক্ষ্য দিতে পণ্ডিতের ডাক পড়ে। পণ্ডিত সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দু'জনের হুবহু ইংরেজি কথোপকথন তুলে ধরেন বিচারকের সামনে। বাদী-বিবাদী দু-জনেই পণ্ডিতের বক্তব্যের সত্যতা মেনে নিলেন। বিচারক পণ্ডিতের স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক। বললেন, "আপনি এতদিন আগের দু'জনের প্রতিটি কথা কি করে মনে রাখলেন? সত্যিই আপনার অসাধারণ স্মৃতি।"

পণ্ডিত তো সাহেবের ইংরেজি বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে পেশকারকে জিজ্ঞেস করলেন, "সাহেব কি বলছেন?"

পণ্ডিতকে পেশকার বললেন, "সে কি, আপনি ইংরেজি জানেন না?"

পণ্ডিত জানালেন, "না।"

"তাহলে দু-সাহেবের এত ঝগড়ার কথা মনে রাখলেন কি করে?"

পণ্ডিতের সরল জবাব, "সে তো শুনেছিলাম, তাই মনে ছিল।"

পেশকারের কাছে পণ্ডিতের কথা শুনে বিচারক তো আরো অবাক্। এমন আশ্চর্য স্মৃতিও মানুষের হয়।

'দুর্বল স্মৃতি' বলে কিছু নেই, ঘাটতি শুধু স্মরণে

একটা কথা বলি। অনেকের কাছেই হয়তো অদ্ভুত শোনাবে। স্বাভাবিক মস্তিষ্কেকোষের অধিকারী মানুষদের ক্ষেত্রে 'দুর্বল স্মৃতি' বলে কিছু নেই। আমাদের স্মৃতি-শক্তির একটা পর্যায় সংরক্ষণ (Retention)। শেষ পর্যায়ে আছে স্মরণ (Recall)। যা দেখি, যা শুনি সে-সব সংরক্ষণের বিষয়ে আমাদের কারুরই কোনও ঘাটতি নেই। স্মরণের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের নানা ধরনের ত্রুটি।

আমার কর্মক্ষেত্রে একটি ছেলে ঘুরে ঘুরে আমাদের চা দিত। প্রতিদিন দেড়শো মানুষকে চা খাওয়াতো। কেউ নিতেন এক কাপ, কেউ দু'কাপ, কেউ অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানাতে নিতেন পাঁচ কাপ। প্রতিদিনই প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই হিসেবেরও তারতম্য হতো। কাল যিনি এক কাপ নিয়েছিলেন, আজ তিনি হয় তো নিয়েছেন তিন কাপ। 'টি-বয়' ছেলেটি প্রত্যেকের হিসেব স্মৃতিতে ধরে রাখতো এবং প্রয়োজনের সময় স্মরণ করতে পারতো। এমনকি সে পাঁচ কাপের হিসেব দিলে যদি কেউ অভ্যাগতর কথা ভুলে তিন কাপ নিয়েছেন বলে জানাতেন, 'টি বয়' ছেলেটিই মনে করিয়ে দিত—'এগারোটা নাগাদ নীলশার্ট সাদা প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোককে এক কাপ চা খাওয়ালেন, দুটো তিরিশ নাগাদ একটা ঝাঁকড়া চুলো ইয়ং ছেলেকে খাওয়ালেন এক কাপ।' এমন অসাধারণ স্মৃতির অধিকারী ছেলেটির দৃঢ় ধারণা, ওর স্মৃতি খুবই দুর্বল তাই লেখাপড়া শেখা হয়ে ওঠেনি।

আমার শৈশব কেটেছে পুরুলিয়া জেলার ছোট্ট রেল-শহর আদ্রার বড়-পলাশখোলায়। রোজকার দুধ নেওয়া হতো একটি আদিবাসী প্রবীণার কাছ থেকে। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু কবে কতটা বাড়তি দুধ রাখতাম, তার পাক্কা হিসেব রাখতেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি তো আরো অনেক বাড়িতেই দুধ দাও, না লিখে সবার বাড়ির হিসেব রাখ কি করে।"

প্রবীণা জানিয়েছিলেন, "কী করে আবার? সে তো মনে থেকেই যায়।"

সে সময় প্রবীণার উত্তরে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম মা মুদির দোকান থেকে সাতটা জিনিস আনতে বললে ছ'টা আনি, একটা ভুলে যাই, আর ও এত বাড়ির এত হিসেব মনে রাখে কী করে?

এমন অনেক মা-বাবা আমার কাছে এসেছেন, যাঁদের সমস্যা সন্তানের দুর্বল স্মৃতিশক্তি। পড়লে মনে থাকে না, পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে। সন্তানদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি এদের অনেকেই এক একটি জীবন্ত তথ্যভাণ্ডার। কেউ কপিল, রবি শাস্ত্রী, ইমরান, মুদস্‌সর নজর, আজাহারউদ্দিন, হ্যাডলি, রণতুঙ্গের ব্যাটিং, বোলিং-এর গড় বলে চলেছে; কেউ বা ব্রুস লী, সিলভেস্টার স্ট্যালোন প্রমুখদের বহু তথ্য স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে অনর্গল বলে চলেছে চরম উত্তেজনার সঙ্গে। কোনও কিশোরীকে দেখেছি

বোম্বের নায়ক-নায়িকাদের যত খবর জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত হয় সবই কণ্ঠস্থ। কেউবা চিমা, চিবুজোর, সুব্রত, মনোরঞ্জনের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানে। এর পরও এদের কাউকেই কি আমরা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার জন্য অভিযুক্ত করতে পারি ? ওরা সেই সব তথ্যই মনে রাখে যা মনে রাখতে ওরা খুব ভালোবাসে অথবা প্রয়োজনে বাধ্য হয়। আমাদের টি-বয়টি বা আদিবাসী দুধওয়ালী অমনি বাধ্য হয়ে মনে রাখার নজির। অমন নজির আরো বহু সহস্র আছে। আমার জীবনেই অমন বহু নজির দেখেছি। আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় দেখেছেন।

মানবগুণ বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব

আমাদের মানসিক জিন বৈশিষ্ট্য কিন্তু পুরোপুরি জিন বা বংশগতি প্রভাবিত নয়। পরিবেশ্ও আমাদের মানসিক বৃত্তির ওপর বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

**আমরা যে দু'পায়ে
ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয়
পশুর মত জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে
পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ
করি—এ-সবের কোনোটাই
জন্মগত নয়।**

এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোই, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ।

মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা (Protentialities) নিয়ে অবশ্যই জন্মায়। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক, সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, পরিচিত ও আশেপাশের মানুষরা অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ। এই মানব শিশুই কোনও কারণে মানুষের পরিবর্তে পশু সমাজের পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকলে তার আচরণে সেই পশু সমাজের প্রভাবই প্রতিফলিত হবে। আমার সমবয়স্ক বা তার চেয়ে প্রাচীন সংবাদ পাঠকদের অনেকেরই জানা নেকড়েদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া 'রামু' ও 'কমলার' ঘটনা। নেকড়েদের ডেরা থেকে বালক-বালিকা দুটিকে উদ্ধার করার পর তাদের এই নামকরণ করা হয়েছিল। ওরা দুজনেই হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতো, জিব দিয়ে চেটে জল পান করতো, রান্না করা খাবার খেত না। কথাও বলতে জানতো না, পরিবর্তে নেকড়ের মতই আওয়াজ করতো। এরা মানুষের সমাজের সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পেরে বেশি

দিন বাঁচেনি।

আমার আপনার পরিবারের কোনও শিশু সভ্যতার আলো না দেখা আন্দামানের আদিবাসী জাড়োয়াদের মধ্যে বেড়ে উঠলে তার আচার আচরণে, মেধায় জাড়োয়াদেরই গড় প্রতিফলন দেখতে পাব। আবার একটি জাড়োয়া শিশুকে শিশুকাল থেকে আপনি-আমি আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলে দেখতে পাব শিশুটি বড় হয়ে আমাদের সমাজের আর দশটি ছেলে-মেয়ের গড় বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু একটি মানুষের পরিবর্তে একটি বনমানুষকে বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলেও এবং আমাদের পরিবারের শিশুর মতই তাকেও পড়াশোনা শেখাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার অধিকারী করতে পারবো না ; কারণ ওই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভিতর বংশগতির ধারায় বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পরিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানব গুণ বিকাশে জিন ও পরিবেশ দুয়েরই প্রভাব বিদ্যমান।

আমাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে অনুকূল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে। জিনগত কারণে বা বংশানুক্রমিক কারণে পশুদের মধ্যে মানবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে পশুদের মানবিক গুণের অধিকারী করা সম্ভব নয়।

এই তত্ত্ব আজ সমস্ত মনোবিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পেয়েছে।

মানবগুণ বিকাশে পরিবেশের প্রভাব

একটি মানুষের শিশু বয়স থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানবিক গুণের ক্রমবিকাশের বিষয়ে উন্নততর দেশগুলোতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ওইসব দেশের মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখন স্বীকার করেই নিয়েছেন—মানুষের বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পরিবেশ দ্বাবা প্রভাবিত। সেই কারণে "মানবিক গুণের বিকাশে কার প্রভাব বেশি—বংশগতি অথবা পরিবেশ ?" এই জাতীয় শিরোনামের বিতর্কে ওসব দেশের বিজ্ঞানীরা আজকাল আর অবতীর্ণ হন না, এককালে যেমনটি হতেন। তবে এখনও এদেশের বহু চিকিৎসা বিজ্ঞানী বংশগতিকে অত্যধিক বা

চূড়ান্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাকেই অস্বীকার করে বসেন, নাকচ করে দেন। এমনটা করার কারণ সম্ভবত, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজ-খবর না রাখা, এক সময় বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার পর প্রতিষ্ঠা পেতেই নিশ্চল হয়ে যাওয়া।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, বিগত বহু হাজার বছরের মধ্যে মানুষের শারীরবৃত্তিক কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।

এই কম্পিউটার যুগের আধুনিক সমাজের মানব শিশুর সঙ্গে বিশ হাজার বছর আগের ভাষাহীন, কাঁচামাংসভোজী সমাজের মানব শিশুর মধ্যে জিনগত বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না।

অর্থাৎ সেই আদিম যুগের মানব শিশুকে এ-যুগের অতি উন্নততর বিজ্ঞানে অগ্রবর্তী কোনও সমাজে বড় করতে পারলে ওই আদিম যুগের শিশুটি আধুনিকতম উন্নত সমাজের গড় মানুষদের মতই বিদ্যে-বুদ্ধির অধিকারী হতো। হয় তো গবেষণা করত মহাকাশ নিয়ে অথবা সুপার-কম্পিউটার নিয়ে, অর্থাৎ অনুকূল পরিবেশে শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেলে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকান দেশের নিরন্ন, হতদরিদ্র, মূর্খ মানুষগুলোও হতে পারে ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার মধ্যে গড়ে ওঠা মানুষগুলোর সমকক্ষ। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বাতন্ত্র্যতা নিশ্চয়ই থাকতো, যেমনটি এখনও থাকে।

বর্ণপ্রাধান্য, জাতিপ্রাধান্য, পুরুষপ্রাধান্য বজায় রাখতে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এক ধরনের প্রচার চালান হয়, উন্নত দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের বর্ণের, তাদের জাতির মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষতা ও বৈশিষ্ট্য। পুরুষরাও একইভাবে প্রচার করে নারীর চেয়ে তাদের মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষতার। বুদ্ধি মাপের নামে বুদ্ধ্যাঙ্ককে কাজে লাগিয়ে অনেক সাদা-চামড়াই প্রমাণ করতে চায় কালো চামড়ার তুলনায় তাদের মেধা ও বুদ্ধির উৎকর্ষতা। আবারও বলি এ যুগের বিজ্ঞানীরা কিন্তু যে বংশগতির তথ্য হাজির করেছেন, তাকে স্বীকার করলে বলতেই হয়, অনুকূল সুযোগ সুবিধে না পাওয়ার দরুনই নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষগুলো অনুকূলতার সুযোগ পাওয়া মানুষের মত মানবিক গুণগুলোকে বিকশিত করার সুযোগ পায়নি।

এ কথাও সত্যি সামান্য অনুশীলনেই কিন্তু বুদ্ধ্যাঙ্ক প্রচুর বাড়ানো সম্ভব—প্রজ্ঞা বা মেধাকে আদৌ না বাড়িয়েই।

রাশিয়ার শিক্ষাসংক্রান্ত আকাদেমির (Pedagogical Acedemy)-র পূর্ণ সদস্য এ

পেট্রোভস্কি (A. Petrovsky)-র পঠিত প্রবন্ধ থেকে জানতে পারছি—স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই শিশুদের অনেক বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের কার্যক্রম রাশিয়ায় গ্রহণ করা হয়েছে যাতে বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা সৃষ্টি করা যায়। দু-সপ্তাহের শিশুকে সাঁতার শেখান হচ্ছে, স্কুলে ঢোকার আগেই তিন মিটার স্প্রিং বোর্ড থেকে ডাইভিং শিখছে। অনুকূল সুযোগ অনেককেই বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। অনেকে প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে পরিণত বয়সে।

পরিবেশকে আমরা প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এক : প্রাকৃতিক পরিবেশ, দুই : সামাজিক পরিবেশ। মানব জীবনকে এই দুই পরিবেশই প্রভাবিত করে।

মানব-জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অনুকূলে আনতে সক্ষম হলেও পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে অনুকূলে আনার চেষ্টা কষ্টকল্পনা মাত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আমাদের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যতা দিয়েছে। আমরা যে অঞ্চলে বসবাস করি তার উচ্চতা, তাপাঙ্ক, বৃষ্টিপাত, জমির উর্বরতা ইত্যাদির উপর আমাদের বহু শারীরিক বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। তাইতেই গ্রাম-বাংলার মানুষের সঙ্গে পাঞ্জাবের মানুষের, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মানুষদের, আফ্রিকার দক্ষিণবাসী মানুষদের সঙ্গে ইউরোপের মানুষদের, মেরু অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে মরু অঞ্চলের মানুষদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখতে পাই।

বিজ্ঞানরা স্বীকার করেন—চুলের রঙ, দেহের রঙ, চোখের তারার রঙ, দেহ গঠন, ইত্যাদির মত অনেক কিছুর পিছনেই যদিও জিন বা বংশগতির অবদান যেমন আছে, তেমনই এও সত্যি—দীর্ঘকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব শরীরগত নানা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে এবং সেই বৈশিষ্ট্যই আবার জিনকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানীরা এও স্বীকার করেন—অতি বিস্ময়কর জটিল আধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও ডি এন-এর ক্ষমতা ও কার্যকলাপ অনেক বেশি জটিল এবং অনেক বেশি বিস্ময়কর।

প্রকৃতির প্রভাব যে দেহগত বৈশিষ্ট্য, দেহ বর্ণের উপর প্রভাব ফেলে থাকে, এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ আমাদের নেই। পরিবর্তে বিষয়টা বুঝতে আমরা একটি দৃষ্টান্তকে ধরে নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

যে মনুষ্যগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই ধীরে ধীরে ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের চামড়ার নীচে ঘোর কৃষ্ণ রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি ঘটেছে তীব্র তাপ থেকে দেহের ভেতরের যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করতে। শরীরের ভেতরে যন্ত্রপাতিকে বাঁচানোর প্রয়োজনেই দেহ বর্ণের এই পরিবর্তন বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে সূচিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু আমাদের শরীরবৃত্তির ওপর নয়, মানসিকতার ওপরও

প্রভাব বিস্তার করে। যে অঞ্চলের চাষী উর্বর জমির মালিক, সহজেই সেচের জল পায়, সে অঞ্চলের চাষীরা আয়াসপ্রিয় হয়ে পড়ে। হাতে বাড়তি সময় থাকার জন্য গ্রামীণ নানা সাংস্কৃতিক কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে। এমনি ভাবেই তো বঙ্গ সংস্কৃতিতে এসেছে 'বারো মাসে তের পার্বণ'। আবার একই সঙ্গে আয়াসপ্রিয়তা আমাদের আড্ডা প্রিয়, পরনিন্দা প্রিয়, ঈর্ষাকাতর, তোষামোদ প্রিয় ইত্যাদির মত বদ্‌দোষের পাশাপাশি বড় বেশি নিরীহ, আপোষমুখি করতেই পারে, দূরে সরিয়ে রাখতে পারে লড়াকু মানসিকতাকে, যদি না সামাজিক পরিবেশের প্রভাব তাদের এইসব দোষ থেকে মুক্ত করে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বা মরু অঞ্চলের মানুষ নিজেদের ন্যূনতম খাদ্য পানীয় সংগ্রহেই, বেঁচে থাকার সংগ্রামেই দিন-রাতের প্রায় পুরোটা সময়ই ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের পক্ষে বুদ্ধি, মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ করার মত সময়টুকুও থাকে না।

আবার যে অঞ্চল পেট্রলের ওপর ভাসছে, সে অঞ্চলের মানুষদের পায়ের তলাতেই তো গলানো সোনা। আয়াসহীন ভাবে কিছু মানুষ এত প্রাচুর্যের অধিকারী যে ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে পারে না তাদের সুবিশাল আয়ের ভগ্নাংশটুকুও। শ্রমহীন, প্রয়াসহীন মানুষগুলো স্রেফ প্রকৃতির অপার দাক্ষিণ্যে ধনকুবের বনে গিয়ে ভোগ সর্বস্ব হয়ে পড়ে। ভোগ থেকে কিছু সময় বুদ্ধি মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে খরচ করতেও এদের অনীহা হিমালয়ের মত বিশাল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কী প্রয়োজন শ্রমে, বুদ্ধি মেধা বাড়াবার শ্রমে ? জীবিকার জন্যেই তো ? প্রাচুর্য যেখানে অসীম, ফুরিয়ে দেওয়ার ফুরসৎ নেই, সেখানে শ্রম একান্তই নিষ্প্রয়োজন। পেট্রল-খনির মালিকদের অর্থ প্রাচুর্যের ছোঁয়া লাগে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যেও। অনেক কম শ্রমে অনেক আয়াস কেনার সুযোগ গড়াগড়ি দেয় এদের হাতের মুঠোয়। প্রায় আয়াসহীন প্রাচুর্য এদেরও ভোগ-সর্বস্ব করে। ফলে মানসিক প্রগতি এই অঞ্চলের মানুষদের কাছে অধরাই থেকে যায়।

বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ে যাদের বাসভূমি তাদের না আছে আবাদী জমি, না আছে শিল্প-কারখানা, না আছে কাজ পাওয়ার সুযোগ। বেঁচে থাকার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সামান্যতম খাদ্য পানীয় যোগাড় করতে এরা প্রতিটি দিন যে সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রামই এদের অনেক বেশি অনমনীয় করে তোলে। আবার যে সব পাহাড়ি অঞ্চল ঘিরে ভ্রমণ ব্যবসা জমে উঠেছে, সে অঞ্চলের মানুষরা ভিন্নতর মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষদের যে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে।

বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় দীর্ঘস্থায়ী হলে বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষদের অনেকেই কষ্টকর এই চাপের মুখে মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়েন, এবং মানসিক রোগের কারণেই রক্তচাপ বৃদ্ধি, হাঁপানি, আন্ত্রিক ক্ষত, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগও অনেকেই ভোগ করেন।

মানবিক গুণের বিকাশে জনসংখ্যার ঘনত্বেরও কিছু প্রভাব আছে। ঘনবসতি

অঞ্চলে বেড়ে ওঠা কিশোর-কিশোরীরা না পায় খেলার মাঠ, না দেখে মুক্ত আকাশ। বিরল বসতি বা পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠা অঞ্চলে যে সব ছেলে মেয়েরা বড় হয়, তারা পার্কে ঘোরে, মাঠে খেলে, নদীতে বা পুকুরে সাঁতার দেয়, নীল আকাশ, সবুজ গাছ, সবই তাদের ভিন্ন ভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এখান থেকেই দেশের ভবিষ্যৎ সাঁতারু, ভবিষ্যৎ ফুটবলার, ক্রিকেটার কি অ্যাথেলিট তৈরি করে।

সামাজিক পরিবেশের দু'টি ভাগ

সামাজিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

সামাজিক পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করলে সুবিধে হয়। এক : আর্থ-সামাজিক, দুই : সমাজ-সাংস্কৃতিক।

মানব-জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাব

দরিদ্র ও উন্নতিশীল দেশে, যেখানে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে রয়েছে বঞ্চনা ও অনিশ্চিয়তা, সেখানে মানুষের জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এ-সব দেশের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের হাতে নেই জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থ, নেই চিকিৎসার সুযোগ, নেই শিক্ষা লাভের সুযোগ, আছে অপুষ্টি, আছে রোগ, আছে পানীয় জলের অভাব, আছে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকুরও অভাব, আছে বঞ্চনা, আছে দুর্নীতি, আছে শোষণ।

শৈশবে সন্তানের সবচেয়ে কাছের মানুষ মা। মায়ের স্বাস্থ্য, মায়ের মানসিকতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সন্তানের স্বাস্থ্য ও মানসিকতা। মায়ের অপুষ্টি, মায়ের বুকের দুধ দানের অক্ষমতা, শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে অক্ষমতা; যে অক্ষমতার কারণ মাকে বেঁচে থাকার ভাত রুটি যোগাড়েই জেগে থাকা সময়ের পুরোটাই প্রায় ব্যয় করতে হয়। সময়ের অভাব ছাড়াও থাকে অর্থের অভাবজনিত অক্ষমতা। মায়ের দরিদ্র রুগ্ন স্বাস্থ্য ও মানসিক অবসাদ শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার ওপর বিশাল প্রভাব ফেলে।

শৈশব ও কৈশোরে শিশুরা ভোগে অপুষ্টিতে। খাদ্যাভাবে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাবে আমাদের দেশে কিশোর-কিশোরীরা বেশির ভাগই অপরিণত দুর্বল দেহ ও মনের অধিকারী। এরা স্নায়ু দুর্বলতায় ভোগে, বোধ-শক্তি কম। আমাদের দেশে প্রতি বছর আড়াই লক্ষ শিশু ও কিশোর-কিশোরী দৃষ্টি শক্তি হারায় স্রেফ ভিটামিন 'এ'-র অভাবে।

'ইউনিসেফ'-এর হিসেব মত এই দুনিয়ায় প্রতিবছর উদরাময়ে মৃত্যু হয় চল্লিশ লক্ষ শিশুর, নিউমোনিয়ায় বাইশ লক্ষ, হামে পনের লক্ষ, ম্যালেরিয়ার দশ লক্ষ, ধনুষ্টঙ্কারে

আট লক্ষ। অনাহারের তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণায় শিকার পনের কোটি শিশু—যাদের বয়স পাঁচ বছরের নিচে। ক্ষুধা আর রোগের আক্রমণে মৃত্যু পরোয়ানা লেখা জীবন্ত কঙ্কাল এইসব শিশুদের প্রায় সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশ, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার সাহারা মরু সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী।

বর্তমানে আমাদের দেশে দশ কোটি শিশু কোন দিনই স্কুলের মুখ দেখেনি ও দেখবেও না—যাদের বয়স পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে। '৯০ সালে যে দশ কোটি শিশু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাদের মধ্যে চার কোটি শিশুই প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও শেষ করতে পারবে না স্রেফ দারিদ্র্যতার কারণে।

যে বয়সের শিশুরা পড়ে খেলে, আবদার করে, অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশের শিশুরা সেই বয়সেই নিজের পেট চালাতে, পরিবারকে সাহায্য করতে শ্রম বিক্রি করে। এরা কাজ করে ক্ষেতে, ইট ভাটায়, চায়ের দোকানে, মুদির দোকানে, গাড়ি সারাইয়ের গ্যারেজে, বিড়ি তৈরির কারিগররূপে, গৃহভৃত্যরূপে, বাস, লরীর ক্লিনাররূপে, ফেরিয়াওয়ালারূপে, দোকানীরূপে, ঠোঙা তৈরির শ্রমিকরূপে; আরও বহু বহু রূপে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত ১৯৭৯-এর তথ্য অনুসারে ভারতবর্ষে শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা ১১ কোটির কাছাকাছি।

এর বাইরেও আরো কয়েক কোটি শিশু ও কিশোর-কিশোরী আছে জীবন ধারণের জন্য পাচার করে চোলাই মদ, অন্যান্য মাদকদ্রব্য, বেআইনি বিদেশী দ্রব্য, বেআইনি খাদ্যশস্য। কয়েক লক্ষ কিশোরী বেঁচে থাকার তাগিদে দেহ বিক্রি করে।

এরাই যখন বড় হয়, হয়ে ওঠে সমাজবিরোধী শক্তি। চুরি, ডাকাতি, লুঠ-পাট, ওয়াগান ভাঙা, ছিনতাই করা, দোকান-বাজার থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা, সাট্টা, জুয়া, চোলাই-হেরোইন ইত্যাদির ব্যবসা করা, নির্বাচনে বুথ দখল করা, লালসা মেটাতে ধর্ষণ করা ইত্যাদি নানা সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। যে কোনও উপায়ে জৈবিক প্রয়োজন মেটানোই এদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রামের কিশোরী-যুবতীদের চেয়ে শহর ও শহরতলী বস্তিবাসী ও ঘিঞ্জি এলাকার বস্তিবাসী কিশোরী ও যুবতীদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। এখানে একটি ছোট্ট ঘরে বহু মানুষকে গাদাগাদি হয়ে ভোরের সূর্যের প্রতীক্ষা করতে হয়। অনেক সময়ই এরা নারী-পুরুষের গোপন ক্রিয়াকলাপ দেখে যৌন আবেগ দ্বারা চালিত হয়। ফুটপাতবাসী কিশোরীদের অবস্থাও একই রকম। অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও এবং অনেক সময় অপরিণত যৌন আবেগে এরা যৌনজীবনে প্রবেশ করে মস্তান, আত্মীয় বা পরিচিতদের হাত ধরে। বহুক্ষেত্রেই কর্মজীবনে ঠিকাদারদের কাছে কাজ করতে গিয়ে, পরের বাড়ি রাঁধুনী বা দাসীর কাজ করতে গিয়ে, অনেকের লালসা মেটাতে বাধ্য হয়।

এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনে জিতে জনগণের চেয়ে পেশী শক্তির ওপর উত্তরোত্তর নির্ভরতা বাড়িয়েই চলেছেন। এই নির্ভরশীলতা যত বাড়বে, সমাজে সমাজবিরোধীদের অত্যাচারও ততই বাড়বে। কারণ সমাজবিরোধীরা জানে—আমরা হত্যাই করি আর ধর্ষণই করি রাজনৈতিক দাদারা তাদের স্বার্থেই, এলাকা দখলের স্বার্থে আমাদের উদ্ধার করতে বাধ্য।

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় স্রেফ বেঁচে থাকার তাগিদে

অসামাজিক কাজে নামতে হয়, মেয়েদের নিজেকে ও সংসারকে বাঁচাতে ইজ্জত বেচতে হয়। হরিজন নারীকে বিয়ে করার অপরাধে বর্ণহিন্দুর চাকরী হারাতে হয়। রয়েছে অস্পৃশ্যতা। রয়েছে বেগার-শ্রম। রাজনীতিকদের আশীর্বাদধন্য না হলে 'ঋণ-মেলা'য় ঋণ মেলে না। চাকরীর সুযোগ সীমিত, বেকার অসীম। ফলশ্রুতি প্রায়শই 'খুঁটির জোর'ই প্রধান যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। তাই যে মুষ্টিমেয়রা শেষ পর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে (তা সে 'খুঁটি' পাকড়াবার হলেও) জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একটা কোনও চাকরী জোটানোই বিবেচিত হয় 'অপার ভাগ্য', 'মানতের ফল', 'গুরুদেবের আশীর্বাদ,' 'গ্রহরত্নের ভেল্কি' ইত্যাদি বলে। দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য 'কাজের অধিকার'-এর ফাঁকা আওয়াজের পরিবর্তে যত বেকার তত কাজ থাকলে এমনটা ভাবার কোনও সুযোগ বা কারণ ঘটতো না। এটাও তো সত্যি,—

**মানুষগুলো শুধু
খাওয়ার জন্য মুখ আর পেট
নিয়ে জন্মায় না, কাজের জন্য
দুটো হাত আর মগজও
নিয়ে জন্মায়।**

ওদের হাত ও মগজকে কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব যদি শাসক শ্রেণী পালন না করে, তবে অবশ্যই আমরা ধরে নিতে পারি—শাসক শ্রেণী এমনটা করছে অক্ষমতা থেকে, নতুবা শোষণের স্বার্থে। সমাজে 'ধনী' আর 'গরিব' এই ধরনের দুটি শ্রেণীর মানুষ যদি থাকে, তবে ধনীরা তো নিজেদের স্বার্থেই গরিবদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতটুকু নিতান্তই দেওয়া প্রয়োজন, তার বেশি দিতে চাইবে না। ছলে, বলে, কৌশলে গরিবদের ন্যায্য পাওনাটুকু থেকে বঞ্চিত করবে। শোষণ না করলে কাকে বঞ্চিত করে ধনী হবে ? আবার গরিবদের বাঁচতেও হবে নিজেদেরই প্রয়োজনে। গরিবরা না বাঁচলে কাদের শ্রমে ধনী হবে ? কাদের শোষণ করবে ? ওরা জোঁকের মতই এমন চতুর সারল্যে নিঃশব্দে গরিবদের শোষণ করতে চায়। তাই কতই না ব্যাপক ব্যবস্থা, কতই না অসাধারণ প্রচার। ওরা আমাদের ঢালাও অধিকার দেয় চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের, শিক্ষা গ্রহণের এবং আরও অনেক কিছুর, কিন্তু অধিকার রক্ষার কোনও ব্যবস্থা করে না। গরিব ঘরের মানুষের বিনে মাইনের স্কুলে সন্তান পড়াবার স্বাদ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। ঘরের ছেলে মেয়ে পড়তে গেলে রোজগার করবে কে ? শিশু শ্রমের ওপর প্রায় সমস্ত দরিদ্র পরিবারকেই কিছুটা নির্ভর করতে হয়। এটাও কঠিন সত্য যে আব্রুরক্ষা করে স্কুলে যাওয়ার মত সাধারণ পোশাকটুকুও অনেকের জোটে না। এখন এইসব নির্যাতিত মানুষদের গরিষ্ঠ অংশই মনে করেন—এসবই গত জন্মের পাপের ফল। এখনও অচ্ছুৎ-রক্তে হোলি খেলা হয়। এখনও ওঁরা পানীয় জলের ছিটে-ফোঁটা পেতে কুয়োর কাছে অপেক্ষা করে।

উচ্চবর্ণের কেউ কৃপা করে তাদের পাত্রে সামান্য জল ঢেলে দিলেই ওঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। নতুবা পান করেন খাল বিল-ডোবার দূষিত জল।

'৮৯ মার্চের একটি ঘটনা। আমাদের সমিতির চাইবাসা ও জামশেদপুরের সদস্য মারফৎ খবর পেলাম বিহারের সিংভূম, গুমলা ও সাহেবগঞ্জ জেলায় এক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে গত এক মাসের ভিতর মারা গেছে একশোর ওপর মানুষ। এটা অবশ্য সরকারি মত। আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বহু গবাদি পশু। ইতিমধ্যে এই অসুস্থতার খবর এসেছে সংলগ্ন ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের অঞ্চল সমূহ থেকে। সিংভূম জেলার ওপর একটা বিস্তৃত রিপোর্ট পেলাম। রোগাক্রান্তরা সকলেই আদিবাসী, দরিদ্র, নিরক্ষর ও সংস্কারাচ্ছন্ন। রোগটা এই ধরনের—রোগীর ধুম জ্বর হচ্ছে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, গলা বুঁজে যাওয়া এবং তিনচার দিনের মধ্যে মৃত্যু। অজানা রোগটি সম্পর্কে স্থানীয় আদিবাসীদের ধারণা—এসবই বোঙ্গার অভিশাপের ফল। রোগের শিকার যেহেতু অতি-অবহেলিত সম্প্রদায় এবং এই মৃত্যুর জন্য, রোগ-ভোগের জন্য তাদের সরকার ও সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, অভিযুক্ত করছে নিজেদের ভাগ্যকেই, তাই ওসব ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেননি কোনও বিধানসভার প্রতিনিধি বা সাংসদ। স্থানীয় সাংসদ বাগুণ সমব্রই মারণ রোগের খবর পেয়ে একবারের জন্যেও ওসব অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। যে বিষয়টির প্রতিকারের সোচ্চারে কোনও দাবি ওঠেনি, ওঠেনি প্রতিবাদের ঝড়, সেখানে হেতুহীন সময় নষ্ট না করে কংগ্রেস সাংসদ নয়াদিল্লির আসল খুঁটির আশেপাশে থাকা ও তোষামোদ করাকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। তাঁর এই মনে করার পিছনেও ছিল আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই প্রভাব।

গিয়েছিলাম পিনাকীকে সঙ্গী করে সিংভূম জেলার বান্দিজারি গ্রামে। চাইবাসা থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের পথ। কিন্তু বেশ দুর্গম। গ্রামটি জঙ্গলের ভেতর। জঙ্গল ভেদ করে আলো আসে না, সবসময় অন্ধকার ঘেরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি এলাকা। গ্রামে শ'দুই ঘর—শ' দুই পরিবার। প্রত্যেক পরিবারেই কেউ না কেউ মারণ ব্যাধির শিকার। খাওয়ার জল চাওয়াতে যে জল এনে দিলেন সে জলের রঙ কালচে শ্যাওলার মতো, তীব্র দুর্গন্ধ। জল খেতে পারিনি। শুনলাম এ জলই ওরা পান করেন। সংগ্রহ করেন একটা প্রাচীন কুয়ো থেকে। এক বাড়ির জলের হাঁড়িতে উঁকি মারতেই দেখতে পেলাম জলের পোকা ও বেঙাচি।

গাঁয়ের অধিকাংশ লোকজনই দেখলাম নেশাগ্রস্ত। হাড়িয়ার নেশা আর কুসংস্কারের নেশায় ওদের ডুবিয়ে রেখে রাজনীতিকদের যখন ভালই চলে যাচ্ছে, তখন নেশা কাটাবার চেষ্টায় নামবে, এমন আকাঠ বোকা তাঁরা নন। অবাক বিস্ময়ে এও জানলাম, এও শুনলাম, উপজাতি বা অনুপজাতীয় কোনও নেতাই এই মারণ রোগের প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলে তুচ্ছ কারণে ব্যতিব্যস্ত করতে চাননি সভার শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিদের। ওঁরা তোলেননি কারণ ওঁরা শাসক শ্রেণী ও শোষক শ্রেণীরই প্রতিনিধি হিসেবেই নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন, ওইসব বঞ্চিত আদিবাসীদের আদৌ আপনজন ওঁরা কেউ নন। পদবি ভাঙিয়ে উপজাতি, অনুপজাতির প্রতিনিধি সেজে বিধানসভা,

লোকসভা, রাজ্যসভা ইত্যাদিতে স্থান করে নিয়েছেন মাত্র।

বান্দিজারি গ্রামের মোড়ল লুগদি মুণ্ডার সঙ্গে কথা বলেছি। ওর নিজের ছেলেটিও এই অজানা রোগে মারা গেছে দিনকয়েক আগে। লুগদির ধারণা, বোঙ্গার অভিশাপেই এই মড়ক। দূরের হাসপাতালে রোগী পাঠায়নি। কারণ পাঠিয়ে লাভ নেই। যাদের মারবার, বোঙ্গা তাদের মারবেই। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটিই পথ, তা হলো বোঙ্গাকে সন্তুষ্ট করা। তুষ্ট করতে তাই বোঙ্গার পুজো দেওয়া হয়েছে, বলি দেওয়া হয়েছে ছাগল-মুরগী।

বান্দিজারির কাছেই মনোহরপুর অঞ্চল। মনোহরপুর ব্লকের বারোটি গ্রামই আক্রান্ত। মনোরহরপুরের আদিবাসীদেরও ধারণা বান্দিজারির আদিবাসীদের মতই। তারাও বোঙ্গার রোষ কমাতে পুজো দিয়েছে। বাড়ি বাড়ি মরার খবর দিতে গিয়ে তাঁরা কাঁদছিলেন। না দোষারোপ করেননি সরকারের উদাসীনতার। দোষ দেননি বোঙ্গাকে পর্যন্ত। দোষ দিয়েছেন নিজেদের ভাগ্যকে।

এরকম গ্রাম আমাদের দেশে একটি দুটি বা দশটি বিশটি নয়, আছে লক্ষ লক্ষ। এমন বঞ্চিত মানুষ কোটি কোটি। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের আলো আর স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টি ভি যোগাযোগের বিজ্ঞাপনের বা তথ্যচিত্রে যে ছবি দূরদর্শনে প্রচারিত হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি গ্রাম দূরদর্শনে হাজির হয়না, আপনার আমার কাছে অধরাই থেকে যায়।

দূরদর্শনের পর্দায় বা বাণিজ্যিক সিনেমায় আমরা যে সুন্দর শান্ত গ্রামের ছবি দেখি, তা নিয়ে কিন্তু আমাদের দেশ নয়। আমাদের দেশ লক্ষ বান্দিজারি গ্রাম নিয়েই।

এত সবই আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই ফল।

**এই পরিবেশের
চাবিকাঠি যাদের হাতে
তারা চায় না ওইসব বঞ্চিত
মানুষগুলোর নেশা কাটুক, ঘুম
ভাঙুক, নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন
হোক। এই সচেতনতা আনতে পারে
অনুকূল, সুস্থ সমাজ—
সাংস্কৃতিক পরিবেশ।**

আর এও চরমতম সত্য—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে চিকিৎসা লাভের স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনতা, জীবিকার স্বাধীনতা ইত্যাদি সব স্বাধীনতাই অর্থহীন রসিকতা মনে হয়।

মানব জীবনে সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব

সংস্কৃতি দেশে দেশে ভিন্নতর। আবার একই দেশের ধর্মভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, অর্থভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক অঞ্চলভিত্তিক আলাদা আলাদা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের কথা ভাবুন, দেখতে পাবেন বিভিন্ন অঞ্চলের বা প্রদেশের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা, বৈচিত্রের অভাব নেই। দার্জিলিং জেলার সংস্কৃতির সঙ্গে মালদা জেলার সংস্কৃতির রয়েছে বহু বিভিন্নতা, যদিও দুটিই উত্তরবঙ্গেরই জেলা। মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার সংস্কৃতিতেও রয়েছে অনেক অসাদৃশ্য, যদিও দুটি জেলার অবস্থান পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে। আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনই আছে তামিল, গুজরাতি, ওড়িয়া, বাংলা, বিহারী ইত্যাদি ভাষাভাষীদের সংস্কৃতির মধ্যে অসাদৃশ্য। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির সঙ্গে শূদ্রের সংস্কৃতির যেমন অসাদৃশ্য আছে, তেমনই অসাদৃশ্য আছে ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরিবদের গড়ে ওঠা সংস্কৃতির মধ্যেও।

আবার এই পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ভারত এমনকি অন্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপকরণে ও গড়নে বহু সাদৃশ্য রয়েছে। তাই এ-কথাও মনে হয় ভারত-সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ-সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপরেখা তৈরি করা অসম্ভব। বিভিন্ন দেশের মধ্যেও আবার খুঁজলেই সংস্কৃতিগত মিল আমরা অনেক পাব। পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ, আমরা 'মানব সংস্কৃতির'ই অংশ।

আমাদের বিভিন্ন মানব গোষ্ঠির' মধ্যে রয়েছে নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা, সঙ্গীত, শিল্প সাহিত্য, নৃত্য, নীতিবোধ, সমাজ ও পরিবার চালাবার রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। সুতরাং একজন মানুষ কোন দেশের কোন্ গোষ্ঠির, কোন্ ধর্মের, কোন্ ভাষার, কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধি, তার উপরই নির্ভর করবে মানুষটি কোন্ ভাষায় কথা বলবে, কী জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, কোন্ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হবে, অংশ নেবে ; কোন জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে ; কোন্ রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিশুকাল থেকে আমরণ আমাদের প্রভাবিত করে আমাদের সমাজ, আমাদের সংস্কৃতি, ফলে আমরা সাধারণভাবেই সেই সমাজ ও সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে পড়ি। শিশুকালে ও কৈশোরে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস, শিক্ষা চেতনার স্ফুরণ শুরু হয় মা-বাবা, আত্মীয়, গৃহশিক্ষক, স্কুলের শিক্ষক, পাড়া-প্রতিবেশীদের মাধ্যমে। প্রভাব পড়তে থাকে স্কুলের বন্ধু, খেলার সঙ্গী ও সমবয়সী বন্ধুদের আচরণ, ব্যবহার, কথাবার্তা ভালোলাগা, খারাপ লাগার। গড়ে উঠতে থাকে রাজনৈতিক মতবাদ বা রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন করার মানসিকতা। কেউ জেনে বুঝে, কেউ না জেনে তার স্কুলের শিক্ষকের প্রভাবে, পরিবারের গুরুজনদের প্রভাবে অথবা কলেজের নিকটতম বন্ধুদের অথবা কোনও রাজনৈতিক সচেতন কারো প্রভাবে কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে শুরু করে, অথবা কেউ ব্যক্তিস্বার্থে জড়িয়ে পড়ে কলেজ-রাজনীতিতে। এমন দেখাই যায় বাবা-মা'য়ের রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক-মতাদর্শকে অগ্রহণীয়, ভ্রান্ত মনে করে সন্তান বিপরীত কোনও মতাদর্শকে গ্রহণ করেছে।

আমাদের এবং অন্যান্য বহু সমাজেই শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের কী পড়াশোনায়, কী জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সন্তানের মা-বাবারাও ভীষণ ভাবেই চাইতে শুরু করেছে, এই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে আমার সন্তানকে টিকে থাকতে হলে, ভাল হতে হবে, দারুণ কিছু ফল করতে হবে। সন্তান স্কুলে প্রথম দু-চারজনের মধ্যে না থাকলে মা-বাবারা শঙ্কিত হন। সন্তানের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকেন তাঁরা। এর ফল অনেক সময়ই প্রীতিপ্রদ হয় না। অনেক মনোরোগ চিকিৎসকই এর জন্য সাধারণত অভিভাবকদের সরাসরি অভিযুক্ত করেন, অথবা পত্র-পত্রিকা ও বেতার মারফৎ মা-বাবাদের দোষারোপ করেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণত কেউই বলেন না এই সামাজিক পরিবেশের জন্য আমাদের সমাজের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তাই দায়ী। অর্থাৎ এ সবই আর্থ-সামাজিক অবস্থারই ফল।

মানুষ যে ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে বেড়ে ওঠে, যে গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম, সেই গোষ্ঠির চোখ দিয়েই দেখে, কান দিয়ে শোনে। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, অন্য গোষ্ঠীর অনেক কিছুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব করে, তাদের আচার-ব্যবহার, ভালো লাগার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। যে পূর্ববঙ্গীয় বালক উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় এসে 'জবরদখল' কলোনীর বাসিন্দা, তার ক্লাসের প্রিয় বন্ধুটিই হয়তো কলকাতার কোনও বনেদি পরিবারের ছেলে। বইয়ের অভাব মেটাতে, একসঙ্গে পড়াশোনা করতে, কলের গান শুনতে, রেডিও শুনতে 'বাঙাল' ছেলেটি অনেকটা সময়ই কাটায় বনেদি 'ঘটি'র বাড়িতে। বনেদি বাড়ির অনেক কিছুই একটু একটু করে ভালো লাগতে থাকে। ভালো লাগে বনেদি সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, মহিলাদের অন্দরমহলের আড়ালকে মনে হয় আভিজাত্যের লক্ষণ। 'বাঙাল'দের প্রাণখোলা উচ্চস্বরে খুঁজে পায় রুচির অভাব। ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে মোহনবাগানের জয় রক্তে বেশি তুফান তোলে।

একই ঘটনা ঘটে প্রবাসীদের ক্ষেত্রেও। তাঁরা প্রবাসভূমির মানুষদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ করেন পরম সমাদরে।

আমাদের সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক চলচ্চিত্র, পত্র-পত্রিকা, দূরদর্শন আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। নারী-পুরুষদের 'ফ্রি-মিকসিং' যখন সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে বিপুলভাবে বিরাজ করে তখন সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার সঙ্কট সংযোজিত হয়। ছাপার অক্ষর বা সেলুলয়েডের বুকে অপরাধ যখন অ্যাডভেঞ্চারের রূপ পায় তখন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তরুণ-তরুণীরা অপরাধ প্রবণতার মধ্যে উত্তেজনার আগুন পোহাতে চায়। পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলো যখন শোভরাজের মত ঘৃণ্য অপরাধীদের 'সুপার হিরো' করার তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন, তখন বহু কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরাই যে তাদের আদর্শ হিসেবে শোভরাজের মত সমাজবিরোধীদের জীবনচর্যাকেই গ্রহণ করতে চাইবে—এটাই স্বাভাবিক। দূরদর্শনে রামায়ণ, মহাভারত যেমন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তেমনই অসাধারণ দক্ষতায় চতুর সারল্যে মানুষকে আবার ভাববাদী, অদৃষ্টবাদীর খাঁচায় পুড়তে চাইছে, ঘড়ির কাঁটাকে প্রগতির বিপরীতে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। ভক্তির প্লাবন এনে ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে মৌলবাদী শক্তিগুলোকেই উৎসাহিত করছে, শক্তিশালী করছে। প্রচার

মাধ্যমগুলো নানা আজগুবি অলৌকিক ঘটনার গালগপ্পো ছেপে এক তরফাভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। লটারি কালচার আজ সর্বগ্রাসী হতে চলেছে। পুজোর আড়ম্বর ও পুজো কালচার যতই বাড়ছে ততই দেখতে পাচ্ছি যে স্বঘোষিত বস্তুবাদীরা জনগণকে সঙ্গে পেতে পুজো কালচারের সঙ্গী হয়েছিলেন, তাঁরাই স্বয়ং ঘোর আস্তিক হয়ে উঠেছেন—একটু চোখ কান খোলা রাখলে দৃষ্টান্ত মিলবে হাজার নয়, লাখে লাখে। সাংস্কৃতিক নানা 'উৎসব'-এ হাজির হয়েছে নানা ঝাঁ-চকচক আড়ম্বর ও হুল্লোড়। চার্টার্ড প্লেন, ফাইভ স্টার হোটেল, গ্ল্যামার কিং ও কুইনদের গা থেকে ঠিকরে পড়া আলো, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, কী নেই ?—সুস্থ সংস্কৃতি ছাড়া অনেক কিছুই উপস্থিত।

এরই মাঝে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পাল্টাতে তৎপর একদল। পাল্টে যাচ্ছেও। এরই পাশাপাশি সাধারণের সাংস্কৃতিক চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গ্রামে-শহরে হাজির হয়েছেন আর একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী মানুষ। মানুষ পাল্টে যাচ্ছেও। এরই নাম ইতিহাস।

**আমরা সমাজবদ্ধ জীব।
সমাজের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিফলন
তাই আমাদের জীবনে দেখতে পাই। আমরা
কীভাবে বিকশিত হবো, তার অনেকটাই
তাই আমাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক
পরিবেশের ওপরও নির্ভর করে।**

অবাক মেয়ে মৌসুমী ও বিস্ময়কর প্রতিভা বা Prodigy নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এতক্ষণ খুবই সংক্ষেপে যেটুকু আলোচনা করলাম তাতে অনেকে হয় তো 'ধান ভানতে শিবের গান'-এর উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু অমার কাছে এ সবই অতি প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। কারণ আমি চাই, ভবিষ্যতে আবার কোনও বিস্ময়কর প্রতিভার খবর প্রচারিত হলে পাঠক-পাঠিকারা বিভ্রান্ত বোধ না করেন, নিজেরাই সঠিক অনুসন্ধানে নামতে পারেন, অথবা এমন বিস্ময়কর প্রতিভার পিছনে জাগতিক কারণগুলোর হদিশ অপরকেও দিতে পারেন।

অবাক মেয়ে মৌসুমীর রহস্য সন্ধানে

মৌসুমীকে জানতে, মৌসুমীর ওপর প্রাথমিক পরীক্ষা চালাতে আদ্রায় যাবো ঠিক করে ফেললাম। ২৯ আগস্ট '৮৯ সন্ধ্যায় পাভলভ ইনস্টিটিউটে ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়কে পেয়ে গেলাম। ডাঃ মুখোপাধ্যায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মনোরোগ

বিশেষজ্ঞ। তিনি মৌসুমীর কাছে গিয়েছিলেন। ১৩ আগস্ট '৮৯-র আনন্দবাজারে এঁকেই পাভলভ ইন্সিটিটিউটের অধিকর্তা ডাঃ ডি এন গাঙ্গুলীর ছাত্র বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মৌসুমীকে পরীক্ষা করে কী মনে হলো আপনার ?"

—"অসাধারণ! কথা বললে অবাক হয়ে যাবেন। যে কোনও প্রশ্ন করুন, কম্পিউটারের মত উত্তর দিয়ে যাবে। আপনিও কি যাবেন নাকি ?"

বললাম, "যাওয়ার ইচ্ছে আছে। আপনি কী ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন ?"

—"ও অনেক কিছু। যেমন অসাধারণ স্মৃতি, তেমনই মেধা। এইটুকুন তো বয়েস, এর মধ্যেই ডাচ্, জার্মান ও দস্তুর মতো শিখে ফেলেছে। স্মার্টলি ডাচ্, জার্মান বলে।"

এই পর্যন্ত বলেই সুর পাল্টালেন বাসুদেববাবু, "আমি মশাই শুধুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, আপনার মত গোয়েন্দা নই। দেখুন, আপনি হয়তো মৌসুমীর মধ্যে অন্য কিছু খুঁজে পাবেন।"

কথায় শ্লেষের সুর স্পষ্ট। অবতার, অলৌকিক ক্ষমতাধর ও জ্যোতিষীদের দাবি যাচাই করতে সত্যানুসন্ধান করি বটে, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি তো আমার নেশা বা পেশা নয়! এই ধরনের ঠেস দেওয়া কথা কি নিজের প্রতি আস্থাহীনতার ফল ? মৌসুমীর মেধা বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেটা সঠিক নাও হতে পারে মনে করেই কি এমন কথা বললেন ?

২ সেপ্টেম্বর '৮৯ রাতে 'হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার' ধরলাম। সঙ্গী হলেন চিত্র-সাংবাদিক কল্যাণ চক্রবর্তী ও আমাদের সমিতির সদস্য মানিক মৈত্র। ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে পেলাম সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর মালাকারকে। ওঁরাও মৌসুমীর বাড়িই যাচ্ছেন 'প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থা'র তরফ থেকে। ৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে মৌসুমীকে অভিনন্দন জানাবেন প্রমার তরফ থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, তারই প্রয়োজনে কিছু কথা সারতে। ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানের বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছে প্রমা।

আদ্রায় যখন পৌঁছলাম তখন সকাল ছ'টা। ঝড়িয়াডিহির রেল কোয়ার্টারে মৌসুমীদের বাড়ি পৌঁছলাম সাড়ে ছ'টায়। পাহারারত পুলিশ ঢোকার মুখে বাধা দিলেন। মৌসুমীর বাবা সাধনবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সুবীরবাবু। সাধনবাবু ভিতরে নিয়ে গেলেন। এক ঘরের ছোট কোয়ার্টার। সামনে একফালি কাঠের জাফরি ঘেরা বারান্দা। ভিতরে রান্না ঘর। ঘরে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়। সাধনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন স্ত্রী শিপ্রা ও দুই মেয়ে মৌসুমী এবং মহুয়ার সঙ্গে।

সাধনবাবু টানা ঘণ্টা দুয়েক মৌসুমী বিষয়ে নানা কথা শোনালেন, দেখালেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পত্র-পত্রিকায় মৌসুমীকে নিয়ে প্রকাশিত লেখা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে আসা চিঠি ও টেলিগ্রাম। জানালেন ২১, ২২, ২৩ সেপ্টেম্বর মৌসুমীকে নিয়ে দিল্লিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে। অফিস 'স্পেশাল লিভ' দিয়েছে। আমন্ত্রণের চিঠি দেখতে চাওয়ায় বললেন, চিঠি অফিসে আছে। শুনলাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট আইন স্টিভেনসন সাধনবাবুকে

চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন, মৌসুমীকে পরীক্ষা করতে আসছেন।

সাধনবাবুর কথায় মাঝেই জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু কিছু পত্রিকায় লেখা হয়েছে মৌসুমীর জ্ঞান গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের। মৌসুমী বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে। কথাগুলো কি সত্যি ?"

সাধনবাবু জানালেন "গ্র্যাজুয়েশন কী বলছেন, ওর জ্ঞান অনার্স লেভেলের। ও মাধ্যমিকে বসতে বাধ্য হচ্ছে, মাধ্যমিক না দিলে কলেজে ভর্তি করায় আইনগত অসুবিধে আছে বলে। তবে এটুকু জেনে রাখুন মাধ্যমিকে ও ফার্স্ট হবেই এবং রেকর্ড নাম্বার পেয়েই। ওর হাই স্ট্যান্ডার্ডের উত্তর কজন এগজামিনার বুঝবেন সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। আর ওর গবেষণার যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সবই সত্যি। ওর রিসার্চের কাজ শেষ হলে পৃথিবী জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। একটুও না বাড়িয়েই বলছি, প্রত্যাশা রাখছি ও নোবেল প্রাইজ পাবে এবং শিগগিরই।"

"কী বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছো তুমি ?" মৌসুমীকে প্রশ্নটা করলে উত্তর দিলেন সাধনবাবুই "তিনটি বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছে। বিষয় তিনটি খুবই গোপনীয়। আর যে সব সাংবাদিক এসেছিলেন তাঁদের কাউকে বলিনি। আপনাকে বলেই শুধু বলছি—এয়ার পলিউশন, সোলার এনার্জি ও কোলকে সালফার মুক্ত করার বিষয় নিয়ে বর্তমানে গবেষণা করছে। পরবর্তীকালে জেনেটিকস নিয়ে গবেষণার ইচ্ছে আছে। অনেক দেশের নজর ওর ওপর রয়েছে। গবেষণার বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে বিদেশী শক্তি ওকে কিডন্যাপ করতে পারে। তাই এই গোপনীয়তা।"

"মৌসুমী তোমার গবেষণার কাজ কেমন এগোচ্ছে।"

এবারের উত্তর মৌসুমীই দিল, "খুব ভালমতই এগোচ্ছে, আশা করছি এর জন্যে নোবেল পাব আড়াই বছরের মধ্যে।"

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে নানারকম গল্প-সল্প, হালকা রসিকতা, মুড়ি-তেলেভাজা, চা ইত্যাদির মাঝে মাঝে মৌসুমীকে যত বারই প্রশ্ন করেছি প্রায় ততবারই উত্তর দিয়েছেন সাধনবাবু এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিপ্রাদেবী। ইতিমধ্যে ওঁরা দুজনেই জানালেন, বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কথা, যাঁরা প্রত্যেকেই মৌসুমীর জ্ঞানের দীর্ঘ পরীক্ষা নিয়ে বিস্মিত হয়েছেন। আমাকে সাধনবাবু বললেন, "আপনি যে কোনও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য মন্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করুন, দেখবেন পটাপট উত্তর দেবে, অথবা জিজ্ঞেস করুন না কোনও দেশের রাষ্ট্র প্রধানের নাম। অথবা অন্য কিছুও জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

সাধনবাবু মৌসুমীকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজীব গান্ধী কবে প্রধানমন্ত্রী হন ?"

মৌসুমী বলে গেল, "থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইট্টি ফোর।"

সাধনবাবুর আবার প্রশ্ন, "কবে কলকাতার জন্ম হয়েছিল ?"

সাধনবাবুর চকচকে চোখে উৎসাহিত প্রশ্নে ও মৌসুমীর জবাবে সুবীরবাবু ও শঙ্করবাবু যথেষ্ট উৎসাহিত হচ্ছিলেন।

সুবীরবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সব ঠিক ঠিক উত্তর দিচ্ছে তো ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

ইতিমধ্যে সাধনবাবু আরও অনেক প্রশ্নই করেছেন। আমাকেও এই ধরনের প্রশ্ন করে মৌসুমীর স্মরণ শক্তির পরীক্ষা নিতে আবারও উৎসাহিত করলেন সাধনবাবু ও

শিপ্রাদেবী।

না, জিজ্ঞেস করলাম না। কারণ মৌসুমীর বাবা মা যেভাবে আমাকে পরীক্ষা নিতে মানসিক ভাবে চালিত করবেন সেভাবে পরীক্ষা নিলে যে বাস্তবিকই পরীক্ষাটা আর পরীক্ষা থাকবে না, সে বিষয়ে সচেতন ছিলাম।

পত্র-পত্রিকা পড়ে ও দূরদর্শনের কল্যাণে জেনেছিলাম সাধনবাবু বিজ্ঞানী। মৌসুমী তাঁকে বিজ্ঞান গবেষণার সাহায্য করে। এও জেনেছি মৌসুমীর মা শিপ্রাদেবীও ভাল ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধনবাবু আর শিপ্রাদেবীর কথাবার্তায়, ব্যবহারে এই জানাকে সত্য বলে মেনে নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল দুজনের বাক্ চাতুর্যকে তারিফ করেও বাস্তব সত্যকে টেনে আনতে বললাম, "ডাক্তার ডি এন গাঙ্গুলী আনন্দবাজারের প্রতিবেদককে বলেছেন,'"মৌসুমীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির পিছনে আছে সম্ভবত বহু প্রজন্ম পূর্বের কোনও সুপ্ত জিন, এই মেয়েটির মধ্যে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।'" এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ও আপনার স্ত্রীর কাছে আপনাদের পূর্ব পুরুষদের বিষয়ে জানতে চাই।"

সাধনবাবু জানালেন, "আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ শ্রুতিধর ছিলেন বলে কোন দিনই শুনিনি।" আরও জানালেন চাষ-বাসই ছিল পূর্ব পুরুষদের জীবিকা। সাধনবাবু ও তাঁর দাদাই প্রথম চাকরী করছেন। শিপ্রাদেবী জানালেন, "আমার বাবা ঠাকুরদারা ছিলেন বড় বড় অফিসার।"

"কি ধরনের বড় অফিসার ?" প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, বাবা ছিলেন গ্রামের পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার এবং ঠাকুরদা ছিলেন বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার।

সাধনবাবু '৬৯ সালে স্কুল ফাইনালে পাশ করেছেন থার্ড ডিভিশনে। '৭৩-এ পাশ কোর্সের বি এস সি পাশ করেন। বিষয় ছিল ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স। '৭৮ এ ধানবাদের ফুয়েল রিসার্চ ইন্সিটিটিউট-এ স্টেনোগ্রাফার হিসাবে যোগ দেন। '৮২-তে প্রমোশন পেয়ে জুনিয়ার লেবরোরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হন এবং বর্তমানে জুনিয়র সাইনটিস্ট পদে কাজ করেছেন।

শিপ্রা দেবী স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন '৭৪-এ থার্ড ডিভিশনে। '৭৮-এ পাশ কোর্সে বি এ পাশ করেন। স্টেনোগ্রাফি জানেন। '৮৬-তে ইনটিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভলাপমেন্ট-এ সুপারভাইজার পদে যোগ দেন।

শিপ্রা দেবী লক্ষ্মীর ভক্ত। সাধনবাবু মা-কালীর। শিপ্রা দেবীকে জিজ্ঞেস করলাম, "একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, আপনি নাকি মৌসুমীর জন্মের সময় দেখেছিলেন মা লক্ষ্মী শ্বেতবর্ণা সরস্বতীর রূপ নিয়ে আপনার কোলের কাছে এসে মিলিয়ে যান। ঘটনাটা কি সত্যি ?"

শিপ্রা দেবী উত্তর দিলেন, "পুরোপুরি সত্যি।"

"আপনি কি বিশ্বাস করেন মৌসুমীই সরস্বতী ?"

"মৌসুমী এই বয়সেই যেভাবে গবেষণার কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাতে এমনটা বিশ্বাস করা কি অবাস্তব কিছু ?"

"মৌসুমী কী কী ভাষা তুমি জান ?" জিজ্ঞেস করায় মৌসুমীর বাবা ও মা জানালেন, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ডাচ ভাষা জানে।

আমার লেখা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি থেকে দুটি বাক্য একটি সাদা পাতায় লিখে ফেলল মানিক। পাতাটা এগিয়ে দিল মৌসুমীর কাছে। অনুরোধ করলাম চারটি ভাষাতেই বাক্য দুটি অনুবাদ করে দিতে।

সাধনবাবু বললেন, "ও পরীক্ষা করতে চাইছেন ? আপনাদের এত ঝামেলার ও কষ্টের কোনও দরকার হবে না।" তাক থেকে একটা বই বের করে তার থেকে একটা পৃষ্ঠা মৌসুমীর সামনে মেলে ধরে বললেন, "এখান থেকে বাংলাটা পড়ে চারটে ভাষাতেই অনুবাদ করে কাকুদের শুনিয়ে দাও।"

সাধনবাবুর রাখা বইটা তুলে নিয়ে বললাম, "হিন্দি, ডাচ, জার্মানের কিছুই বুঝবো না। তাইতেই মৌসুমীকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছি। যাঁরা জানেন তাঁদের দেখিয়ে নেব।"

মৌসুমী বার কয়েক পড়ে বললো, "ইংরেজি করতে পারবো না।" বললাম, "তাই লিখে দাও।" 'English'-এর জায়গায় 'No' লিখে তলায় নিজের নাম সই করে দিল। হিন্দিতে প্রথম দুটি বাক্য অনুবাদ করলো। ইতিমধ্যে মা বললেন, "কেন, তুমি ইংরেজি পারবে না, চেষ্টা কর না।" মৌসুমী বললো, "যুগের ইংরেজি কি ?" মা বললেন, "তুমি তো জান যুগের ইংরেজি era। চেষ্টা কর চেষ্টা কর।' মৌসুমী 'In modern era' পর্যন্ত লিখে প্রথম বাক্যটা অসমাপ্ত রাখলো কয়েকটা ডট্ চিহ্ন দিয়ে। তারপর দ্বিতীয় বাক্যটা শেষ করলো। Dutch লিখে লিখলো No। German লিখেও No। তারপর স্বাক্ষর ও তারিখ।

সাধনবাবু আমাকে কিছু বলছিলেন। শুনছিলাম। সেই সুযোগে শিপ্রা দেবী মৌসুমীকে ইংরেজি অনুবাদের অসমাপ্ত অংশটুকুর ইংরেজিটা বলে দিয়ে লেখালেন আমাদের পাঁচ আগন্তুকের উপস্থিতিতেই। আমি শিপ্রাদেবীকে বললাম, "পরীক্ষাটা মৌসুমীর নিচ্ছি, আপনার নয়। অতএব, আপনার বলে দেওয়া অংশটা কাটুন।" অসন্তুষ্ট শিপ্রা দেবী লম্বা দাগ টেনে কাটলেন। অবশ্য না কেটে মৌসুমীর ইংরেজি জ্ঞানের প্রমাণ হিসেবে ধরে নিলেও মৌসুমীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামান্যতম তারতম্য ঘটতো না। কারণ শিপ্রা দেবীর অনুবাদও ছিল সম্পূর্ণ ভুলে ভরা। কাটা অংশে মৌসুমী, সাধনবাবু ও সুবীর চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষর করলেন।

শিপ্রা দেবী আবার মুখ খুললেন, "মৌসুমী, তুমি ডাচ ও জার্মান যে সব শব্দগুলো শিখেছ সেগুলো বলে দাও তো।" বললাম, "তার কোন প্রয়োজন নেই। 'ধন্যবাদ' কথাটা ২৫টি ভাষায় কেউ বলতে বা লিখতে শিখলে এই প্রমাণ হয় না যে সে ২৫টি ভাষা জানে।"

দুটি বাক্যের হিন্দি অনুবাদে মৌসুমী ভুল করেছিল ১৩টি। একথা পরের দিন জেনেছিলাম কলকাতা ৫৫-র রাষ্ট্রভাষা জ্ঞানচক্রের অধ্যক্ষ নিমাই মণ্ডলের কাছ থেকে। ইংরেজি অনুবাদের অবস্থা আরও খারাপ। প্রথম বাক্যটির কথা তো আগেই বলেছি। দ্বিতীয় বাক্যটির অনুবাদও ছিল আগাগোড়া অর্থহীন ও ভুলে ভরা।

সাধনবাবু এক সময় বলতে শুরু করলেন, "বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে 'প্রডিজি' বলে ঘোষণা করেছে। মৌসুমীর আই কিউ অবশ্যই প্রডিজি মিনিমাম লেভেলের চেয়ে অনেক বেশি, ওর আই কিউ ২৮০।"

তৈরিই ছিলাম। নর্মান সুলিভান-এর লেখা 'টেস্ট ইয়োর ইনটেলিজেন্স' বই-এর

'ইজি' গ্রুপ থেকে তিনটি এবং 'মোর ডিফিকাল্ট' গ্রুপ থেকে দুটি আই কিউ দিলাম। যারা আই কিউ ক্ষমতার ন্যূনতম দাবীদার তারা প্রত্যেকেই এই পাঁচটির মধ্যে অন্তত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। মৌসুমী আমাদের প্রত্যেককে নিরাশ করে সাধনবাবুর দাবির চূড়ান্ত অসাড়তা প্রমাণ করলো দুটির ক্ষেত্রে "পারবো না" জানিয়ে এবং তিনটির ক্ষেত্রে ভুল উত্তর দিয়ে।

তিনটি অংক দেওয়া হলো। যার মধ্যে দুটি সিক্স সেভেন লেভেলের। প্রথম অংকটি—দুটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল ৭৫। সম্ভাব্য সংখ্যা দুটি কত ? ইংরেজিতে লেখা প্রশ্নটা মানিককেই পড়ে দিতে হলো। মৌসুমী মানে বুঝতে পারছিল না। বাংলা মানে করে মৌলিক সংখ্যার ব্যাখ্যা করে দেওয়া হলো—যে সংখ্যাকে শুধু মাত্র সেই সংখ্যা এবং ১ দিয়ে ভাগ করা যায় তাকেই বলে মৌলিক সংখ্যা।

এত বোঝানোর পরও মৌসুমী লিখলো ৫২ ও ২৩। উত্তরটা অবশ্যই ভুল। কারণ ৫২কে ২, ৪, ১৩ ইত্যাদি দিয়ে ভাগ করা যায়।

দ্বিতীয় অংকটি ছিল, রাম শ্যামের দোকানে এলো। ৫০ টাকার জিনিস কিনে ১০০ টাকা দিল। শ্যামের কাছে খুচরো না থাকায় শ্যাম মধুর দোকান থেকে রামের ১০০ টাকা দিয়ে খুচরো এনে ৫০ টাকা রামকে দিল রাম চলে গেল। মধু এসে জানালো ১০০ টাকাটা নকল। শ্যাম মধুকে ১০০ টাকার একটা নোট ফেরত দিতে বাধ্য হলো। শ্যামের কত টাকা ক্ষতি হলো ?

মৌসুমী বার কয়েক প্রশ্নটা পড়লো। ওর বাবাও প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করলেন। মৌসুমী বাবার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "২০০ টাকা হবে না বাবা।"

সাধনবাবু বললেন, "তাই লেখো"। এই কথার মধ্য দিয়েই সাধনবাবু মৌসুমীকে ২০০ টাকা লেখার সংকেত দিলেন। আমি নিশ্চিত, সাধনবাবুর কাছে উত্তরটা অন্য কিছু মনে হলে "আর একটু ভাব" জাতীয় কিছু বলে বুঝিয়ে দিতেন উত্তর ঠিক হচ্ছে না।

মৌসুমী উত্তর ২০০ টাকা লিখে স্বাক্ষর করলো। এই উত্তরটাও মৌসুমী ও সাধনবাবুর ভুল হলো। উত্তর হবে ১০০ টাকা। কারণ, শ্যাম মধুর কাছ থেকে ১০০ টাকা পেয়েছিল, ১০০ টাকাই ফিরিয়ে দিল। লাভ-ক্ষতি শূন্য। ক্ষতি শুধু রামকে, দেওয়া ৫০ টাকার জিনিস ও ৫০টি টাকা।

ব্যর্থতা ও অনিশ্চিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাধনবাবু বললেন, "ও ফিজিক্স, কেমেস্ট্রিতে অনার্স স্ট্যান্ডার্ডের। ওকে বুঝতে হলে ওই সব নিয়ে প্রশ্ন করুন।"

এমন একটা অবস্থার জন্যও তৈরি ছিলাম। পাঁচটা প্রশ্ন লিখে উত্তর দেওয়ার মত জায়গা রেখে হাজির করলাম মৌসুমীর সামনে। প্রশ্নগুলো অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বি এস সি পাশ কোর্স মানের। প্রথম প্রশ্ন "What is the formula of Chrome alum ?"

মৌসুমী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা ইংরেজিও পড়তে পারছিল না। পড়ে বাংলা মানে করে দেওয়ার পরও মৌসুমী উত্তরের সংকেতের আশায় বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বাবা বললেন, "মনে নেই পটাসিয়াম অ্যালার্মের ফর্মূলা ?" বাবার সব চেষ্টাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে মৌসুমী লিখল "No"। করলো স্বাক্ষর।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল "What is the clue of chemical reactions ?" মৌসুমীকে পূর্ববৎ বাংলা মানে করে দিতে হলো। মৌসুমী আবার দীর্ঘ সময় নিয়ে শেষ পর্যন্ত লিখলো "No"। করলো স্বাক্ষর।

তৃতীয় প্রশ্ন "What is the equivalent weight of an acid ?" প্রশ্ন নিয়ে মৌসুমী এবারও খাবি খেল। সাধনবাবু বললেন, "অ্যাসিড কাকে বলে মনে নেই।" মৌসুমী দম দেওয়া পুতুলের মত বলে গেল, অ্যাসিড কাকে বলে। সাধনবাবু মেয়েকে বার বার করে ধরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু মৌসুমী আবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে লিখলো "No"।

চতুর্থ প্রশ্ন "What is dynamic allotropy ?" বাংলা মানে বলে দেওয়া সত্ত্বেও মৌসুমীর কিছুই বোধগম্য হলো না। বাবা allotropy-র মানে ধরিয়ে দিতে বলেছিলেন, "কার্বন মানে হিরে।" না, মৌসুমী তাও উত্তর খুঁজে পায়নি। লিখেছিল "No"।

শেষ প্রশ্ন ছিল "What is the condition for the angle of contact to wet the surface ?" এবার বাংলা করে দেওয়া সত্ত্বেও মৌসুমী কেন, সাধনবাবুও মানে ধরতে পারলেন না।

প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তরের পাতায় সাধনবাবু ও সাক্ষী হিসেবে সুবীরকুমার চ্যাটার্জির স্বাক্ষর করিয়ে নিলাম।

সাধনবাবুর নিজের বাড়ি রেল-কোয়ার্টারের কাছেই। সেখানেই মৌসুমীর গবেষণাগার। আমরা সকলেই গেলাম সেখানে। ছোট বাড়ি। তারই ঘরের দেওয়ালের র‍্যাকের দুটি সারিতে কয়েকটা টেস্ট টিউব, রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক ইত্যাদি সাজান। এটাকে গবেষণাগার বললে গবেষণা ব্যাপারটাকেই ছেলেখেলা পর্যায়ে টেনে নামান হয়।

সাধনবাবুকে বললাম, "আলোকপাত পড়ে জানলাম, মৌসুমীর টাইপের স্পিড ইংরেজিতে ৯০ এবং বাংলায় ৪০। ওর টাইপের স্পিড নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন কথা লেখা হয়েছে। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে—আমার মত অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না। এ বিষয়ে আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।"

সাধনবাবু জানালেন, "ইংরেজিতে ওর স্পিড মিনিটে ৬০, তবে বাংলায় ধরে ধরে টাইপ করে। কোনও স্পিড নেই।"

ইংরেজি টাইপের পরীক্ষা নিতে চাওয়ায় শিপ্রা দেবী একটা বই এগিয়ে দিলেন মেয়ের দিকে। আমি সেই বইটা সরিয়ে এগিয়ে দিলাম 'সানডে' পত্রিকার ২৩—২৯ জুলাই সংখ্যার পৃষ্ঠা ২১। মৌসুমী টাইপ করলো ১ মিনিট সময়ে যতটা পারলো। স্বাক্ষর করলো নিজেই। সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দিলেন সাধনবাবু ও সুবীরবাবু। সাধনবাবু এও লিখে দিলেন : এটা এক মিনিটে টাইপ করা হয়েছে।

দমদম মতিঝিল কলেজের গায়ে হিলনার কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট-এর ইনস্ট্রাক্টর নিরঞ্জন দাসের সঙ্গে দেখা করে মৌসুমীর করা টাইপের পাতাটা দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, এটার টাইপিং স্পিড কত ? শ্রীদাস এই কাগজেই লিখে দিলেন স্পিড ২২। অবশ্য টাইপিং নির্ভুল ছিল না। ভুল ছিল তিনটি। আমরা কয়েকজন টাইপ

d:

One minute typing by M. Chaymalal — MMhattyo 3.9.89

SLL 3/9/89

Ona given working day, the office of Maharashtra's sotetary of urbar development, Dinesh Kumar Jain, is invaded by aby number of represent

Sunday 23-29 July
Page-21

MMChatterjee 3-9-89
134/3A, Bidhan Sarani
Calcutta. 4

Mousumi Chakraborty.

Date:- 3/9/89

মৌসুমী ও তার গবেষণাগার

শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, তাঁরা ওই অংশটুকু ৩৫ থেকে ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে করে দিতে পেরেছেন।

বিদায় লগ্নে মৌসুমীর বাবা অনুরোধ করলেন, মেয়ের ঐ অকৃতকার্যতাকে প্রকাশ না করার জন্য। সেই সঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে মৌসুমীকে অভিনন্দন জানাবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালেন।

আমাদের পাঁচ আগন্তুককে রিক্সায় তুলে দিতে এলেন সাধনবাবু। সাধনবাবুকে বললাম, "মৌসুমী খুব সুন্দর যথেষ্ট সম্ভাবনাময় একটি মেয়ে। ওর মুখ চেয়ে আপনাকে একটি অনুরোধ, ওকে না বুঝিয়ে মুখস্থ করাবেন না। এতে প্রচার হয়তো পাবেন কিন্তু এই না বুঝে মুখস্থ করার-প্রবণতা ওর বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে বাধা হতে পারে।"

৭ আগস্ট "The Telegraph" দৈনিক পত্রিকায় বক্স করে প্রকাশিত হলো মৌসুমীকে পরীক্ষা করার ও তার অনুত্তীর্ণ হওয়ার খবর।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

The Telegraph

THURSDAY 7 SEPTEMBER 1989 VOL. VIII NO. 62

Prodigy fails test by rationalist

By Pathik Guha

Calcutta, Sept. 6: Six-year-old Mousami Chakraborty is not the prodigy her parents have been making her out to be.

As a special case, Mousami has been allowed by the state government to sit for the Madhyamik examination in 1991. But rationalist Prabir Ghosh, masquarading as a journalist, met her on September 3 at Adra in Purulia and found that she could not answer a single of his IQ posers.

Mr Ghosh interviewed Mousami for an hour. He had for her five IQ posers, three class-VIII mathematical problems and five science problems. Mousami drew a blank on each of these and Ghosh has the answers on paper.

Mousami made headlines when her father took her to Writers' Buildings to meet the state relief minister, Ms Chhaya Bera. The minister was so impressed that she persuaded the education department to allow the girl to sit for the Madhyamik examination.

Earlier, Mousami's father had failed to get her admitted to class-VIII of a local school because she was underaged.

Since the visit to Writers', Mousami has been something of a celebrity. Her father has an appointment with the Prime Minister later this month. And tomorrow an organisation called Proma will be "honouring" the little girl at Sisir Mancha.

Mousami's parents say she knows Dutch, German, Hindi and has a typing speed of 45 words per minute.

Mr Ghosh, who is a secretary of the Science and Rationalists' Association, found none of this to be true. Mr Ghosh is a veteran at debunking godmen and investigating paranormal feats.

One of the mathematical puzzles he put her was: Ram bought items worth Rs 50 from Shyam's shop. He gave him a 100-rupee note. Shyam did not have change and so he got it (exchanging the note) from a shop next to his. After Ram left Shyam's shop with the purchase, the shopkeeper came to Shyam to tell him that the 100-rupee note was a forged one and Shyam had to compensate him. How much loss did Shyam incur? Mousami's answer: Rs 200 (The correct answer: Rs 100).

Mr Ghosh believes that Mousami has an extraordinary memory and may have been tutored to answer questions by rote. But a prodigy, he says, she definitely is not.

৭ আগস্ট সন্ধ্যায় আমাদের সমিতির পক্ষে আমি এবং কয়েকজন 'রবীন্দ্র সদন'-এ উপস্থিত ছিলাম মৌসুমীর অভিনন্দন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে।

মৌসুমীকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা মত অন্নদাশঙ্কর রায় কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। মামুলি প্রশ্ন। সচেতন দর্শকরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের ইংরেজিতে করা প্রশ্ন "ডু ইউ ওয়ান্ট হ্যাপিনেস ?" স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলেও ও মানে ধরতে পারলো না। উত্তর দিল "আই ওয়ান্ট টু বি এ সায়েনটিস্ট"। অন্নদাশঙ্কর হেসে ফেলে আবার প্রশ্নটা করলেন। মৌসুমী বিষয়টা ধরতে চাইছিল কিন্তু পারছিল না। পাশে বসা কৃষ্ণ ধর প্রশ্নটা বাংলা করে দিলেন। এরপরও অন্নদাশঙ্কর যেসব ইংরেজি প্রশ্ন করেছিলেন, তার বাংলা অনুবাদ করে দিতে হয় পাশে বসা কৃষ্ণ ধরকে।

সাধনবাবু কিছু বলতে উঠলেন। মেয়ের বিষয়ে অনেক কিছুই বললেন। আবারও ঘোষণা করলেন হিন্দি, ইংরাজি, ডাচ, জার্মান ভাষা জানে। সাধনবাবুই মেয়েকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। ও উত্তর দিল। আমি প্রমা সংস্থার অন্যতম ব্যবস্থাপক সুধীরবাবু ও শংকরবাবুকে বললাম আমাকে কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি দেবেন ? সভার পরিচালক অমিতাভ চৌধুরী আমাকে অনুরোধ করলেন কোনও প্রশ্ন না করতে এবং সাধনবাবুর মিথ্যা ভাষণের প্রতিবাদ না করতে। যুক্তি হিসাবে শ্রীচৌধুরী দুটি কারণ দেখিয়েছিলেন। এক : মেয়েটি তার অভিনন্দন অনুষ্ঠানেই অপমানিত হলে চরম আঘাত পাবে। দুই : অনুষ্ঠানে গোলমাল হতে পারে। অগ্রজ-প্রতিম অমিতাভ চৌধুরীর অনুরোধকে আদেশ হিসেবে শিরোধার্য করে নিয়েছিলাম।

৭ সেপ্টেম্বরের টেলিগ্রাফে মৌসুমীর বিষয়ে আমাদের সমিতির মতামত প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই, অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বরের টেলিগ্রাফে দেখলাম সাধনবাবু টেলিগ্রাফের সাংবাদিককে জানিয়েছেন, সে দিনের পরীক্ষায় খারাপ করার কারণ মৌসুমী সেদিন 'ব্যাড মুড'-এ ছিল এবং কিছু প্রশ্ন ছিল সাধনবাবুরও বোধশক্তির অগম্য। মৌসুমীকে নাকি আমি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলের প্রশ্ন করেছি। আই কিউ-এর প্রশ্নগুলো নাকি ব্যাঙ্কের প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ পরীক্ষায় দেওয়া হয়। অনুবাদ করতে দিয়েছিলাম গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের। তারপরই সাধনবাবু আবার পরীক্ষা করার জন্য আমার ও আমাদের সমিতির উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

সেই সঙ্গে জানিয়েছেন এটা ভুললে চলবে না সে সাত বছরের শিশু এবং ১৯৯১-এ মাধ্যমিকে বসবে।

মৌসুমীর মুড ছিল না বলে সবই ভুল করেছে, এমনটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। তবু আমরা সাধনবাবুর দেওয়া আবার পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছি।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন, সংবাদ সরবরাহ সংস্থা সহ প্রচার মাধ্যমগুলো, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, মধ্য শিক্ষা পর্যদের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত এক বক্তব্যে আমাদের সমিতির পক্ষে সভাপতি ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জি জানান, মৌসুমীকে পরীক্ষা করতে কী কী ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌসুমীর ব্যর্থতার খবর। আরও জানান, মৌসুমী লিখিতভাবেই জানিগেছে 'ডাচ', 'জার্মান' জানে না, হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, ইংরেজিতে টাইপ করেছে ২২ স্পিডে, তা[illegible] টাইপে

Child prodigy was in a bad mood

Calcutta, Sept. 7: The seven-year-old child prodigy, Mousami Chakraborty, said here today that she "performed miserably" in a recent test by rationalists because she was "in a bad mood on the day of the interview and some of the questions were beyond my comprehension."

Mousami was honoured by Proma a cultural organisation for "being endowed with surprising qualities of memory and intelligence" at a function in Rabindra Sadan here today. The noted litterateur Ananda Shankar Ray presented Mousami with a trophy and praised the girl's "unique perception of knowledge considering her tender age."

Mousami's father, Mr Sadhan Chakraborty, a resident of Adra, today criticised Mr Prabir Ghosh, secretary of the Science and Rationalist Association for "passing a hurried judgment about the girl's intelligence without resorting to any scientific ways of assessing her intelligence." He said, "Mousami is just seven years old and she has been allowed to sit for the Madhyamik examinations in 1991 whe she would be nine years old. But the questions asked by Mr Ghosh were of post graduate level."

Referring to the IQ posers which Mousami could not answer, Mr Chakraborty said the questions asked were those asked in tests for probationary officers in Indian banks. The Bengali to Hindi translation was "too difficult and surely of the graduate level. You cannot just expect her to know everything. It would be unjust to say that because she is out of the ordinary, there is nothing she does not know."

Mr Chakraborty said he challenged the rationalist to test his daughter once again after the questions were vetted by independent authority. "It is not without reason that the West Bengal government has allowed my daughter to appear for the Madhyamik examinations in 1991 where her actual talents will be tested."

Mousami's mother said it was true that the seven-year-old girl had an exceptional memory and "does not forget anything if she has read it only once." Mousami is also a talented singer and has composed many songs, she added. "We must appreciate that the girl has several marvellous qualities which she has proved to several journalists, ministers and professors. And it is they who discovered the prodigy." After being honoured at the function here, Mousami recited by rote the Oath of President of India.

However, Mousami faulted while mentioning the birthday of Ananda Shankar Ray.

ভুল ছিল। মৌসুমীর বাবা দাবি করেছেন—অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল গ্রাজুয়েট লেভেলের, আই কিউ ছিল ব্যাঙ্কের প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ পরীক্ষা পর্যায়ের এবং প্রশ্নগুলো ছিল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলের। আমরা সেভেন, এইটের কয়েকজন ভাল ছাত্র-ছাত্রীকে ওইসব অঙ্ক, আই কিউ ও ইংরেজি অনুবাদ করতে দিয়ে দেখেছি, তারা প্রত্যেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরদানে সমর্থ হয়েছিল। মৌসুমীর বাবা আমাদের সমিতিকে জানিয়েছিলেন, মৌসুমীর জ্ঞান যদিও অনার্স গ্রাজুয়েটের মান অতিক্রম করেছে, কিন্তু শুধুমাত্র আইনসম্মতভাবে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়োজনে ও '৯১-তে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। মৌসুমীর বাবা যে হেতু জানিয়েছিলেন পরীক্ষা গ্রহণের দিন মৌসুমী মুডে ছিল না, আমরা মৌসুমীকে কিছু প্রস্তাব রাখছি।

১। মৌসুমী যখন ভাল 'মুডে' থাকবে তখন আবার ওর পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের সংস্থা মৌসুমীর এবং ওর মা-বাবার যাতায়াত খরচ পর্যন্ত বহন করবে।

২। সংবাদপত্র, দূরদর্শন, বেতার এবং অন্যান্য প্রচার-মাধ্যম, শিক্ষা দপ্তর ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর মৌসুমীর বিষয়ে পরীক্ষা চালাতে চাইলে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবো।

৩। মৌসুমীর মা-বাবা মৌসুমীর মেধার সত্যিকার মান বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করুন।

তাঁরা কখনো বলছেন মৌসুমীর জ্ঞান অনার্স গ্রাজুয়েট মানের, কখনো বা বলছেন, এটা ভুললে চলবে না, মৌসুমী '৯১-এ মাধ্যমিক দেবে।

বহু ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় আমাদের সমিতির এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে আবার পরীক্ষায় হাজির করতে সম্ভাব্য সমস্ত রকম চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মৌসুমীর বাবা-মা তাঁদের দাবির সত্যতা প্রমাণে এগিয়ে আসেননি।

সেই সময় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কোলফিল্ড টাইমস'-এ প্রকাশিত একটি লেখায় বলেছিলাম—

সাধনবাবুকে একটা স্পষ্ট কথা বলি, আপনি নিজে চিন্তা-ভাবনা করে জানান মৌসুমীর জ্ঞান কোন্ পর্যায়ের। তারপর তা আবার ঘোষণা করুন। আপনিই এতদিন সংবাদ মাধ্যমগুলোকে বলেছেন মৌসুমী গবেষণা করছে, জ্ঞান অনার্স লেভেলের, দারুণ আই কিউ, দারুণ টাইপ স্পিড, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ডাচ জানে (যা ৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনেও প্রকাশ্যে বলেছেন), আজ তা হলে বলছেন কেন এটা ভুললে চলবে না ও সাত বছরের মেয়ে ১৯৯১-তে মাধ্যমিক দেবে। আপনি কি মানুষকে বোকা বানাতে সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিতে চাইছেন?

ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের পক্ষে ২২ স্পিডে টাইপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু ৬০-৯০-এ তোলার মিথ্যে চেষ্টা কেন? কোন উদ্দেশ্যে ডাচ, জার্মানের মিথ্যে গল্প ফাঁদছেন? কোন্ উদ্দেশ্যে ওর গায়ে অনার্স লেভেলের তকমা এঁটেছেন? গবেষক ইত্যাদি উদ্ভট কথা বলেছেন? বহু সংবাদ মাধ্যমকে এইসব কথা বলার পর এখনি কি আবার 'বলিনি' বলবেন ভাবছেন? আপনি যে বাস্তবিকই ওসব কথা বলেছেন, এমন প্রমাণ হাজির করলে কী করবেন ভেবেছেন কি? আবার একটি বিনীত অনুরোধ, মৌসুমীকে 'দেবী' বা 'দেবশিশু' বানিয়ে শেষ করে দেবেন না।

একটি স্বার্থান্বেষী মহল থেকে চক্রান্তও শুরু হয়ে যায় তারপরেই। প্রচার করতে থাকেন, 'সাত বছরের বাচ্চার পিছনে লেগেছে,' 'বাঙালী হয়ে বাঙালীকে বাঁশ দিচ্ছে', 'নাম কেনার জন্য চিপ স্টান্ট দিচ্ছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের উদ্দেশ্যে জানাই—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রসার চায়। যুক্তি মিথ্যেকে আশ্রয় করে থাকতে পারেনা। কোন্ রাজনৈতিক নেতা, কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি, কোন্ প্রচার মাধ্যম কাকে সমর্থন করেছে দেখে সত্যানুসন্ধানে নামা বা না নামাটা আমাদের সমিতি ঠিক করে না। যাঁরা সাত বছরের বাচ্চার প্রসঙ্গ তুলেছেন, সাত বছরের বাচ্চাটির ক্ষতি তাঁরাই করছেন। তিলে তিলে মিথ্যে প্রচারের পাঁকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন একটা শিশুর সম্ভাবনাকে, একটা সত্যকে। ধ্বংস করতে চাইছেন একটা আন্দোলনকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে। মিথ্যাচারীদের সহানুভূতি ও কৃপার উপর কোনও আন্দোলন কোনদিনই গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠবেও না। সমালোচকদের প্রতি আর একটা জিজ্ঞাসা—আপনারা কি চান এরপর থেকে যুক্তিবাদী সমিতি বয়স, লিঙ্গ, বাঙালি-অবাঙালি ইত্যাদি বিচার করে মিথ্যাচারিতা ধরতে নামবে? যাঁরা সমালোচনার গণ্ডি পার হয়ে 'নাম কেনার জন্য মিথ্যা চিপ স্টান্ট' বলে নোংরা কুৎসা ছড়াচ্ছেন, তাঁদের কাছে আমাদের চ্যালেঞ্জ—সাহস থাকলে সামনাসামনি প্রমাণ করুন আপনাদের বক্তব্যের সত্যতা।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন ও পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি'র অষ্টম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বক্তা হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর '৯০ আমন্ত্রিত ছিলাম। কয়েক হাজার শিক্ষক ও সাক্ষরতা কর্মীদের সোচ্চার জিজ্ঞাসা ছিল মৌসুমীকে ঘিরে। উত্তরে সব কিছুই জানিয়েছিলাম। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, মৌসুমী কি সত্যিই মাধ্যমিকে প্রথম হবে বলে মনে করেন ?

বলেছিলাম, আগের দাবি প্রমাণের ক্ষেত্রে দেখেছি মৌসুমীর মা-বাবা যে ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে এমনটা ঘটা অস্বাভাবিক নয়, মৌসুমীর মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রেও কিছু ফাঁক ও ফাঁকির ব্যবস্থা থেকেই যাবে, অর্থাৎ বাইরে থেকে মৌসুমীকে সহায়তা করার সুযোগ থেকেই যাবে।

১৭ সেপ্টেম্বর '৯০-এ 'আজকাল' দৈনিক পত্রিকায় 'রবিবাসর'-এ পাভলভ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখা প্রকাশিত হলো। ১৩ আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বক্তব্য থেকে তিনি অদ্ভুত রকম সরে এসেছেন, লক্ষ্য করলাম। ১৭ সেপ্টেম্বর লিখছেন, "মৌসুমীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। কাগজপত্রে তার কথা পড়েছি, আর শুনেছি আমার সহকর্মী ডঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। ডঃ মুখোপাধ্যায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি মৌসুমীর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি তিনি আর সকলের মত কোন প্রশ্ন না করে মৌসুমীকে শুধু অবজার্ভ করে গেছেন। তাঁর কাছে যা শুনেছি এবং কাগজপত্রে যা পড়েছি তাতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। সকলেই বলেছেন, মৌসুমীর তাৎক্ষণিক স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর।....সুতরাং মৌসুমীকে নিয়ে হইচই করার কোন কারণ নেই। মনে রাখতে হবে স্মৃতির সঙ্গে বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। তার স্মৃতির মত বুদ্ধি ততটা নেই শুনেছি।"

কিন্তু বাসুদেববাবুর কাছ থেকে শুনে ও কাগজপত্র পড়ে আনন্দবাজার প্রতিনিধিকে যে জানিয়েছিলেন, মৌসুমীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পিছনে সুপ্ত জিনের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনার কথা। মৌসুমীর বুদ্ধির যে স্তর তাতে বিদেশে বিশেষত আমেরিকায় ওর শিক্ষার ব্যবস্থা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এরপর এমন কী ঘটলো, যাতে মাত্র ১ মাস ৪ দিনের মধ্যেই তাঁর মত খ্যাতিমান মানসিক ব্যাধির চিকিৎসককে এমন অস্বাভাবিক রকমের মত পাল্টে বিপরীত কথা বলতে বাধ্য হলেন ? তবে কি 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ৭ সেপ্টেম্বরে "Prodigy fails test by rationalist" শিরোনামের প্রকাশিত খবরটিই তাঁকে এই বিপরীত বক্তব্য প্রকাশে বাধ্য করেছে ? ওই সংবাদের শেষ পংক্তিতে ছিল "Mr. Ghosh believes that Mousami has an extra-ordinary memory and may have been tutored to answer questions by rote." অর্থাৎ 'শ্রী ঘোষ মনে করেন, মৌসুমীর স্মৃতি অসাধারণ এবং ওকে কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করান হয়েছে।" আর তাইতেই কি মৌসুমীর স্মৃতিকে 'খুব প্রখর' বলে মেনে নিয়েছেন ? জানিনা, প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্ণধার সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর মালাকারের সঙ্গে ওই ৩ সেপ্টেম্বরই আমার মৌসুমীর স্মৃতি বিষয়ে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তা যদি কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ডাক্তার গাঙ্গুলীর নজরে পড়ত, তারপরও ডঃ গাঙ্গুলি মৌসুমীর স্মৃতি বিষয়ে নিজের বর্তমান মতে স্থির থাকতেন কি না ? সুবীরবাবু ও শঙ্করবাবুকে বলেছিলাম, "মৌসুমীর যে স্মৃতি দেখে আপনারা বিস্মিত তেমন স্মৃতি শক্তি তৈরি করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আপনারা তো অনুষ্ঠান স্পনসর করেন। স্মৃতি শক্তির এক মজার পরীক্ষার সঙ্গে উৎসাহী দর্শকদের পরীক্ষা করতেই না হয় স্পনসর করলেন। ফেব্রুয়ারি নাগাদ রবীন্দ্রসদন 'বুক' করুন। হিন্দু, বেথুন, রামকৃষ্ণ মিশন, সেন্ট জেভিয়াস, সাউথ পয়েন্টের মত ভাল স্কুলের ক্লাস এইট-নাইনের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ছটি আগ্রহী ভাল ছাত্র-ছাত্রী বেছে আমার হাতে তুলে দিন সাত দিনের মধ্যে। অনুষ্ঠানের দিন দর্শকদের সামনে হাজির করুন মৌসুমীকে ও আমার হাতে তুলে দেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের। হলের যে কোনও একটা অংশকে বেছে নিয়ে পঞ্চাশটির মত দর্শকাসন রঙিন রিবন দিয়ে ঘিরে দিন। রিবন ঘেরা দর্শকদের এক এক করে নিজেদের নাম বলতে বলুন। নামগুলো টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখুন। তারপর মৌসুমী ও ওই ছ'টি ছেলে-মেয়েকে দর্শকদের নাম বলতে বলুন। দেখুন, মৌসুমী কতজনের ঠিক বলতে পারে। আশা রাখি আমার ছ'জনই প্রতিটি দর্শকের নাম বলতে পারবে।

সুবীরবাবু ও শঙ্করবাবু যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, "মৌসুমীরা দু-চার দিনের মধ্যেই তো কলকাতায় আসছে, সেই সময় এ বিষয়ে সাধনবাবুর সঙ্গে কথা বলে নেব। ওঁরা রাজি হলে নিশ্চয়ই স্পনসর করবো।" জানুয়ারি '৯১ অতিক্রান্ত। সুবীরবাবুদের মৌসুমীকে হাজির করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, চলতি কথায় যাকে 'স্মৃতিশক্তি বাড়ানো' বলে, সেই 'স্মৃতি বৃদ্ধি' বিষয়ে জানতে ও স্মৃতি বাড়াতে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের উৎসাহ মেটাতে 'স্মৃতি প্রসঙ্গ' নিয়ে ভবিষ্যতে একটি বই লেখার ইচ্ছে আছে।

মৌসুমী প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রথম ঘটনা : ১৭ সেপ্টেম্বর '৮৯

আজকাল পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অমিতাভ চৌধুরী লিখলেন, "মৌসুমীকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে বছর দুয়েক। মৌসুমী যে একটি অসাধারণ প্রতিভা সে বিষয়ে কোন কাগজেরই দ্বিমত নেই। কিন্তু যে মেয়ে বলে আগামী আড়াই বছরের মধ্যে, অর্থাৎ সাড়ে ন'বছর বয়সে সে নোবেল প্রাইজ পাবে, তখন সন্দেহ হয় তার এই প্রতিভা ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে তো ? তাছাড়া সেদিন রবীন্দ্রসদনে সে প্রতিভার পরিচয় দিলেও অন্নদাশঙ্কর যেসব ইংরেজি প্রশ্ন করেছিলেন, তার বাংলা অনুবাদ করে দিতে হয় পাশে বসা কৃষ্ণ ধরকে।"...."মৌসুমীর বিস্ময়কর প্রতিভা স্বীকার করে নিয়েও বলতে ইচ্ছে করছে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ? প্রথমত একটা রঙ্গমঞ্চে তাকে হাজির করে একমাত্র তার বাবাই অনবরত প্রশ্ন করে যাবেন এবং সে সবকটির নির্ভুল উত্তর দেবে—এর মধ্যে কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে বলে মনে হয়।"...."মৌসুমীর প্রতিভা যাচাইয়ের ভার তার বাবার ওপর না ছেড়ে অন্য কোন বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে দেওয়া উচিত।"

দ্বিতীয় ঘটনা : আদ্রা থেকে ফেরার পর মৌসুমীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আগে সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তের সঙ্গে মৌসুমীর প্রসঙ্গ নিয়ে ফোনে কথা হয়। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, মৌসুমী অন্য পত্রিকা প্রতিনিধিদের সামনে অত দ্রুততার সঙ্গে টাইপ করছে কী করে ?

বলেছিলাম, "সাংবাদিকদের সামনে মৌসুমী টাইপ করেছিল নিশ্চয়ই ওর মা-বাবার এগিয়ে দেওয়া কোনও বইয়ের অংশ, যে সব অংশ ও দীর্ঘকাল ধরে টাইপ করে করে অতি-অভ্যস্ত।" মৌসুমীর অসাধারণ সব উত্তরদান প্রসঙ্গে জানিয়েছিলাম, "সাধারণত মৌসুমীকে প্রশ্ন করার দায়িত্ব পালন করেন সাধনবাবু স্বয়ং। এমনভাবে উনি প্রশ্ন করা শুরু করেন যেন সাংবাদিকদের সাহায্য ও সহযোগিতা করতেই ওঁর প্রশ্নকর্তার ভূমিকা নেওয়া। সাধনবাবুর বাক্য-বিন্যাসে মোহিত হয়ে এরপর কেউ যদি সাধনবাবুর ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন, তবে দেখা যাবে মৌসুমী সঠিক উত্তর দিয়ে চমকে দিচ্ছে। সাধনবাবুর দ্বারা চালিত না হয়ে প্রশ্ন করলে অর্থাৎ প্রকৃত পরীক্ষা করলে মৌসুমীর তেমন বিস্ময়কর প্রতিভার কিন্তু হদিশ মিলবে না।"

১৭ সেপ্টেম্বর '৮৯ 'আজকাল', 'রবিবাসর'-এর একটা পুরো পৃষ্ঠা ছিল মৌসুমীকে নিয়ে লেখায় ও ছবিতে সাজান। তাতে ছিল মৌসুমীর এক দীর্ঘ ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরে। নিয়েছিলেন অরুন্ধতী মুখার্জী। শ্রীমতী মুখার্জীর লেখা দুজনের কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। "মৌসুমীকে প্রশ্ন করার ভার নিলেন ওর বাবা—সাধন চক্রবর্তী। জিজ্ঞেস করলেন, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কী কী উদ্দেশ্য। মৌসুমী প্রথমত, দ্বিতীয়ত করে পাঁচটি পয়েন্ট টানা মুখস্থ বলে গেল। অদ্ভুত দ্রুত উচ্চারণে—একবারও না থেমে। আর আমি সুযোগ পেলাম না। ওর সাত বছরের মেয়ের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত প্রশ্ন করে চললেন ইংরেজিতে। ইংরেজিতে উত্তরও। সবই সঠিক। গড়গড় করে উত্তর—কোন অ্যাকসেন্টের বালাই না রেখেই। বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস সবের ওপর প্রশ্নবান ছুঁড়লেন তিনি। একটি বানও বিদ্ধ করতে পারেনি তার মেয়েকে।"...."প্রায় আধঘন্টা চলল বাবা-মেয়ের ক্যুইজ টাইম। জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি যা বলছ বাংলায়

বলতে পারবে ?"

পাশ থেকে ওর বাবা—হ্যাঁ পারবে।

ইংরেজিতে আবার বাবার প্রশ্ন, রাজীব গান্ধী কবে প্রধানমন্ত্রী হন ?

—থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইট্টি ফোর।

প্রশ্নটা বাংলায় বলে বাংলায় উত্তর চাইলাম। এবারও স্মার্ট মেয়ে মৌসুমী দ্রুততার সঙ্গে বলল, থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইট্টি ফোর।

(এখানেও সাধারণ বোধ-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে স্রেফ মুখস্থ উগড়ে গেছে।)

আবার ওর বাবা শুরু করলেন, কলকাতার জন্ম কবে হয়েছিল ? এটা কলকাতার কত বছর ? কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কবে হয়েছিল ?

এবার বাধা দিলাম আমরা—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জিনিসটা কী ?

—উত্তর দেয়নি মৌসুমী।"

..."স্টেফি গ্রাফের নাম শুনেছ ?

—১৯৮৮-র গোল্ডেন গার্ল।

—সে কী করে ?

—(একটু চুপ থেকে) রান.....রান করে.....।

পাশ থেকে উৎসাহে ওর বাবা বললেন—বল, বল, কত মিটার।"

মৌসুমী এই বয়সে মৌসুমী যা পারে, অনেকেই পারে না। মৌসুমীর স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের স্বার্থেই তার মা বাবার উচিত ওই ধরনের মুখস্থ করাবার প্রবণতা থেকে বিরত থাকা। মৌসুমী জীবন্ত সরস্বতী বা সরস্বতীর অংশ, প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা তাৎক্ষণিক লাভের আশায় শুধুমাত্র মানুষকে প্রতারিতই করছেন না, একটি শিশুকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছেন।

বক্সিংয়ের কিংবদন্তী মহম্মদ আলি শূন্যে ভাসেন আল্লা-বিশ্বাসে !

কিংবদন্তী বক্সার ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলি তাঁর সোনালি দিনগুলোয় দুনিয়া কাঁপিয়ে ছিলেন স্ব-উদ্ভাসিত 'রোপ-এ-ডোপ' কৌশলে। আবার কাঁপালেন বড়দিনের ঠিক পরের দিনই।

মঙ্গলবার বড়দিনের রাতে আলি কলকাতায় পৌঁছোন। কলকাতায় আসার আগে আলি কালিকট ও বোম্বাই গিয়েছিলেন বিভিন্ন সমাজসেবী ধর্মীয় সংস্থাকে উৎসাহিত করতে। গত কয়েকটা বছর আলিকে দেখা গেছে ধর্মীয় ও সমাজসেবী সংস্থাগুলোর পাশে। অধ্যাত্মবাদী চিন্তা যে তাঁকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে, অধ্যাত্ম-জগতেই যে তিনি ডুবে থাকতে চান, তা তাঁর জীবনচর্যা থেকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতা থেকে আলি নেমে এসেছিলেন মানুষ দেবতাদের কাছাকাছি। আর্ত ও শিশুদের সেবার মধ্যেই আল্লার সেবা করতে চেয়েছিলেন, আল্লাকে পেতে

চেয়েছেন আপন করে। এমনই এক সন্ধিক্ষণে আলি এমন এক বিশ্ব-কাঁপানো ঘটনা ঘটালেন, যা তাঁকে রাতারাতি মানুষের দেবতা করে দিল। দীর্ঘদেহী আলি শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোরে নিজেকে শূন্যে ভাসিয়ে রেখে বুঝিয়ে দিলেন—মাটির বুকে নেমে এসেও রয়ে গিয়েছেন সবার চেয়ে কিছুটা উপরে। যে কথা বারংবার শুনিয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে, "আলি ইজ আলি। আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট।" সে কথাটাই আবার সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন বক্সিং জগৎ থেকে অধ্যাত্মিক জগৎ ও সেবার জগৎ-এ প্রবেশ করে।

২৭ ডিসেম্বর '৯০ বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকাগুলোয় বিশাল গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হলো আলির শূন্যে ভেসে থাকার অসাধারণ কাহিনী। পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মেটাতে নমুনা হিসেবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজার থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি। খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠাতেই আলির বিশাল ছবি সহ বিরাট করে।

বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব, বলেন আলি

স্টার্ফ রিপোর্টার : ছয় ফুটের উপরে লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মহম্মদ আলি। হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন দেহের সমান্তরালে। কয়েক সেকেণ্ড পরে উপস্থিত সাংবাদিক, আলোকচিত্রীদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হোটেলের ঘরে মেঝে থেকে ইঞ্চি দুয়েক উপরে উঠে গেলেন তিনি। প্রায় নির্ভার একটি পালকের মতো কয়েক সেকেণ্ড শূন্যে ভেসে থাকলেন বক্সিংয়ের কিংবদন্তী নায়ক। তারপরে মাটি ছুঁলো তাঁর পা। হতবাক দর্শকদের দিকে ফিরে অস্ফুটে বললেন আলি : বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব, বিশ্বাসই আসল।"... "আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতা থেকে নেমে এসেছেন মাটির কাছাকাছি। তবু সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকেও নেই তিনি," ....."শূন্যে ভেসে থেকে তিনি সেটাই বোঝালেন সবাইকে।"

আলির শূন্যে ভাসা নিয়ে তোলপাড় শুরু হতেই রহস্যভেদের আমন্ত্রণ এলো 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে। আমন্ত্রণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

বিশ্বাসের জোরে, স্রেফ বিশ্বাসের জোরে আলি ভেসে ছিলেন !! মেনে নিতে মন চায় না। যতই প্রত্যক্ষদর্শী থাকুক, নিজের চোখে একবার না দেখে আমার পক্ষে মেনে নেওয়াটা···· না, কিছুতেই পারলাম না। বারবারই মনে হতে লাগলো ফাঁকিটা প্রত্যক্ষদর্শীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি এ-জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় কিছু কিছু ফাঁক থেকেই যায়। তবু প্রাথমিক একটা ধারণা গড়ে তুলতে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। এক সাংবাদিক বললেন, "আলি একটা অন্য ব্যাপার। উনি যখন এসে দাঁড়ালেন, ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো ওঁর সারা শরীর থেকে যেন একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে।

এখনও ভাবতে গেলে গা শিরশির করে। ও এখন অন্য জগতের মানুষ। খুব কাছ থেকে ওঁর শূন্যে ভাসা দেখেছি। না স্টেজ, না আলোর কারসাজি, উনি শূন্যে ভেসে রইলেন। না না, এতে কোনও কৌশল-টৌশলের ব্যাপার ছিল না।"

আর এক সাংবাদিক বন্ধু জানালেন, "আলি তো অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করেননি। যোগ ক্ষমতার দ্বারা তো এমনটা করা যায়ই। আমাদের দেশে এ তো নতুন কিছু নয়। অনেক সাধু-সন্তরাই যোগ ক্ষমতায় এমনটা ভেসে দেখিয়েছেন। এমনটা যে ভেসে থাকা যায় সে তো প্রমাণ হয়েই গেছে।"

এক সাহিত্যিক বন্ধু তো একটা গল্পই শোনালেন। একটি বিখ্যাত সাধকদের জীবন-গ্রন্থে নাকি আছে, কোনও এক সাধু গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসে ভর করে হেঁটে উত্তাল নদী পার হচ্ছিলেন। সাধু হেঁটে চলেছেন ঈশ্বর বিশ্বাসে বুঁদ হয়ে, নেশাগ্রস্ত মানুষের মত। পাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ সাধু হুঁশ ফিরে পেলেন—আমি এতটা পায়ে হেঁটে চলে এসেছি। শেষ পথটুকু পার হতে পারব তো ? যেমনি ভাবা,অমনি টুপ করে এক টুকরো পাথরের মতই ডুবে গেলেন। আসলে বিশ্বাসই সব। ঈশ্বরে অন্ধ বিশ্বাস রাখলে অমন অনেক কিছুই ঘটে, ঘটান যায়—যেগুলো সাধারণ মানুষদের চোখে 'অলৌকিক' বলেই প্রতিভাত হয়।

স্টেজে নয়,-হোটেলের ফ্লোরে মোট দু'বার সাংবাদিকদের শূন্যে ভেসে দেখিয়েছেন আলি। কী এমন কৌশল !! যার ফলে একজন মানুষ একটু একটু করে উঠে পড়েন শূন্যে ? যে সব তথাকথিত অবতাররা শূন্যে ভাসেন বলে কথিত আছে তাঁদের সে-সব কৌশল আমার অজানা নয় (উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানাই 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর প্রথম খণ্ডে সেইসব গোপন কৌশল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি বহু ছবি সহ)। তাঁরা কেউই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যে উঠে পারেননি। এ এক নতুন ভাবে শূন্যে ভাসা, নতুন পদ্ধতিতে শূন্যে ভাসা !

২৯ ডিসেম্বর শনিবার দুপুরে আমাদের সমিতির জ্যোতি মুখার্জিকে সঙ্গী করে তাজ বেঙ্গল হোটেলে পৌঁছোলাম। তখন হোটেলের লাউঞ্জে আলির খবর সংগ্রহ করতে সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকদের ভিড়। শুনলাম, তিনদিন ধরে সকাল থেকে রাত ওঁরা ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন। কিন্তু আলিকে যাঁরা এদেশে এনেছেন তাঁদের হার্ডেল টপ্‌কে ৩২৪ নম্বর ঘরে ঢুকে আলির সঙ্গে আলাপ জমাবার সুযোগ পাননি কেউই। আলি একতলার রেঁস্তোরায় এলে বা বাইরে বেরুলে আলিকে ফিল্ম বন্দী করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু নিশ্ছিদ্র পাহারা এড়িয়ে কথা বলার তেমন সুযোগ জুটছে না।

'আজকাল'-এর সাংবাদিক অনুরূপ ভৌমিক ও চিত্র-সাংবাদিক সজল মুখার্জির দেখা পেলাম হোটেল লাউঞ্জেই। তারপর প্রতীক্ষা। আলির মুখোমুখি হতে পারলেও তাঁর মত বিশাল ব্যক্তিত্ব আমার অনুরোধকে মর্যাদা দিয়ে আবার শূন্যে ভেসে দেখাবেন কি না, এ বিষয়ে আমারও সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখানে এসে দেখছি—প্রবেশাধিকারের হার্ডেলই এভারেস্টের উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এরই ফাঁকে আলাপ হলো আলির জীবনী নিয়ে গড়ে ওঠা 'দ্য হোল স্টোরি'র পরিচালক লিণ্ডসে ক্লেনেল-এর সঙ্গে। জানালেন, 'দ্য হোল স্টোরি'র শুটিং উপলক্ষেই তাঁর ভারতে আগমন। ছবিটির প্রযোজক মহমেডান ক্লাবের সহ-সভাপতি মির মহম্মদ

ওমরের দাদা। খরচ হবে কয়েক লক্ষ ডলার। সারা পৃথিবীতে ছবিটি মুক্তি পাবে।

মির মহম্মদ ওমরের সহযোগিতায় ৩২৪ নম্বর ঘরে আলির মুখোমুখি হলাম। তখনও দুটো হার্ডেল অতিক্রম করা বাকি। এক : আলির শূন্যে ভাসা দেখা, দুই : শূন্যে ভাসার রহস্যভেদ। শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল ? না, আমি আর মুখ খুলছি না। আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ৩০ ডিসেম্বর 'আজকাল'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়। আলি এবং আমার ছবি সহ প্রতিবেদনটি থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি।

ফেরার দিন ম্যাজিক দেখলেন, দেখালেনও

আজকালের প্রতিবেদন : মহম্মদ আলি আবার শূন্যে ভেসে উঠলেন। একবার নয়, পাঁচবার। এবং এবার পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল ব্যাপারটা অলৌকিক নয়। যতবার শূন্যে উঠলেন একটা দিকে কাউকে থাকতে দেননি। ব্যালে নর্তকীর মত সেদিকে মুখ করে এক পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাটি থেকে উঠলেন, দূর থেকে বোঝার উপায়ও নেই, পা মাটি স্পর্শ করে আছে। বোঝা যেতও না, যদি না প্রবীর ঘোষ থাকতেন। শনিবার আলি ফিরে গেলেন। তার আগে দুপুরে তাঁর কাছে

মহম্মদ আলি ও লেখক

গিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ, যিনি নিজে ম্যাজিকের ভাণ্ডার এবং যাঁর কাজ অলৌকিক ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া। তিনিই ধরলেন ম্যাজিকটা। পরে হোটেলের লাউঞ্জে নিজে করেও দেখালেন। আধ ঘণ্টা আলির সঙ্গে ছিলেন ভদ্রলোক। জমে উঠল দারুণ আড্ডা। দুজনে মেতে উঠলেন ম্যাজিক বিনিময়ে। আলি বের করলেন ম্যাজিক বক্স। দুটো ছোট স্পঞ্জের বল নিয়ে একটা নিজের বাঁ হাতে রেখে অন্যটি দিলেন প্রবীরবাবুর হাতে। কয়েক সেকেণ্ড পর আলি হাত খুললেন, দেখা গেল হাত ফাঁকা। দুটি বলই প্রবীরবাবুর হাতে। প্রবীরবাবু এক টাকার মুদ্রা ঢুকিয়ে ফেললেন সরু মুখের একটা বোতলের মধ্যে। আবার বের করে আনলেন বোতল ও মুদ্রা অক্ষত রেখে। পরে বিস্মিত আলিকে রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন প্রবীর ঘোষ—মুদ্রাটা বিশেষভাবে নির্মিত, ভাঁজ করে সরু করা যায়। আলিকে কয়েকটা উপহার দিলেন। আলি আরও অবাক একটা মুদ্রা থেকে দুটো হওয়া দেখে।

অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার ও জ্যোতিষীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সহযোগী সংস্থায় সমন্বয়কারী হিসেবে এবং নিজের শাখা সংগঠনগুলোকে নিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে কাজ করছে। এই আন্দোলনেরই এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল—'চ্যালেঞ্জ'। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গল্পের গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যেই এই 'চ্যালেঞ্জ'। দোদুল্যমান, সুবিধাভোগী ও ঈর্ষাকাতরদের কাছে চ্যালেঞ্জ 'অশোভন' মনে হতেই পারে, কেন না, 'চ্যালেঞ্জ' বাস্তব সত্যকে বড় বেশি স্পষ্ট করে তোলে। সাধারণ মানুষের কাছে তাই আজকের জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তব সত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন?

পৃথিবীর সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাধর ও জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে সাধারণ মানুষকে এই উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে চাই—অলৌকিকত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততার অস্তিত্ব আছে শুধু পত্র-পত্রিকায়, ধর্মগ্রন্থে, বইয়ের পাতায় এবং অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়েদের গল্পে। তাই ঘোষণা করছি—

আমি প্রবীর ঘোষ, এই বইটির লেখক এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, ঘোষণা করছি বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের যে কোনও ব্যক্তি কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা যদি আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে সমর্থ হন, তাঁকে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব। আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যে ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি কৌশল ছাড়া অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যেই ঘটিয়ে দেখাতে হবে—

১। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখা।

২। যোগবলে শূন্যে ভাসা।

৩। একই সঙ্গে একাধিক স্থানে হাজির হওয়া।

৪। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জেনে দেওয়া।

৫। জলের ওপর হাঁটা।

৬। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করা, যার ছবি তোলা যায়।

৭। বিদেহী আত্মা এনে তার সাহায্যে পকেটবন্দী বা খাম-বন্দী নোটের নম্বর বলা।

৮। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।

৯। একটা নোট দেখাবো, সেই নোটের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে হবে।

১০। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চলন্ত গাড়ি থামাতে হবে।

১১। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

১২। জলকে পেট্রলে বা ডিজেলে পরিণত করতে হবে।

১৩। অলৌকিক ক্ষমতাবলে বা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের ছাপের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে হবে।

১৪। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে—

১। আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমার কাছে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেই সঙ্গে যাঁরা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর ব্যস্ততার মধ্যে ফেলার জন্য এগুতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২। যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া কারও সঙ্গেই চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।

৪। চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তির সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে অথবা দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত ও শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারলে আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব। একই সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি তাদের সমস্ত রকম অলৌকিক ও জ্যোতিষ বিরোধী প্রচার অভিযান ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবে।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেইসব অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যেগুলো নিয়ে বিভিন্ন অবতারদের বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে বা কিংবদন্তির রূপ পেয়েছে।

যদি বইটি যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার কাজে, মানুষের কুসংস্কার মুক্তির কাজে সামান্যতম ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে—আমার চেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

গ্রন্থটির সাহায্যকারী সূত্র ঃ

১। Essays in Modern Indian History : Aparna Basu
২। Communal Interpretation of Indian History : Satish Chandra
৩। Communalism in Modern India : Bipan Chandra
৪। ভারতবর্ষের ইতিহাস : রোমিলা থাপার
৫। The Communal Triangle in India : Ashoka Mehta
৬। Flim-Flam : James Randi
৭। Arigo,Surgeon of the Rusty Knife : John Fuller.
৮। পরিবর্তন
৯। আজকাল
১০। আনন্দবাজার
১১। আলোকপাত
১২। বর্তমান
১৩। বর্তিকা
১৪। বাঁকুড়া জেলা হ্যাণ্ডবুক
১৫। সুচেতনা
১৬। Witch Killing Among The Santals : A. B. Chowdhury
১৭। সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস : ধীরেন্দ্রনাথ বাস্‌কে
১৮। The Tribes and Castes of Bengal : H. H. Risley
১৯। Witchcraft and Sorcery : Max Marwick
২০। কৈশোর ও তার সমস্যা : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২১। Labashev. M., Genetics, Leningrad referred by Dmitri Lebayev.
২২। Fedosyev. P., The Problem of the Social and Biological in Philosophy and Sociology. Moscow.
২৩। Gasell A. and Amatruda C., The Embryology of Behaviour, Newyork.
২৪। Piaget Jean, Genetic Approach of The Psychology & Thoughts ; Journal of Educational Psychology
২৫। Linton. The Study of Man, New York.
২৬। Merril. Society and Culture. New Jersey.
২৭। Child of the Third World, P. P. H., New Delhi.

বিষয়-সূচী

অধ্যায় পাঁচ : ভূতুড়ে তান্ত্রিক

অধ্যায় ছয় : ডাইনি ও আদিবাসী সমাজ

অধ্যায় সাত : আদিবাসী সমাজের তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক

অধ্যায় আট : ঈশ্বরের ভর